মুসলিম আমলে বাংলার শাসনকর্তা

আসকার ইবনে শাইখ

মুসলিম আমলে
বাংলার শাসনকর্তা

মুসলিম আমলে বাংলার শাসনকর্তা ❑ আসকার ইবনে শাইখ

মুসলিম আমলে
বাংলার শাসনকর্তা

আসকার ইবনে শাইখ

পুস্তক ক্রয় ও
বিতরণ শাখা

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

মুসলিম আমলে বাংলার শাসনকর্তা
আসকার ইবনে শাইখ
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৪৬০
ইফাবা প্রকাশনা : ১৫৬৮/২
ইফাবা গ্রন্থাগার : ৯২৩. ১৫৪১৪
ISBN : 984—06—0704—9
প্রথম প্রকাশ
জুলাই ১৯৮৮
তৃতীয় সংস্করণ
আগস্ট ২০০৪
ভাদ্র ১৪১১
রজব ১৪২৫
প্রকাশক
মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা ১২০৭।
ফোন ঃ ৮১২৮০৬৮
কম্পিউটার কম্পোজ
মাহফুজ কম্পিউটার
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার
ঢাকা -১১০০।
প্রচ্ছদ শিল্পী
রায়হান শরীফ
মুদ্রণ ও বাঁধাই
এ. এম. এম. সিরাজুল ইসলাম
প্রকল্প ব্যবস্থাপক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরে বাংলানগর, ঢাকা-১২০৭
মূল্য ঃ ৯৫.০০ টাকা

MUSLIM AMALE BANGLAR SHASANKARTA (Rulers of Bengal Under the Muslim Period) : Written by Asker Ibn Shaikh in Bangla and published by Muhammad Abdur Rab, Director, Publication, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka - 1207; Phone : 8128068 August 2004
Web site : www.islamicfoundation-bd.org
E-mail : info@islamicfoundation-bd.org
Price : Tk 95.00; US Dollar : 3.00

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

বাংলায় মুসলিম বিজয়ের পটভূমি ও পূর্বকথা ৩৫-৬০

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলায় লাখনৌতি রাজ্যের প্রতিষ্ঠাকাল (১২০৩-১২২৭) ৬১-৭৪

ইখতিয়ার-উদ-দীন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী ৬২

মুহম্মদ শীরন খিলজী ৬৭

হুসাম-উদ-দীন ইওজ খিলজী ৬৭

আলা-উদ-দীন আলি মর্দান খিলজী ৬৮

সুলতান গিয়াস-উদ-দীন ইওজ খিলজী ৭০

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলায় লাখনৌতি রাজ্যের বিস্তৃতিকাল (১২২৭-১৩৩৭ সাল) ৭৫-১০৮

নিরঞ্জনের রুষ্মা ৭৬

(ক) দিল্লীর পূর্ণ আনুগত্যকাল (১২২৭-১২৭২) ৮০

নাসির-উদ-দীন মাহমুদ ৮০

দওলত শাহ্ বিন্ মওদুদ ৮০

ইখতিয়ার-উদ-দীন বলকা খিলজী ৮১

মালিক আলা-উদ-দীন জানী ৮১

মালিক সইফ-উদ-দীন আইবক ৮১

আওর খান ৮১

তুগরল তুগান খাঁ ৮২

মালিক তমর খান কিরান ৮৩

মালিক জালাল-উদ-দীন মাসুদ জানী ৮৩

মালিক ইখতিয়ার-উদ-দীন ইওজবক ৮৪
ইয্য্‌-উদ-দীন বলবন-ই-ইওজবকী ৮৪
মালিক তাজ-উদ-দীন আরসালান খাঁ ৮৪
তাতার খান ৮৫
শের খান ৮৫

(খ) স্বাধীনতা প্রয়াসকাল (১২৭২-১৩৩৮) ৮৫

আমিন খান ৮৭
সুলতান মুগীস-উদ-দীন তুগরীল ৮৮
সুলতান নাসির-উদ-দীন মাহমুদ বুগরা খান ৮৯
সুলতান রুকন-উদ-দীন কায়কাউস ৯০
সুলতান শামস-উদ-দীন ফিরোজ শাহ্‌ ৯০
সুলতান গিয়াস-উদ-দীন বাহাদুর ৯১
বাহ্‌রাম খান ৯৩
মালিক ইয্য্‌-উদ-দীন ইয়াহিয়া ৯৪
কদর খান ৯৪

(গ) প্রাক-স্বাধীন বাংলায় ইসলাম ও বাংলাভাষা ৯৫

(ঘ) বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্মেষকালের রূপরেখা ১০১

চতুর্থ অধ্যায়

স্বাধীন বাঙ্গালা ১০৯-১২৪

(ক) বাঙ্গালায় ভিন্ন ভিন্ন স্বাধীন জনপদ (১৩৩৮-১৩৫২ সাল) ১০৯

সোনারগাঁও ১১০

সুলতান ফখর-উদ-দীন মুবারক শাহ্‌ ১১০

লাখনৌতি ও সাতগাঁও ১১১

সুলতান ইখতিয়ার-উদ-দীন গাজী শাহ্‌ ১১৫

(খ) একীভূত স্বাধীন বাঙ্গালা সালতানাত (১৩৫২-১৫৩৮ সাল) ১১৬

সুলতান শামস-উদ-দীন ইলিয়াস শাহ্‌ ১১৬
সুলতান সিকান্দার শাহ্‌ ১২০
সুলতান গিয়াস-উদ-দীন আজম শাহ্‌ ১২২
সুলতান সাইফ-উদ-দীন হামজা শাহ্‌ ১২৪

পঞ্চম অধ্যায়

ব্রাহ্মণ্য পুনরুত্থান-প্রয়াসকাল (১৪১২-১৪১৮ সাল) ১২৫-১৩২
সুলতান শিহাব-উদ-দীন বায়েজীদ শাহ্ ১৩১
সুলতান আলা-উদ-দীন ফিরোজ শাহ্ ১৩১
রাজা গণেশ ১৩১

ষষ্ঠ অধ্যায়

আবার সালতানাত আমল (১৪১৮-১৪৩৫/৩৬ সাল) ১৩৩-১৩৮
সুলতান জালাল-উদ-দীন মুহম্মদ শাহ্ ১৩৪
সুলতান শামস-উদ-দীন আহমদ শাহ্ ১৩৮

সপ্তম অধ্যায়

পরবর্তী ইলিয়াস শাহী আমল (১৪৩৫/৩৬-১৪৮৭ সাল) ১৩৯-১৫১
সুলতান নাসির-উদ-দীন মাহমুদ শাহ্ ১৪০
সুলতান রুকন-উদ-দীন বারবক শাহ্ ১৪৪
সুলতান শামস-উদ-দীন ইউসুফ শাহ্ ১৪৮
সুলতান জালাল-উদ-দীন ফতেহ্ শাহ্ ১৪৯

অষ্টম অধ্যায়

আবিসিনীয় শাসন আমল (১৪৮৭-১৪৯৩ সাল) ১৫২-১৫৭
সুলতান শাহ্জাদা বারবক শাহ্ ১৫৫
সুলতান সাইফ-উদ-দীন ফিরোজ শাহ্ ১৫৫
সুলতান নাসির-উদ-দীন মাহমুদ শাহ্ ১৫৭
সুলতান শামস-উদ-দীন মুজাফ্ফর শাহ ১৫৭

নবম অধ্যায়

হোসেন শাহী আমল (১৪৯৩-১৫৩৮ সাল) ১৫৮-১৯৩
সুলতান আলা-উদ-দীন হোসেন শাহ্ ১৫৯
সুলতান নাসির-উদ-দীন নসরত শাহ্ ১৬০
সুলতান আলা-উদ-দীন ফিরোজ শাহ্ ১৬১
সুলতান গিয়াস-উদ-দীন মাহ্মুদ শাহ্ ১৬২

স্বাধীন সুলতানী বাঙ্গালার সাংস্কৃতিক পটভূমি ১৬২
স্বাধীন সুলতানী আমলে বাংলা সাহিত্যের বিকাশ–ধারা ১৬৮
স্বাধীনতাকালে বাংলা সাহিত্যের বিষয়ভিত্তিক রকমারি ১৭৫
স্বাধীন সুলতানী বাঙ্গালার আর্থ-সামাজিক কথকতা ১৭৮

দশম অধ্যায়

আফগান শাসন আমল (১৫৩৯-১৫৭৫ সাল) ১৯৪-২০২
জাহাঁগীর কুলী বেগ ১৯৬
খিজির খান ১৯৬
শামস-উদ-দীন মুহম্মদ সূর ১৯৭
সুলতান গিয়াস-উদ-দীন বাহাদুর শাহ্ ১৯৭
সুলতান গিয়াস-উদ-দীন জালাল শাহ্ ১৯৮
সুলতান গিয়াস-উদ-দীন ১৯৮
সুলতান তাজ খান কররানী ১৯৮
সুলায়মান খান কররানী ১৯৮
দাউদ খান কররানী ২০০

একাদশতম অধ্যায়

মুঘল সাম্রাজ্যের অধীনে সুবে বাঙ্গালা (১৫৭৬-১৭১৭ সাল) ২০৩-২২৫
সুবাদার হোসাইন কুলী ২১২
সুবাদার মুজাফ্ফর খান তুরবতী ২১২
সুবাদার খান-ই-আযম মির্যা আযীয কোকাহ্ ২১২
সুবাদার শাহ্বায খান ২১২
সুবাদার সাদেক খান ২১২
সুবাদার ওয়াযির খান ২১২
সুবাদার সাঈদ খান ২১২
সুবাদার রাজা মানসিংহ ২১২
সুবাদার শেখ কুতবুদ্দীন খান কোকাহ্ ২১২
সুবাদার জাহাঁগীর কুলী ২১২
সুবাদার ইসলাম খান ২১২
সুবাদার শেখ কাসিম খান চিশ্তী ২১৮
সুবাদার ইবরাহীম খান ফতেহ্ জং ২১৮

সুবাদার দারাব খান	২১৯
সুবাদার মহব্বত খান	২১৯
সুবাদার শেখ মুকাররম খান চিশ্‌তী	২১৯
সুবাদার মির্জা হেদায়েতুল্লাহ্ ফিদাই খান	২১৯
সুবাদার কাসম খান জুইনী	২২০
সুবাদার মীর মহম্মদ বকর আযম খান	২২০
সুবাদার ইসলাম খান মাশ্‌হাদী	২২০
সুবাদার শাহ্‌যাদা শুজা	২২০
সুবাদার মীর জুমলা	২২০
সুবাদার শায়েস্তা খান	২২১
সুবাদার ফিদাই খান	২২২
সুবাদার শাহ্‌যাদা মুহম্মদ আযম	২২২
সুবাদার শায়েস্তা খান	২২২
সুবাদার খান-ই-জাহান	২২২
সুবাদার ইবরাহীম খান	২২৩
সুবাদার আযীমুশ্‌ শান	২২৩
সুবাদার খান-ই-আলম	২২৩
অনুপস্থিত সুবাদার দ্বিতীয় মীর জুমলা	২২৪

দ্বাদশতম অধ্যায়

মুর্শিদাবাদ নিযামত আমল (১৭১৭-১৭৬৫ সাল)	**২২৬-২৫৫**
নবাব সুবাদার মুর্শিদ কুলী খান	২২৭
নবাব সুবাদার শুজা-উদ-দীন মুহম্মদ খান	২৩১
নবাব সুবাদার সরফরাজ খান	২৩২
নবাব সুবাদার আলীওয়ার্দী খান	২৩৩
নবাব সিরাজউদ্দৌলা	২৩৪
নবাব মীর জাফর আলী খান	২৩৭
নবাব মীর কাশেম আলী খান	২৩৮
নবাব মীর জাফর আলী খান	২৩৯
মুঘল আমলে বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা	**২৪৮**

ত্রয়োদশতম অধ্যায়

মুর্শিদাবাদ নাজিমী আমল (১৭৬৫-১৮৫৪ সাল)	২৫৬-২৭৩
নবাব-নাজিম নজম-উদ-দৌলাহ্	২৬২
নবাব-নাজিম সৈফ-উদ-দৌলাহ্	২৬২
নবাব-নাজিম মোবারক-উদ-দৌলাহ্	২৬২
নবাব-নাজিম বাবর জং	২৬২
নবাব-নাজিম আলিজা	২৬৩
নবাব-নাজিম ওয়ালাজা	২৬৩
নবাব-নাজিম হুমায়ুনজা	২৬৩
নবাব-নাজিম মনসুর আলী খান বা ফেরিদুনজা	২৬৩
ইংরেজ আমলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য	২৬৫

চতুর্দশতম অধ্যায়

সূফী-দরবেশদের বাংলা	২৭৪-৩২৭

পঞ্চদশতম অধ্যায়

পরিশিষ্ট	৩২৮-৪৫৭
গ্রন্থপঞ্জি	৪৫৮-৪৬০

মহাপরিচালকের কথা

আজকের স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ এক কালে বাংলা মুলুক, সুবে বাংলা ইত্যাদি নামে পরিচিত ছিল। বাংলা অঞ্চল কখনো ছিল স্বাধীন, কখনো দিল্লীর শাসনাধীন। ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী (১২০৩/১২০৪) রাজা লক্ষ্মণ সেনের কাছ থেকে বাংলা জয় করে প্রথম মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। তারপর থেকে দীর্ঘকাল মুসলিম শাসকগণ বাংলাদেশ শাসন করেছেন। এঁদের অনেকেই স্বাধীনভাবে আবার কেউ কেউ দিল্লীর কেন্দ্রীয় শাসনের অধীনে থেকে বাংলাদেশ শাসন করেছেন।

এভাবে বিচিত্র ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে বাংলাদেশ। আর রচিত হয়েছে বাংলার শাসনেতিহাস। লক্ষণীয়, বৃটিশরা শাসনক্ষমতা দখল করার পূর্ব পর্যন্ত সাড়ে পাঁচ শত বছর যাঁরা বাংলাদেশ শাসন করেছেন, তাঁরা সবাই ছিলেন মুসলমান। এসব মুসলিম শাসকদের অধিকাংশই এ অঞ্চলে ইসলামের প্রচার-প্রসার ও বিকাশে বিভিন্নমুখী ভূমিকা পালন করেছেন। তবে বাংলার এসব শাসকদের ব্যাপারে আমাদের অনেকেরই সম্যক ধারণা নেই।

এক্ষেত্রে বিশিষ্ট লেখক, গবেষক ও নাট্যকার ড. আসকার ইবনে শাইখের রচিত 'মুসলিম আমলে বাংলার শাসনকর্তা' শীর্ষক বইটি গুরুত্বপূর্ণ ও নির্ভরযোগ্য হিসেবে সুধীমহলে বিবেচিত। লেখক কষ্টসাধ্য পরিশ্রমের মাধ্যমে ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে বাংলাদেশের কয়েকশ' বছরের শাসনকর্তাদের পরিচয় জাতির সামনে তুলে ধরেছেন। তাঁর প্রয়াস নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবী রাখে। আশা করি পূর্বের সংস্করণের ন্যায় বর্তমান সংস্করণও সুধী পাঠকের সমাদর লাভ করবে।

সকল মহৎ কাজে মহান আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সহায় হোন। আমীন!

এ. জেড. এম. শামসুল আলম
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকের কথা

উপমহাদেশে ইসলাম ধর্মের আগমন ও মুসলিম শাসন কায়েম ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। স্মরণ করা যায় যে, তরুণ সেনাপতি মুহাম্মদ বিন কাসিম উপমহাদেশে প্রথম মুসলিম অভিযানকারী। অষ্টম শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকে তিনি সিন্ধুতে তাঁর ঐতিহাসিক অভিযান পরিচালনা করেন। পরবর্তীতে একাদশ শতাব্দীতে দিল্লী কেন্দ্রিক মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এ পর্যায়ে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী (১২০৩/১২০৪) সর্বপ্রথম বাংলাদেশে অভিযান করেন এবং বাংলায় মুসলিম শাসন কায়েম হয়। ইংরেজরা শাসন কর্তৃত্ব দখলের পূর্ব পর্যন্ত প্রায় সাড়ে পাঁচশত বছর অসংখ্য মুসলিম শাসনকর্তা, স্বাধীন সুলতান ও নবাব বাংলা শাসন করেছেন। ঐতিহাসিকদের মতে, এর মধ্যে ১৩৩৮-১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল। তার আগে বা পরে কার্যত কিংবা নামেমাত্র হলেও বাংলার শাসনকর্তারা দিল্লীর শাসনাধীনে থেকেছেন। একথা অনস্বীকার্য, মুসলিম শাসনকর্তারা বাংলা ভূখণ্ডে ইসলামের প্রচার ও প্রসারে বিপুল ভূমিকা পালনের পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও ব্যাপক অবদান রেখেছিলেন। কিন্তু তাঁদের সেই ভূমিকা ও অবদানের কথা আমরা আজ বিস্মৃত প্রায়।

প্রখ্যাত নাট্যকার, লেখক ও গবেষক ড. আসকার ইবনে শাইখ তাঁর 'মুসলিম আমলে বাংলার শাসনকর্তা' গ্রন্থে তাঁদের কথাই তুলে ধরেছেন। এতদিন যাঁরা শুধু ইতিহাসে উল্লিখিত ছিলেন, এ গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে লেখক তাঁদের সাথে সাধারণ পাঠকের পরিচয় ঘটার সুযোগ করে দিয়েছেন। ফলে আমাদের বর্তমান প্রজন্মও তাঁদের সম্পর্কে বিশদভাবে জানার সুযোগ লাভ করেছে।

১৯৮৮ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে 'মুসলিম আমলে বাংলার শাসনকর্তা' গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। প্রকাশের পর পরই মননশীল পাঠকদের কাছে গ্রন্থটি ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়। বর্তমানে এ গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করতে পেরে আমরা পরম করুণাময় আল্লাহ্ পাকের কাছে শুকরিয়া আদায় করছি। আমিন!

মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রসঙ্গ-কথা

'মুসলিম আমলে বাংলার শাসনকর্তা' পড়তে গিয়ে প্রথমেই পাঠক-পাঠিকাদের মনে যে প্রশ্নটা হয়তো জাগতে পারে তা হচ্ছে ঃ ঐতিহাসিক বিবরণী সম্বলিত এই গ্রন্থের প্রতিটি অধ্যায়ের আরম্ভে কিছু কাব্যাংশ– কিছু মতামত-প্রধান বক্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে কেন ? এমনি প্রশ্নের উত্তরে বলব ঃ সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শাসনকর্তাদেরও যেমন পরিবর্তন হয়েছে– এক শাসনকর্তার বদলে এসেছেন অন্য শাসনকর্তা, তেমনি সময়ের পরিবর্তনে বাংলার আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটেরও পরিবর্তন হয়েছে। এই পরিবর্তনশীল আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের একটা ধারণা সৃষ্টির জন্যই আমাদের এ প্রয়াস।

গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণের উপর আলোচনা প্রসঙ্গে এ দাবি করা হয়। তাই তৃতীয় সংস্করণে বিভিন্ন শাসনকালের পর বাংলার আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট নিয়ে এর শিক্ষা-সংস্কৃতি সম্পর্কে কিছু বিশদ আলোচনা সংযোজিত করা হয়েছে।

ধরা যাক, এদেশে মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে বাংলার আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের কথা। সেন-রাজকুল শাসিত বাংলাদেশ। অধ্যাপক অতীন্দ্র মজুমদারের কথায়, "চরিত্রহীনতা, বিলাস লালসাময় জীবন, স্তুতিবাদপূর্ণ আত্মপ্রশংসা শোনা আর সভানন্দিনীদের নিয়ে নিরঙ্কুশ ভোগ-বিলাসের পরিবেশে সে-কালের রাজসভাগুলি কোন্ স্তরে পৌঁছেছিল তার অসংখ্য নিদর্শন ছড়ানো আছে সমকালীন কাব্য-কবিতায়, চিত্রশিল্পে, ভাস্কর্যে, শিলালিপিতে ও দানপত্রে॥ ... এর বিপরীত অবস্থা সমাজের নিম্নস্তরে। সেখানে অবিচ্ছিন্ন অভাব-দারিদ্র্য শোষণ অত্যাচার অবিচার।"

শ্রীগীত গোবিন্দের রচয়িতা কবি-শ্রেষ্ঠ জয়দেব মহারাজা লক্ষণ সেনের অন্যতম রাজকবি। শ্রী মজুমদার বর্ণিত ভোগ-বিলাসের রাজসভায় তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয় ঃ

স্মর-গরল-খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনম্
দেহি পদ-পল্লবমুদারম্।
জ্বলতি ময়ি দারুণো মদনকদনারুণো–
হরতু তদুপাহিত-বিকারম॥

হে প্রিয়ে! কামবিষবিনাশক তোমার ঐ মনোহর পদপল্লব আমার মস্তকে স্থাপন কর। আমার অন্তর দারুণ মদনারুণে জ্বলিতেছে, তোমার চরণ স্পর্শে সে বিকার দূরীভূত হউক॥

অন্যদিকে দেশের নিম্নস্তরের আপামর জনসাধারণের কবিরা চর্যাপদে বিবৃত করছেন পার্বতীর দুঃখভরা আর্তি, বর্ণনা করছেন অভাব ও দারিদ্র্যভরা সাধারণ মানুষের ঘর-সংসারের দৃশ্য ঃ

টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী।
হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী॥

শ্রী মজুমদারেরই কথায়, "একদিকে সামাজিক গোঁড়ামি, ঐশ্বর্যবিলাস এবং কামবাসনার সোৎসাহ আতিশয্য। কাব্য-কবিতাগুলির অধিকাংশই যৌনকামবাসনায় মদির ও মধুর; রাজসভার চরিত্র ও আবহাওয়া চূড়ান্ত লাম্পট্য, চারিত্রিক অবনতি, তরল রুচি ও দেহগত বিলাস এবং ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত দুর্নীতির কলঙ্কে মলিন; ... অন্যদিকে নিদারুণ দারিদ্র্য, ক্ষুধা, অভাব, শোষণ, বর্জন, যন্ত্রণা ও মৃত্যু। ... সমস্ত বাংলা দেশই যেন এই অন্ধকারের সুকঠোর পেষণে মৃত্যুযন্ত্রণায় অভাবদৈন্য-পীড়িত পার্বতীর মতো করুণ কণ্ঠে ক্রন্দন করছে- গই ভবিত্তি কিল কা হমারী! ... কী গতি হবে আমার!"

শিষ্ট জনদের রাজসভার কাব্য-ভাষা তখন সংস্কৃত, অবিশ্যি কবি জয়দেবের হাতে তা বেশ কিছুটা ঢিলেঢালা হয়ে এসেছে, জনসাধারণের মুখোচ্চারিত কিছু কথাও সেখানে ঢুকেছে। আর চর্যাপদের ভাষা? আমাদের মাতৃভাষা বাংলার প্রাথমিক রূপ। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র কথা, "জানি না কত দিন বঙ্গবাণী জন্মিয়া ঘরের কোণে লাজুক বধূটির মত নিরিবিলি বাস করিয়াছিল। সে দিন বাঙ্গালার অতি স্মরণীয় সুপ্রভাত যে দিন সে সাহিত্যের বিস্তীর্ণ আসরে দেখা দিল। বাস্তবিক সে দিন বাঙ্গালীর এক নবযুগের পুণ্যাহ।"

প্রথম অধ্যায়ে তদানীন্তন বাংলাদেশের এই দুই স্তরের মানুষের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা প্রকাশের প্রতিনিধিত্বশীল কাব্যাংশগুলো উদ্ধৃত করে তদানীন্তন বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটকেই চিত্রিত করতে চেষ্টা করেছি। প্রতিটি অধ্যায়ের আরম্ভে উদ্ধৃত কাব্যাংশ ও বক্তব্য সম্পর্কে এই-ই আমাদের উত্তর। সমগ্র গ্রন্থে উদ্ধৃত এসব কাব্যাংশ ও বক্তব্য থেকে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা দেশের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এবং সে পরিবর্তনের সঙ্গে বাংলার শাসনকর্তাদের অবদানও নিশ্চয় জড়িত, তার শাসন-বিবরণী অধ্যায়ের পরপর স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদাকারে পরিবর্তন সাধনকারীদের নামসহ তুলে ধরেছি। খুবই দুর্বোধ্য হয়ে থাকে যদি, সেটা আমারই অক্ষমতার জন্য।

'মুসলিম আমলে বাংলার শাসনকর্তা' গ্রন্থটিকে যতদূর সম্ভব শাসনকর্তাদের কালানুক্রমিক পরিচয় ও তাঁদের গুরুত্বানুসারে কিছুটা কমবেশি বিবরণীতেই সীমিত রাখতে চেষ্টা করেছি, যেমনটি করেছি সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন সাধনকারীদের ক্ষেত্রেও। এ গ্রন্থে কোন সজ্ঞান বিচার-বিশ্লেষণের প্রয়াস নেই। বিচার-বিশ্লেষণ কোথাও যতটুকু এসেছে, তা সর্বস্বীকৃত পণ্ডিতদের বিচার-বিশ্লেষণ। প্রত্যেক শাসনকর্তার তথ্য-নির্ভর পরিচয় তুলে ধরারই চেষ্টা করেছি। তাতে করে একটা লাভ আমার নিজেরও হয়েছে। সেটা হলো, প্রায় ছয়'শ বছরের মধ্যে যেসব গোত্র গোষ্ঠি বা বংশ বাংলা শাসন করেছেন, তাঁদের উত্থান-পতনের কাহিনী থেকে একটা প্যাটার্ন আকারে ইতিহাসের সত্য ধরা পড়েছে। সে সত্যটা হলো ঃ নিজেদের উত্থান-পতনের মূল কারণ নিজেদের চরিত্রেই নিহিত থাকে। চরিত্রগুণেই মানুষ, সে মানুষ সুলতান শাসনকর্তা যিনিই হোন, কীর্তি-শীর্ষে উত্থিত হয়, আর চরিত্র-দোষেই মানুষ পতনের অতলে তলিয়ে যায়। সেন রাজাদের উত্থান-পতনের ইতিহাসে এ সত্য যেমন উদ্‌ঘাটিত, তেমিন এ সত্য উদ্‌ঘাটিত পাঠান ও মুগলদের উত্থান-পতনেও।

'মুসলিম আমলে বাংলার শাসনকর্তা'র প্রয়োজন আছে প্রধানত দু'টি কারণে। প্রথমত, কালানুক্রমিকভাবে একের পর এক শাসনকর্তার পরিচয় একসঙ্গে পাওয়ার একটা সুবিধা তো আছেই। তাতে মুসলিম আমলের পুরো চিত্রটাই চোখের সামনে ফুটে উঠতে পারে। দ্বিতীয় যে কারণটা রয়েছে সেটা আরও গুরুত্বপূর্ণ। আর তা হচ্ছে এই বাংলার স্বাধীনতা-স্পৃহা। মুসলিম আমলের প্রথম থেকেই দেখা যায়, বাংলার শাসনকর্তারা সুযোগ পেলেই বাংলাকে স্বাধীন রাজ্যে পরিণত করতে চেয়েছেন। ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দীন বারণী তাঁর 'তারিখ-ই-ফীরূজ শাহী'তে বলেন যে, বাংলা দেশ বরাবরই বিদ্রোহী প্রদেশ রূপে গণ্য ছিল এবং দিল্লীর শাসকেরা বাংলাদেশকে 'বলগাকপুর' বা 'বিদ্রোহী এলাকা' নামে অভিহিত করতেন। "যেহেতু বাংলা দেশ দিল্লী হইতে অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় অপেক্ষাকৃত দূরে অবস্থিত ছিল এবং যেহেতু বাংলা দেশের প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক অবস্থা ভারতের অন্যান্য এলাকা হইতে ভিন্ন ছিল, সেহেতু দিল্লীর কেন্দ্রীয় সরকার লাখনৌতির উপর কড়া নজর রাখিতে পারিত না এবং লাখনৌতির বিদ্রোহ দমন করার উদ্দেশ্যে ক্ষিপ্রগতিতে বাংলাদেশে আসিতে পারিত না বা আসিলেও লাখনৌতির বিদ্রোহ দমন করা খুব সোজা ছিল না। বারণী আরও বলেন যে, বাংলাদেশের আবহাওয়াই বিদ্রোহীদের পক্ষে সহায়ক ছিল। এইখানে শাসকেরা স্বভাবতই বিদ্রোহী ছিল; নূতন শাসক আসিলে অমাত্য অনুচর সকলে মিলিয়া তাঁহাকে বিদ্রোহের প্ররোচনা দিত; যদি কোন শাসক বিদ্রোহ করিতে অস্বীকার করিতেন তাহা হইলে অমাত্য-অনুচরেরা সকলে মিলিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার চেষ্টা করিত;

সুতরাং শাসককে বাধ্য হইয়া দিল্লীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে হইত।" (ডক্টর আবদুল করিম, বাংলার ইতিহাস, সুলতানী আমল, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭, পৃ. ১৩০-১৩১)।

তাই আমরা দেখি, খিলজী শাসনামলেই গিয়াস উদ্দীন ইওজ খিলজী বাংলায় স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন, দিল্লী-বাহিনীর মুকাবিলায় যুদ্ধ করেছেন। তেমনি দিল্লীর শক্তিশালী সুলতান গিয়াস উদ্দীন বলবনের বিরুদ্ধে বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণাকারী মুগীস উদ্দীন তুগরল এক দৃঢ়পণ সংগ্রামে রত হয়েছেন। প্রায় তিন লক্ষ সৈন্য নিয়ে বাংলার পথে ছুটে এসেছেন দিল্লীর সুলতান। তবুও সুলতান মুগীস উদ্দীন তুগরল বাংলার স্বাধীনতা রক্ষার ব্রত নিয়ে ছুটে বেড়াচ্ছেন স্থান থেকে স্থানান্তরে। স্বাধীনতার জন্য এই যে সংগ্রাম, এটাকে গণতন্ত্রবিহীন যুগে রাজা-সুলতানদের স্বার্থরক্ষার ব্যক্তিগত প্রয়াস বলে উড়িয়ে দিলে চলবে না। ডক্টর কালিকারঞ্জন কানুনগোর কথায় ঃ

His Court at Lakhnawati rivalled that of Delhi in power and magnificence and he was more popular with his people, and much better served by them than Sultan Balban, who was more feared than loved by his subjects. Barani does Tughral bare justice in saying : 'He was profuse in his liberality; so the people of the city (of Delhi)' who had been there, and also the inhabitants of that place (Lakhnawati) became very friendly to him. The troops and citizens having shaken off all of The Balbani chastisement, joined Tughral heart and soul. We have it on the authority of Barani that Tughral sent largesses even to Delhi, and in Bengal he is said to have made a gift of five maunds of gold (about eighteen seers of Persian weight) for the maintenance of an establishment of Darwishes in Bengal, whose leader was afterwards executed by Balban. Tughral was, as subsequent events show, popular with all classes of his people, Hindu and Muslim alike, and this was not due to his liberality alone but to his other kingly virtues as well. His people followed his fortune through thick and thin, and none voluntarily betrayed him. In short Balban was now at war not with an individual rebel but with a whole province, and this accounts for the repeated failures of the imperial armies against Bengal, and the Sultan's own difficulties in subduing Tughral." (History of Bengal, Vol. II, edited by Sir Jadunath Sarker, The University of Dacca, Second Impression, 1972, PP. 60-61).

১২১০ সাল থেকে ১৩৩৮ সালের পূর্ব পর্যন্ত এই প্রায় সোয়া শ' বছরে লাখনৌতি রাজ্যের স্বাধীনতার পতাকা বহুবার উড্ডীন হয়েছে, আবার তা নেমেও গেছে। কিন্তু

১৩৩৮ সাল থেকে যে স্বাধীনতার পতাকা বাংলায় উড্ডীন হলো, দু'শ' বছরের মধ্যে সে পতাকা আর ধূলায় বিলুণ্ঠিত হয়নি। সুলতানী আমলে বাংলার এই দু'শ' বছরের স্বাধীনতা বাংলার ইতিহাসে চিরস্মরণীয়।

"গৌড় নামে বাংলার সমস্ত জনপদকে ঐক্যবদ্ধ করার যে চেষ্টা শশাঙ্ক, পাল ও সেন রাজারা করেছিলেন, তাতে কাজ হল না। যে বঙ্গ ছিল আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক থেকে ঘৃণিত ও অবজ্ঞাত, যা ছিল পাল ও সেনদের আমলে কম গৌরবের ও আদরের– সেই বঙ্গ নামেই শেষ পর্যন্ত তথাকথিত পাঠান আমলে বাংলার সমস্ত জনপদ ঐক্যবদ্ধ হল।" [ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়-এর 'বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)'-এর সংক্ষেপিত সংস্করণ, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, নিউ এজ সংস্করণ, ১৯৬০, পৃ. ২২]।

ইতিপূর্বে লাখনৌতি ও সাতগাঁও-এর স্বাধীন সুলতান "ইলিয়াস শাহ ১৩৫২ খৃস্টাব্দের কোন এক সময়ে সোনারগাঁও (এটা ১৩৩৮ সাল থেকে স্বাধীন ছিল– লেখক) দখল করার ফলে তিনি সারা বাংলাদেশের অধীশ্বর হইলেন। ইলিয়াস শাহের পূর্বে বাংলার কোন মুসলমান সুলতান সারা বাংলা দেশের অধীশ্বর ছিলেন না, তাঁহারা হয় লাখনৌতি বা সাতগাঁও বা সোনারগাঁও-এর সুলতান ছিলেন। ইতিপূর্বে বাংলার মুসলমান সুলতানেরা কোন এক অংশের সুলতান ছিলেন, কিন্তু ইলিয়াস শাহই সর্বপ্রথম বাংলার সুলতানে পরিণত হইলেন। এই জন্যই ঐতিহাসিক আফীফ ইলিয়াস শাহকে 'শাহ-ই-বাঙ্গাল' 'শাহ-ই-বাঙ্গালীয়ান' এবং 'সুলতান-ই-বাঙ্গালা' উপাধিতে ভূষিত করেন।" (ডক্টর আবদুল করিম, বাংলার ইতিহাস, সুলতানী আমল, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭, পৃ. ২০২-২০৩)।

ইতিহাসের এসব কথা আমাদের জানা দরকার। একটি জনপদের স্বাধীনতা নিয়ে যদি গৌরব করার মত হয়, তাহলে অতীতে বাংলার স্বাধীনতা নিয়ে এসব সংগ্রাম-কথা, সে সংগ্রামের সাফল্য-কথা আমাদের ছেলেমেয়েদের এবং আমাদেরও জানা দরকার। অতীতের প্রকৃত ইতিহাস ও ঐতিহ্যের যথাযথ অবহিতি ছাড়া কোন জাতিই মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে না, গৌরবোজ্জ্বল ভবিষ্যত রচনা করতে তো পারেই না। আমাদের জানতে হবে বুঝতে হবে বাংলার ইতিহাসে কোথায় আমাদের অবস্থান, কি আমাদের পরিচয় ? 'মুসলিম আমলে বাংলার শাসনকর্তা'–এই শিরোনামে রয়েছে দু'টি শব্দ, 'মুসলিম' ও 'বাংলা,' যার আলোচনায় ইসলাম ও বাংলা স্বাভাবিকভাবেই এসে যায়। (এখন যা বলতে যাচ্ছি, তা এস. এ. সিদ্দিকী রচিত 'ভুলে যাওয়া ইতিহাসে'র ভূমিকায় আমিই ১৯৭৫ সালে লিখেছিলাম– লেখক)। এটা অনস্বীকার্য যে, আমাদের পরিচয়ের মূলে আছে দু'টি অভ্রান্ত উপাদান। তার একটি নৈতিক ও আধ্যাত্মিক, অপরটি বাহ্যিক ও পারিপার্শ্বিক। "মুসলমানদের বেলায় প্রথমটির উৎস ইসলাম, পরেরটির উৎস জন্মভূমি। দু'টিই পরস্পর-সংশ্লিষ্ট, পরস্পর-পরিপূরক, বিরোধী নয়। শুধুমাত্র একটির জন্য

অন্যটিকে ত্যাগ করা চলে না বা তার প্রয়োজনও নেই। দু'য়েরই রয়েছে পরগ্রাহিতার ক্ষমতা। যেখানে এই পরস্পর গ্রহণ একে অপরকে ধ্বংস বা বিপন্ন করে না, সেখানে দু'য়ের এই সহাবস্থান অধিকতর কাম্য।" সহাবস্থান ও সহযোগিতা কখনো ব্যক্তিগত বা জাতীয় পরিচয়ের বিলোপ সাধনের সমার্থক হওয়া উচিত নয়। এই ধারণার প্রেক্ষিতেই এ-দেশে বসবাসকারী মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃস্টান বা অন্যান্য ধর্মবিশ্বাসের মানুষ আমরা সবাই বাঙ্গালী। এই বাঙ্গালীত্বের যে উৎসটি ধর্মবিশ্বাসে নিহিত, তা ইসলামকে যেমন স্বীকার করে, তেমনি স্বীকার করে হিন্দুধর্মকে অথবা অন্য যে কোন ধর্ম বা জীবন বিশ্বাসকে; প্রতিটি ধর্ম তাতে স্বকীয় সত্তায় বিকশিত হবার অধিকারী। আর যে উৎসটি জন্মভূমি বা এই জনপদকে কেন্দ্র করে উৎসারিত, তাতে সবাই সব ধর্মবিশ্বাসীই একক সত্তায় চিহ্নিত। এই বাঙ্গালীত্বে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে স্বীয় ধর্মীয় সত্তা ত্যাগ করতে হয় না। সকল সম্প্রদায়ের ধর্মীয় সত্তার সমস্বীকৃতির মাধ্যমেই আমাদের এ বাঙ্গালীত্ব অসাম্প্রদায়িক। অতীতের শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সংজ্ঞায়িত 'বাঙ্গালী জাতীয়তা' এবং বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর আমাদের বাঙ্গালী জাতীয়তার (যাকে এখন বাংলাদেশী জাতীয়তা বলা হচ্ছে) পার্থক্য এখানেই এবং এখানেই তার বৈশিষ্ট্য।

এই পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য স্মরণে রেখে একথা উল্লেখ করা খুবই প্রাসঙ্গিক হবে যে, ইসলাম এসেছিল যুগ-সঞ্চিত অত্যাচার-অবিচার ও দুঃখ-লাঞ্ছনা থেকে মুক্তির বাণীবাহক হিসাবে। সত্য ও ন্যায়ের সপক্ষে তা ছিল এক কল্যাণমুখী বিদ্রোহ আর দুর্জয় সংগ্রামের এক বাণী, এক সামগ্রিক বিপ্লব। লেনিন-সহকর্মী এম. এন. রায়ের কথায়, "ইসলাম ইতিহাসের এক স্বাভাবিক অভিব্যক্তি, মানব সভ্যতার অগ্রগতির অপরিহার্য সহায়। নূতন সমাজ সম্পর্কের বাণী নিয়ে গড়ে উঠল এর আদর্শ, আর তার ফলে হল মানব মনের বৈপ্লবিক পরিবর্তন। ... একথা অবধারিত সত্য, ইসলাম যে তত্ত্ব ও আদর্শবাদের জন্ম দিয়েছে তাই কালে কালে জগতে নানা সমাজবিপ্লবে সহায়তা করল। জীবনের বিভিন্ন দিক থেকে সে তত্ত্ব ও আদর্শবাদ হল বিজ্ঞানের নিরীক্ষা ও পরীক্ষা আর দর্শনের যুক্তিবাদ। সমাজে নূতন বিপ্লবের বীজ বাঁচিয়ে রাখার যে গৌরব, ইসলামের সংস্কৃতিই সে গৌরবের একমাত্র অধিকারী।" তিনি আরও বলেন "ইসলামের বিদ্রোহ মানবতাকে রক্ষা করেছিল। ইতিহাসের প্রয়োজনীয় পরিণাম ছিল ইসলাম, ছিল মানুষের অগ্রগতির এক উপায়। ... আর ইসলামের বিপ্লবই বাঁচিয়ে দিয়ে গেল মানুষকে।"

সাধারণ মানুষের প্রয়োজন ও আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে ইসলাম প্রচারিত হয়েছিল তাদেরই মত এক মানুষের দ্বারা। যেদিন আলোর দিশারী হযরত মুহাম্মদ (সা) দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন মানুষের মুক্তিবাণী, সেদিন থেকে শুরু হলো মানবতার এক নতুন অভিযান। আল-কুরআন মানুষের জন্য বয়ে আনল এক মহা সওগাত, চিন্তার মুক্তি, মানুষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ। কিন্তু পরবর্তীকালে তার বিস্তৃতি ও প্রয়োগের ইতিহাসে

ঘটেছে নানা উত্থান-পতন। নবী করীম (সা) ও খোলাফায়ে রাশেদার সেই মুক্তি-উজ্জ্বল কালাবসানের পর পথ-পরিক্রমায় এল নতুন মোড়। বৈপ্লবিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে যেমনটি ঘটে থাকে, পরবর্তীকালে ইসলামের ক্ষেত্রেও তেমনি এসেছে বিচ্যুতি ও বিভ্রান্তির মোহ। প্রতিক্রিয়াশীল মানবতা-বিরোধী শক্তি নিশ্চেষ্ট বসে ছিল না। বরং বেশীর ভাগ সময়ই সেসব অশুভ শক্তিই প্রাধান্য লাভ করেছে। চরম দুঃখজনক সত্য এই যে, নামসর্বস্ব ইসলাম-ভক্তগণই প্রায় সময়েই সেজেছেন এই প্রতিক্রিয়াশীলতার বীর নেতা!

জাতির ইতিহাসে পতন-যুগে জাতীয় জীবন হয় মৃত্যুর জরায় জীর্ণ, নিপীড়িত। তখন প্রয়োজন দেখা দেয় রেনেসাঁ-নকীব অগ্নিপুরুষের– কোন অন্যায় অধর্মের সাথে যিনি সমঝোতা করেন না, চিন্তাশক্তি যাঁর অনাবিল, অন্তর্দৃষ্টি যাঁর তীক্ষ্ণ, অসাধারণ প্রতিভা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব যাঁর জন্মগত বৈশিষ্ট্য, সর্বোপরি মানব-কল্যাণ যাঁর লক্ষ্য, তেমন অগ্নিপুরুষের আহ্বানেই জাতির জীবনে আবার আসে সুবেহ্ সাদেক, তার দেহে নতুন যৌবনশক্তির হয় পুনরাবির্ভাব, হয় তার পুনরুজ্জীবন। এই তো জাতির জন্য রেনেসাঁ।

বিভ্রান্তির বেড়াজাল থেকে, বিচ্যুতির মোহ থেকে ইসলামকে স্বীয় মহিমায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার অধীর আগ্রহসম্পন্ন অগ্নিপুরুষের আবির্ভাবও ঘটেছে যুগে যুগে। খলিফা উমর বিন আবদুল আজিজ, ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী, ইব্ন তায়মিয়া, মুজাদ্দেদ আলফে সানী, শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ দেহলভী, সৈয়দ জামালুদ্দীন আফগানী, এমনি আরও অনেকে তুলে ধরেছেন বৈপ্লবিক চেতনার প্রকৃত পতাকা। ইসলামকে কখনো তাঁরা মানবতার কল্যাণ ছাড়া অন্য কোন স্বার্থে ব্যবহৃত হতে বা ভেসে যেতে দিতে চাননি। আমাদের এই উপমহাদেশেও অনেক 'মুসলিম সম্রাট' বা 'মুসলিম সুলতান'-এর আবির্ভাব ঘটেছে, স্বেচ্ছায় বা সম্পূর্ণ অজ্ঞানতার বশে যাঁরা ইসলামের প্রভূত ক্ষতি সাধন করেছেন। পক্ষান্তরে, সংস্কারক ও মুজাদ্দেদও এসেছেন এখানে যারা সজীব ও উন্নীত করে তুলেছেন ইসলামের প্রাণশক্তিকে। নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সূত্রে দুনিয়াজোড়া মুসলমানের মন ও মানস ইসলামের এই বৈপ্লবিক রূপেরই স্বপ্ন দেখে। দেশ ও কালের বাধা এড়িয়ে আজও তাদের মানস-তন্ত্রীতে বেজে ওঠে দূর মদিনার সেই সুর। উজ্জীবিত হয়ে ওঠে তাদের কল্পনা। বাংলাদেশের মুসলমানেরাও তার ব্যতিক্রম নয়।

এই উপমহাদেশে সেদিন ইসলামের উপর আক্রমণ এসেছিল প্রথমে বৃটিশ কর্তৃক বাংলা অধিকার এবং পরে অন্যান্য অংশ অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে। বিদেশীরা আমাদের স্বাধীনতা হরণ করে নিয়ে এ-দেশের শাসক ও শোষক হয়ে বসল। কিন্তু কি আশ্চর্য, এ-দেশেরই কিছু সংখ্যক লোক, একটা সুবিধাভোগী কোলেবোরেটর বা 'দালাল শ্রেণী' নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির মানসে এবং মুসলমানদের কর্তৃত্ব ও সংস্কৃতি ধ্বংসের ভ্রান্ত ও ঘৃণ্য

উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হয়ে বৃটিশদের পেয়ারের গোলাম সেজে তাদের শাসন-শোষণ ও অত্যাচার চালিয়ে যাওয়ার কাজে সহযোগিতা করতে এগিয়ে গেল! অথচ হিন্দু-মুসলমান যে ভাই-ভাই, একই দেশের সন্তান এবং সেই দেশ পর-পদানত-- এসব কথায় তখন ওই তথাকথিত কলোনিয়্যাল 'রেনেসাঁ'-প্রাপ্ত নব্য দালাল শ্রেণীটি মোটেই কান দিল না। কার্ল মার্কসের কথায়, "কলকাতায় ইংরেজদের তত্ত্বাবধানে অনিচ্ছা সহকারে ও স্বল্প পরিমাণে শিক্ষিত ভারতে দেশীয় অধিবাসীদের মধ্য থেকে নূতন একটি শ্রেণী গড়ে উঠেছে যারা সরকার পরিচালনার যোগ্যতাসম্পন্ন।" বোঝাই যাচ্ছে, ধর্মীয় পরিচয়ে হিন্দু ওই দালাল শ্রেণীটির তখন সুবিধা কুড়োবার দিন। আর বাংলার মুসলমানদের অবস্থা ?

পলাশী-পরবর্তী ইতিহাস বাংলার মুসলমানদের জন্য এক রোদনভরা কালো ইতিহাস। প্রতারিত ও বেদনাহত ইতিহাস। অপূর্ণ আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বুকে পুরে অন্ধকার দীর্ঘ রাত কাটাবার ইতিহাস। পলাশী-বিপর্যয়ের পর বাংলার মুসলমানেরা হারাল অর্থ-বৈভব, হারাল এতদিনের সুযোগ-সুবিধা, শিক্ষা-সংস্কৃতি। পার্থিব সকল প্রতিষ্ঠার শিকল তাদের কেটে গেল এক এক করে। কোম্পানী শাসনামলে বাংলার মুসলমানদের সর্বস্ব গিয়ে উঠল ইংরেজসৃষ্ট বর্ণহিন্দুর এক নব্য মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভাণ্ডারে। উইলিয়াম হান্টারের কথা, "নিম্নবঙ্গের মুসলমানদেরই আমি বেশী চিনি এবং তারা বৃটিশ শাসনে সবচেয়ে বেশী নির্যাতিত হয়েছে। যদি কখনো একটা জাতি জীবনোপায়শূন্য হয়ে থাকে, সেটি হল নিম্নবঙ্গের মুসলমানেরা। এক শ' সত্তর বছর আগে বাংলার একজন মুসলমানের গরীব হওয়া ছিল অসম্ভব; এখন তার পক্ষে ধনী হয়ে চলাই অসম্ভব।" ওই সময়কার বাংলার মুসলমানদের সামাজিক ইতিহাস সুস্পষ্টভাবে চিত্রিত করে তোলে মুসলমান উচ্চ শ্রেণীর বেদনাদায়ক উচ্ছেদ প্রক্রিয়া এবং সমগ্র সাধারণ মুসলমান সমাজের ক্রমাবনতির এক করুণ কাহিনী। আবার উইলিয়াম হান্টারের কথা, "সত্যটি হচ্ছে এই যে, আমাদের প্রচলিত জনশিক্ষা পদ্ধতি যা হিন্দুদেরকে কয়েক শতাব্দীর ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলেছে এবং একটি জাতির কতক মহৎ গুণ অর্জনে ত্বরান্বিত করেছে হিন্দু জনসাধারণের নিষ্ক্রিয়তাকে, তা মুসলমানদের ঐতিহ্যের বিরোধী, তাদের প্রয়োজনের অনুপযোগী এবং তাদের ধর্মের জন্য ঘৃণার্হ। "ফলে জীবনের প্রতিযোগিতায় সর্বক্ষেত্রে মুসলমানেরা পড়ে গেল হিন্দুদের অনেক পেছনে। "অন্তত পক্ষে বাংলার মুসলমানদের কোন চান্সই আর নেই। এক কথায়, তারা হল এমন এক জনগোষ্ঠী যাদের আছে বিরাট ঐতিহ্য, কিন্তু নেই কোন জীবিকানির্বাহের উপায়।" হিন্দুদের আনন্দোচ্ছল দিবালোক খা-খা রোদ হয়েই দেখা দিল মুসলমানদের কাছে। মুসলমানের কাছে যা ছিল নবাবের পরাজয়ের মাধ্যমে সমগ্র মুসলিম সমাজের ভাগ্য-বিপর্যয়, দালাল নব্য শ্রেণীটির কাছে তা-ই ছিল প্রভু পরিবর্তনের মাধ্যমে এক নতুন সুযোগ। 'ধর্মতত্ত্ব' গ্রন্থে শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র তাই বলেন, "মুসলমানের পর ইংরেজ রাজা হইল, হিন্দু প্রজা তাহাতে

কথা কহিল না। বরং হিন্দুরাই ইংরেজকে ডাকিয়া রাজ্যে বসাইল। হিন্দু সিপাহী ইংরেজের হইয়া লড়িয়া হিন্দু রাজ্য জয় করিয়া ইংরেজকে দিল। কেননা, হিন্দুর ইংরেজের উপর ভিন্ন জাতীয় বলিয়া কোন দ্বেষ নাই।" স্বাভাবিকভাবেই নব-প্রভুদের পক্ষে দাঁড়িয়েছিল, বিশেষ করে, নব্য-হিন্দু সমাজ। সহযোগিতার মাধ্যমে নিজেদের ভাগ্য রচনায় এগিয়ে গিয়েছিল নতুন উৎসাহে, নব উদ্দীপনায়। শুধুমাত্র পরাজিত মুসলমানেরাই হয়ে থাকল ইংরেজের পরম শত্রু।

কিন্তু সাধারণ হিন্দু সমাজের পক্ষে কি এই কথা খাটে? খাটে না। ইংরেজের অনুগ্রহপুষ্ট সুবিধাভোগী নব্যশ্রেণীটি ছাড়া বাদবাকী মেহনতী হিন্দু সমাজ ইংরেজ শাসনকে প্রথমে 'ভগবানের আশীর্বাদ' রূপে মেনে নেয়নি, যেমন মেনে নেয়নি দেশের গোঁড়া ব্রাহ্মণ সমাজ। কিন্তু রাজা রাহমোহন রায় প্রমুখ ব্যক্তির চেষ্টায় নব্যশ্রেণীটির ধ্যান-ধারণাই ক্রমে হিন্দু সমাজের নিয়ামক শক্তি হয়ে দাঁড়াল। ফলে "১৭৫৭ হইতে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ এই একশত বৎসরকাল মুসলমান জনসাধারণ বৃটিশ শাসকশক্তির সহিত বিরোধিতা ও সংগ্রামের পথ অবলম্বন করিয়াছিল; 'ওয়াহাবী বিদ্রোহ' প্রভৃতি বহু গণবিদ্রোহে মুসলমান জনসাধারণই বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদ ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে প্রধান শক্তিরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিল। অপরদিকে, বৃটিশ শাসনের আরম্ভকাল হইতেই হিন্দু সম্প্রদায় ছিল বৃটিশ শাসকগোষ্ঠীর প্রধান সহযোগী এবং ভারতে বৃটিশ শক্তিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার প্রধান অবলম্বন।" (সুপ্রকাশ রায়, ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস, পৃ. ১৫-১৬)।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী তথা বৃটিশ শাসকগোষ্ঠীর প্রধান অবলম্বন এই হিন্দু সম্প্রদায়টি ছিল নবপ্রতিষ্ঠিত হিন্দু-মধ্যবিত্ত বলে পরিচিত শ্রেণীটি। 'ঊনবিংশ শতাব্দীর পথিক' গ্রন্থে অরবিন্দ পোদ্দারের মতে, "প্রাক-ব্রিটিশ আমলে হিন্দু জাতির মধ্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আবির্ভাব হওয়ার উপাদানসমূহ প্রচ্ছন্নভাবে বর্তমান ও সক্রিয় ছিল, কেবল পারিপার্শ্বিক অবস্থাঘটিত কারণে এ সমাজ দানা বেঁধে সুগঠিত হতে পারেনি। ব্রিটিশের শাসননীতি– যা রামমোহন, দ্বারকানাথ কেশব সেন থেকে শুরু করে উনিশ শতকের শেষপাদ পর্যন্ত প্রতিটি হিন্দুর চোখে প্রতিভাত হয়েছিল 'বিধাতার আশীর্বাদ' রূপে, তাই ত্বরান্বিত করেছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণীটির আবির্ভাব।" "মনে রাখা ভালো, সাম্রাজ্যিক কাঠামোর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে কাজ করেছিল হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণী। ইংরেজ সংসাধিত রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের ক্ষতি ও দুঃখের বোঝা বহন করা ব্যতীত সেকালীন বাংলা তথা ভারতীয় জনসাধারণের আর কোন ভূমিকা ছিল না।" (আবদুল মওদুদ, মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ : সংস্কৃতির রূপান্তর, পৃ. ৪৯)

এখানে উল্লেখ্য যে, 'পলাশী বিপর্যয়ের প্রাক্‌কালে প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে বাঙালী হিন্দুরা বাংলার প্রশাসনিক পদগুলোর অধিকাংশই অধিকার করে নিয়েছিল এবং বৃহৎ

জমিদার গোষ্ঠীতে পরিণত হয়ে রাজস্ব বিষয়ক সর্বকর্মই নিয়ন্ত্রিত করছিল। ভূম্যধিকারেও তারা মুসলমানদের পিছনে ছিল না। তদুপরি, মুসলিম শাসনামলের শেষদিকে বাংলার শাসনকর্তাগণ অভ্যন্তরীণ মতানৈক্য ও পারস্পরিক বিরোধে দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। উচ্চ শ্রেণীর মুসলমানেরা যে নিশ্চিন্ত আয়েশে দিন কাটাচ্ছিলেন একথাও ধারণা করা যায়। তাঁদের মধ্যে তখন পচন ধরেছে। সুতরাং নিজেদের স্বার্থের জন্য বাংলার হিন্দুরা যে বাংলার মসনদ থেকে মুসলমান নবাবকে সরিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠবে এবং মুসলমানশাহী লুপ্ত করতে ব্যগ্র হয়ে উঠবে, তা মোটেই বিচিত্র নয়। তখন নতুন দিগন্তের দ্বার খুলে গেছে এবং পশ্চিমের খোলা দ্বার দিয়ে যারা বাংলার বুকে থাবা বিস্তারের জন্য শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হচ্ছে, সেই ইংরেজদের সঙ্গে মিতালীতে হিন্দুরা মত্ত হয়ে পড়বে, তাও বিচিত্র নয়। কারণ শাসনদণ্ডের হাতফের হলে হিন্দু সমাজই লাভবান হবে বেশী মুসলমানদের চেয়ে। প্রভুত্ব যদি আর কারও মানতেই হয়, তাহলে ইংরেজ ও মুসলমানের মধ্যে হিন্দু সমাজের চোখে কোনও পার্থক্য ঠেকেনি। বরং এই প্রভু বদলের মাধ্যমে উচ্চাভিলাষী হিন্দু সমাজ নিজেদের মঙ্গল ও উন্নতির পথই সন্ধান করেছিল।

এটাই ছিল মুসলমানী শাসন আমলের পরিসমাপ্তি সাধনে বাংলার উচ্চবর্ণ হিন্দু সম্প্রদায়ের মর্মান্তিক ভূমিকা এবং এ ভূমিকার হোতা ছিল নিঃসন্দেহে সে সব বর্ণহিন্দু সম্প্রদায়, যারা ইংরেজ আমলে মধ্যবিত্ত শ্রেণীরূপে এ দেশের আকাশে উদিত হয়েছিল।' (আবদুল মওদুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮-৪৯)

ঐতিহাসিক নিখিলনাথ রায়-এর কথায়, "রায়দুর্লভ, উমিচাঁদ ও জগৎশেঠদের কথায় নবাব নবাবী পাইয়াছেন, আবার তাঁহাদের ইঙ্গিতে নবাবী হারাইয়াছেন। তাঁহাদের কটাক্ষমাত্রেই বাংলার তৎকালীন রাষ্ট্রবিপ্লবসমূহ সংঘটিত হইয়াছে। বাস্তবিক, জগৎশেঠগণ অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলায় সমুদয় রাজনৈতিক ব্যাপারেরই মূলে ছিলেন।" (শ্রীনিখিলনাথ রায়, মুর্শিদাবাদ-কাহিনী, কলিকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ২০)

ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারও বলেন, "মহারাষ্ট্র সৈন্যরা (অর্থাৎ বর্গীরা) যখন বাংলা আক্রমণ করিল তখন বাংলার হিন্দুরা ইহা পাপীষ্ঠ যবনের বিরুদ্ধে পরিত্রাণকারী হিন্দুর অভিযান রূপেই গ্রহণ করিয়াছিল। ক্লাইভের মুর্শিদাবাদ প্রবেশকালে রাজপথে যে বিরাট জনতা হইয়াছিল কেবলমাত্র যষ্টি ও ইষ্টকের সাহায্যেই তাহারা ক্ষুদ্র ইংরাজ সৈন্য বিনাশ করিতে পারিত, কিন্তু বাঙালী তাহা করে নাই। হিন্দুর বিদ্বেষই যে ইহার প্রধান কারণ সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণই নাই।" আমরাও কোন সন্দেহ করি না। আমরা দেখেছি, বিভিন্ন মুসলিম শক্তির বিপর্যয়কারী ইংরেজ বানিয়াকে সানন্দে পরম শ্রদ্ধাভরে স্বাগত জানিয়েছেন এদেশীয় হিন্দু নেতৃবর্গ। তাদের কাছে বাংলার তখনকার স্বাধীনতা ছিল 'মুসলমানের স্বাধীনতা'। তাই 'মুসলমানের স্বাধীনতা' কালে যথেষ্ট

সুযোগ-সুবিধা এবং প্রাপ্তিযোগ ঘটলেও দেশে মুসলিম-শক্তির বিপর্যয় ও ইংরেজ শক্তির অভ্যুদয় তাদের কাছে ছিল শুধুমাত্র প্রভু বদলের পালা। পুরাতন প্রভুর প্রতি চরম বিদ্বেষ ও ঘৃণায় তাদের বিপর্যয়ে হিন্দু নেতৃবর্গ আনন্দিতই হয়েছিলেন এবং নতুন প্রভুকে গ্রহণ করেছিলেন 'মুক্তিদাতা' হিসাবে।

হান্টার, হুইলার, ক্রুম প্রমুখ ঐতিহাসিকের রচনা থেকে জানা যায় ঃ বাংলার শাসন ব্যবস্থার এই বিরাট পরিবর্তনের গুরুত্ব সর্বত্র অনুভূত হতে থাকে। নবাব সরকারের বহু কর্মচারী স্বাভাবিক কারণেই কর্ম হারালেন এবং সে স্থলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অনুগৃহীত হিন্দুগণ নিয়োজিত হলেন। এ দেশে নতুন শাসনব্যবস্থাকে মজবুত করার জন্য ইংরেজরা এদেশীয় হিন্দুদের যে সহায়তা লাভ করেছিল, তার প্রতিদানে এবং মুসলমানদেরকে চরমভাবে দাবিয়ে দেওয়ার জন্যে ইংরেজ শাসকেরা হিন্দুগণকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে দিল একক প্রাধান্য।

বস্তুত দেশের অবস্থা এমন হয়ে উঠল যে, নানা স্থানে বিদ্রোহ-বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। অভাব-অনটন, অত্যাচার-উৎপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে উঠল জনসাধারণ। দেশের মধ্যে শুরু হলো লুঠতরাজ। চুরি-ডাকাতিতে ভরে গেল দেশ। খুন-খারাবি হয়ে দাঁড়াল নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। এমনি অবস্থায় বাংলায় দেখা দিল এক ভীষণ দুর্ভিক্ষ, ছিয়াত্তরের মন্বন্তর। ১১৭৬ বঙ্গাব্দে (১৭৭০ সালে) এই দুর্ভিক্ষ এমন চরম আকার ধারণ করল যে, দেশের মানুষ পথে-ঘাটে মরতে থাকল কুকুর–বেড়ালের মত। গ্রাম-কে-গ্রাম উজাড় হয়ে গেল। শ্মশান হয়ে গেল সোনার বাংলা।

"তখনকার কর্তৃপক্ষের মতে মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ লোক মারা যায় (প্রায় এক কোটি), অর্থাৎ মোট কৃষিজীবীদের প্রায় অর্ধেক। চাষের জমিও অর্ধেক অনাবাদী হয়ে পড়ে। বস্তুত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অন্যতম কারণও এই-ই। হেস্টিংস ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময়ও খাজনা বাড়াতে ইতস্তত করেন নি, কিন্তু পরে তাঁর মত লোককেও থমকে দাঁড়াতে হলো। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রথম ইঙ্গিত আসে হেস্টিংসের কাছ থেকেই (রমেশচন্দ্র দত্তের Economic History of India দ্রষ্টব্য); ফ্রান্সিস্‌ও তাই বলেন। কর্নওয়ালিশ এসে দেখলেন, বাংলার এক-তৃতীয়াংশ জমি জঙ্গল ও অনাবাদী হয়ে রয়েছে। ততদিনে শিল্পও ধ্বংসপ্রাপ্ত, কাজেই জমি হতে আয় না বাড়লে কোম্পানীরও চলে না, লোকদের তো নয়ই। কর্নওয়ালিশ এক ঢিলে অনেক পাখী মারবার চেষ্টা করলেন। তাঁর মনে হলো, বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী করে দিলে কোম্পানীরও একটা বাঁধা আয় রইল (সে সময় আয়ের তুলনায় রাজস্ব খুব চড়া হারেই স্থির করেছিলেন কর্নওয়ালিশ), জমিদারেরা চাষের বিস্তার করে লাভবান হবারও চেষ্টা করবে, কোম্পানীকে আর প্রজা শোষণের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব নিতে হবে না, উপরন্তু ইংরেজের

সহায়ক একটা রাজনৈতিক শ্রেণীও গড়ে উঠবে।"(শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ,পশ্চিমবঙ্গের জনবিন্যাস, পৃ.১৮)

তার পরের ইতিহাস ভারতবর্ষে ইংরেজদের রাজ্য বিস্তারের ইতিহাস এবং শান্তিতে সেই বিশাল রাজ্য শাসন করার ইতিহাস। কিন্তু আমরা জানি, রাজ্যশাসনে সে শান্তি ইংরেজ শাসকেরা পায়নি। কারা ইংরেজ শাসকদের সে শান্তি নষ্ট করেছিল ? "আমাদের সীমান্তে একটি স্থায়ী বিদ্রোহী বসতি আছে এবং সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে নিরন্তর ষড়যন্ত্র চলছে। ইংরেজ সরকার সশস্ত্র বিশ্বাসঘাতকদের সঙ্গে কোন সন্ধি করতে পারেন না। যারা অস্ত্রের সাহায্য নেয়, তারা অবশ্য অস্ত্রের মুখে ধ্বংস হবে।" উদ্ধৃতিটা ডব্লিউ. ডব্লিউ. হান্টার সাহেবের 'দি ইণ্ডিয়ান মুসলমান' থেকে নেওয়া। হান্টার সাহেবের বর্ণিত 'বিশ্বাসঘাতক' তারাই যারা 'শান্তিতে ইংরেজ শাসন মেনে' নেন নি। বই-এর আরম্ভেই এঁদের পরিচয় দিতে গিয়ে হান্টার সাহেব লিখেছেন ঃ

"বাংলার মুসলমানরা পুনরায় এক অদ্ভুত অবস্থার সম্মুখীন হয়েছে। কয়েক বছর ধরে একটা বিদ্রোহী বসতি আমাদের সীমান্ত প্রদেশকে বিপন্ন করে তুলেছে। সময়ে সময়ে সেখান থেকে গোঁড়া মুজাহিদ বাহিনীর লোক দলে দলে বের হয়ে আমাদের ছাউনি আক্রমণ করছে, আমাদের গ্রাম পুড়িয়ে দিচ্ছে, আমাদের প্রজাদেরকে খুন করছে। ইতিমধ্যেই তারা আমাদের সেনাবাহিনীকে তিনটি ব্যয়সাধ্য যুদ্ধে লিপ্ত করেছে। মাসের পর মাস ধরে সীমান্তের এই বিদ্রোহী বসতিতে বাংলাদেশের অন্তস্থল থেকে নতুন নতুন মুজাহিদ এসে যোগ দিয়েছে। একের পর এক সরকারী মামলায় প্রকাশ পেয়েছে যে, ষড়যন্ত্রের এই তিমিরজাল আমাদের প্রদেশগুলিতে ছড়িয়ে আছে এবং পাঞ্জাব সীমান্তের বাইরে অবস্থিত জনবিরল পর্বতগুলির সঙ্গে এক সূত্রে বাঁধা আছে অসংখ্য ষড়যন্ত্র ঘাঁটি। গ্রীষ্মপ্রধান বিস্তৃত জলাভূমির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত গঙ্গা নদীর মোহনা পর্যন্ত এসব ষড়যন্ত্রের ঘাঁটি বিদ্যমান। আরও প্রকাশ পেয়েছে যে, একটি সংগঠনের মারফত ব-দ্বীপ আকৃতি বঙ্গদেশ থেকে নিয়মিতভাবে মানুষ ও টাকাকড়ি সংগৃহীত হয়ে দু' হাজার মাইল দূরে অবস্থিত বিদ্রোহী বসতিতে চালান হয়- আমাদেরই শাহী সড়কের উপর দিয়ে একের পর এক ঘাঁটি পার হয়ে। প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন ও ধনী লোকেরা এই ষড়যন্ত্রের নায়ক। তারা টাকা-পয়সা এমন সুকৌশলে চালান দেয় যে, এই বিপজ্জনক ষড়যন্ত্রমূলক কাজও তাদের জন্য ব্যাংকের লেনদেনের মত সহজ ও নিরাপদ হয়ে পড়েছে।

অপেক্ষাকৃত গোড়া মুসলমানেরা যখন এভাবে প্রকাশ্যে রাজদ্রোহে জড়িয়ে পড়েছে, তখন সমস্ত মুসলমান সম্প্রদায়ই প্রকাশ্যে আলোচনা করছে, জেহাদে যোগ দেওয়া তাদের পক্ষে ফরয কি না! ... এ সম্বন্ধে যেসব কাগজ-পত্র প্রকাশিত হয়েছে, এমন কি, মুসলমানদের লিখিত যেসব কাগজ-পত্র প্রকাশিত হয়েছে, তা থেকেও আমাদের ভারত

সাম্রাজ্য যে কি ভীষণ বিপজ্জনক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে চলেছে, তৎসম্পর্কে সন্দেহ থাকে না। সে সব থেকে প্রত্যেক যুক্তিনিষ্ঠ মনে এই প্রত্যয় জন্মায় যে, বহু বৎসর ধরে হঠকারী মুসলমানরা যেখানে প্রকাশ্যে রাজদ্রোহে লিপ্ত রয়েছে, সেখানে সমস্ত মুসলমান সম্প্রদায়ই এখন এমন একটা অতি বৃহৎ রাষ্ট্রীয় প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে, যা পূর্বে কোন জাতিকে এত উত্তেজিত করেনি।" (ডব্লিউ. ডব্লিউ. হান্টার, দি ইণ্ডিয়ান মুসলমান, অনুবাদঃ আবদুল মওদুদ, পৃ. ১-২)

ইংরেজরা মুজাহিদদের ধ্বংস সাধন করেছিল ঠিকই, তবে সেটা তাদের চিরাচরিত ভেদনীতি ও কূটচালের আশ্রয় নিয়ে, কয়েকবার শোচনীয় পরাজয়ের পর। আর মুজাহিদদের 'রাজদ্রোহী' খেতাব লাভটা হান্টার সাহেব কোন রকমে প্রমাণ করতে পারলেও 'বিশ্বাসঘাতক' খেতাবটার কোন আইনসঙ্গত ভিত্তিই তিনি খুঁজে পাবেন না বলে আমাদের বিশ্বাস। মুজাহিদগণ তো একদিনের জন্যও ইংরেজ শাসনকে মেনে নেন নি বা 'বিশ্বাস' করেন নি যে তাঁরা তা ভঙ্গ করে 'বিশ্বাসঘাতক' হতে যাবেন! নিজেদের জীবন-বিশ্বাসের প্রেরণাতেই তাঁরা বিদেশী শাসনের প্রতিরোধ করতে চেয়েছেন। ব্যর্থতা– তা তো অগৌরবের নয়, নয় বিদেশী প্রভুদের পদলেহনের গ্লানিতে কলঙ্কিত! ইংরেজ অনুগৃহীত ঐতিহাসিকেরা এবং সেই ভাবধারায় মোহাচ্ছন্ন পণ্ডিতেরা এইসব স্বাধীনতাপ্রিয় সংগ্রামীদের যতই কলঙ্কিত করুন না কেন, দেশবাসীর কাছে মজনু শাহ্-তিতুমীর-মুজাহিদরা বরাবরই শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত থাকবেন। পলাশী পরবর্তীকালে মজনু শাহ্-তিতুমীর-শরীয়তুল্লাহ্‌র মাধ্যমে স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য যে সংগ্রামের সূচনা, ১৮৫৭-তে সেই সংগ্রাম প্রয়াসেরই বিস্ফোরণ। আর এ প্রয়াসের সূচনাকারী ছিলেন সর্বশ্রদ্ধেয় শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ দেহ্‌লভী (র)।

এ সব ঘটনা হচ্ছে আমাদের ইতিহাসের প্রকৃত উপাদান, আমাদের অগ্রপথের মাইলফলক। কিন্তু এ যাবত কালের প্রচলিত ইতিহাসে আছে কি এসব মাইলফলকের মূল্যায়ন? বাংলাদেশে গত কয়েক শতকে রচিত ইতিহাসে সে সবের বিচ্ছিন্ন উল্লেখ থাকলেও তার যথাযথ গুরুত্ব সে সবে অনুপস্থিত। শুধু তা-ই নয়, মিথ্যার আবরণে সে সব ঘটনা, সে সব সংগ্রামী নির্ভীক বীরদের পরিচয় আবৃত।

কিন্তু সত্যকে তো বেশিদিন মিথ্যার আবরণে আবৃত রাখা যায় না। অতিসম্প্রতি কলকাতার আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত (১৩ অগ্রহায়ণ, রবিবার, ১৩৯৪ সন) গৌতম রায়-এর একটি প্রবন্ধ পড়ে মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল যে, মিথ্যার আবরণ খসিয়ে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার দিন হয়তো এসেই গেছে। এগিয়ে আসছেন মানুষের কল্যাণব্রতী সত্যসন্ধানীরা। গৌতম রায়-এর সে প্রবন্ধটি আমরা এখানে হুবহু তুলে দিয়ে এবং এ গ্রন্থ প্রকাশের জন্য ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষকে আমার কৃতজ্ঞতা জানিয়ে শেষ করছি এই প্রসঙ্গকথা।

[চব্বিশ]

ইতিহাস যখন অনৈতিহাসিক

তর্ক কি শুধু দূরদর্শনের 'রামায়ণ' আর 'বাহাদুর শা জাফর' নিয়েই? ভারত ইতিহাসকে নানাভাবে বিকৃত করা হয়েছে কিন্তু ইতিহাস চর্চার তথাকথিত আধুনিক কালের সূচনা থেকেই। বিকৃতি এমনকি তথ্য সংগ্রহ এবং বিন্যাসেও। ফলে একদিকে অনিবার্যভাবেই যেমন ঘটছে বিচার বিভ্রাট, অন্যদিকে তেমনই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ এবং অবিশ্বাস।

সম্প্রতি ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের সুবর্ণজয়ন্তী অধিবেশনের মঞ্চ থেকে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে, দূরদর্শনে প্রচারিত সিরিয়াল 'বাহাদুর শা জাফর'-এ ইতিহাসের সাম্প্রদায়িক বিকৃতি ঘটানো হচ্ছে। শুধু দূরদর্শন বা আকাশবাণীর মতো গণমাধ্যম নয়, স্কুল-কলেজে পাঠ্য ইতিহাসের বইগুলিও সাম্প্রদায়িকতা দোষে সমান দুষ্ট। আজ দেশের সর্বত্র ধর্মীয় মৌলবাদের যে পুনরুজ্জীবন অনাস্থা, বিদ্বেষ ও হানাহানিতে নিয়ত বিস্ফোরিত, তার মূলে কিন্তু রয়ে গেছে ওই সব পাঠ্যবই থেকে আহরিত বর্তমান প্রজন্মের অমার্জিত ইতিহাস চেতনা। এই সব কিতাবে ছাত্রছাত্রীরা এতকাল যা পড়ে এসেছে এবং এখনও পড়ে চলেছে, তাতে প্রকারান্তরে ভারতের যাবতীয় গৌরবের অংশীদারী দেওয়া হয়েছে হিন্দুদের, আর সবরকম দুর্ভাগ্য, তমসা ও ধ্বংসের দায়ভাগ চাপানো হয়েছে মুসলিমদের ঘাড়ে। দেশের ইতিহাস সম্পর্কে এরকম একপেশে ধারণা নিয়ে যারা কর্মজগতে প্রবেশ করছে, প্রশাসনের কর্ণধার বা আইনসভার জনপ্রতিনিধি হয়ে তারা যে সংখ্যালঘুদের সম্পর্কে অবিশ্বাস ও সন্দেহ পুষে রেখেই আগাগোড়া কাজ করে যাবে, ক্ষেত্রবিশেষে পক্ষপাতপূর্ণ ও বৈষম্যমূলক আচরণ করে যাবে, তাতে আর আশ্চর্য কী?

অন্য অনেক কিছুর মতো, এদেশে ইতিহাসের সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যার সূচনাও ঘটেছিল ইউরোপীয়দের হাতে। ম্যাক্স মূলার প্রমুখ প্রাচ্যবেত্তা বৈদিক যুগের গুণগান করতে গিয়ে সবরকম পরিমিতিবোধ খুইয়ে বসেছিলেন। অবিমিশ্র বিশুদ্ধ আর্যরক্তের সন্ধানে জার্মান প্রাচ্যবিদদের ভারত-অভিসার সেই সব মনগড়া জাতীয় অহমিকারই রকমফের, পরবর্তীকালে সমগ্র মানব সভ্যতাকে ভ্রাতৃঘাতী রক্তক্ষয়ের মূল্যে যার পাওনা মিটিয়ে দিতে হয়েছে। এদের অস্বস্তিকর ভারতপ্রেম এই উপমহাদেশের ঐতিহ্য সম্পর্কে যে সব উদ্ভট তত্ত্ব ও অভিসন্ধিমূলক তথ্যবিন্যাস সৃষ্টি করে, দেশীয় ঐতিহাসিকেরা সেগুলোই শেখানো বুলির মতো আউড়ে গেছেন। সে সময়কার ভারতবিদ্যা ছিল একান্তভাবেই 'হিন্দু ভারতের' জীবনচর্চা। যেন তুর্কি আগমনের পরবর্তী ছশ বছরের কোনও অনুসন্ধানযোগ্য ইতিহাস নেই। অথচ তথাকথিত ওই হিন্দু ভারতে, অর্থাৎ বৈদিক, মৌর্য বা গুপ্ত যুগে, ভারতবাসীর কাছে 'হিন্দু' কথাটার কোনও অর্থ ছিল না। প্রাক-ইসলামি উপাদানগুলোয় শব্দটির অস্তিত্ব নেই। আরবরাই প্রথম সিন্ধু অববাহিকার

বাসিন্দাদের 'হিন্দু' নামে ডাকতে শুরু করে। সংজ্ঞাটি অতএব মোটেই জাতিবাচক ছিল না। তখন যেসব ধর্মীয় গোষ্ঠী এদেশে ছিল, কেউই নিজেদের হিন্দু বলে জানত না, এমনকি একটি অখণ্ড ঐক্যবদ্ধ সম্প্রদায়ের অংশও ভাবত না। আধা সভ্য কৌম নৃগোষ্ঠীর কৌলিক আচারের বেশি কিছু তারা অনুশীলন করত না (আজও তা-ই করে)। তবু পশ্চিমের হিতবাদী দার্শনিক ও প্রাচ্যবিদরা এ যুগকে 'হিন্দু যুগ' আখ্যা দিলেন। অথচ সামাজিক ইতিহাসের কথা বাদই দিলাম, রাজবংশের ইতিহাস বিচারেও এ যুগকে কোনক্রমেই হিন্দু যুগ বলা যায় না। কারণ মৌর্য, ইন্দো-গ্রিক, শক, কুষাণ রাজবংশ হিন্দু ছিল না। অনেক রাজাই ছিলেন বৌদ্ধ এবং সচেতনভাবে নিজেদের বৌদ্ধ বলে প্রচার করতেন, কিন্তু কোনও রাজাই নিজেকে হিন্দু দাবি করেন নি। মাত্র গত শতকে সাম্প্রদায়িক ঐতিহাসিকরা ১২০০ সনের আগেকার রাজবংশগুলোর ওপর হিন্দুত্ব আরোপ করেন।

ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তকে সিন্ধু সভ্যতার পর্যালোচনায় সর্বক্ষণ এমন একটা ভান করা হয়, যেন ওই সুপ্রাচীন সভ্যতার উত্তরাধিকার একা ভারতের– হিন্দু ভারতের, পাকিস্তানের নয়। অথচ এই সভ্যতা যেসব স্থানে সবচেয়ে বিকশিত হয়েছিল, সেগুলি সবই আজকের পাকিস্তানে। পাঠ্যপুস্তক পড়লে আরও মনে হয়, প্রাচীন ভারতীয় সমাজে কোনও সংঘাত-বিরোধ ছিল না। মুনিঋষিরা নদীর ধারে আশ্রম বানিয়ে জপতপ করতেন, ছাত্ররা গুরুগৃহে বেদপাঠ করত, চতুর্বর্ণে বিভক্ত সমাজের বর্ণশ্রেষ্ঠরা চতুরাশ্রম অনুযায়ী জীবনযাপন করতেন, ত্যাগে-তিতিক্ষায়, দানে-ধ্যানে নিস্তরঙ্গ নিরুপদ্রব দিন গড়িয়ে চলত। তুর্কিরা এসেই সব গোলমাল করে দিল। কিন্তু প্রাচীন যুগের এমন স্বর্ণময় ছবি তুলে ধরার জন্য যেসব উপাদান ব্যবহার করা হলো, সেগুলো কোনটাই সমসাময়িক জীবনের বাস্তব আলেখ্য নয়, বরং জীবনযাপনের আদর্শ কী হওয়া উচিত, রক্ষণশীল সমাজপতিদের কলমে তারই প্রস্তাবনা। আচরণের তাত্ত্বিক সূত্র এবং বক্ষ্যমাণ সমাজ জীবন কোনও যুগেই অভিন্ন হতে পারে না, 'হিন্দু যুগেও' ছিল না।

পাঠ্যবইয়ে যে ধারণাই প্রচার করা হোক, আধ্যাত্মিকতায় ভারত বিশ্বের অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতার তুলনায় মোটেই অগ্রণী ছিল না। ব্রাহ্মণ পূরোহিতরা যথেষ্ট ভোগীও ছিলেন। বস্তুত 'হিন্দু' ব্রাহ্মণ্যবাদের অনুষ্ঠানসর্বস্বতা এবং ইন্দ্রিয়পরায়ণতার প্রতিবাদস্বরূপই বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের উত্থান, আর তার পরস্বাপহারী ক্ষয়িষ্ণু ঔপচারিকতার বিরুদ্ধেই ছিল চার্বাকদের জিহাদ। বৌদ্ধদের কাছ থেকেই ভারতবাসী আয়ত্ত করে অহিংসা, ত্যাগ, সন্ন্যাস ও সহিষ্ণুতার ধারণা। আজ ভারতে যথেষ্ট সংখ্যক বৌদ্ধ নেই। থাকলে হিন্দু যুগের মতো প্রাচীন ভারতে একটি বৌদ্ধ যুগের অস্তিত্বের ধারণাও আজ জনপ্রিয় হতো। সেক্ষেত্রে খ্রিস্টপূর্ব ৫০০ থেকে ৩০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত আটশো বছরের ইতিহাসকে অনায়াসে বৌদ্ধযুগ আখ্যা দেওয়া যেত। বৌদ্ধ ও জৈনদের

মতো চার্বাকরাও ধারাবাহিকভাবে ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের বিব্রত করে গেছেন। তাঁরাই প্রাচ্যের বাস্তববাদী সত্যজ্ঞানের প্রবক্তা। তাই ইউরোপে যাজকদের হাতে কোপার্নিকাস-জিওর্দানো ব্রুনো–গালিলিওরা যে নির্যাতন ভোগ করেছিলেন, এদেশে চার্বাকদের সঙ্গে সমাজপতিরা ঠিক একই আচরণ করেছিল। চার্বাকপন্থীদের জীবন্ত পুড়িয়ে মারার ঐতিহ্য এদেশে সুপ্রাচীন। তাঁদের লোকায়ত দর্শনের সমস্ত পুঁথিপত্র সুপরিকল্পিতভাবে নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে। ঐতিহাসিকরা কিন্তু বৌদ্ধ-জৈন আজীবিক চার্বাক প্রভৃতি সম্প্রদায়ের উত্থান ও বিকাশকে অখণ্ড ও সর্বপ্রয়াসী এক কল্পিত 'হিন্দু সংস্কৃতির' সমুদ্রে কয়েকটি ক্ষণস্থায়ী ঝঞ্ঝাবাতের চেয়ে বেশি মূল্য দেননি, কারণ 'হিন্দু ভারতের' ছকে এই ধর্মান্দোলনগুলিকে খাপ খাওয়ানো যায়নি।

পাঠ্যপুস্তকে মধ্যযুগের ইতিহাসের শুরুতেই কাফেরের রক্তাপ্লুত তরবারি হাতে আরবি ঘোড়সওয়ারের ঝটিকা প্রবেশ। অথচ অসংখ্য হিন্দুকে হত্যা করে ভারতে তুর্কি শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়নি। শুধু তাই নয়, সেই আধিপত্যের বিরুদ্ধে তেমন উল্লেখযোগ্য কোনও গণ-প্রতিরোধও একেবারেই দেখা যায়নি। কারণ, সে সময় হিন্দুস্তানের রাজনৈতিক মাৎস্যন্যায় ও সামাজিক অবক্ষয় এমন স্তরে পৌঁছেছিল যে, তাকে টিকিয়ে রাখার জন্য রাজপুত প্রভুদের হয়ে লড়ার কোনও প্রেরণা জনগণের মধ্যে জাগেনি। জাগার কথাও নয়। তুর্কিদের চেহারা, লোকাচার, সংস্কৃতি বা শাসনপদ্ধতির মধ্যে এমন ভয়ঙ্কর বা দানবীয় কিছু ছিল না, যা হিন্দুস্তানের জনগণ ইতিপূর্বেই রাজপুতদের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেন নি। শুধু বহিরাগত বিধর্মী বলেই তুর্কিদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে হবে, এমন কোনও কুসংস্কার ত্রয়োদশ শতকে ছিল না। থাকলে রাজপুতদেরই কি এখানকার ভূমিপুত্ররা মেনে নিতেন ? কিংবা তারও আগে বর্বর আর্য উপজাতীয়দের? তুর্কিদের চেয়ে তারা তো কম বহিরাগত ছিল না, কিংবা কম বিধর্মী। কয়েক শতাব্দী আগে তারাও তো তুর্কিদের ভূখণ্ড থেকেই এদেশে ঢুকেছিল ? আসলে বইয়ে যাই লেখা হোক, তদানীন্তন জনসাধারণ তুর্কি আধিপত্যকে বিদেশী আগ্রাসন ভেবে নেয়নি। গণপ্রতিরোধও তাই দেখা দেয়নি।

তাছাড়া, হিন্দু শাসকদের আনুগত্যেব অঙ্গীকার ছাড়া মুসলিমদের পক্ষে খাইবার গিরিপথের এ পারে থেকে যাওয়া কিছুতেই সম্ভব হতো না। আঞ্চলিক বা প্রাদেশিক শাসকদের বিদ্রোহও যে তেমন দানা বাঁধতে পারেনি, তার কারণ সুলতানকে একটা নির্দিষ্ট অঙ্কের রাজস্ব সময় মতো দিয়ে গেলে হিন্দু রাজা রানা জায়গীরদারদের কাউকেই উচ্ছেদ না করার নীতি সব তুর্কি-মুঘল শাসকই অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলেছেন। পরবর্তীকালে রাজপুত, মারাঠা বা শিখ রাজাদের কেউ কেউ যখন বাদশাহদের কাছ থেকে ঘা খেতে শুরু করলেন, ততদিনে মুসলিমরা আর বহিরাগত নয়, 'হিন্দুদের' মতোই ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির সমান অংশীদার। তখন 'হিন্দু' রাজাদের বিদ্রোহ আর

বিদেশী দখলদারদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার যুদ্ধ নেই বরং হয়ে পড়েছে নিজের হৃত রাজ্যাংশ ফিরে পাওয়ার সংকীর্ণ গোষ্ঠীগত, এমনকি ব্যক্তিগত লড়াই।

হিন্দুদের গণ-ধর্মান্তরের ধারণাটি সাধারণ্যে যতই ছড়িয়ে দেওয়া হোক, মধ্যযুগে রাষ্ট্র কখনও ব্যাপকভাবে হিন্দুদের ইসলামে দীক্ষিত করার চেষ্টা করেনি, বহুনিন্দিত ঔরঙ্গজেবের ক্ষেত্রেও এরকম প্রমাণ নেই। তুলনায় সম্রাট অশোকের কথা ভাবুন। সমগ্র প্রজাপুঞ্জকে রাজধর্মে আকৃষ্ট করতে তিনি কী না করেছেন? বস্তুত গণ-ধর্মান্তরে তাঁর সর্বাত্মক প্রয়াসের জন্যই ইতিহাসকাররা অশোককে মহামতি বলেছেন। আধুনিক ভারতীয় জাতীয়তাবাদ তাঁর কাছ থেকেই ধার করেছে অহিংসার প্রতীক।

পাঠ্যপুস্তকে সুলতান মাহমুদ এবং ঔরঙ্গজেবের মন্দির ধ্বংসকে হিন্দু বিদ্বেষের প্রমাণ বলে প্রচার করা হয়। অথচ মাহমুদের লক্ষ্য ছিল নিছক ধন-লুণ্ঠন। আজকের মতো সেদিনও মন্দির শুধু দেবোপাসনার স্থল ছিল না, তার গুপ্ত প্রকোষ্ঠে সঞ্চিত হতো পৃষ্ঠপোষক শ্রেষ্ঠীদের রত্নভাণ্ডার। খবরটা কেউ মাহমুদের কানে পৌঁছে দিয়ে থাকবে। ঔরঙ্গজেবের কোপদৃষ্টি পড়েছিল শত্রুপক্ষের এলাকার মন্দিরের ওপর। আসলে সেগুলি রাষ্ট্রদ্রোহিতার কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। দেবার্চনার আধ্যাত্মিক প্রচ্ছদের আড়ালে সেখানে রচিত হতো নিতান্ত জাগতিক ষড়যন্ত্রের নীল-নকশা। তাই বোধ হয় বাদশাহের ফৌজ সেগুলো গুঁড়িয়ে দিলে নৈষ্ঠিক হিন্দুদের মনেও কোনও তীব্র প্রতিক্রিয়া ঘটেনি। পাশাপাশি, বহু হিন্দু মন্দিরে দরাজ হাতে ভূমি ও অর্থ দান করেছিলেন ঔরঙ্গজেব। তা ছাড়া, তাঁর মন্দির বিনাশ যদি বিধর্মীর হিন্দুবিদ্বেষ হয়, কাশ্মীরের হিন্দু রাজা হর্ষের মন্দির ধ্বংসকে তাহলে কী বলা যাবে? একাদশ শতকে হর্ষ 'দেবোৎপাটননায়ক' নামে এক বিশেষ শ্রেণীর রাজকর্মচারীই নিয়োগ করেছিলেন, যাদের সরকারি দায়িত্বই ছিল মন্দির লুণ্ঠন ও ধ্বংস। একইভাবে দ্বাদশ শতকে পারমারের 'হিন্দু' রাজা সুভাতবর্মণ গুজরাট আক্রমণ করে দাভয় ও ক্যাম্বে এলাকার অসংখ্য জৈন মন্দির ধ্বংস করেছিলেন। আর গোটা হিন্দুযুগ ব্যাপী লিঙ্গায়েৎ ও বীরশৈব সম্প্রদায়গুলি নিরবচ্ছিন্নভাবে বৌদ্ধ ও জৈন মন্দির মঠ পুঁথি ধ্বংস করে গেছেন। পাঠ্যবইগুলি এদের ব্যাপারে নীরব কেন? সনাতন ভারতের পরধর্মসহিষ্ণুতার ফানুসটি ফেঁসে যাবার ভয়ে? একই কথা প্রযোজ্য জিজিয়া কর সম্পর্কে, যা অ-মুসলিমদের দিতে হতো। কিন্তু একইভাবে মুসলিমদেরও দিতে হতো 'যাকাত'। তাছাড়া জিযিয়া শুধু তুর্কি-মুঘলরাই চাপায়নি। চতুর্দশ শতকে দাক্ষিণাত্যে 'হিন্দু' জামোরিন রাজারা তাঁদের ইহুদি প্রজাদের কাছ থেকে জিযিয়া কর আদায় করতেন। 'মুসলিম' যুগে জিযিয়ার আওতা থেকে রেহাই ছিল নারী, শিশু, ব্রাহ্মণ, প্রতিবন্ধী ও সৈন্যদের। এসব কথা কেন ছাত্রছাত্রীদের বলা হয় না?

আসলে অসংখ্য ভারতীয় স্বেচ্ছায় ইসলাম বরণ করে নিয়েছে, এটা হজম করতে বর্ণহিন্দু সংস্কারে লালিত ঐতিহাসিকদের বাধে। অথচ সে সময় তথাকথিত হিন্দু ধর্ম ও

সমাজের জরদগব অচলায়তনটি যেরকম জরাজীর্ণ, ক্ষয়িষ্ণু ও অধঃপতিত হয়েছিল, বর্ণাশ্রমের অবমাননাকর বিকৃতি, তন্ত্রের উৎকট বীভৎসতা এবং কৌলীন্য প্রথার কদর্য অনাচার মিলে জনসমাজে এমন একটা হীনমন্যতা সৃষ্টি করেছিল যে, ইসলামের সাম্য ও সৌভ্রাত্রের উদার আহবানে আপামর জনগণ সাড়া না দিয়ে পারেনি। সূফী সন্ত-দরবেশ-ফকিরদের সমন্বয়ের বাণী, প্রীতি ও সৌহার্দ্যের আন্তরিক আবেদন উপেক্ষা করা সেদিন সম্ভব ছিল না। বহুক্ষেত্রে গোঁড়া উলেমাদের পরামর্শে মুসলিম রাজশক্তি দ্বারা নিগৃহীত ও বিতাড়িত হয়েও এই সর্বস্বত্যাগী সন্ন্যাসীরা প্রেম ও ভ্রাতৃত্বের যে প্লাবন বইয়ে দিয়েছিলেন, তারই তরঙ্গ অভিঘাতে এদেশে বৈষ্ণব ভক্তিবাদ নিজেকে ফিরে পায়, জন্ম নেয় শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদ, আর জোয়ার আসে আচারসর্বস্ব, দেবতাবহুল, পুরোহিতনির্ভর, যাগযজ্ঞভারাক্রান্ত ক্ষয়িষ্ণু হিন্দুধর্মের মরা গাঙেও। হিন্দুযুগ নয়, পরমতসহিষ্ণুতা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ঐতিহ্য শিক্ষার শ্রেষ্ঠ মডেল এই উপমহাদেশে তুর্কি-মুঘলদের শাসন ইতিহাস। ইসলামের অপ্রতিহত রথের পথ আগলে দাঁড়াতে নয়, একেশ্বরবাদী ইসলামের ভাবপ্রভাবেই ব্রহ্মবাদী শংকরের উদয়।

মুসলিম রাজশক্তির উচ্ছেদ করে নিজেদের উপনিবেশ স্থাপনের প্রেক্ষাপট হিসেবে ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদ ও হিতবাদী দার্শনিকরা অষ্টাদশ শতকে যে ভাবাদর্শগত জমি তৈরি করেছিলেন, স্বভাবতই সেখানে সংস্কৃতি সমন্বয় ও সাম্প্রদায়িক সংহতির মুসলিম ঐতিহ্যকে সম্পূর্ণ উহ্য রাখা হলো। আর সেই জমিতেই উনিশ শতকের ভারতীয় ঐতিহাসিকরা আবাদ করলেন বিষবৃক্ষ। ততদিনে ধুরন্ধর সাম্রাজ্যবাদীরা তাঁদের বুঝিয়ে ফেলেছে, ভারতের শক্তি তার আধ্যাত্মিকতায়—হিন্দু আধ্যাত্মিকতায়। ক্রমে হিন্দু ভারত ও মুসলিম ভারতের উপকথা জন্ম নিল। শুরু হলো হিন্দু ভারতের সবকিছুই বৃহৎ ও মহৎ বলে ধরে নিয়ে, মুসলিম ভারতের অপযশ গাওয়া। চালু হলো তুর্কি ও মুঘল বাদশাহদের ইতিহাসের খলনায়করূপে চিত্রিত করার রেওয়াজ, আর আঁতিপাতি করে খোঁজা শুরু হলো, ৬০০ বছরের মুসলিম শাসনের বিরুদ্ধে অমুসলিম বিদ্রোহী রাজা রানা ভূস্বামী বা কুলপতিদের নাম। শুধু মুসলিম শাসকের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণের কৃতিত্বেই অতঃপর ওইসব ভুঁইফোঁড় খুদে জায়গীরদারদের জাতীয় বীর, মহান দেশপ্রেমিক ইত্যাদি অভিধায় ভূষিত করা হলো। পাদপ্রদীপের আলো এসে পড়ল শিবাজী, রানা প্রতাপ, গোবিন্দ সিংহের ওপর।

কিন্তু কেন ? হাতের কাছে মজুত যখন 'নীলদর্পণ', তাঁতিয়া টোপি আর নানা সাহেবের রক্তে ভিজে রয়েছে মাটি, কানপুর-অযোধ্যার পথের ধারে ঝোলানো রয়েছে বিদ্রোহী সিপাহীর লাশ, তখনই ঐতিহাসিকরা আশ্চর্যজনকভাবে শিবাজী-রানা প্রতাপকে নিয়ে পড়লেন। কিন্তু এঁরা কি বিদেশী প্রভুত্ব উচ্ছেদের জন্য লড়েছিলেন ? ষোড়শ শতকে মুঘলদের কে বিদেশী ভাবত ? পেশোয়াশাহীর কট্টর সমর্থক মুষ্টিমেয় মারাঠা

সৈন্য ছাড়া তামাম হিন্দুস্তানের জনমানস শিবাজীর হিন্দুরাষ্ট্র স্থাপনের কল্পনায় উদ্দীপ্ত হয়েছিল এমন কোনও প্রমাণ নেই। গোটা ভারত বা উত্তর ভারত দূরস্থান, রানা প্রতাপ এমনকি সমগ্র রাজপুতানার হয়ে লড়ার কথাও কখনও ভাবেননি। রাজপুতরা ১৯০১ সনেও খোদ রাজপুতানায় মোট জনসংখ্যার ৬ শতাংশের বেশি ছিল না। তারও কয়েকশ বছর আগে কত রাজপুত ছিল? প্রতাপের পক্ষে কি একশ রাজপুতও লড়েছিল? নিজের হৃত রাজ্যাংশ ফিরে পাওয়া ছাড়া অন্য কোনও মহত্তর আবেগ তাঁকে তাড়িত করেনি। অথচ ইতিহাসের কিতাবে এদের নিয়ে কত আদিখ্যেতা।

বস্তুত শিবাজী প্রতাপ বা গোবিন্দ সিংহের বিদ্রোহগুলির সংকীর্ণ ও সাম্প্রদায়িক চরিত্র মিল-বেন্থাম পড়া নেটিভ ঐতিহাসিকরা বুঝতে পারেননি, বুঝেছিলেন এক মুণ্ডিতমস্তক সন্ন্যাসী। 'ভারতের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ' প্রবন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ যথার্থভাবেই বলেছেন, "মহারাষ্ট্র বা শিখ সাম্রাজ্যের উত্থানের প্রাক্কালে যে আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইয়াছিল, তাহা ছিল সম্পূর্ণ প্রতিক্রিয়াশীল। ওই দুই ক্ষণপ্রভা সাম্রাজ্য–ধর্মান্ধ গণ-অভ্যুত্থানের প্রতিনিধিস্বরূপ ছিল; উভয়েই মুসলমান রাজত্ব ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গেই নিজেদের সকল প্রেরণা ও কর্মপ্রবৃত্তি হারাইয়া ফেলিয়াছিল।" ইতিহাসের পাঠ্য-কিতাবে কিন্তু ঠিক উল্টো ধারণাই প্রচার করা হয়। জাতীয় বীর খুঁজতে গিয়ে লেখকরা লক্ষ্মীবাই, নানা সাহেব, তাঁতিয়া টোপিদের খুঁজে পান না, কারণ ওরা কেউ যে মৌলবাদী হিন্দু নয়, ওদের কারও তরবারি যে ম্লেচ্ছের রক্তে সিক্ত নয়। এভাবেই ইতিহাসের বইগুলি খিড়কির দরজা দিয়ে হিন্দু জাতীয়তাবাদকে পাচার করে, ছাত্র-ছাত্রীদের সুকুমার মনে যা দ্বিজাতিতত্ত্বরূপে চোলাই হয়।

এই সম্পূর্ণ অনৈতিহাসিক ইতিহাস শিক্ষাই পাড়ায় পাড়ায় একটি দুটি এমন উন্মাদকে ছড়িয়ে রাখে, যারা বিশ্বাস করে শাস্ত্রকার মণু বর্ণিত মহাপ্রলয়ের রেডিও কার্বন তারিখ পাঁচ লক্ষ খ্রিস্টপূর্বাব্দ এবং বেদ উপনিষদ তার আগেই লেখা হয়ে গেছে, যারা প্রচার করে ভারতই আর্যদের আদিনিবাস, গ্রিক-ল্যাটিনের আদি-জননী সংস্কৃত, মিসর-ব্যাবিলনের সভ্যতার উৎস গাঙ্গেয় উপত্যকা, পরমাণু বোনা কিংবা সুপারসনিক জেট 'ব্যাদেই ছিল', যারা প্রচার করে তাজমহল রূপান্তরিত হিন্দু মন্দির, যারা মহাকাব্যের নায়কের 'জন্মস্থান' নিয়ে রক্তাক্ত কাজিয়া করে এবং পি এন ওকের মতো যাদের কেউ কেউ ফোকটে ঐতিহাসিক বনে যায়।

এই সাম্প্রদায়িক ইতিহাসচর্চা বন্ধ করতে হবে। দেখাতে হবে অভিন্ন ধর্মাবলম্বী সব মানুষের মধ্যে ঐক্যের ধারণাটি ভ্রান্ত। বুঝতে হবে, যারা উদ্বৃত্ত উৎপাদন করে এবং অন্য যারা সেই উদ্বৃত্ত আত্মসাৎ করে, এই দুপক্ষেই নানা ধর্মের লোক রয়েছে। এবং ব্রিটিশ শাসন যেমন খ্রিস্টান শাসন নয়, তুর্কি-মুঘলের শাসনও তেমন মুসলিম শাসন ছিল না, বা

[ত্রিশ]

তার আগেকার যুগ ছিল না অবিমিশ্র হিন্দু যুগ। মধ্যযুগে মুসলমান মাত্রেই শাসক ছিল না, আপামর মুসলিমরা হিন্দু প্রজাদের মতোই নিঃস্ব ছিল। আজও আছে। ধর্ম নয়, অর্থনৈতিক স্বার্থই নির্ধারণ করে রাজনীতি এবং শাসক-বিদ্রোহী উভয়েই জাগতিক উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করতেই ধর্মের জিগির তোলে। শেখাতে হবে ভারত কোনকালেই শুধু হিন্দুর দেশ ছিল না। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে অহিন্দুর অবদান, অংশীদারী ও উত্তরাধিকার হিন্দুর চেয়ে এক চুলও কম নয়।

উৎসর্গ

যাঁর অনুপ্রেরণায় এ গ্রন্থ রচনার প্রয়াস,

অননুকরণীয় আদর্শনিষ্ঠ ও নিরলস কর্মী

জনাব এ. জেড. এম. শামসুল আলম

সাহেবের নামে-

মুসলিম আমলে

বাংলার শাসনকর্তা

প্রথম অধ্যায়

বাংলায় মুসলিম বিজয়ের পটভূমি ও পূর্বকথা

টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী।
হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী॥
বেঙ্গ সংসার বড়হিল জাঅ।
দুহিল দুধু কি বেন্টে ষামাঅ॥ (চর্যা ঃ ৩৩)

টিলায় আমার ঘর, প্রতিবেশী নেই। হাঁড়িতে ভাত নেই, নিত্যই ক্ষুধিত (অতিথি)। (অথচ আমার) ব্যাঙের সংসার বেড়েই চলেছে। দোয়ানো দুধ আবার বাঁটে ঢুকে যাচ্ছে (যে খাদ্য প্রায় প্রস্তুত, তাও নিরুদ্দেশ হয়ে যাচ্ছে)।

বাল কুমার ছঅ মুণ্ডধারী
উবাঅহীণা মুই এক্কু ণারী।
অহংণিসং খাই বিসং ভিখারি
গই ভবিত্তি কিল কা হমারী॥

আমার বালক পুত্র ছয় মুণ্ডধারী। আমি এক উপায়হীনা নারী। আমার ভিখারী (স্বামী) অহর্নিশ কেবল বিষ খায়। কী গতি হবে আমার।

স্থল-কমলগঞ্জনং মম হৃদয়রঞ্জনম্
জনিত-রতি-রঙ্গ-পরভাগম্ ।
ভণ মসৃণ-বাণি করবাণি চরণদ্বয়ম্
সরস-লসদলক্তক-রাগ্‌ম ॥
স্মর-গরল-খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনম্
দেহি পদ-পল্লবমুদারম্ ।
জ্বলতি ময়ি দারুণো মদনকদনারুণো
হরতু তদুপাহিত-বিকারম্॥
ইতি চটুল-চাটু-পটু-চারু মুরবৈরিণো
রাধিকামধি বচনজাতম্ ।
জয়তি পদ্মাবতী-রমণ-জয়দেব-কবি-
ভারতী-ভণিতমতিশাতম্॥

তুমি আদেশ দাও, আমার হৃদয়ের শোভাবর্ধক, স্থল-কমলের শোভাহারী, রতিরঙ্গে পরম রমণীয় তোমার ঐ চরণ-কমল সরস-অলক্তরাগে রঞ্জিত করি। হে প্রিয়ে! কামবিষবিনাশক তোমার ঐ মনোহর পদপল্লব আমার মস্তকে স্থাপন কর। আমার অন্তর দারুণ মদনারুণে জ্বলিতেছে, তোমার চরণ স্পর্শে সে বিকার দূরীভূত হউক॥

রাধিকার প্রতি প্রযুক্ত মুরারীর সুন্দর অনুরাগবাক্য-সম্বলিত পদ্মাবতী-রমণ জয়দেব কবির এই আনন্দপ্রদ সঙ্গীত জয়যুক্ত হউক॥

(কবি জয়দেব রচিত 'গীতগোবিন্দ')

১

সেই বহু প্রাচীনকালে আনুমানিক খৃস্টপূর্ব ২৫০০ অব্দ থেকে ১৫০০ অব্দের ব্যাপ্তিতে সিন্ধু-নদ বিধৌত অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল এক উন্নত সভ্যতা, নাম তার সিন্ধু সভ্যতা। সিন্ধু অঞ্চলে লারকানা জেলার মোয়েন-জো-দাড়ো, পাঞ্জাবের মন্টোগোমারি জেলার হরপ্পা এবং আরও প্রায় ষাটটি শহরের ধ্বংসাবশেষে পাওয়া গেছে সেই সিন্ধু সভ্যতার নিদর্শন। এই সভ্যতা-আলোকিত সুবিশাল জনপদের উত্তরে পূর্ব-পাঞ্জাবের রূপার থেকে দক্ষিণে আহমেদাবাদের লোথার, আর পশ্চিমে আরব সাগরের তীরে অবস্থিত সুতাকাগেনডোর থেকে পূর্বে রাজস্থানের বিকানীর।

মোয়েন-জো-দাড়ো ও হরপ্পা নগরীর উভয়টিই ছিল প্রায় তিন মাইল পরিধি-বিশিষ্ট, সুপরিকল্পিতভাবে নির্মিত এবং দুর্গ-প্রাকারে সুরক্ষিত। তখনকার নগরবাসীরাও সংগৃহীত খাদ্য মওজুদ রাখত আর্দ্রতা-প্রতিরোধক গুদামে। শ্রমিকদের জন্য ছিল শ্রেণীবদ্ধ আবাসগৃহ, পুরোহিতদের জন্য প্রাচীর-বেষ্টিত বাসস্থান, রাষ্ট্রীয় প্রধান ও অমাত্যদের দরবার-স্থল। ইষ্টক নির্মিত দোতলা পাকা বাড়ি ছিল অনেক, ছিল গোসলখানা, আবর্জনা ও ময়লা পানি নিষ্কাশনের জন্য নর্দমা। রাস্তাগুলো ছিল সোজা আর চওড়ায় দশ গজ পর্যন্ত।

সিন্ধু সভ্যতাকে ব্রোঞ্জ যুগের সভ্যতা বলাই সমীচীন; কারণ এই যুগে তামা ও টিনের সংমিশ্রণে তৈরি ব্রোঞ্জের ব্যবহার আরম্ভ হয় ব্যাপকভাবে। সর্বপ্রথম তুলার চাষ আরম্ভ হয় এখানেই। এখান থেকেই কাপড় রপ্তানী হতো ইরাকে। দজলা-ফোরাত অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল সিন্ধু-সওদাগরদের ছোট ছোট উপনিবেশ। সিন্ধু-সভ্যতার দেশে গড়ে উঠেছিল সুউন্নত অলংকার শিল্প, স্থপতিবিদ্যা, ধাতু শিল্প, কৃষিবিদ্যা আর নানারকম চারুশিল্প।

"খৃস্টজন্মের প্রায় দেড় হাজার বছর আগে সিন্ধুনদের উপত্যকায় এবং মধ্য ভারতে ও রাজস্থানের অনেক জায়গায় যেমন তাম্র-প্রস্তর যুগের সভ্যতা ছিল, বাংলাদেশের এই (সম্ভবত অন্য) অঞ্চলেও সেইরূপ সভ্যতাসম্পন্ন মনুষ্য-গোষ্ঠী বাস করিত। ইহারা ধান্য চাষ করিত। নানা রকমের এবং নানা নক্সার চিত্র শোভিত মৃৎপাত্র ব্যবহার করিত, সম্বর নীলগাই প্রভৃতি পশু শিকার ও শূকর প্রভৃতি পশুপালন করিত। এখানকার সর্বপ্রাচীন অধিবাসীরা প্রস্তর ও তাম্র ধাতুর ব্যবহার করিত এবং ক্রমে লৌহের সহিত পরিচিত হইয়াছিল। .... ইহার অধিবাসীরা ইটের ও পাথরের ভিত্তির উপর প্রশস্ত গৃহ নির্মাণ করিত। ..... কোন কোন বাড়ীর দেয়ালগুলি নলখাগড়ার সহিত মাটি মিশাইয়া তৈরী হইত। ..... প্রাচীন সভ্যতার আবাসস্থল ক্রীট দ্বীপের সহিত বাংলা দেশের বাণিজ্য সম্বন্ধ

ছিল। অজয় নদের উপত্যকায় নানা স্থানে মৃৎপাত্রের উপর কতকগুলি চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, এগুলি বাংলাদেশে প্রাচীন যুগে প্রচলিত অক্ষর।.....

সুতরাং প্রাচীন যুগে অন্তত তিন হাজার বছর অথবা তাহারও পূর্বে যে বাংলাদেশের এই অঞ্চলে সুসভ্য জাতি বাস করিত ইহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। অনেক লৌকিক ব্রত, আচার, অনুষ্ঠান, বিবাহ ক্রিয়ায় হলুদ সিন্দুর প্রভৃতির ব্যবহার, নৌকা নির্মাণ ও অন্যান্য অনেক গ্রাম্য শিল্প এবং ধুতি-শাড়ী প্রভৃতি বিশিষ্ট পরিচ্ছদ প্রভৃতিও এই যুগের সভ্যতার অঙ্গ বলিয়াই মনে হয়। মোটের উপর আর্য জাতির সংস্পর্শে আসিবার পূর্বেই যে বর্তমান বাঙালী জাতির উদ্ভব হইয়াছিল এবং তাহারা একটি উচ্চাঙ্গ ও বিশিষ্ট সভ্যতার অধিকারী ছিল, এই সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত বলিয়া গ্রহণ করা যায়।"[১]

প্রথমে সিন্ধু সভ্যতা ও পরে বাঙালী সভ্যতা। ভারতের দুই প্রান্তের এই দুই সভ্যতা ক্রমে ধ্বংসপ্রাপ্ত ও লাঞ্ছিত হয় আর্যদের হাতে। পোল্যাণ্ড থেকে মধ্য এশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে ছিল আর্যদের আদি বাসস্থান। কালক্রমে তারা ছড়িয়ে পড়ে পৃথিবীর নানা দিকে। আসে ইরানে এবং সেখান থেকে একাংশ ভারত উপমহাদেশে।

"The Aryans were pastoral tribesmen and warriors, tall and fair with straight noses. Their first move into India, about the beginning of the second millennium BC was as settlers, with their wives and children and their herds of animals. This peaceful immigration was followed by others which resulted in expansion, and conflict with the people living in fortified areas which now appear possible to have been outposts of the Indus Valley civilization. These peoples were crushed and destroyed, probably because of that characteristic historical movement in which decadent high-level civilizations fall so easily to the vigour of barbarians.

That the Aryans of the first invasion remained a nomadic people, an administration in the tent rather than the city, can be assumed from the Rig-Veda. The high god of the Vedas, Indra, is known as the`Breaker of cities (parumdara) but no mention is made of a builder or possessor of cities ... . The Aryan people lived in camps. The people whom they conquered are described in the Vedas as short, black and noseless. as dasyu or`slaves' ... A second invasion appears to have taken place not later than 1000 BC and the Aryans moved

১. ডক্টর শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, প্রাচীন যুগ, ষষ্ঠ সংস্করণ ১৯৭৪, পৃ. ১৩-১৪।

outwards from the Punjab towards the east. They had become much more sophisticated, inheriting, from the Indus civilization, the plough and the techniques of pottery, weaving, and carpentry.

The Aryans were continually fighting among themselves, and the Vedic hymns record great battles fought by infantry armed with bows and arrows, spears, swords, and battle axes, and nobles dressed in armour, fighting from chariots—all to the sound of music and drums. It would seem from the Rig-Veda that many of the battles were fought for the control of water, an essential factor in nomadic agriculture. This continual inter-tribal strife and the pressures of the second invasion compelled the Aryans to move eastwards."[২]

পূর্বদিকে আর্যদের অভিযান পরিচালনা করার কারণ ভারতে অবস্থিতির হাজার বছরে তাদের জনসংখ্যার বিপুল বৃদ্ধি। গঙ্গার পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহ অধিকার করে তারা সমগ্র উত্তরাপথের মালিক হয়ে বসেন। এখানে তাঁরা প্রতিষ্ঠা করেন বিভিন্ন রাজ্যের–কুরু, পঞ্চাল, কাশী, কোশল, শূরসেন, মৎস্য, মগধ, অঙ্গ, বিদেহ প্রভৃতি। আর্য-প্রভুত্বের এই ভূ-ভাগের নাম হয় আর্যাবর্ত।

আর্যরা ততদিনে নগর-সভ্যতার পথে বহুদূর এগিয়ে গেছেন। যাযাবর জীবন ত্যাগ করে গ্রহণ করেছেন গৃহীর জীবন। গড়ে উঠেছে পারিবারিক ও সামাজিক জীবন। ব্যবহার করতে আরম্ভ করেছেন সোনা ও রূপার অলংকার। খাদ্যাভ্যাসে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে মাছ-মাংস-ঘি-দুধ-মাখন প্রভৃতি, এমন কি কচি গোমাংসও। সোম-সুরা ও নৃত্য-গীত ও শিল্প-সাহিত্যের ভক্ত হয়েছেন তাঁরা। জীবিকা নির্বাহের প্রধান উপায় হিসাবে বেছে নিয়েছেন কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও পশুপালনকে। আর সৃষ্টি করেছেন বর্ণ প্রথার–ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। বিজিত রাজ্যসমূহের সকল অধিবাসীই শূদ্র। সংখ্যায় শূদ্রেরাই অনেক বেশি এবং তাদের বৃত্তি নির্ধারিত হলো আর্যদের ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য বর্ণাদির সেবা করা। অগণিত সেবাদাস নিয়ন্ত্রণকারী আর্যরা তখন এক সুউন্নত সভ্যতার অধিকারী। সৃষ্টি করেছেন সংস্কৃত ভাষার এবং সমৃদ্ধ করেছেন সংস্কৃত সাহিত্য। রচিত হয়েছে বেদ-উপনিষদাদি ধর্মগ্রন্থ।

"বৈদিক ধর্মাবলম্বী আর্যগণ যখন পঞ্চনদে বসতি স্থাপন করেন, তখন এবং তাহার বহুদিন পরেও বাংলাদেশের সহিত তাঁহাদের কোন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল না। ..... ঐতরেয় অরণ্যকে বঙ্গদেশের লোকের নিন্দাসূচক উল্লেখ আছে। বৈদিক যুগের শেষভাগে রচিত

---

2. Michael Edwardes, A History of India, First NEL MENTOR edition 1967, PP. 21-22.

বৌধায়ন ধর্মসূত্রেও পুণ্ড্র ও বঙ্গদেশ বৈদিক কৃষ্টি ও সভ্যতার বহির্ভূত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে এবং এই দুই দেশে স্বল্পকালের জন্য বাস করিলেও আর্যগণের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, এইরূপ বিধান আছে।

এই সমুদয় উক্তি হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয়, বাংলার আদিম অধিবাসিগণ আর্যজাতির বংশসম্ভূত নহেন। .... বাংলাদেশে কোল, শবর, পুলিন্দ, হাড়ি, ডোম, চণ্ডাল প্রভৃতি যে সমুদয় অন্ত্যজ জাতি* দেখা যায়, ইহারাই বাংলার আদিম অধিবাসিগণের বংশধর।.... এই মানব-গোষ্ঠীকে 'অস্ট্রো-এশিয়াটিক' অথবা 'অষ্ট্রিক' এই সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে; (বর্তমানে বলা হয় 'ভেড্ডিড' –লেখক) কিন্তু কেহ কেহ ইহাদিগকে 'নিষাদ জাতি' এই আখ্যা দিয়াছেন। .... বাংলার নিষাদ জাতি প্রধানত কৃষিকার্য দ্বারা জীবন ধারণ করিত এবং গ্রামে বাস করিত। ... আর্যজাতির সংস্পর্শে আসিবার পূর্বেই যে বর্তমান বাঙালী জাতির উদ্ভব হইয়াছিল এবং তাহারা একটি উচ্চাঙ্গ ও বিশিষ্ট সভ্যতার অধিকারী ছিল, এই সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত বলিয়া গ্রহণ করা যায়।"[৩]

আর্যগণ পূর্বদিকে অভিযানে বেরিয়ে এই বাংলাদেশও আক্রমণ করতে আসেন। কিন্তু ব্যর্থ মনোরথ হয়েই তাঁদের ফিরে যেতে হয়। "প্রায় সমস্ত উত্তর ভারত যখন বিজয়ী আর্যজাতির অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল, বঙ্গবাসীরা তখন সগর্ব্বে মস্তক উত্তোলন করিয়া তাঁহাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিল। শতপথ ব্রাহ্মণ বলেন, আর্য্যদের হোমাগ্নি সরস্বতী তীর হইতে সদানীরা (করতোয়া) নদীর পশ্চিম তীর পর্য্যন্ত আসিয়া নিভিয়া গিয়াছিল অর্থাৎ সদানীরার অপর পারে অবস্থিত বঙ্গদেশের মধ্যে তাঁহারা প্রবেশ করিতে পারেন নাই। তখন তাঁহারা 'অপ্রাপ্য আঙ্গুরফল মাত্রেই টক' এই নীতি অনুসারে বঙ্গবাসীদের উপর গালিবর্ষণ করিয়া গাত্রজ্বালা নিবারণ করিয়াছিলেন। ঐতরেয় আরণ্যক বলেন, বঙ্গবাসীরা অবোধ্য ভাষাভাষী পক্ষি জাতীয়; এবং তাঁহার ভাষ্যকার তাহার উপর আর-এক গ্রাম সুর চড়াইয়া তাহাদিগকে পিশাচ, রাক্ষস, অসুর প্রভৃতি মধুর আখ্যায় বিভূষিত করিয়াছেন। স্বয়ং মনু পর্যন্ত বিধান দিয়াছেন, তীর্থযাত্রা ভিন্ন এ ম্লেচ্ছ দেশে আসিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। বাঙালী বণিকেরা দেশ-বিদেশ ঘুরিয়া বেড়াইতেন বলিয়াই বোধ হয় সমুদ্রযাত্রা-বিরোধী আর্য্যগণ তাঁহাদিগকে 'পক্ষি জাতীয়' বলিয়া উপহাস করিয়াছিলেন। ভারতীয় আর্য্যগণ সমুদ্রযাত্রায় অনভ্যস্ত ছিলেন, সুতরাং অজানা সমুদ্রে পাড়ি দেওয়া অমানুষিক কার্য বলিয়া মনে করা তাঁহাদের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল।

---

* হীন বৃত্তির এসব 'অন্ত্যজ' জাতিগুলোর নাম পরিচয় বৃত্তি আর্যদেরই দেওয়া। বিজিত জনের জন্য এই-ই স্বাভাবিক।

৩. ডক্টর শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলদেশের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, প্রাচীন যুগ, ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৯৭৪, পৃ. ১০-১৪।

অতএব ইহা নিশ্চিতভাবে বলা যাইতে পারে যে, বাংলাদেশ আর্য্যাবর্তের অন্তর্ভুক্ত হইবার পূর্বে বহু সহস্র বৎসর ধরিয়া তাহার শিল্পকলা ও কাব্যাদি স্বাধীনভাবে নিজ পুরাতন ভিত্তিরই উপর গড়িয়া উঠিয়াছিল।"[৪]

কিন্তু সদানীরা বা করতোয়া নদীর পশ্চিম তীর থেকে আর্যবাহিনী ফিরে গেলেও কালক্রমে বাংলায় এসে আর্য-ব্রাহ্মণরা প্রভাব বিস্তার করতে থাকেন এবং এক সময় এ দেশও তাঁদের পদানত হয়ে যায়। বৈদিক যুগের শেষ দিকে অথবা তার অব্যবহিত পরেই বাংলাদেশে আর্য উপনিবেশ ও আর্যসভ্যতা বিস্তারের প্রমাণ পাওয়া যায়। ততদিনে আর্যদের বর্ণবাদ কুফল ফলাতে আরম্ভ করেছে। সমাজে ও রাষ্ট্রে ব্রাহ্মণদের আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে বহু আগেই। তার ফলে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যরা তাঁদের প্রতি বিদ্রোহীভাবাপন্ন হয়েছেন। তাছাড়া, এই সময়ে বৈদিক যুগের ধর্মপালন ও উপাসনার স্থলে আড়ম্বরপূর্ণ যাগযজ্ঞ ও পশুবলির বাড়াবাড়ি চলতে থাকে। জাতিভেদ প্রথার কঠোরতা সাধারণ মানুষের জন্য কষ্টকর হয়ে ওঠে। শূদ্রদের উপর নানা প্রকার অত্যাচার বেড়ে যায়। তখন খৃস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক। আর্যাবর্তে সূচিত হয় এক ধর্মবিপ্লব। ব্রাহ্মণ-প্রভাবিত প্রচলিত ধর্মের প্রতি বিরূপ হয়ে নতুন ধর্মমত প্রচার করেন মহাবীর ও গৌতম। তাঁদের নতুন ধর্মমতের নাম হয় জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম। জৈনদিগের মতে তাদের চব্বিশজন তীর্থঙ্করের (ধর্ম প্রচারকের) মধ্যে মহাবীর ছিলেন সর্বশেষ ধর্ম প্রচারক। কিন্তু তিনিই জৈনধর্মে প্রাণসঞ্চার করেন বলে তাঁকেই জৈনধর্মের প্রকৃত স্থাপনকর্তা বলা হয়। তাঁর জন্ম আনুমানিক খৃস্টপূর্ব ৫৪০ অব্দে, বৈশালীর নিকটবর্তী কুন্দ গ্রামে। আর কপিলাবস্তু নগরীর নিকটবর্তী লুম্বিনী গ্রামে গৌতমবুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন খৃস্টপূর্ব আনুমানিক ৫৬০ অব্দে। কালক্রমে বৌদ্ধ মতবাদ ভারতে খুবই গ্রহণীয় ধর্মমত হয়ে ওঠে। এখানে উল্লেখ্য যে, মহাবীর এবং গৌতম উভয়েই ছিলেন ক্ষত্রিয় বর্ণভুক্ত। পরবর্তীকালে দেখা যায়, ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় উভয় ক্ষেত্রেই ব্রাহ্মণ্যবাদ ও বৌদ্ধবাদের মধ্যে শত্রুতা ও সংঘর্ষ খুব প্রকট আকার ধারণ করেছে এবং শেষ পর্যন্ত বজায় থেকেছে ব্রাহ্মণ্যবাদেরই প্রাধান্য। সঙ্গে সঙ্গে একথাও স্মরণ রাখতে হবে, ব্রাহ্মণ্য জৈন বৌদ্ধ মতবাদ আর্যদেরই ধর্মীয় মতবাদ। তাছাড়া,"Jainism and Buddhism have much in common. Both were revolts, not against Hinduism itself, but against the diverse polytheism and the arrogant claims of the Brahmins.... Jainism and Buddhism represent similar ideas in extreme and moderate degrees. The Jains practised extensive penances and believed it meritorious to take one's own life. The Buddhists were

---

৪. অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু, বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৯, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ২২।

more moderate. Both believed it a sin to kill but the Jains took extreme precautions to avoid even the death of an insect.

Both sects in their attitude to caste caused a social revolution but this was incidental to the teachings of the two Masters, for both claimed no break with Aryan tradition — only a new way to liberation."[৫]

কালক্রমে আর্যদের মধ্যে এই ধর্ম-বিরোধ ছাড়াও দেখা দিয়েছিল রাজ্য-বিরোধ। আর্যদেরই বিভিন্ন রাজ্যে স্বাভাবিকভাবেই দেখা দিয়েছিল স্বাতন্ত্র্যবোধ। খৃস্টপূর্ব সপ্তম শতকের উত্তরাপথেই কয়েকটি রাজ্য শক্তিশালী হয়ে উঠে গ্রাস করে নিয়েছিল ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যসমূহকে। এই শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল দক্ষিণ বিহারের মগধ এবং অযোধ্যার কোশল। খৃস্টপূর্ব ৫৪০ অব্দের দিকে মহারাজাধিরাজ বিম্বিসারের অধীনে মগধ তো রাজ্যবিস্তারে অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করেছে। কিন্তু দিন কারোর সমান যায় না। খৃস্টপূর্ব ৪১৩ অব্দের দিকে বিম্বিসার বংশকে বিতাড়িত করে মগধে প্রতিষ্ঠিত হলো নন্দবংশ।

তারপর গ্রীক বীর আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণ এবং তাঁর হাতে ভারতের নাস্তানাবুদ অবস্থা। খৃস্টপূর্ব ৩২৫ অব্দের দিকে আলেকজান্ডারের ভারত ত্যাগের পর নন্দবংশকে বিতাড়িত করে রাজশক্তির অধিকারী হলেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য; তাঁর মন্ত্রণাদাতা ছিলেন 'অর্থশাস্ত্র'-প্রণেতা সেই বিখ্যাত ব্রাহ্মণ কৌটিল্য। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য রাজত্ব করেন খৃস্টপূর্ব ২৯৮ অব্দ পর্যন্ত, পরবর্তী রাজা বিন্দুসার, এবং খৃস্টপূর্ব ২৭৩ অব্দে ভারতের রাজনৈতিক আকাশে দেখা দিলেন মহারাজা অশোক। "When he succeeded to the throne there was little to distinguish him from any other Hindu ruler. In 261 BC, however, he determined to add to his empire Kalinga or Orissa, the last of the independent states on the Bay of Bengal.

In his campaign, Asoka tells us 125,000 people were taken captive and 100,000 killed; even Brahmins and ascetics were murdered. The Maurya empire now extended from the Himalayas to Mysore, from the borders of Assam to the Hindu Kush.

Shortly afterwards, the emperor was converted to Buddhism ... and shaken by the suffering and misery of war he turned to a philanthropic administration, moral reform, and the propagation of the teachings of the Buddha .... The influence of Asoka on Buddhism is as significant as that of Buddhism on Asoka. Buddhism itself began

---

5. Michael Edwardes, A History of India, First NEL MENTOR edition 1967, PP 30-32.

to change... An attempt was made to secure unity among Buddhists and a council was held at Pataliputra which resolved and determined on authoritative canon of the scriptures.

Asoka died in 232 BC. His reign is unique in history — here was an emperor who ruled upon the established principles of a religious creed. His experiment in administration did not long survive him. In 185 BC the last Maurya king was murdered by his commander-in chief, and the Maurya empire began to disintegrate."[৬]

মৌর্যবংশের পতনের পর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-পথে আবার এল বহিরাগত আক্রমণকারীর দল; আবার পাঞ্জাব হয়ে উঠলো শক্তি পরীক্ষার কেন্দ্রভূমি। এরাই পরে পরিচিত হলেন ইন্দো-গ্রীক রূপে। আর এদের পরাজিত করে পাঞ্জাবের রাজশক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত হলেন মধ্য এশিয়া থেকে আগত শক উপজাতিরা। শুধু পাঞ্জাব নয়—মথুরা, তক্ষশীলা প্রভৃতি জনপদও তাদের পদানত হলো। তখন খৃস্টপূর্বকাল শেষ হতে প্রায় শতবর্ষ বাকি।

"A Saka dynasty also reigned at Ujjain and its kings assumed Hindu names — Rudradaman, etc. Their dominion covered Malwa, Kathiawar, Cutch, and Gujarat, and they inter-married with the Andhras of the Deccan. The Ujjain dynasty survived for several hundred years —it was finally defeated by the Gupta emperor, Chandragupta II, in AD 388. Another Saka dynasty ruled for a short period in Nasik, but was soon conquered by the Andhras."[৭]

এর পর ভারতে এল হুনেরা, কুশানেরা। কালক্রমে প্রবল কুশানেরা ক্ষুদ্র ভারতীয় গ্রীক, শক ও পার্থিয়ান রাজ্যগুলোর উপর আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হলো। পাঞ্জাব, সিন্ধু, উত্তর-গুজরাট ও মধ্য-ভারতের কতকাংশ নিয়ে তারা গড়ে তুলল বিশাল সাম্রাজ্য।"The Chronology of this dynasty is still uncertain, but it is generally accepted that Kanishka, the only Kushan king about whom we really know much, ascended the throne in AD 120—though some scholars suggest he reigned from an earlier date. His capital was at Peshawar... Kanishka was said to have been converted to Buddhism ... He was succeeded by his son Huvishka, but decay seems to have set in and the last recorded Kushan king, Vasudeva I, who seems to have adopted Hinduism, was apparently deprived of most of his dominions... His

---

6. Michael Edwardes, A History of India, First NEL MENTOR edition, 1967, PP 40-43
৭. ibid, p. 57.

defeat may have been at the hands of the Sassanian Persians who early in the third century AD invaded the Punjab."[৮]

পরবর্তীকালে ভারতের প্রধান শক্তি হয়ে দেখা দিল গুপ্তবংশীয়রা।

বৈদিক যুগের শেষদিকে বা তার অব্যবহিত পরেই বাংলাদেশে আর্যদের উপনিবেশ স্থাপনের কথা আগেই বলা হয়েছে। "আর্যগণের উপনিবেশের ফলে আর্যগণের ভাষা, ধর্ম, সামাজিক প্রথা ও সভ্যতার অন্যান্য অঙ্গ বাংলাদেশে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল। প্রাচীন অনার্য ভাষা লুপ্ত হইল, বৈদিক ও পৌরাণিক এবং বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম প্রচারিত হইল, বর্ণাশ্রমের নিয়ম অনুসারে সমাজ গঠিত হইল। এক কথায় সভ্যতার দিক দিয়াও বাংলাদেশ আর্যাবর্তের অংশরূপে পরিণত হইল। অনুমান হয় যে, খ্রীস্টীয় প্রথম শতাব্দে বা তাহার পূর্বেই যুদ্ধযাত্রা, বাণিজ্য ও ধর্মপ্রচার প্রভৃতি উপলক্ষে ক্রমশ বহু সংখ্যক আর্য এদেশে আগমন ও বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। গুপ্ত সম্রাটগণ এদেশে রাজ্য স্থাপন করার ফলে যে আর্য প্রভাব বাংলায় দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বঙ্গদেশে গুপ্তযুগের অর্থাৎ পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দের যে কয়খানি তাম্রশাসন ও শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে বেশ বোঝা যায় যে, আর্যগণের ধর্ম ও সামাজিক রীতিনীতি এই সময় বাংলায় দৃঢ় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল।"[৯]

ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়েরও একই অভিমত। "গুপ্তরাজবংশ ছিল ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী। এদের রাজত্বকালেই ভারতবর্ষে পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বা হিন্দু ধর্মের অভ্যুত্থান ও প্রসার হয়। জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি রাজকীয় উদারতা থাকলেও ব্রাহ্মণ্য ধর্মই বিশেষ প্রশ্রয় পেয়েছিল। তারই ফলে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ্য সমাজ রাষ্ট্রের অন্যতম ধারক ও পোষক শ্রেণী হিসেবে গড়ে উঠতে আরম্ভ করে এবং এরাই হয়ে ওঠেন ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতির নিয়ন্তা। এদের অবলম্বন করেই আর্যভাষা, আর্য-ধর্ম ও আর্য-সংস্কৃতির স্রোত বাংলাদেশে সবেগে আছড়ে পড়ল। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণকথা, বিচিত্র লৌকিক কাহিনী ইত্যাদি সেই স্রোতের মুখে ভেসে এসে বাংলার প্রাচীনতর ধর্ম, সংস্কৃতি, লোক-কাহিনীকে একপ্রান্তে ঠেলে নামিয়ে দিল। উচ্চতর শ্রেণীগুলির ভাষা হল আর্য ভাষা, ধর্ম হল বৌদ্ধ, জৈন বা পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম। আর্য-আদর্শ অনুযায়ী সাংস্কৃতিক আদর্শ গড়ে উঠল।"[১০]

বাংলাদেশের এই যে আর্যীকরণ, এর পেছনে ছিল শুধুমাত্র ব্রাহ্মণদেরই প্রভাব। আর্যদের মধ্য থেকে শুধুমাত্র ব্রাহ্মণেরাই বাংলায় এসে সমাজে ও রাষ্ট্রে প্রাধান্য বিস্তার

---

৮. ibid, P 61.

৯. ডক্টর শ্রী রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, প্রাচীন যুগ, ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৯৭৪, পৃ.১৫-১৬।

১০. ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় ঃ বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব))-এর সংক্ষেপিত সংস্করণ, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, নিউ এজ সংস্করণ, ১৯৬০, পৃ. ৭৮।

করেন। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের কোন অস্তিত্বই পাওয়া যায় না। তবে সে সমাজে গুরুত্বপূর্ণ অভ্যুদয় ঘটে কায়স্থ ও বৈদ বলে পরিচিত শূদ্র বর্ণভুক্ত 'উত্তম সংকর' জাতের এক শ্রেণীর রাজকর্মচারীর ও চিকিৎসকের। এ সম্পর্কে ডক্টর রায়ের বক্তব্য ঃ "বাংলাদেশের অধিকাংশ জনপদ গুপ্ত-সাম্রাজ্যের দখলে আসার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালী সমাজ উত্তর-ভারতীয় আর্য-ব্রাহ্মণ্য বর্ণ-ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হতে আরম্ভ করে। পঞ্চম শতকে দেখা যায়, উত্তরবঙ্গে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম স্বীকৃতি লাভ করেছে। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের দেবদেবীর পূজো করা হচ্ছে, ব্রাহ্মণদের বসবাস ক্রমেই বাড়ছে, অব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণদের জমি দিচ্ছে, অযোধ্যাবাসী ভিন্-প্রদেশী এসেও এদেশে মন্দির সংস্কারের জন্যে জমি কিনছে। উত্তর-পূর্ব বাংলার ষষ্ঠ শতকের গোড়াতেই পুরোদস্তুর ব্রাহ্মণ সমাজ গড়ে ওঠে। ...পঞ্চম থেকে অষ্টম শতকের মধ্যে, ব্যক্তি ও জায়গার সংস্কৃত নাম যে পাওয়া যায়, তাতে দেখা যায় আর্যীকরণ দ্রুত এগিয়ে চলেছে।

এই যুগে কায়স্থ নামে এক শ্রেণীর রাজকর্মচারীর খবর পাওয়া যায়। করণ বলতেও কায়স্থদের মতই এক শ্রেণীর রাজকর্মচারীদের বোঝাত। ... বাংলার বর্ণবিন্যাস ব্রাহ্মণ এবং শূদ্র বর্ণ ও অন্ত্যজ-ম্লেচ্ছদের নিয়ে গঠিত। কারণ— কায়স্থ, অম্বষ্ঠ-বৈদ্য এবং অন্যান্য সংকর বর্ণ সমস্তই শূদ্র-পর্যায়ে; সবার নিচে অন্ত্যজ বর্ণের লোকেরা। দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে খুব সুস্পষ্টভাবে দেখা না দিলেও তার মোটামুটি কাঠামো এই যুগেই গড়ে উঠেছিল। তিনটি দ্বিজবর্ণের (অর্থাৎ পৈতাধারী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের –লেখক) মধ্যে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণদেরই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত এই যুগে পাওয়া যায়। অন্যেরা বিভিন্ন বৃত্তি অবলম্বন করে বিভিন্ন শূদ্র উপবর্ণ গড়ে তুলেছিলেন। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবর্ণের কোন হদিশই পাওয়া যায় না।...

নবম-দশম শতক নাগাদ বাংলাদেশে পাল আমলে করণ-কায়স্থেরা বর্ণ হিসেবে গড়ে উঠেছিলেন। এই সময় থেকে করণ ও কায়স্থ সমার্থক হয়ে দাঁড়ায়। বাংলাদেশে করণেরা ক্রমে কায়স্থ নামের মধ্যেই বিলীন হয়ে যায়। একাদশ-দ্বাদশ শতকের আগে পর্যন্ত বৈদ্য ছিল বৃত্তিবাচক শব্দ; কিন্তু এই সময় থেকে বৈদ্যবৃত্তিধারীরা বৈদ্য উপবর্ণ হিসেবে গড়ে ওঠেন।"[১১]

খৃস্টীয় পঞ্চম শতকে দুর্ধর্ষ হুনদের আক্রমণে ভারতের গুপ্ত সাম্রাজ্যের ভিত নড়বড়ে হয়ে গেল। আর গুপ্ত-সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে ষষ্ঠ শতকের গোড়ার দিকে প্রথমে বঙ্গ ও পরে গৌড় স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করল এবং গৌড়ের স্বাতন্ত্র্য-পথেই সপ্তম শতকের গোড়ায় বা তার কাছাকাছি সময়ে রাজা শশাঙ্কের অভ্যুদয়। কর্ণসুবর্ণকে রাজধানী করে তিনি হন গৌড়ের স্বাধীন রাজা। কজঙ্গল, পুন্ড্রবর্ধন, কর্ণসুবর্ণ তাম্রলিপ্ত বাংলার এই চারটি জনপদ রাজা শশাঙ্কের রাজ্যভুক্ত হয়। ব্রাহ্মণ্যবাদী কীর্তিমান নরপতি রাজা শশাঙ্ক

১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩-৫৪।

উত্তর-ভারতেও বিস্তৃত করেন তাঁর রাজ্যের সীমানা। তাঁর রাজত্বকাল আনুমানিক ৬০৬ সাল থেকে ৬৩৭ সালের পূর্ব পর্যন্ত। তাঁর প্রধানতম শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন বৌদ্ধধর্মালম্বী মহারাজা হর্ষবর্দ্ধন। "বৌদ্ধ লেখকেরা শশাঙ্কের নামে যে সব অপবাদ দেন, তার সব সত্যি না হলেও এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, শশাঙ্ক ও তাঁর রাষ্ট্রের ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে পক্ষপাত ছিল। "গোটা যুগ সম্বন্ধেই একথা খাটে। কারণ, একটানা দেড়শো বছর ধরে কোন রাষ্ট্র বা রাজবংশই সমসাময়িক বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির কোন পোষকতা করেননি; অন্যদিকে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতি তাঁদের অবারিত দাক্ষিণ্য লাভ করেছে।"[১২]

রাজা শশাঙ্কের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মানব মাত্র ৮ মাস ৫ দিন রাজত্ব করেন। তার পরেই তাঁর সুবিশাল রাজ্যে আরম্ভ হয় অন্তর্কলহ। ওদিকে ৬৪১ সালে হর্ষবর্দ্ধনেরও মৃত্যু হয়। ফলে পূর্ব-ভারতে দেখা দেয় রাষ্ট্রীয় দুর্যোগ। বাংলার ভাগ্যেই সবচেয়ে গুরুতর হয়ে দেখা দেয় এক অরাজক কাল। শতবর্ষের এই অরাজক বিশৃঙ্খলাময় কালকে ইতিহাসে অভিহিত করা হয় "মাৎস্য-ন্যায়ের"* কাল বলে। শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজন্যবর্গ বা সামন্তগণ এক হয়ে নিজেদের মধ্য থেকেই একজনকে বাংলার রাজা নির্বাচন করে তাঁর সর্বময় প্রভুত্ব মেনে নিলেন। এই নির্বাচিত রাজার নাম গোপালদেব। আনুমানিক ৭৫০ সালে তিনি আরোহণ করেন বাংলার সিংহাসনে। স্থিতিশীলতা ফিরে আসে বাংলায়। অতঃপর প্রায় চারশ' বছর পালবংশীয়রা এদেশে রাজত্ব করেন।

পালবংশ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হওয়ায় বৌদ্ধধর্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতি অষ্টম শতকের শেষ পঁচিশ বছর থেকেই প্রসার লাভ করেছিল বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণ্য ধর্মও আগের তুলনায় ঢের বেশি বিস্তৃতি লাভ করেছিল এই বাংলায়। এমন কি, বৌদ্ধ ধর্মের সাংস্কৃতিক আদর্শও অনেকাংশে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ছাঁচে গড়ে উঠেছিল। বাংলাদেশে পাল আমল থেকেই বৌদ্ধধর্ম ক্রমেই তান্ত্রিকতার পথে অগ্রসর হয়েছে এই যুগের আগে থেকেই এবং এই যুগেও। ব্রাহ্মণ্য প্রাধান্য সম্পর্কে ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়ের বক্তব্য হচ্ছে (সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ভাষায়) ঃ "পাল-চন্দ্র-কম্বোজ রাজারা বৌদ্ধ হলেও তাঁদের প্রত্যেকেরই সমাজাদর্শ ছিল একান্তই ব্রাহ্মণ্য সংস্কার ও আদর্শ অনুযায়ী। সপ্তম শতকের মাঝামাঝি থেকে অষ্টম শতকের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে দেখা যায় ব্রাহ্মণদের আস্তানা সমুদ্রতীর পর্যন্ত ছেয়ে ফেলেছে। বৌদ্ধ মঠগুলি জীর্ণ হয়ে পড়েছে। লোকেরা তার ইটকাঠ খুলে নিয়ে ঘরবাড়ি তৈরি করছিল। ছোট বড় ভূস্বামীরাও তখন অনেক ব্রাহ্মণ। বৌদ্ধ পাল

১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২।

* সপ্তম শতকের মাঝামাঝি থেকে অষ্টম শতকের মাঝামাঝি—এই একশত বছরই মাৎস্য ন্যায়ের শতবর্ষ।

রাষ্ট্রের ব্রাহ্মণ্য সমাজ ও বর্ণব্যবস্থা পুরোপুরি স্বীকৃত হয়েছিল। চন্দ্র ও কম্বোজ রাষ্ট্রেও একই জিনিস দেখা যায়। এই দুই রাষ্ট্রেই ঋত্বিক, ধর্মজ্ঞ, পুরোহিত, শান্তিবারিক প্রভৃতি ব্রাহ্মণদের রাজপুরুষ হিসেবে দেখা যায়। সমাজ ব্যবস্থার ব্যাপারে বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্যে কোনই তফাত থাকল না। গৃহী বৌদ্ধেরা সাংসারিক ক্রিয়াকর্মে প্রচলিত বর্ণশাসন মেনেই চলতেন।[১৩] এখানে উল্লেখ্য যে, দশম শতকের মধ্যভাগে উত্তর-পশ্চিম বঙ্গে কম্বোজ রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং পূর্ব-দক্ষিণ বঙ্গে প্রতিষ্ঠিত ছিল চন্দ্রবংশীয়দের স্বতন্ত্র এক রাজ্য।

পালবংশের রাজত্বকালকে বাংলাদেশে ব্রাহ্মণ্য ও অব্রাহ্মণগণের ধ্যান-ধারণার সমন্বয়কাল বলা যায়। ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ-বহির্ভূত স্মৃতি ও আচার, আর্য এবং আর্য-বহির্ভূত সংস্কার-সংস্কৃতি, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য পুরাণ-পূজা-শিক্ষা- আদর্শ-দেবদেবী সব কিছু মিলেমিশে এক সামাজিক সমন্বয় গড়ে ওঠে এই কালেই। বলতে হয়, ব্রাহ্মণ্য প্রভাবেই এই সমন্বয় গড়ে ওঠে। ফলে বৌদ্ধ রাষ্ট্রশক্তির সাহায্যেই যেন সমন্বয়ের মাধ্যমে ব্রাহ্মণ্যবাদ গ্রাস করে ফেলে অ-ব্রাহ্মণ্য সব কিছুকে। ভূমিব্যবস্থা, উত্তরাধিকার বিধান, বর্ণভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা, সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও প্রচলনের মধ্যেই সমন্বয়ের এই রূপ সুস্পষ্ট। এই সর্বগ্রাসী সময়ের সূত্রপাত হয়েছিল গুপ্ত আমলে, পূর্ণতা পেল পাল আমলে এবং তার মাধ্যমেই ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক আদর্শের দিক দিয়ে বাংলাদেশ যুক্ত হলো উত্তর-ভারতীয় ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ধারার সঙ্গে। বাংলার আদিম অধিবাসীরা তো বটেই, বাংলার বৌদ্ধরাও হারাল নিজেদের স্বকীয়তা।

পালবংশীয় রাজত্বের অবসানে বাংলার শাসন ক্ষমতায় এল সেন বংশ। সেন বংশীয়রা বাংলায় বহিরাগত, কর্ণাট দেশ থেকে এসেছিলেন তাঁরা। এ সম্পর্কে 'গৌড়রাজমালায়' বলা হয়েছে ঃ "পাল-সাম্রাজ্যের অধঃপতন সময়ে সেন রাজগণ যে কোন না কোন উপায়ে, পালরাজগণের শিথিল মুষ্টি হইতে রাজদণ্ড কাড়িয়া লইয়া গৌড়মণ্ডলে একটি আগন্তুক রাজবংশের প্রতিষ্ঠা সাধনে সফলকাম হইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। এ পর্যন্ত প্রাচীন লিপিতে যাহা কিছু প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে সেন-রাজ্য বাহুবলের রাজ্য বলিয়াই প্রকাশিত হইয়াছে; তাহা পাল-রাজ্যের ন্যায় প্রজাপুঞ্জের নির্বাচন প্রণালীতে* গঠিত গৌড়ীয় সাম্রাজ্য বলিয়া কথিত হইতে পারে না।[১৪]

---

১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫।

* এ সম্পর্কে 'গৌড়রাজমালা'র ভূমিকায় ডঃ শ্রী দীনেশচন্দ্র সরকার বলেন, পালবংশীয় গোপালের রাজ্যশাসকরূপে নির্বাচন প্রকৃতপক্ষে জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচন নহে। এই নির্বাচনের স্বরূপ কাঞ্চীয় বৈকুন্ঠ পেরমাল মন্দির থেকে বর্ণিত পল্লব বংশীয় নন্দিবর্মার এবং 'রাজতরঙ্গিণী' বর্ণিত কাশ্মীররাজ যশস্করের নির্বাচনের কাহিনী হইতে বোঝা যায়। পল্লব লেখটিতে মন্ত্রী প্রমুখ

এখানে উল্লেখ্য যে, গুপ্তরাজগণ এবং সেনরাজগণ এবং বর্মণ বংশীয়রাও ছিলেন অবাঙালী ব্রাহ্মণ্যবাদী। কিন্তু পালবংশীয়রা বাঙালী বৌদ্ধবাদী ছিলেন বলেই সর্বস্বীকৃত। বাংলায় সেন আমলের অবদান সম্পর্কে ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়ের অভিমত হচ্ছে ঃ পাল চন্দ্র রাষ্ট্রে ও তাঁদের সময়ে ব্রাহ্মণ্য বর্ণবিন্যাসের আদর্শ ছিল যেমন উদার, তেমনি নমনীয়। কম্বোজ সেন বর্মণ আমলে সেন বর্মণ রাষ্ট্রের সক্রিয় সচেতন চেষ্টার ফলে সেই আদর্শ হলো সুদৃঢ়, অনমনীয় ও সুনির্দিষ্ট। এইভাবে দেড়শো বছরে প্রায় হাজার বছরের বাংলাদেশকে ভেঙ্গে নতুন করে ঢেলে সাজার পাকাপোক্ত ব্যবস্থা হলো। পালবংশের জায়গায় এল সেন বংশ, চন্দ্র বংশের জায়গায় বর্মণ বংশ। দুটি বাঙালী বৌদ্ধ রাজবংশের বদলে এল এমন দুটি ভিন-প্রদেশী রাজবংশ, যারা অত্যন্ত নৈষ্ঠিক ও গোঁড়া ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, সংস্কার ও সংস্কৃতির ধারক ও পোষক। দেখতে দেখতে বাংলাদেশে যাগযজ্ঞের ধুম পড়ে গেল; নদনদীর ঘাটে ঘাটে শোনা গেল বিচিত্র পুণ্যস্নানার্থীদের মন্ত্রগুঞ্জরণ; ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর পূজা, বিভিন্ন পৌরাণিক ব্রতানুষ্ঠান দ্রুত বেড়ে গেল। বাঙালীর দৈনন্দিন ক্রিয়াকর্ম বিবাহ, জন্ম, মৃত্যু শ্রাদ্ধ, পারম্পরিক আহার-বিহার, বিভিন্ন বর্ণের নানান স্তর উপস্তর বিভাগের সীমা উপসীমা এক কথায়, সমস্ত রকম সমাজকর্মের রীতিপদ্ধতি ব্রাহ্মণ্য নিয়ম অনুযায়ী বেঁধে দেওয়া হলো। পাল আমলের শেষের দিকে মাত্র অঙ্কুর দেখা গিয়েছিল; বর্মণ রাষ্ট্রকে অবলম্বন করে ব্রাহ্মণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা বাংলাদেশে ডালপালা ছড়াতে আরম্ভ করল।[১৫] শুধু তাই নয়। পাল আমলে সমন্বয়ের মাধ্যমে বৌদ্ধ তান্ত্রিক মতের যে প্রভাব ব্রাহ্মণ্য আদর্শে ঢুকে পড়েছিল, তাও ঝেড়ে ফেলার ব্যবস্থা হলো। "বর্মণ ও সেন আমলে ব্রাহ্মণ্য সমাজ তাই স্মৃতি ও ব্যবহার গ্রন্থ রচনা করে আত্মপ্রতিষ্ঠার কাজে কোমর বেঁধে লাগলো। দন্তধাবন, আচমন, স্নান, সন্ধ্যা, তর্পণ, আহ্নিক, যাগযজ্ঞ, হোম, পূজানুষ্ঠান, ক্রিয়াকর্মের শুভাশুভ কাল বিচার, অশৌচ, আচার, প্রায়শ্চিত্ত, বিচিত্র অপরাধ ও তার শাস্তি, কৃচ্ছ্র, তপস্যা, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সমস্ত ব্রাহ্মণ্য সংস্কার উত্তরাধিকার স্ত্রীধন, সম্পত্তি-বিভাগ, আহার-বিহারের নানান বিধি-নিষেধ, বিচিত্র দানের বিবৃতি, দানকর্মের নানান বিধি-নিষেধ, তিথি নক্ষত্রের ইঙ্গিত বিচার, দৈবিক, বায়বিক ও পার্থিব নানা ধরনের উৎপাত, লক্ষণাদির শুভাশুভ নির্ণয়, বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্রপাঠের নিয়ম ও কাল– এক কথায়, ব্রাহ্মণ্য জীবন শাসনের কোন নির্দেশই

উচ্চরাজকর্মচারী উচ্চশ্রেণীর প্রজাবর্গ বণিক শ্রেণী ইত্যদির উল্লেখ আছে; 'রাজতরঙ্গিণী'-তে ব্রাহ্মণদিগকে রাজা নির্বাচন করিতে দেখা যায় (পৃ. ০.০৬)। তাই বলতে হয়, গোপালদেব প্রজাপুর দ্বারা রাজা নির্বাচিত হননি। হয়েছিলেন উচ্চরাজকর্মচারী, উচ্চশ্রেণীর প্রজাবর্গ প্রমুখের দ্বারা ।

১৪. রমাপ্রসাদ চন্দ্র, গৌড়রাজমালা, প্রথম নবভারত সংস্করণ ১৯৭৫,পৃ. ৮১।

১৫. ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় ঃ 'বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব) –এর সংক্ষেপিত সংস্করণ', সুভাষ মুখোপাধ্যায়, নিউ এজ সংস্করণ, ১৯৬০, পৃ. ৫৫-৫৬।

এইসব গ্রন্থ থেকে বাদ পড়েনি। সমাজের বিভিন্ন স্তর-উপস্তর, বর্ণ-উপবর্ণের পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্ণয়, বিশেষত ব্রাহ্মণদের সঙ্গে তাদের সম্বন্ধের অসংখ্য বিধি-নিষেধও এইসব স্মৃতিকর্তাদের আলোচনার বিষয়। এই যুগের স্মৃতিশাস্ত্রই পরবর্তী বাংলার ব্রাহ্মণ-তন্ত্রের ভিত্তি।

কম্বোজ-বর্মণ-সেন রাষ্ট্রে ব্রাহ্মণেরা রাজপুরুষ হিসেবে দেখা দিচ্ছেন। রাষ্ট্রে তাঁদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ক্রমেই বাড়ছে। তাঁরা রাষ্ট্রের কাছ থেকে প্রচুর দাক্ষিণ্য লাভ করেছেন। নানা উপলক্ষে দান গ্রহণ করে তারা অগাধ জমির মালিক হয়ে বসেছেন। এক বর্ণ, এক ধর্ম ও সমাজাদর্শের একাধিপত্যেই সেন বর্মণ যুগের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াল। সে-বর্ণ ব্রাহ্মণ বর্ণ; সে ধর্ম ব্রাহ্মণ্য ধর্ম। সে সমাজাদর্শ পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য সমাজের আদর্শ, সেই আদর্শই হলো সমাজের মাপকাঠি। রাষ্ট্রের মাথায় রাজা তার প্রধান খুঁটি ব্রাহ্মণেরা। কাজেই মূর্তিতে মন্দিরে, রাজকীয় লিপিমালায় স্মৃতিব্যবহারে ও ধর্মশাস্ত্রের সমস্ত রকম উপায়ে এই আদর্শ ও মাপকাঠির ঢাক পেটানো হতে লাগল। রাষ্ট্রের ইচ্ছায় ও নির্দেশে সর্বময় ব্রাহ্মণ্য একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হলো।[১৬]

ব্রাহ্মণদের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের করণ-কায়স্থদের প্রভাবও ছিল যথেষ্ট। জমির মাপ-জোক, হিসাবপত্র ও দপ্তরাদির তদারক এবং লেখার কাজকর্মের দরুনই করণ-কায়স্থদের এই প্রভাব। অম্বষ্ঠ-বৈদ্যদের প্রভাবও একেবারে কম ছিল না। ব্রাহ্মণদেরই বিধান অনুসারে দেশের অব্রাহ্মণরা সংকরশূদ্র হিসাবে ছত্রিশটি উপবর্ণে বিভক্ত ছিলেন; বাংলায় 'ছত্রিশ জাত' কথাটার উৎপত্তির কারণ এটাই। পরে আরও পাঁচটি উপবর্ণ এতে যোগ করা হয়। মোট একচল্লিশটি উপবর্ণকে আবার তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছিল। সেগুলো হচ্ছে ঃ

১. উত্তম সংকর ঃ এতে ২০টি উপবর্ণ; যথা ঃ করণ (পরে কায়স্থ বলে পরিচিত) অম্বষ্ঠ (পরে বৈদ্য বলে পরিচিত), উগ্র (বৃত্তি-যুদ্ধ). মগধ(চারণ ও সংবাদবাহী). তন্তুবায়, গন্ধবণিক, নাপিত, গোপ, কর্মকার, তৈলিক বা তৌলিক (সুপারি ব্যবসায়ী), কুম্ভকার, কাংস্যকার, শংখকার, দাস (চাষী), বারজীবী (পানের বরজ ছিল যাদের), মোদক (ময়রা), মালাকার, সূত (চারণ গায়ক– পতিত ব্রাহ্মণ), রাজপুত্র (রাজপুত?), তাম্বলী (পান বিক্রেতা)।

২. মধ্যম সংকর ঃ এতে ১২টি উপবর্ণ; যথা ঃ তক্ষণ (খোদাইকর), রজক, স্বর্ণকার, সুবর্ণ বণিক, আভীর (গোয়ালা), তৈলকার, ধীবর, শৌণ্ডিক (শুঁড়ি), নট (যারা নাচে, খেলা ও বাজি দেখায়) শাবাক (শাবার), শেখর, জালিক (জেলে)।

---

১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫-৫৭।

৩. অধম সংকর ঃ অন্ত্যজ শ্রেণীর ৯টি উপবর্ণ; যথা ঃ মলেগহী, কুড়ব, চণ্ডাল, বরুড়, তক্ষ, চর্মকার, ঘট্টজীবী, ডোলাবাহী, মল্ল। ম্লেচ্ছ পর্যায়ে বর্ণাশ্রমের বাইরে ছিল পুক্‌কশ, পুলিন্দ, খস, খর, কম্বোজ, যবন, সুহ্ম, শবর প্রভৃতি কয়েকটি দেশী ও ভিন্ন-প্রদেশী কোম।

নতুন বর্ণ ব্যবস্থায় এই-ই ছিল সমাজ-কাঠামো। দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর কথায় এসে বলতে হয়, পঞ্চম থেকে সপ্তম শতক পর্যন্ত বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল 'প্রধানত শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যের উপর বেশি নির্ভরশীল। কিন্তু তারপর থেকে সমাজ ক্রমেই কৃষিনির্ভর হয়ে উঠেছে; কাজেই শ্রেণী হিসেবে শিল্পী-ব্যবসায়ী বণিকদের প্রাধান্যও আর থাকেনি। ষষ্ঠ-সপ্তম শতকে ভূমি নির্ভর সামন্ত প্রথার স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠা এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, সংস্কার ও সংস্কৃতির বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দুটি শ্রেণীর সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হলো– একটি বহু স্তরে বিভক্ত ভূম্যাধিকারী শ্রেণী ও অন্যটি ব্রাহ্মণ-প্রধান জ্ঞান-ধর্মজীবী শ্রেণী। সামন্তচক্র ছিল রাষ্ট্রের শক্তি ও নির্ভর; এই সামন্তচক্রকে আশ্রয় করেই ভূম্যাধিকারী শ্রেণীর অস্তিত্ব। কাজেই এই শ্রেণীর সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হওয়া খুবই স্বাভাবিক। একদিকে রাষ্ট্র এবং অন্যদিকে ভূম্যাধিকারী শ্রেণীর দাক্ষিণ্যের উপর ব্রাহ্মণদের জমি ও অর্থ প্রাপ্তি নির্ভর করত। কাজেই তাঁরা ছিলেন এই দুইয়েরই পোষক ও সমর্থক। অষ্টম শতক থেকে শিল্প ব্যবসা বাণিজ্যের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে ভূম্যাধিকারী শ্রেণীর সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্বন্ধ আরও ঘনিষ্ঠ হতে থাকে। সেন ও বর্মণ রাজবংশ যে সমাজাদর্শ ও পরিবেশের মধ্যে তাদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন, যে আদর্শ ও আবেষ্টনের মধ্যে ভূম্যাধিকারতন্ত্র বজায় রাখা সম্ভব ও সহজ– সেই আদর্শ ও পরিবেশ রচনা ও প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব ছিল জ্ঞান-বুদ্ধিজীবী ব্রাহ্মণ শ্রেণীর ওপর।"[১৭]

কিন্তু সেই আদর্শ ও পরিবেশ রচনা ও প্রতিষ্ঠার পথে নীরব প্রতিরোধ এল বাংলার আপামর জনসাধারণের আর্যপূর্ব-সংস্কৃতি ও সমাজাদর্শের দিক থেকে। দশম থেকে দ্বাদশ শতক– এই দুশ বছরের বাংলার রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক অন্তর্দ্বন্দ্ব বর্ণনা করতে গিয়ে অধ্যাপক অতীন্দ্র মজুমদার বলেন, "একদিকে ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতি সামাজিক আদর্শ ও ভাবধারার প্রসার, অন্যদিকে আর্যপূর্ব সংস্কৃতি ও সমাজচিন্তার জীবন বিন্যাস ও জীবনাদর্শের প্রতিরোধ প্রচেষ্টা; দারিদ্র্য অভাব অনশন অত্যাচার পীড়ন শোষণ অন্যদিকে বিলাস ব্যসন কামচর্চা কাব্যানুশীলন চিত্রচর্চা; একদিকে জ্ঞানসাধনা ধর্মসাধনা কঠোর চরিত্রানুশীলন, অন্যদিকে বিশ্বাসের অভাব, মনোজগতে নৈরাজ্যের আবহাওয়া, মানবতাবোধে অবিশ্বাস। এই আলোড়ন উত্তেজনা সৃষ্টি রক্ষা ধ্বংস, আবার নতুন

১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১-৬২।

জীবনবোধ নবতর জীবনাদর্শ –সব নিয়ে উত্তাপ তরঙ্গবিক্ষুব্ধ সমুদ্রের মতোই এই দুশ' বছরের বাংলাদেশের ইতিহাস অস্থির ঘটনা চাঞ্চল্যে আন্দোলিত।"[১৮]

ব্রাহ্মণ্য বিধানে সমুদ্রযাত্রা নিন্দনীয় ছিল বলে ব্রাহ্মণ্য শাসনামলে সমুদ্র পথে বাংলার বহির্বাণিজ্য নিরুৎসাহিত হয়। ফলে বাইরে থেকে অর্থাগমের পথ প্রায় রুদ্ধ হয়ে যায়। মধ্যে পাল আমলে বহির্বাণিজ্যের প্রতি কিছুটা উৎসাহ দেখা গেলেও বাংলার অতীত বাণিজ্য-গৌরব আর ফিরে আসেনি। দেশের অর্থনৈতিক অবনতির একটা সূচক হচ্ছে দেশে অর্থনৈতিক লেনদেনে সোনার ব্যবহার। দেখা যায়, গুপ্ত আমলে বাংলায় যেমন সোনার, তেমনি রূপার মুদ্রাও বাজারে প্রচলিত ছিল। তাছাড়াও ছিল তাম্র মুদ্রা এবং সর্বনিম্নে কড়ি। সপ্তম শতকের পর থেকেই দেখা যায়, বাংলাদেশে স্বর্ণমুদ্রা একেবারে উধাও হয়ে গেছে, তার সঙ্গে রূপার মুদ্রাও। অষ্টম শতকে পাল রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবার পর বাজারে নতুন করে রৌপ্য মুদ্রার প্রচলন দেখা গেল। কিন্তু স্বর্ণমুদ্রা আর ফিরে এল না। তারপর সেন আমলে রূপার মুদ্রাও উধাও হয়ে গেল। এমন কি তামার মুদ্রাও আর দেখা গেল না। মুদ্রা হিসাবে চালু থাকল একমাত্র কড়ি। এখানে স্মরণীয় যে, মধ্য-সপ্তম থেকে মধ্য-অষ্টম শতক (পাল-রাজত্ব আরম্ভ হওয়ার আগ পর্যন্ত) এই শতবর্ষ ছিল অরাজক 'মাৎস্যন্যায়ের' সময়। সে সময় যে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা অবনতির চরমে উপনীত হবে, এ তো স্বাভাবিক। সপ্তম শতক থেকে দ্বাদশ শতক–এই সুদীর্ঘ সময়ে সামুদ্রিক বাণিজ্যে বাংলাদেশের কোন উল্লেখযোগ্য স্থান নেই। "কাজেই বাইরে থেকে সোনা-রূপার আমদানিও কম। স্বর্ণমুদ্রার অবনতির ভেতর দিয়ে এই দৈন্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ব্যবসা-বাণিজ্যর অবনতির ফলে শিল্প প্রচেষ্টারও কিছুটা অবনতি ঘটল।... ফলে কৃষির ওপর নির্ভরতা বাড়তে বাড়তে পাল আমলের শেষের দিকে এবং সেন আমলে বাংলাদেশ পুরোপুরি কৃষিনির্ভর ও ভূমিনির্ভর অচল অনড় গ্রাম্য সমাজে পরিণত হলো।[১৯]

অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যলয়ের 'ভারতবিদ্যা বিভাগ'-এর অধ্যাপক শ্রী অতীন্দ্র মজুমদার তাঁর রচিত গ্রন্থ ~~'চর্যাপদ' —এ~~ 'চর্যাপদের সমকালীন বাঙলাদেশ'-এ যে চিত্র তুলে ধরেছেন, তার থেকেই তুলে ধরছি এক দীর্ঘ উদ্ধৃতি ঃ* "ব্রাহ্মণরা ছিলেন

১৮. অধ্যাপক অতীন্দ্র মজুমদার, চর্যাপদ (প্রবন্ধ ঃ চর্যাপদের সমকালীন বাংলাদেশ) ১৯৭২, পৃ. ২০।

১৯. ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়-এর 'বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)' –এর সংক্ষেপিত সংস্করণ, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, নিউ এজ সংস্করণ, ১৯৬০, পৃ. ৪৭।

* নানা কারণে কিছুটা স্পর্শকাতর বিষয় বলেই নিজের জবানীতে বক্তব্যগুলো উপস্থিত না করে এ বিষয়ে যারা অথরিটি ও গবেষক তাদের বক্তব্যের উদ্ধৃতি (দীর্ঘ হলেও) তুলে ধরাটাকেই শ্রেয় মনে করছি। প্রকৃত প্রস্তাবে, অতীত সম্পর্কে লিখতে গেলে বিভিন্ন অথরিটি ও গবেষকের প্রকাশিত রচনাবলী থেকেই তো মন্তব্য ও বক্তব্য নিয়ে লিখতে হবে। তাই প্রয়োজনে তাঁদের মন্তব্য বক্তব্য নিজের জবানীতে না দিয়ে উদ্ধৃতির আশ্রয় নেয়া। তাতে বরং বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি পায় বলেই আমাদের ধারণা। —লেখক।

সমাজের উচ্চ মঞ্চে, কিন্তু সাধারণ লোকের ভাবনা ধারণা চিন্তা কর্মের সংস্পর্শের বাইরে। গোটা সমাজ তখন তিনটি বৃহৎ প্রাচীরের দ্বারা বিভক্ত—সবার উপরে ব্রাহ্মণ, মাঝে অগণিত শূদ্র পর্যায়ের সাধারণ লোক আর সবার নিচে সমস্ত রকম সামাজিক অধিকার ও মানবিক মর্যাদা থেকে বঞ্চিত অস্পৃশ্য দীন ও নিরন্তর দুঃখের দাহনে দগ্ধ অন্ত্যজ ও ম্লেচ্ছ সম্প্রদায়। প্রত্যেকটি বর্ণের মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য দূরতিক্রম্য বাধার প্রাচীর। এমন কি, ব্রাহ্মণদের মধ্যেও নানা মেল বন্ধন, ভৌগোলিক বাধা, বংশ ও কুলমর্যাদাজাত বিভেদ বিধি-নিষেধের গণ্ডী টানা। এর পরিণতি তাই শেষ পর্যন্ত দাঁড়ালো ব্রাহ্মণ এবং অব্রাহ্মণের মধ্যে একটা গুপ্ত বিরোধ এবং অবিশ্বাস। এই বিরোধ, অবিশ্বাস, ঘৃণা এবং অপমানের ধূমকলঙ্কে মলিন পরিবেশে সেদিন বাংলার সমাজজীবনকে ঘোলাটে করে তুলেছিল॥ ...ধর্মে কর্মে আচারে ব্যবহারে বিবিধ বিধিনিষেধে চর্যাপদের সমকালীন বাঙলাদেশে ব্রাহ্মণের ছিল একচ্ছত্র আধিপত্য। এই নিরঙ্কুশ ক্ষমতাও ব্রাহ্মণশাসিত সমাজে নানা কদাচার ও নৈতিক অধঃপতনের জন্ম দিয়েছিল। বাৎস্যায়নের নাগর জীবনের আদর্শ সমগ্র বাঙলাদেশের নাগরজীবনের আদর্শ হয়ে উঠল। ...... বাৎস্যায়ন পরিষ্কারভাবে বলেছেন, গৌড়বঙ্গের রাজান্তঃপুরে মহিলারা নির্লজ্জভাবে ব্রাহ্মণ রাজকর্মচারী ও দাসভৃত্যদের সঙ্গে কামচর্চা কামষড়যন্ত্র ও কামসম্ভোগ করতেন। তিনি আরও বলেছেন, কামচরিতার্থতার জন্য নগরে এবং গ্রামে বিত্তবানদের ঘরে দাসী রাখা হোত এবং ছিল বাররামা ও দেবদাসী (বাৎস্যায়ন-কামসূত্র .... ৫/৬/৩৮; ৫/৬/৪১; ৬/৪/৯; ৬৫/৩৩) (এমনি আরও বর্ণনা দিয়েছেন শ্রী মজুমদার –লেখক)। ...সুখ ও আনন্দের চেতনা যা মানুষের জীবনে সদাজাগ্রত থাকে— তা থেকে সামাজিক কারণেই বঞ্চিত সে-যুগের সাধারণ মানুষ।

চর্যাপদের সমকালীন এবং তার কিছু আগের বাঙলাদেশের সামগ্রিক চিত্রটি নানা উপাদানের সাহায্যে এতক্ষণ পাঠকের সামনে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি। এই চিত্রের একদিকে সামাজিক গোঁড়ামি, ঐশ্বর্যবিলাস এবং কামবাসনার সোৎসাহ আতিশয্য। কাব্য-কবিতাগুলির অধিকাংশই যৌনকামনায় মদির এবং মধুর; রাজসভার চরিত্র ও আবহাওয়া চূড়ান্ত লাম্পট্য, চারিত্রিক অবনতি, তরল রুচি ও দেহগত বিলাস এবং ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত দুর্নীতির কলঙ্কে মলিন; ধর্ম আচরণে ভেদবুদ্ধি নিন্দনীয় যৌনকামনা, অমানুষিক ঘৃণা ও অবহেলা জীবনের সমস্ত দিকে কদর্যতার সমাবেশ। আর অন্যদিকে নিদারুণ দারিদ্য, ক্ষুধা, অভাব, পীড়ন, শোষণ, বর্জন, যন্ত্রণা ও মৃত্যু। উচ্চতর বর্ণসমাজ ব্রাহ্মণ্য পুরোহিততন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ্য রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্বে অসাড়, রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক অধোগতি অবাধ, শিল্প সাহিত্য বস্তুসম্বন্ধরহিত, নিতান্ত ভাবকল্পনার জগতে পল্লবিত বাক্য, উচ্ছ্বাসময় অত্যুক্তি এবং দেহগত লীলাবিলাসে ভারগ্রস্ত।

এই নিশ্ছিদ্র সর্বব্যাপী সুগভীর অন্ধকারের বেড়াজালে চর্যাপদের সমকালীন বাঙলাদেশ অসহ্য আত্মসন্তুষ্টি, দুর্বল আত্মশক্তি এবং দুরপনেয় চারিত্রিক কলঙ্কের ক্রমবর্ধমান অভিশাপে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছে– কোথাও তার আশা নেই, নিপীড়িতের যন্ত্রণা প্রকাশের নেই ভাষা, মানবধর্মে নেই ক্ষীণতম বিশ্বাস। সমস্ত বাঙলাদেশই যেন এই অন্ধকারের সুকঠোর পেষণে মৃত্যুযন্ত্রণায় অভাবদৈন্য-পীড়িত পার্বতীর মতো করুণ কণ্ঠে ক্রন্দন করছে— গই ভবিত্তি কিলকা হমারী।"[২০]

এমনি একটি যুগের শেষ গৌড়েশ্বর ছিলেন লক্ষ্মণ সেন। এবং তাঁর হাত থেকেই নদীয়া কেড়ে নিয়ে বঙ্গবিজয়ের সূচনা করেন ইখতিয়ার-উদ-দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী । এ প্রসঙ্গে রমাপ্রসাদ চন্দ্র বলেন, "গোপালের বংশধরগণকে গৌড়জন যেরূপ ভক্তি নেত্রে দেখিতেন বিদেশাগত পাল রাজকুল উন্মুলনকারী বিজয় সেনের এবং বল্লাল সেনের উত্তরাধিকারী লক্ষ্মণ সেন সেরূপ ভক্তি লাভ করিতে পারিয়াছিলেন না। বরেন্দ্রের (কৈবর্ত) বিদ্রোহে গৌড়ের প্রজাশক্তি এবং রাজশক্তি এই উভয়ের মধ্যে যে ভেদ উপস্থিত হইয়াছিল, কর্ণাটাগত সেনবংশের অভ্যুদয়ে, তাহা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল; এবং মাৎস্যন্যায় নিবারণের অথবা 'অনীতিকারম্ভের' প্রতিকারের অধিকার বিস্মৃত হইয়া গৌড়জন কালস্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছিলেন। মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ারের অভ্যুদয় গৌড়ের সর্বনাশের মূল বা সর্বনাশের ফল বলিয়া কথিত হইতে পারে না; বিজয় সেনের অভ্যুদয়ই গৌড়ের সর্বনাশের প্রকৃত মূল বা ফল বলিয়া কথিত হইতে পারে। লক্ষ্মণ সেন গৌড়রাষ্ট্রের বহিঃশত্রু দমনে সমর্থ হইয়া থাকিলেও প্রজাপুঞ্জের সহযোগিতার অভাবে, আভ্যন্তরীণ ঐক্যসাধনে এবং বিভিন্ন অংশের রক্ষার সুব্যবস্থা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন না। সেই জন্যই মহাম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার অবাধে মগধ এবং বরেন্দ্র অধিকার করিতে পারিয়াছিলেন।"[২১]

তাছাড়াও, রাজা লক্ষ্মণসেনের রাজ্য আভ্যন্তরীণভাবেও ক্রমে দুর্বল হয়ে আসছিল। আভ্যন্তরীণ এই দুর্বলতার মূলে ছিল সামন্ততন্ত্র। গুপ্ত-আমল থেকেই সামন্ত রাজারা নিজ নিজ রাজ্যের শাসনকার্য চালাতেন, অবিশ্যি সম্রাটের হয়েই। সামন্তদের এই যে আত্মকর্তৃত্ব, এর থেকেই সামন্ততন্ত্রের বিকাশ। মোটামুটিভাবে ষষ্ঠ শতক থেকে বাংলায় মহারাজাধিরাজদের অধীনে সামন্ত নায়ক ও সামন্ত রাজ্যের উদ্ভব ঘটে আসছিল। পাল-আমলে এই সামন্ততন্ত্র ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মত বাংলাদেশেও পূর্ণ পরিণতি লাভ করে। এমনি অবস্থায় স্বাভাবিকভাবেই কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র ও রাজবংশ দুর্বল হয়ে পড়লে এই সামন্তচক্র মাথাচাড়া দিয়ে উঠত। পাল আমলে এরকম ঘটনা একাধিকবার

২০. অধ্যাপক অতীন্দ্র মজুমদার, চর্যাপদ (প্রবন্ধ ঃ চর্যাপদের সমকালীন বাঙলাদেশ), ১৯৭২, পৃ. ৩১-৩৩ এবং ৩৭ ও ৩৯।

২১. রমাপ্রসাদ চন্দ্র, গৌড়রাজমালা, প্রথম নবভারত সংস্করণ, ১৯৭৫, পৃ. ৮১-৮২।

ঘটেছে। সেন আমলে লক্ষ্মণসেনের রাজত্ব এই সমস্যাটা গুরুতর রূপ ধারণ করে। সুন্দরবন অঞ্চলে এক মহামাণ্ডলিকের পুত্র ডোম্মনপাল এক স্বাধীন রাজ্যখণ্ড প্রতিষ্ঠা করে বসেন। ত্রিপুরা অঞ্চলে পট্টিকেরায় রণবঙকমল্ল তাই করলেন। মেঘনার পূর্বতীরেও তেমনটি ঘটল। সেখানে পুরুষোত্তমদেবের পুত্র মধুমথন বা মধুসূদনদেব স্বাধীন রাজা হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। মুঙ্গের অঞ্চলেও এক সামন্ত কৃষ্ণগুপ্ত ও তাঁর পুত্র সংগ্রামগুপ্ত লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালেই স্বতন্ত্র রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করলেন। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে যখন এমনটি চলছে, তখনই ভারতের পশ্চিমাঞ্চল থেকে মুসলিম রাজশক্তি ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে আরম্ভ করেছে পূর্বদিকে। তাই শ্রী অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বলেন, (সেনদের) এই সাম্রাজ্য পাল সাম্রাজ্যের ন্যায় সকল উত্তরাপথে প্রাধান্য রক্ষা করিতে সমর্থ হয় নাই। রণপাণ্ডিত্যের অভাব না থাকিলেও কাশীধামে প্রয়াগধামে এবং পুরুষোত্তমক্ষেত্রে জয়স্তম্ভ সংস্থাপিত করিবার প্রমাণ শ্লোকের অসদ্ভাব না থাকিলেও সেনরাজবংশের অধিকারভুক্ত প্রাচ্যসাম্রাজ্য পতনোন্মুখ অবস্থায় পতিত হইয়াছিল এবং অল্পকালের মধ্যেই (মুসলমানের সহিত প্রথম সংঘর্ষেই) পশ্চিমাঞ্চল পরিত্যাগ করিয়া পূর্বাঞ্চলের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল।[২২]

সেন রাজ্যের এ সমস্ত দুর্বলতার প্রেক্ষিতে মন্তব্য করতে গিয়ে ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়-এর অভিমত হচ্ছে ঃ এর পর বখৎ-ইয়ারের নবদ্বীপ জয় এবং একশো বছরের মধ্যে সারা বাংলাদেশ জুড়ে মুসলমান রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা মোটেই আকস্মিক ঘটনা নয়–সেন আমলে রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধোগতিরই পরিণাম।[২৩]

এই প্রেক্ষিত-ব্যাখ্যায় আনুষঙ্গিক কারণের কথাও ডক্টর রায় উল্লেখ করেছেন। তাঁর বিশ্লেষণ অনুযায়ী মুসলিম অভিযানের মুখে কোন প্রতিরোধই না টেঁকার কারণ ছিল। "প্রথমত, ইসলামধর্মী আরব, তুর্কী, খিল্‌জী প্রভৃতি বিদেশী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে উত্তরভারতের হিন্দুরাজশক্তির প্রতিরোধ ভেঙে পড়ায় দুর্ধর্ষ মুসলমান অভিযাত্রীদের ঠেকিয়ে রাখার মত মনোবল বা শক্তি সেন-রাষ্ট্রযন্ত্রের ছিল না। বিহারকে ধনেপ্রাণে ধ্বংস হতে দেখে আতঙ্কগ্রস্ত দেশের লোক দলে দলে পূর্ববঙ্গে, কামরূপে পালিয়ে গিয়েছিল। এমন কি নবদ্বীপও জনশূন্য হয়ে পড়েছিল। দ্বিতীয়ত, পরাজয়ের মনোভাব রাষ্ট্রকে যে পেয়ে বসেছিল, অদৃষ্টের ওপর নির্ভরতার ভেতর দিয়ে তার পরিচয় পাওয়া যায়। রাজা, মন্ত্রী, ব্রাহ্মণ, সেনাপতি, বণিক, রাজপুরুষ সবাই জ্যোতিষশাস্ত্রে পরম বিশ্বাসী হয়ে

---

২২. শ্রী অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, গৌড়রাজমালা'র উপক্রমণিকা, পৃ. ০.৩৩।

২৩. ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়-এর 'বাঙালীর ইতিহাস (আদি পর্ব)'-এর সংক্ষেপিত সংস্করণ, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, নিউ এজ সংস্করণ ১৯৬০, পৃ. ৯৮।

পড়েছিলেন। তৃতীয়ত, লক্ষ্মণসেন বিহারে বাংলার পথে ও নবদ্বীপে শত্রুকে যতটুকু বাধা দিয়েছিলেন, তা মোটেই কার্যকরী হয়নি।[২৪]

কিন্তু এখানে প্রশ্ন জাগে– "বিহারকে ধনেপ্রাণে ধ্বংস হতে দেখে আতঙ্কগ্রস্ত দেশের যেসব লোক দলে দলে পূর্ববঙ্গে, কামরূপে পালিয়ে গিয়েছিল" তাঁরা দেশের কোন্ শ্রেণীর লোক? দেশের আপামর জনসাধারণ নিশ্চয়ই এমনি করে পালিয়ে যাননি। ধারণা করা যায়, পূর্ববঙ্গে কামরূপে পালিয়ে গিয়েছিলেন এতদিনের সকল সুবিধা ভোগকারী উচ্চশ্রেণীর অনেকেই। আমরা তো মনে করি, তুর্কী ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত পালিয়ে যাওয়া লোকেরা ছিলেন অতীন্দ্র মজুমদার বর্ণিত সেই তিন শ্রেণীর মধ্যে "সবার উপরে ব্রাহ্মণ" শ্রেণীভুক্ত "সবার পিছে সবার নীচে" অবস্থিত "সমস্ত রকম সামাজিক অধিকার ও মানবিক মর্যাদা থেকে বঞ্চিত অস্পৃশ্য দিন ও নিরন্তর দুঃখের দাহনে দগ্ধ অন্ত্যজ ও ম্লেচ্ছ সম্প্রদায়"-এর লোকেরা নিশ্চয়ই নয়; এবং মাঝের শ্রেণীর "অগণিত শূদ্র পর্যায়ের সাধারণ লোক"দের মধ্য থেকেও যারা রাষ্ট্রশক্তি-সংযুক্ত ছিলেন তাঁদের কিছু সংখ্যক বাদে বাকিরাও নয়। শ্রী মজুমদার 'চর্যাপদের সমকালীন বাঙলাদেশ-এ যে চিত্র তুলে ধরেছেন, তাতে আমাদের উপরোক্ত ধারণা সত্য বলেই অনুমিত হয়। তার সঙ্গে এ ধারণাও করা যায়, তখনকার শ্রী মজুমদারের কথায় "ব্রাহ্মণ এবং অব্রাহ্মণদের মধ্যে একটি গুপ্ত বিরোধ এবং অবিশ্বাস" ভরা বাংলাদেশ বিদেশী অভিযানকারীর বিজয়ের জন্য উপযুক্ত ক্ষেত্র হিসাবেই তৈরী ছিল। তাই দেশের সর্বময় কর্তা ব্রাহ্মণ্য শক্তিকে আঘাতকারী বিজয়ী মুহাম্মদ বিন বখতিয়ারের কাফেলাকে শ্রী রমাপদ চন্দ্রের কথায় "কালস্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছিলেন," যে গৌড়জন তাঁরা আন্তরিক সংবর্ধনা না জানালেও অন্তত শত্রু-অপসারণজাত সন্তুষ্টিতে নিতান্তই কাম্য হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। তাই তো দেখা যায়, লাখনৌতি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে মুহাম্মদ বিন বখতিয়ারের কাফেলাকে দেশবাসীর পক্ষ থেকে কোন বাধারই সম্মুখীন হতে হয়নি। এবং তাই ডক্টর মুহাম্মদ এনামুল হকের মতে 'রামাঞি পণ্ডিত' কর্তৃক অন্তত ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ দিকের রচনা 'নিরঞ্জনের রুষ্মা' কবিতার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "সদ্ধর্মী বা নিম্নশ্রেণীর বৌদ্ধেরা ব্রাহ্মণদের অত্যাচার সহ্য করিত বলিয়া নিশ্চয় উত্ত্যক্ত ও বিব্রত বোধ করিতেছিল। এমন সময় মুসলমান তুর্কীদের কাছ হইতে ইসলামী মানবতাবোধের এবং ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধের স্পর্শ লাভ করিয়া তাহারা যে ব্রাহ্মণ্য অত্যাচারের হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। ফলে তাহারা বঙ্গে মুসলিম শাসনকে অভিনন্দিত করিয়াছে ও ব্রাহ্মণ্য শাসনের আশু নিপাতও কামনা করিয়াছে।"[২৫]

২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬-৯৭।

২৫. ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, মুসলিম বাঙলা সাহিত্য, প্রথম মুদ্রণ , ১৯৫৭, পৃ. ১৯-২০।

স্পষ্টতই তের শতকের প্রারম্ভে ইখতিয়ার-উদ-দীন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজীর নদীয়া বিজয় কোন অচিন্ত্যনীয় ঘটনা নয়। ওই বিজয়কালীন বাংলার রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক পরিস্থিতি এমনি এক বিজয়ের সহায়ক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তদুপরি ভারতের মাটিতে ক্রমপ্রতিষ্ঠিত মুসলিম রাষ্ট্রশক্তির যে বিকাশ চঞ্চল করে তুলেছিল দ্বাদশ শতককে, তারই এক পরিশিষ্ট হিসাবে মুহম্মদ বিন বখতিয়ারের এই বিজয় অসম্ভব ছিল না।

এই উপমহাদেশে মুসলিম রাষ্ট্রশক্তি প্রতিষ্ঠার রয়েছে তিনটি পর্যায় ঃ প্রথম পর্যায়ে ৭১১ থেকে ৭১৩ সালের মধ্যে মুহম্মদ বিন কাশেমের নেতৃত্বে আরবদের সিন্ধু–মুলতান বিজয়; দ্বিতীয় পর্যায়ে ৯৯৯ সাল থেকে আরম্ভ করে ১০২৭ সাল পর্যন্ত গজনীর সুলতান মাহমুদ কর্তৃক সতের বার ভারতে যুদ্ধাভিযান; এবং তৃতীয় পর্যায়ে দ্বাদশ শতকের শেষ দিক থেকে সূচিত মুহম্মদ গূরী নামে সুপরিচিত গজনীর সুলতান মুইজ-উদ-দীন মুহম্মদ বিন সা'ম কর্তৃক ভারত অভিযান।

অষ্টম শতকের প্রথম দশক অতিক্রান্ত। ইরাকের শাসনকর্তা হাজ্জাজ বিন ইউসুফ সাকাফীর জন্য প্রেরিত উপঢৌকন ও সিংহল-প্রবাসী কতিপয় আরব-বণিকের এতিম কন্যাদের নিয়ে সিন্ধু উপকূলে এসে পৌঁছেছে একটি আরব জাহাজ। আর তখনি দেবল বন্দরের অদূরে সিন্ধুর জলদস্যুরা ঝাঁপিয়ে পড়ল সে-জাহাজের উপর। লুণ্ঠন করে নিয়ে গেল হাজ্জাজের উপঢৌকন সামগ্রী ও এতিম কন্যাদের। সংবাদ অবগত হয়ে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ সিন্ধুরাজ দাহিরের নিকট এ কাজের জন্য ক্ষতিপূরণ ও জলদস্যুদের শাস্তিদানের দাবি জানালেন। প্রত্যুত্তরে রাজা দাহির ক্ষতিপূরণ তো দিলেনই না, উপরন্তু জলদস্যুদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণেরও অক্ষমতা জ্ঞাপন করলেন। পরিণামে মুসলমানদের পক্ষ থেকে যুদ্ধাভিযানের সেনাপতি হয়ে এলেন সতের বছরের এক তরুণ মুহম্মদ বিন কাশিম। তাঁর বাহিনীতে ছিল ৬ হাজার অশ্বারোহী, প্রায় সমান সংখ্যক উষ্ট্রারোহী, ৩ হাজার বাহ্লীক দেশীয় রসদবাহী সৈন্য এবং ৫টি আগ্নেয় ক্ষেপণাস্ত্রসহ একটি নৌবাহিনী। ৭১২ সালে মুহম্মদ জয় করে নিলেন হায়দারাবাদের অদূরস্থিত নিরুন, তারপর নিরুনের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত সেহ্ওয়ান, কুম্ভ নদীর তীরে অবস্থিত বুধিয়া রাজ্যের রাজধানী সিসাম। বুধিয়ার জাঠরাজ মুহম্মদের বশ্যতা স্বীকার করে মুসলিম বাহিনীতে যোগ দিলেন। অতঃপর মুহম্মদের অধীনে আসে ব্রাহ্মণাবাদ। রাওয়ারে এক যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন রাজা দাহির। তাঁর রাজধানী আরোর অধিকার করেন মুহম্মদ। তারপর অধিকৃত হয় সিকা এবং ৭১৩ সালে মুলতান। এভাবে সমগ্র সিন্ধু দেশ ও পাঞ্জাবের দক্ষিণাংশের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় আরব মুসলিমদের আধিপত্য। এই হলো ভারতে মুসলিম রাষ্ট্রশক্তি প্রতিষ্ঠার প্রথম পর্যায়।

দ্বিতীয় পর্যায়ের সূচনাকারী গজনীর সুলতান মাহমুদ তাঁর প্রথম ভারত অভিযান আরম্ভ করেন ৯৯৯ সালে। এই অভিযান পরিচালিত হয়েছিল পেশোয়ার সীমান্তে

অবস্থিত কয়েকটি শত্রুদুর্গের বিরুদ্ধে। অতঃপর তাঁর দ্বিতীয় অভিযান ১০০১ সালে পাবের এক রাজা জয়পালের বিরুদ্ধে, তৃতীয় অভিযান ১০০৪ সালে ভাতিন্দা রাজ্যের বিরুদ্ধে, চতুর্থ অভিযান ১০০৬ সালে মুলতানের মুসলিম রাজ্যের বিরুদ্ধে (কারণ সুলতান মাহমুদের ভাতিন্দা বিজয়ের পর ১০০৫ সালে মুলতানের মধ্য দিয়ে ফিরবার সময় মুলতানের ইসমাঈলী শিয়া শাসনকর্তা আবুল ফাত্তাহ্ দাউদ সুলতানের সঙ্গে শত্রুতামূলক ব্যবহার করেছিলেন), পঞ্চম অভিযান আবারও মুলতানের বিরুদ্ধে ১০০৮ সালে, ষষ্ঠ অভিযান ১০০৮ সালেই রাজা আনন্দপালের বিরুদ্ধে (এই যুদ্ধে দিল্লী, আজমীর, কালিঞ্জর, কান্যকুব্জ, উজ্জয়িনী, গোয়ালিয়র প্রভৃতি রাজ্যের রাজন্যবর্গ রাজা আনন্দ পালের সঙ্গে সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ে তুলেও পরাজিত হন) সপ্তম অভিযান ১০০৯ সালে আলোয়ার জেলার নারায়ণপুর রাজ্যের বিরুদ্ধে, অষ্টম অভিযান ১০১০ সালে মুলতানের বিরুদ্ধে, নবম অভিযান ১০১৪ সালে রাজা ত্রিলোচন পালের বিরুদ্ধে, দশম, অভিযান ১০১৪ সালেই মানেশ্বর রাজ্যের বিরুদ্ধে, একাদশতম অভিযান ১০১৫ সালে কাশ্মীর রাজ্যের বিরুদ্ধে (অত্যধিক তুষারপাতের জন্য এই অভিযানে সুলতান মাহমুদ জয়লাভে ব্যর্থ হন), দ্বাদশতম অভিযান ১০১৮ সালে কান্যকুব্জ রাজ্যের বিরুদ্ধে, ত্রয়োদশতম অভিযান ১০১৯ সালে রাজা ত্রিলোচন পালের বিরুদ্ধে, চতুর্দশতম অভিযান ১০২১ সালে কাশ্মীরের বিরুদ্ধে (এবারও অকৃতকার্য), পঞ্চদশতম অভিযান ১০২২ সালে গাণ্ডা রাজ্যের বিরুদ্ধে, ষোড়শতম অভিযান ১০২৫ সালে গুজরাটের সোমনাথ মন্দির অধিকারের উদ্দেশ্যে এবং সপ্তদশতম অভিযান ছিল ১০২৭ সালে জাঠদিগের বিরুদ্ধে। সুলতান মাহমুদের অভিযানের উপর আলোচনা করতে গিয়ে ঐতিহাসিক হ্যাভেল বলেন,"The almost invariable success of his arms added immensely to his prestige and brought Islam many adherents among the uncultured warrior classes of the North Western Provinces to whom fighting was a religion and victory in the field the highest proof of inspiration."[২৬]

তৃতীয় পর্যায়ের প্রধান পুরুষ শিহাব-উদ-দীন মুহম্মদ গূরী। ১০৩০ সালে সুলতান মাহমুদের মৃত্যুর পর গজনীতে আরও ১৫ জন সুলতান ১১৮৬ সালে পর্যন্ত রাজত্ব করেন। এই বংশের খসরু শাহ্ অবশেষে তুর্কীদের হাতে পরাজিত হয়ে লাহোর চলে আসেন। এই সময় শুধু মাত্র পাঞ্জাব থেকে যায় গজনীর সুলতানদের হাতে। খসরু শার পুত্র খসরু মালিক ছিলেন গজনী বংশের শেষ সুলতান। ১১৮৬ সালে তাঁকে পরাজিত করে তুর্কী বীর মুইজ-উদ-দীন মুহম্মদ বিন সা'ম পাঞ্জাবও অধিকার করে নেন।

---

২৬. Quoted from MN Roy. The Historical Role of Islam, Bombay, Fourth Impression. 1938, p.10.

পারশ্যবাসী গজনীদের রাজত্ব পুরোপুরি চলে যায় তুর্কীস্তানের অধিবাসী গূরী বংশের হাতে। অতঃপর দীর্ঘকাল বড় ভাইয়ের অধীনে শাসনকর্তা ও সেনাপতিরূপে মইজ-উদ-দীন মুহম্মদ বিন সা'ম ভারত উপমহাদেশে বিরাট এক মুসলিম সাম্রাজ্যের স্থাপন কর্তার ভূমিকা পালন করে যান। অবশেষে ১২০৩ সালে ভ্রাতার মৃত্যুর পর তিনি হন গূরী সাম্রাজ্যের সুলতান। এর আগে ১১৭৫ সালে মুহম্মদ গূরী মুলতান জয় করেন এবং ১১৭৯ সালে জয় করেন পেশোয়ার। ১১৮১ সালে পাঞ্জাব আক্রমণ করে তিনি সুলতান খসরু মালিককে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করেন। অতঃপর গোখারদিগকে দমন করার লক্ষ্যে তিনি নির্মাণ করেন শিয়ালকোট দুর্গ। ১১৮২ সালে মুহাম্মদ গূরী দখল করেন সিন্ধুর দেবল বন্দর ও অন্যান্য শহর। ১১৮৬ সালে তিনি পাঞ্জাবের খসরু মালিককে সরিয়ে পাঞ্জাবকে প্রত্যক্ষ শাসনে নিয়ে আসেন। ইতোপূর্বে ভাতিন্দা মুসলিম অধিকার থেকে চলে যায় দিল্লী আজমীরের চৌহানরাজদের হাতে। ১১৯০-৯১ সালে মুহম্মদ গূরী থানেশ্বরের নিকটবর্তী তরাইন প্রান্তরে মোকাবিলা করেন চৌহানরাজ পৃথ্বীরাজের বাহিনীর সঙ্গে। মুহম্মদ গূরী পরাজিত হন। কিন্তু ১১৯২ সালে দ্বিতীয় যুদ্ধে জয়লাভ করে আজমীর অধিকার করেন তিনি। এসব যুদ্ধে তাঁর অন্যতম সঙ্গী ছিলেন তুর্কী সেনাপতি কুতব-উদ-দীন আইবক। গজনীতে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে মুহম্মদ গূরী ভারতের এই নব-বিজিত রাজ্যগুলোর শাসনভার সেনাপতি কুতব-উদ-দীন আইবকের হাতেই ন্যস্ত করে যান। কুতব-উদ-দীন আইবক মিরাট দুর্গ জয় করে অতঃপর ১১৯২-৯৩ সালে দিল্লী অধিকার করে দিল্লীতেই স্থাপন করেন তাঁর শাসনকেন্দ্র। দিল্লীকে রাজধানী করে আরম্ভ হয় গূরী সাম্রাজ্যের অধীনে ভারতের মুসলিম শাসন। অল্পদিন পরেই কুতব-উদ-দীন আইবক দোয়াব অঞ্চল আক্রমণ করে কোয়েল দুর্গ অধিকার করে নেন। অতঃপর মুহম্মদ গূরী কাম্যকুব্জ ও বারানসীর গাহড়বালরাজ জয়চন্দ্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযানের উদ্দেশ্যে গজনী থেকে ভারতে এসে পৌঁছলে কুতব-উদ-দীন আইবক ৫০ হাজার অশ্বারোহী নিয়ে তার সঙ্গে যোগ দেন। ১১৯৪ সালে তাঁরা চন্দবার নামক স্থানে ভীষণ যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করেন জয়চন্দ্রকে। অধিকার করেন কান্যকুব্জ ও বারানসী। রণথম্ভোর দুর্গও অধিকৃত হয় ১১৯৪ সালেই। অতঃপর মুহম্মদ গূরীর আহ্বানে কুতব-উদ-দীন আইবক গজনীতে গেলে তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতস্থ গূরী সাম্রাজ্যের শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়। ১১৯৬ সালে মুহম্মদ গূরী আবার ভারত অভিযানে এলে কুতব-উদ-দীনও তাঁর সঙ্গে যোগদান করে বিয়ানা দুর্গ অধিকার করেন এবং গোয়ালিয়রের রাজাকে পরাভূত করেন। তারপর ১২০৩ সালে স্বীয় ভ্রাতার মৃত্যুতে শিহাব-উদ-দীন মুহম্মদ গূরী সুলতানী মসনদে আরোহণ করেন। কুতুব-উদ-দীন আইবক থাকেন ভারতের মুসলিম সাম্রাজ্যের শাসনকর্তা। আর ঠিক তখনই অন্য এক তুর্কী বীর

ইখতিয়ার-উদ-দীন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী স্বীয় বাহুবলে বাংলায় এসে নদীয়া জয় করেন।

মুইজ-উদ-দীন মুহম্মদ গূরী ছিলেন উচ্চাভিলাষী সাহসী উদ্যমশীল এক সুনিপুণ যোদ্ধা এবং সদাশয় ও দয়ালু এক উঁচুদরের মানুষ। তদুপরি উন্নত চরিত্রের এক সমরকুশলী সেনাপতি। নিজের গুণাবলী ও প্রতিভাবলে উত্তরভারতে তিনি মুসলিম অধিকারের ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করে যান। কুতব-উদ-দীন আইবক ছিলেন মুহম্মদ গূরীর অন্যতম এক সুযোগ্য সঙ্গী। মুহম্মদ গূরীর কর্মজীবনের এক পর্যায়ে অন্য এক উদ্যোগী পুরুষ মুহম্মদ বিন বখতিয়ার বাংলায় নদীয়া জয়ের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করেন লাখনৌতি রাজ্য। বাংলায় উড্ডীন হয় ইসলামের পতাকা। তাই মুহম্মদ বিন বখতিয়ারের বাংলা বিজয়কে উত্তর ভারতে মুহম্মদ গূরীর বিজয় অভিযানের এক পরিশিষ্ট বলে গণ্য করা চলে।

প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে, মুহম্মদ বিন কাশেমের সিন্ধু মুলতান বিজয়ের প্রায় তিনশ' বছর পর উত্তর-ভারতে প্রথমে সুলতান মাহমুদ এবং পরে মুহম্মদ গূরী ও কুতব-উদ-দীন আইবকের মাধ্যমে যে নাটকের অভিনয় হয়ে গেল তার প্রভাব সমগ্র ভারতের উপরই পড়বার কথা। চরিত্রে ভিন্ন ভিন্ন হলেও মুহম্মদ বিন কাশেম, সুলতান মাহমুদ ও গূরী-আইবকের এবং মুহম্মদ বিন বখতিয়ারের পতাকাগুলোতে ছিল ইসলামের পরিচয়। বৌদ্ধ বিপ্লব ব্যর্থ হওয়ার পর আর্য শাসিত এই বিশালউপমহা-দেশটিতে এসেছিল যদি বিচ্ছিন্নতা ও বিশৃঙ্খলা, অত্যাচার-ক্লিষ্ট তার সামাজিক জীবনে এসেছিল যদি শোচনীয় দুর্গতি এবং নিপীড়িত জনসাধারণের মনে জেগেছিল যদি মুক্তির তীব্র বাসনা, তাহলে স্বীকার করতেই হবে যে, মহীয়ান সেই তরুণ বীর মুহম্মদ বিন কাশেম সিন্ধু-মুলতানের জনমানুষের কাছে ছিলেন এক মহান মুক্তিদাতা। এই তরুণ বছর ছয়েক রাজ্য শাসন করার পর ইরাকের শাসন কর্তৃত্বের রদবদলের ফলে অন্যায়ভাবে দোষী সাব্যস্ত হন। তাঁকে বন্দী করে ইরাকে নিয়ে যাওয়া হয় এবং বিচারে তার হয় প্রাণদণ্ড। ইতিহাসের সাক্ষ্য, বন্দীরূপে সিন্ধুদেশ ছেড়ে যাবার সময় অমুসলিম সিন্ধুবাসীরাও তার জন্য কান্নাকাটি করেছিল।

তেমনি উত্তর-পশ্চিম ভারতের সাধারণ মানুষের কাছে ভয়ঙ্কর শক্তিশালী সুলতান মাহমুদ এবং সুদক্ষ রণনায়ক মুহম্মদ গূরী ছিলেন পিলে-চমকানো বাহাদুর আর রাজা দেবতাদের অসারত্ব প্রমাণকারী দুর্নিবার বীর যোদ্ধা। এই হিসাবে তাঁরাও ছিলেন সাধারণ মানুষের মুক্তি-দিশারী

একথা অস্বীকার করার কোন অবকাশ নেই যে, মানবেতিহাসে ইসলাম একটি অবিস্মরণীয় স্থান অধিকার করে রয়েছে। মানুষের সামগ্রিক মুক্তির বাণী নিয়েই ইসলামের আবির্ভাব। ইসলামের মহান নবীজির কাছ থেকে সেই ইসলামের বাণীই

শুনেছিল পৃথিবীর মানুষ। কালক্রমে ইসলামের সেই বাণী নানারকম শব্দে চাপা পড়ার উপক্রম হয়েছে। আল কুরআন প্রদর্শিত পথ নানা কারণে স্থানে স্থানে মোড় নিয়েছে, সহজ-সরল পথ আঁকাবাঁকা রূপ নিয়েছে। ভারতবর্ষে প্রবেশের পূর্বেই তার গতিশীল বিপ্লবী ভূমিকার অবদান অনুজ্জ্বল হতে আরম্ভ করেছে। ভারতবর্ষে ইসলাম অনুসারীদের প্রথম পর্যায়ের রূপকার যারা তাঁদের প্রদর্শিত পথ তুলনামূলকভাবে অনেকটা সহজ সরল। তাঁদের উদাত্ত আহবানে অনেকটাই ছিল মানবমুক্তির আশ্বাস। কিন্তু তিনশ বছর পর দ্বিতীয় পর্যায়ে যারা ইসলামের পতাকা ওড়ালেন তাঁরা রীতিমতই রাজা-বাদশা; তাঁদের আহ্বানে যতটা না মানব-প্রীতি, তার চাইতে অনেক বেশি আস্ফালন ও শক্তিমদমত্ততার মাধ্যমে ভয় প্রদর্শন। তৃতীয় পর্যায়েও রাজা-বাদশারই পদচারণা। সব মিলিয়ে "তবু ব্রাহ্মণ্য প্রতিক্রিয়ায় বৌদ্ধ বিপ্লব যখন পর্যুদস্ত হয়ে গেল আর তাতেই হলো ভারতের সমাজে বিশৃঙ্খলার উৎপত্তি। তখন অগণিত জনসাধারণ তা থেকে স্বস্তি ও মুক্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচবার জন্য ইসলামের বার্তাকেই জানাল সাদর সম্ভাষণ। ভারতের পারস্যবাসী কি মোঘল বিজেতাদের কেউই আরব বীরদের যুগান্ত প্রবাহিত মহানুভবতা, সহিষ্ণুতা কি উদারতা থেকে নিজেদের একেবারে দূরে সরিয়ে ফেলেনি। ....ভারতীয় সমাজের বাস্তব প্রয়োজন তারা অনেকাংশেই মেটাতে সক্ষম হয়েছে। এমন কি প্রতিক্রিয়ার ভারে যখন তার বিপ্লবজনিত আদি উত্তাপের অনেকটাই হ্রাস পেয়ে গেছে তখনও ইসলাম হিন্দু সমাজে তার অনেক বিপ্লবাত্মক প্রভাব বিস্তার করেছে। আক্রমণকারীদের শক্তির উৎকর্যের দ্বারা ভারতবর্ষে মুসলিম শক্তি ততটা সংহতি লাভ করেনি, যতটা করেছে ইসলাম ধর্মের প্রচারণায় আর ইসলামের আইন-কানুনের প্রগতিশীল রূপধারার সহায়তায়।"[২৭]

আর এদেরই পতাকা-চিহ্ন ও বিশ্বত্রাস তলোয়ারের ঝলকানিতে ভীত-শঙ্কিত ভারতবর্ষীয় জন-বিচ্ছিন্ন রাজন্যবর্গ হয়ে পড়েছিলেন চরম হতাশাগ্রস্ত। এবং তাই হয়তো জ্যোতিষগণনায় ধরা পড়েছিল সেসব রাজন্যবর্গের দ্রুত ধ্বংসমুখী ভবিষ্যত পরিণাম। রাজ-প্রসাদভোগী সভাষদবর্গ এবং রাজানুগৃহীত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও ভদ্রজনদের কাছে এই পরিণাম-কথা অমোঘ ও অনিবার্য বলেই প্রতিভাত হয়েছিল। তাই হয়তো প্রসাদদাতা বৃদ্ধ রাজাকে ফেলে এতদিনের রাজানুগৃহীতদের পূর্ববঙ্গে ও কামরূপ-আসামে দ্রুত সন্ত্রস্ত পলায়ন।

বলা চলে, প্রায় বিনাযুদ্ধেই ইখতিয়ার-উদ-দীন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার রাজা লক্ষণসেনের হাত থেকে কেড়ে নিয়েছিলেন নদীয়া।

---

২৭. মানবেন্দ্র নাথ রায়, ইসলামের ঐতিহাসিক অবদান, অনুবাদ ঃ মুহম্মদ আবদুল হাই, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৬৯. পৃ. ১০১-১০২।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলায় লাখনৌতি রাজ্যের প্রতিষ্ঠাকাল
(১২০৩/০৪-১২২৭ সাল)

'মুসলিম বাঙ্গলা-সাহিত্যে' (পৃষ্ঠা ২৫-২৬) ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক বলেন ঃ

"আমরা দেখিয়াছি খ্রীস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলা-ভাষা সৃজ্যমান অবস্থায় ছিল। চর্যাপদে সে ভাষা ধৃত হইয়াছে। এই কথা সহজে অনুমান করা যায় যে, চর্যার বঙ্গীয়-বৈশিষ্ট্যময় অপভ্রংশ তুর্কী আমলে আসিয়া আরও বেশী মাত্রায় বাংলা হইয়া উঠিয়াছে। এমন ভাষার কয়েকটি নমুনা 'প্রাকৃত পৈঙ্গল' নামক অপভ্রংশ ভাষায় রচিত গীতিকবিতার সঙ্কলনটিতে দেখিতে পাওয়া যায়। বাংলা ভাষার অনুরূপ ভাষার যে কয়টি নমুনা এই গ্রন্থে পাওয়া যায় সেগুলি বাংলাদেশেই রচিত হইয়া থাকিবে এবং এগুলির রচনাকালও তুর্কী আমলের একবারে গোড়ার দিককার বলিয়া মনে হয়, কারণ এগুলির সহিত চর্যাপদগুলির ভাষার সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ। এমনই একটি গীত নিম্নে উদ্ধৃত হইল ঃ

'তরুণ তরণি তবই ধরণি
পবন বহ্ খরা।
লগ ণহি জল বড় মরু থল
জন-জীবন হর্।।
দিসই বলই হিঅঅ দুলই
হামি একলি বহু।
ঘর ণহি পিঅ সুণহি পহিঅ
মণ ঈচ্ছই কহু।।

"তরুণ তরণিতে (সূর্যে) ধরণী তপ্ত হইতেছে। পবন খরবেগে বহিতেছে, নিকটে জল (ও) নাই, (তদুপরি) জন-জীবন হরণকারী মরুস্থল (সম্মুখে) বিস্তৃত। দিশা বলিয়া দাও, হৃদয় দুলিতেছে, আমি বধূ (যে) একাকিনী; আমার প্রিয় ঘরে নাই, হে পথিক শুন (আমার) মন কি ইচ্ছা করে।"

২

১. ইখতিয়ার-উদ-দীন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী (১২০৩/০৪–১২০৬ সাল)

এই মহান বীর মুজাহিদ প্রচলিত ইতিহাসে বখতিয়ার খিলজী নামেই পরিচিত হয়ে এসেছেন। কিন্তু বখতিয়ারের পুত্র অর্থাৎ মুহম্মদ বিন বখতিয়ারই হচ্ছেন ইতিহাসের আলোচ্য সেই দুর্ধর্ষ বীর মুজাহিদ। খিলজী বা খালজী অথবা, খলজী একটি সম্প্রদায়ের পরিচয়সূচক শব্দ। মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজীর জন্মস্থান আফগানিস্তানের গরমসির বা আধুনিক দশ্‌ত্‌-ই-মার্গো। জীবিকান্বেষণে হিন্দুস্থানে আগত এই বীরযোদ্ধা ছিলেন তুর্কীদের খিলজী সম্প্রদায়ভুক্ত। তাঁর জীবনের প্রতিষ্ঠাকালে গজনীর সুলতান ছিলেন মুইজ-উদ-দীন মুহম্মদ গূরী (১২০৩–১২০৬ সাল)। মুহম্মদ গূরীর মসনদ লাভের আগেই যখন মুহম্মদ গূরীর বড় ভাই গিয়াস-উদ-দীন মুহম্মদ গজনীর সুলতান তখনই মুহম্মদ গূরী অভিযান চালিয়ে দিল্লী কেন্দ্রিক মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেন। আর এই মুসলিম রাজ্যটি শাসনভারের দায়িত্ব পান কুতব-উদ-দীন আইবক। এর আগেই মুহম্মদ বিন কাশেমের নেতৃত্বে সম্পন্ন হয় আরবদের সিন্ধু বিজয় এবং ক্রমে সিন্ধু ও মূলতান অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয় মুসলিম রাজ্য। বাংলায় তখন কর্ণাটক থেকে আগত সেনদের রাজত্বকাল; বৃদ্ধ রাজা লক্ষ্ণণসেন তখন বাংলার অধীশ্বর।

এমনি একটা সময়ের প্রেক্ষিতে মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী ভগ্যান্বেষণে আসেন হিন্দুস্থানে। দুর্ধর্ষ যোদ্ধা কিন্তু কপর্দকহীন এই তুর্কী বীর সুলতান মুহম্মদ গূরী অথবা কুতব-উদ-দীন আইবক কারও কাছে চাকুরী না পেয়ে অবশেষে অযোধ্যার প্রাদেশিক শাসনকর্তা মালিক হুসাম-উদ-দীন-এর কাছে উপস্থিত হন। মালিক হুসাম-উদ-দীন তাঁকে ভিউলী ও ভাগত নামে দুটি পরগনার জায়গীর দিয়ে অযোধ্যার পূর্ব সীমান্তে সীমান্ত রক্ষীর দায়িত্বে নিযুক্ত করেন। এই দায়িত্ব পালন থেকেই শুরু হয় মুহম্মদ বিন বখতিয়ারের কর্ম-জীবন।

মুহম্মদ বিন বখতিয়ারের জায়গীরটি সীমান্তে অবস্থিত থাকায় তিনি পার্শ্ববর্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দু রাজ্যের সংস্পর্শে আসেন। এসব রাজ্যে আগে থেকেই ছিল তুর্কী বিজয়ের আতঙ্ক। তদুপরি তাদের মধ্যে ছিল অন্তর্বিরোধ।এমনি পরিস্থিতিতে মুহম্মদ বিন বখতিয়ার ওসব রাজ্যে মাঝে-মধ্যে আক্রমণ চালিয়ে ধন-সম্পদ হস্তগত করতে থাকেন। ক্রমে বিহার রাজ্যটিও এসে যায় তাঁর আওতায় এবং তিনি ওদন্তপুরী বিহার জয় করে নেন। এই বিজয়ের পর মুহম্মদ বিন বখতিয়ার অনেক ধন-রত্ন নিয়ে দিল্লীর শাসনকর্তা কুতব-উদ-দীনের দরবারে হাযির হন। কুতব-উদ-দীন খুশী হয়ে মুহম্মদ বিন

বখতিয়ারকে পুরস্কৃত করেন এবং সম্মান দান করেন। অতঃপর মুহম্মদ বিন বখতিয়ার আরও সৈন্য সংগ্রহ করে পরের বৎসর (১২০৩/১২০৪) নদীয়া আক্রমণ করেন। অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তিনি নদীয়ায় পৌছেন; তখন তাঁর সঙ্গে ছিল মাত্র ১৭ জন অশ্বারোহী। নদীয়ায় অবস্থান করছিলেন তখন বৃদ্ধ রাজা লক্ষণসেন। বিনাবাধায় নগর মধ্যে প্রবেশ করেই মুহম্মদ বিন বখতিয়ার ও তাঁর সঙ্গীরা প্রাসাদ রক্ষীদের হত্যা করে সোজা রাজা লক্ষণসেনের প্রাসাদ-দ্বারে গিয়ে হাযির হন। রাজা তখন মধ্যাহ্ন-ভোজে বসেছিলেন। হৈচৈ ও খবর শুনে রাজা লক্ষণসেন মধ্যাহ্ন-ভোজ ফেলে প্রাসাদের পশ্চাৎ দ্বার দিয়ে পলায়ন করে সরাসরি পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুরে অবস্থিত সেনদের অন্যতম রাজধানীতে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এমনিভাবে সম্পন্ন হয় মুহম্মদ বিন বখতিয়ারের নদীয়া বিজয়। এই বিজয়ের ফলে রাজা লক্ষণসেনের বিপুল ধনসম্পদ তাঁর দখলে আসে।

নদীয়া ছিল গঙ্গার (ভাগীরথীর) তীরে অবস্থিত হিন্দুদের একটি পবিত্র তীর্থস্থান। অনেক ঐতিহাসিকের মতে, বৃদ্ধ বয়সে রাজা লক্ষণসেন সপারিষদ সেই পবিত্র স্থান নদীয়ায় বাস করতেন। তুর্কী আক্রমণ সম্পর্কে রাজা লক্ষ্মণসেন ও তাঁর সভাসদগণ সজাগ ও সতর্ক ছিলেন। এমন কি তাঁর সভাসদ ও নদীয়াস্থিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ তুর্কী আক্রমণের ভয়ে আগেই নদীয়া ত্যাগ করে পূর্ববঙ্গের নানা স্থানে পালিয়ে যান। এখানে উল্লেখ্য, পূর্ব বঙ্গ তখনো ছিল পুরোপুরি হিন্দু অধিকারে এবং সেনদের অন্যতম রাজধানী অবস্থিত ছিল পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুর অঞ্চলে। যাক, রাজা লক্ষ্মণসেন তাঁর সভাসদ ও পণ্ডিতবর্গের মত নদীয়া ত্যাগ না করে তার বিশাল রাজ্যের পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত গুরুত্বপূর্ণ তেলিয়াগড় গিরিপথে সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। পশ্চিম দিক থেকে এদেশে কোন অভিযানকারীর প্রবেশের জন্য তেলিয়াগড় গিরিপথই ছিল একমাত্র সম্ভাব্য পথ। কিন্তু মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী তেলিয়াগড়ের পথে অগ্রসর না হয়ে পশ্চিম সীমান্তেরই ঝাড়খণ্ডের দুর্গম জঙ্গলের ভেতর দিয়ে অগ্রসর হয়ে সেন-সেনাবাহিনীর অলক্ষ্যে নদীয়ায় পৌছে যান। ফলে প্রায় বিনাযুদ্ধেই নদীয়া মুহম্মদ বিন বখতিয়ারের হস্তগত হয়। এদেশে সূচিত হয় মুসলিম বিজয়। তিনদিন ধরে নদীয়ার নিয়ন্ত্রণ সুসম্পন্ন করে মুহম্মদ বিন বখতিয়ার নদীয়া থেকে চলে এসে লক্ষ্মণাবতী (গৌড়) অধিকার করেন অতি সহজে। এখানেই স্থাপন করেন তাঁর রাজধানী। তখন থেকেই লক্ষ্মণাবতীর নাম হয় লাখনৌতি।

মুহম্মদ বিন বখতিয়ার সুলতান মুইজ-উদ-দীন মুহম্মদ গূরীর প্রতি ছিলেন খুবই শ্রদ্ধাশীল এবং সেই সুবাদে সুলতান গূরীর অধীনস্থ দিল্লীর শাসনকর্তা কুতব-উদ-দীনেরও অনুগত। ওদন্তপুরী বিহার জয়ের পরে যেমন কুতব-উদ-দীনের সঙ্গে সাক্ষাত করেন তিনি, তেমনি নদীয়া জয়ের পরেও আনুগত্যের নিদর্শন স্বরূপ কুতব-উদ-দীনের নিকট প্রেরণ করেন অনেক ধন-রত্ন। ঐতিহাসিক মিনহাজের ভাষ্যে জানা যায়, লাখনৌতিতে

রাজধানী স্থাপনের পর মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খোতবা পাঠ করেন ও মুদ্রা জারি করেন। কিন্তু এসব করেন কার নামে, মিনহাজ তা উল্লেখ না করলেও অনুমান করা হয় যে, সুলতান গূরীর নামেই তা করা হয়। উল্লেখ্য যে, মুহম্মদ বিন বখতিয়ারের নামে উৎকীর্ণ কোন মুদ্রা এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। তাই মুহম্মদ বিন বখতিয়ার ছিলেন বাংলায় এই নব-প্রতিষ্ঠিত মুসলিম রাজ্যটির বা গজনী সালতানাতের অনুগত এই প্রদেশটির প্রথম শাসনকর্তা।

এই লাখনৌতি রাজ্যটি পূর্বে তিস্তা-করতোয়া নদী, দক্ষিণে পদ্মা নদী, উত্তরে দিনাজপুর জেলার দেবকোট হয়ে রংপুর শহর এবং পশ্চিমে ইবনে বখতিয়ারের পূর্ব-অধিকৃত বিহার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। রাজ্য সুনিয়ন্ত্রিত করার পর মুহম্মদ বিন বখতিয়ার তাঁর নব-প্রতিষ্ঠিত রাজ্যের সুশাসনের ব্যবস্থায় মনোনিবেশ করেন। কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে প্রত্যেক ভাগে একজন শাসনকর্তা-সেনাপতি নিযুক্ত করেন। ওই সময়ে বিভিন্ন বিভাগকে বলা হতো 'ইকতা' এবং ইকতার শাসনকর্তাকে বলা হতো 'মুকতা'। মুহম্মদ বিন বখতিয়ারের শাসনকর্তা-সেনাপতিদের মধ্যে মাত্র তিনজনের নাম জানা যায় ঃ আলি মর্দান খিলজী, হুসাম-উদ-দীন ইওজ খিলজী এবং মুহম্মদ শীরন খিলজী। প্রথম জন ছিলেন 'বরসৌল' (বর্তমান দিনাজপুর জেলার ঘোড়াঘাট এলাকা), পরের জন 'গঙ্গতরী' (খুব সম্ভব তাণ্ডা এলাকা) এবং তৃতীয় জন লাখনৌতির দক্ষিণে পদ্মা তীরের সীমান্তবর্তী এলাকার মুকতা। শাসন ব্যবস্থা সুবিন্যাসের সঙ্গে সঙ্গে মুহম্মদ বিন বখতিয়ার লাখনৌতি রাজ্যে মুসলিম সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য মনোনিবেশ করেন এবং রাজ্যের নানা স্থানে নির্মাণ করেন মসজিদ, মাদ্রাসা এবং ইসলাম-প্রচারক ও সাধকদের জন্য খানকাহ্।

বাংলায় মুসলিম রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে ইখতিয়ার-উদ-দীন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজীর নাম ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকার কথা। বাংলায় তাঁর অভিযান পরিচালনার সময়ে এবং এখানে তাঁর ক্ষুদ্র রাজ্যটি প্রতিষ্ঠার পরে পরেই অন্যান্য স্থান থেকে মুসলমানরা স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্য লাখনৌতি রাজ্যে আসেন। মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী তাদের আগমনের জন্য উৎসাহও দিয়েছিলেন। তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, একটি মুসলমান সমাজ প্রতিষ্ঠা ব্যতীত লাখনৌতি রাজ্যটিকে টিকিয়ে রাখার জন্য শুধুমাত্র সামরিক শক্তির উপর নির্ভর করে থাকলে ভুল করা হবে। এমনি একটি সমাজ প্রতিষ্ঠার কাজ অবিশ্যি আগেই আরম্ভ করেছিলেন এদেশে আগত ওলি-আওলিয়াগণ। পাণ্ডুয়ায় সূফী হযরত শেখ তবরিজী ও তাঁর খলিফাগণ ইসলামের বাণী প্রচার করছিলেন। তাছাড়াও বাংলার নানা স্থানে ওলি-দরবেশদের আগমনে মুসলমানদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। মুসলমানদের জন্য মসজিদ, তাদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার জন্য মাদ্রাসা এবং সূফীদের ইসলাম প্রচারের কেন্দ্র হিসাবে খানকাহ্ নির্মাণ করে ইবনে বখতিয়ার মুসলমানদের সামাজিক সংহতি সুদৃঢ় করার কাজে সাহায্য করেন।

লাখনৌতি রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যাপারে মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন বলে ঐতিহাসিক ডক্টর আবদুল করিম মত প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, "তিনি স্বীয় ইচ্ছামত শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন এবং যুদ্ধ পরিচালনা করেন। কুতুব-উদ-দীন বখতিয়ার খলজীর জীবদ্দশায় লাখনৌতিতে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করেন নাই।"[১]

লাখনৌতি রাজ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী ৩ বছরের বেশি সময় পান নাই। তাঁর জীবনের শেষ কাজ ছিল তিব্বত অভিযান। সমগ্র বাংলা জয় করার চেষ্টা না করে সুদূর দুর্গম পার্বত্য এলাকা তিব্বত আক্রমণ করার কারণ অনুধাবন করা কঠিন। হতে পারে, জন্মভূমি তুর্কীস্তানের সঙ্গে সোজা যোগাযোগ স্থাপন করার উদ্দেশ্যেই তিনি এমনটি করে থাকবেন। "হয়ত তাঁহার দুর্ধর্ষ মনোভাব একটা নতুন এবং অসম সাহসিক কিছু করার জন্য তাঁহাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল, বা হয়ত বখতিয়ার খলজী তুর্কীস্তানের সঙ্গে সোজা যোগাযোগ করার উদ্দেশ্যেই তিব্বত আক্রমণ করিয়াছিলেন। হয়ত তাঁহার ধারণা ছিল যে, তিব্বতের পরেই তুর্কীস্তান। যাহাই হউক, বখতিয়ার খলজীর তিব্বত আক্রমণ উগ্র মস্তিষ্কের পাগলামী নয় বা তাঁহার হঠকারিতার পরিচায়কও নয়; তিনি খুব সতর্কতার সহিত তিব্বত আক্রমণের পরিকল্পনা করেন।"[২] কিন্তু তিব্বত অভিযানে ব্যর্থ হয়ে অনেক সৈন্যসামন্ত হারিয়ে ভগ্ন হৃদয়ে স্বীয় রাজ্যে ফিরে দেবকোটে অবস্থান করতে থাকেন। বিপুল সেনাবাহিনী ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় তিনি শোকাভিভূত হয়ে পড়েন। স্বাস্থ্যও তাঁর ভেঙ্গে পড়ে, যার জন্য তাঁকে শয্যাশায়ী হয়ে পড়তে হয়। এমনি অবস্থায় ১২০৬ সালে সেই রোগশয্যায় ঘুমের মধ্যেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। এ ব্যাপারে অনেকেরই সন্দেহ, ঘুমের মধ্যেই তাঁকে গোপনে হত্যা করেন তাঁরই দুরাকাঙ্ক্ষী সহকর্মী আলি মর্দান খিলজী। দৈবচক্রে ওই একই সময়ে এই উপমহাদেশে মুসলিম অধিকারকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠাকারী সুলতান মুইজ-উদ-দীন মুহম্মদ গূরীও পাঞ্জাবের ঝিলাম নদীর তীরে আততায়ী কর্তৃক নিহত হন এবং নদীয়া থেকে বিক্রমপুরের রাজধানীতে পালিয়ে-আসা রাজা লক্ষ্মণসেনও মৃত্যুবরণ করেন।

এভাবে দুরাকাঙ্ক্ষী সহকর্মীর এক নির্মম ফুৎকারে অকালে নিভে গেল ইসলামের ইতিহাসের এক উজ্জ্বল দীপ-শিখা। অবিশ্যি নিভে গেল নিজ দায়িত্ব সুসম্পন্ন করেই। অস্পষ্ট-পরিচয় এক তুর্কী সন্তান তখনকার শক্তিস্তম্ভ সুলতান মুহম্মদ গূরী বা দিল্লী-প্রধান কুতুব-উদ-দীনের কোন রকম সাহায্য ছাড়াই ইসলাম অনুসারীদের জন্য প্রতিষ্ঠিত করে

১. ডক্টর আবদুল করিম, বাংলার ইতিহাস, সুলতানী আমল, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭, পৃ. ৮৬।

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১।

যান এমন এক রাজ্য, গুরুত্বে যা অল্পদিনের মধ্যেই হয়ে দাঁড়ায় দিল্লী-সালতানাতের ঈর্ষার ব্যাপার। উচ্চতায় খাটো হলেও মুহম্মদ বিন বখতিয়ার এমন এক সেনাপতি যাঁর সাহস, উদ্যম ও নেতৃত্বের তুলনা মেলা ভার। রণকৌশলের মত প্রশাসন-দক্ষতায়ও তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। রণক্ষেত্রে দুর্জয় ও রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা বিধানে অতুলনীয় এই মর্দে মুজাহিদ রাজ্যবাসীর সর্বরকম কল্যাণ সাধনে ছিলেন সদা তৎপর।

মুহম্মদ বিন বখতিয়ার এমন এক সময়ে লাখনৌতি রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করে যান, যখন পরাক্রান্ত আব্বাসীয় খেলাফত মোঙ্গলদের আক্রমণে বিপর্যস্ত ও পর্যুদস্ত হয়ে পড়ে। মধ্য এশিয়ার ঐ চরম দুর্দিনে সেখানকার গণ্যমান্য বিদ্বান সূফীদের অনেকেই ভারতের সুদূর এই পূর্ব প্রান্তের রাজ্যটিতে এসে আশ্রয় নেন। এমন কি, শক্তি-দ্বন্দ্বে দিল্লী-সালতানাত যখন দুর্বল হয়ে পড়ে তখন উত্তর-ভারতের অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবার লাখনৌতি রাজ্যে এসে বসতি স্থাপন করেন। এদেশে এই বহিরাগতদের স্থায়ী বসবাসের ফলে এখানকার অধিবাসীদের সামাজিক কাঠামোয় ও মানসিক মূল্যবোধে সাধিত হতে আরম্ভ করে এক গুণগত পরিবর্তন। এতদিনকার বাংলাদেশ মুসলিম বাংলার রূপ নিতে আরম্ভ করে। ডক্টর কানুনগোর কথায়, "Malik Ikthyar-ud-din Muhammad Bakhtyar was indeed the maker of the medieval history of Bengal. He made his mark in an age when 'From the Nakhas to the Masnad (from the slave-market to the carpet of royalty) was a more common phenomenon in the East than one 'From Log Cabin to White House' in the New World of the nineteenth century. But Muhammad Bakhtyar unlike other indo-Muslim worthies was born a fee man, and lived and died a free man, elevating himself by his own unaided efforts from the position of a poor adventurer to that of a Sultan in all but the name. His life was too short and stormy to give him time and opportunity to consolidate his conquests and prove his capacity as an administrator .... Mosques, madrasas (schools of Muslim learning) and Khanqahs (monasteries) arose in the new abode of Islam through Muhammad Bakhtyar's beneficence and his example was worthily imitated by his Amirs. These have all perished .... But his fame endures and will endure so long as Islam survives in the land. His chief monument of glory was the Muslim principality of Lakhnawati with traditions of independent origin, which not only survived his death but went on expanding into the glorious Sultanate of Gaur."[৩]

---

৩. Dr. Kalika Ranjan Qanungo, History of Bengal, Vol, II. PP. 12 and 14.

২. মুহম্মদ শীরন খিলজী (১২০৬ – ১২০৭/০৮ সাল)

ইখতিয়ার-উদ-দীন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজীর মৃত্যু-সংবাদ শুনে পদ্মা তীরবর্তী এলাকার মুকতা মুহম্মদ শীরন খিলজী দেবকোটে চলে আসেন। সেখানে উপস্থিত খিলজী প্রধানগণ ও সৈনিকেরা মুহম্মদ শীরন খিলজীকেই তাঁদের নেতা মনোনীত করেন। ফলে, মুহম্মদ শীরন খিলজী হন লাখনৌতি রাজ্যের দ্বিতীয় শাসনকর্তা বা গভর্নর। গভর্নর হয়েই মুহম্মদ শীরন খিলজী মুকতা আলি মর্দান খিলজীর ইকতা বরসৌল আক্রমণ করে আলি মর্দান খিলজীকে বন্দী করেন। সেই বন্দী খুনীকে হাজী বাবা ইস্পাহানী নামক একজন কোতোয়ালের হেফাজতে রাখা হয়।

মুহম্মদ শীরন খিলজী অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে রাজ্য শাসন আরম্ভ করেন। মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজীর সময়কার সকল আমীরকে তিনি পূর্ব পদে বহাল রাখেন এবং খিলজী নেতৃবৃন্দের মধ্যে ঐক্য বজায় রাখেন। এমন কি, আলি মর্দান খিলজীর সমর্থকগণকেও তিনি কোন শাস্তি দেন নাই। দিল্লীর সঙ্গেও মুহম্মদ শীরন খিলজী ইবনে বখতিয়ারের নীতি অনুসরণ করেন। সেই নীতি হলো ঃ দিল্লীর প্রতি আনুগত্য বজায় রেখে রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যাপারে নিজেদের সুবিবেচনা অনুযায়ী কাজ করা।

এর মধ্যে মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজীর ঘাতক আলি মর্দান খিলজী বন্দী অবস্থা থেকে পালিয়ে সোজা দিল্লীতে গিয়ে হাজির হন। কুতব-উদ-দীনকে তিনি লাখনৌতি আক্রমণ করতে প্ররোচিত করেন। সহজে মানুষকে ভুলিয়ে নিজের প্রতি সহানুভূতি আদায়ের সহজাত ক্ষমতা আলি মর্দান খিলজীর ছিল। দিল্লীর শাসনকর্তা কুতব-উদ-দীনের সহানুভূতিও তিনি লাভ করতে সমর্থ হন। তাঁর দ্বারা প্ররোচিত কুতব-উদ-দীন অযোধ্যার গভর্নর কায়েমাজ রুমীকে লাখনৌতি দখল করে সেখানকার খিলজী আমীরদের বিরোধ মীমাংসা করে দিয়ে প্রত্যেক মুকতাকে নিজ নিজ ইকতায় বহাল করতে হুকুম জারি করেন। মুহম্মদ শীরন খিলজী রাজ্যের দুর্বল অবস্থা অনুধাবন করে বিনাযুদ্ধে দেবকোট ছেড়ে চলে যান। কায়েমাজ রুমী তখন গঙ্গতরী ইকতার মুকতা হুসাম-উদ-দীন ইওজ খিলজীকে লাখনৌতির শাসনকর্তা নিযুক্ত করে অযোধ্যায় ফিরে যান।

৩. হুসাম-উদ-দীন ইওজ খিলজী (১২০৮–১২১০ সাল)

ইওজ খিলজী দিল্লীর উপদেশ মোতাবেক প্রায় দুই বছরেরও অধিক কাল লাখনৌতি শাসন করেন। উল্লেখ্য যে, মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী অনেক সময়ই দেবকোটে অবস্থান করে রাজ্য শাসন করতেন। মৃত্যুর পর দেবকোটেই তিনি কবরস্থ হন। তাঁকে অনুসরণ করে মুহম্মদ শীরন খিলজীও দেবকোটেই অবস্থান করতেন। কিন্তু ইওজ খিলজী দেবকোটে অবস্থান না করে শাসনকার্যের কেন্দ্র লাখনৌতিতে স্থানান্তরিত

করেন। তাঁর আমলে লাখনৌতিতে খিলজী প্রধানদের মধ্যে কোনরকম গোলযোগ দেখা দেয় নাই। কিন্তু এই যে শান্তি, ১২১০ সালের পরেই আলি মর্দান খিলজী আবার সে শান্তি নষ্ট করতে এগিয়ে আসেন। এখানে তাঁর চরিত্রের কিছুটা পরিচয় দেওয়া দরকার বলে মনে করি। এমনিতে আলি মর্দান ছিলেন খুবই সাহসী এবং তার সঙ্গে সুযোগ সন্ধানীও। ১২০৮ সালে গজনীর শাসনকর্তা তাজ-উদ-দীন এলদুজ লাহোর আক্রমণ করলে কুতব-উদ-দীন তাঁকে বাধা দিয়ে পরাজিত করেন। আলি মর্দান ছিলেন লাহোরে কুতব-উদ-দীনের যুদ্ধসঙ্গী। কুতব-উদ-দীন তাজ-উদ-দীন এলদুজকে পরাজিত করেই ক্ষান্ত হন নি, এগিয়ে গিয়ে গজনীও দখল করেন। তখনও আলি মর্দান খিলজী কুতব-উদ-দীনের সঙ্গী। কিন্তু গজনীতে কুতব-উদ-দীনের অধিকার মাত্র ৪০ দিনের জন্য স্থায়ী হয়। তাজ-উদ-দীনের চক্রান্তে ৪০ দিন পর কুতব-উদ-দীনকে গজনী থেকে পালিয়ে আসতে হয়। কিন্তু আটকা পড়ে যান আলি মর্দান। তাতে অবিশ্যি আলি মর্দানের প্রভু পরিবর্তন ছাড়া আর কোন ক্ষতি হয়নি। ক্রমে তাজ-উদ-দীনের অনুগ্রহও লাভ করে বসেন আলি মর্দান। তদুপরি, সালার জাফর নামক এক খিলজী আমীরের সঙ্গেও আলি মর্দানের বন্ধুত্ব হয়ে যায়। একদিন তাজ-উদ-দীন এলদুজের সঙ্গে শিকারে যান আলি মর্দান ও সালার জাফর। সেখানে আলি মর্দান সালার জাফরকে প্রস্তাব দেন যে, সালার জাফর যদি গজনীর মসনদে বসতে চান তো আলি মর্দান তাজ-উদ-দীন এলদুজকে তীরবিদ্ধ করে হত্যা করতে পারেন। সালার জাফর তো অবাক! আলি মর্দানের চরিত্র অনুধাবন করে সালার জাফর দু'টি ঘোড়া উপহার দিয়ে আলি মর্দানকে গজনীর সীমা ছেড়ে চলে যেতে বলেন। এমনি অবস্থায় আলি মর্দান ফিরে আসেন দিল্লীতে। কুতব-উদ-দীন আলি মর্দানকে সানন্দে গ্রহণ করেন এবং হুসাম-উদ-দীনের স্থলে আলি মর্দানকেই লাখনৌতির শাসনকর্তা নিযুক্ত করে পাঠান।

৪. আলা-উদ-দীন আলি মর্দান খিলজী (১২১০–১২১২ সাল)

আলি মর্দান খুব ভাল করেই জানতেন যে, তাঁর কার্যাবলীর জন্য লাখনৌতির খিলজী আমীরগণ তাঁকে সহজ মনে গ্রহণ করবেন না। তাই লাখনৌতি আসার আগে অনেক সৈন্য সংগ্রহ করে নিজ কার্যস্থলের দিকে রওনা দিলেন। এখানে উল্লেখ্য যে, বখতিয়ার খিলজীর পরে এদেশে এই দ্বিতীয় পর্যায়ে অধিক সংখ্যক মুসলমানের আগমন ঘটে।

আলি মর্দান কিন্তু লাখনৌতিতে এসে কোন বাধাই পেলেন না। হুসাম-উদ-দীন ইওজ খিলজী বরং কুশী নদী পর্যন্ত এগিয়ে এসে আলি মর্দানকে অভ্যর্থনা জানালেন এবং রাজ্যভার ছেড়ে দিলেন আলি মর্দানের হাতে। আলি মর্দান খিলজী লাখনৌতির শাসনভার গ্রহণ করার অল্পদিন পরেই সুলতান কুতব-উদ-দীনের মৃত্যু হয়। সুলতানের কোন পুত্র-সন্তান না থাকায় দিল্লীর মসনদ নিয়ে আরম্ভ হয় অন্তর্বিরোধ। দুই দলে বিভক্ত

আমীরদের এক দল সমর্থন করেন সুলতানের পালিত পুত্র আরাম শাহ্‌কে, অন্য দল সুলতানের জামাতা ও বদায়ুনের গভর্নর ইলতুতমিশকে। ফলে লাহোর থাকে আরাম শা'র অধিকারে আর দিল্লী ইলতুতমিশের অধিকারে। এই দলাদলির সুযোগে কোন কোন হিন্দু রাজা বিদ্রোহ করে। আলি মর্দানের জন্যও এমনি একটা অবস্থা ছিল খুবই বাঞ্ছনীয়। তিনিও নিজেকে লাখনৌতির স্বাধীন সুলতান বলে ঘোষণা করেন। তাঁর আগে মুহম্মদ বিন বখতিয়ার, মুহম্মদ শীরন বা নিজের প্রথম পর্যায়ের শাসনকালে হুসাম-উদ-দীন ইওজ খিলজীও লাখনৌতি রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে স্বাধীনভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করলেও প্রকাশ্যে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন নি। সেই হিসাবে সুলতান আলা-উদ-দীন আলি মর্দান লাখনৌতি রাজ্যের প্রথম স্বাধীন সুলতান।

এই স্বাধীন সুলতানটি একজন সাহসী যোদ্ধা হলেও তাঁর কোন ধীর-স্থির কাণ্ডজ্ঞান ছিল বলে মনে হয় না। অযথা রক্তপাতেও তাঁর কোন দ্বিধা ছিল না। 'তাবকাত-ই-নাসিরী'র বরাত দিয়ে ডক্টর কানুনগো বলেন, "Sultan Alauddin as Ali Mardan now styled himself was a man of undoubted ability as a soldier, but impolitic, blood-thirsty and of a murderous disposition. 'He sent armies in all directions and martyred the greater part of the Khilji Amirs; the Rais of the surrounding country trembled in fear and sent him tribute and khiraj' (Tabqat-i-Nasiri). This sudden turn of fortune, inflow of wealth, and unbridled power completely turned the head of Sultan Alauddin. He now imagined himself the monarch all within the ken of his inflamed political vision."[8]

মিনহাজের মতে, দরবারে বসে তিনি খোরাসান, গজনী, গূর প্রভৃতি এলাকায় যাকে ইচ্ছা তাকেই জায়গীর দান করতেন। কথিত আছে, একজন মুসলমান ব্যবসায়ী ব্যবসা-বাণিজ্যে সর্বস্বান্ত হয়ে সুলতান আলা-উদ-দীনের নিকট সাহায্যের আবেদন জানালে সঙ্গে সঙ্গে সুলতান তাকে ইস্পাহানের জায়গীর দিয়ে দিলেন; কারণ লোকটি ছিল ইস্পাহানবাসী। দরবারের আমীরগণ পড়লেন বিষম ফাঁপরে; কারণ, ইস্পাহান সুলতানের রাজ্য-বহির্ভূত এলাকা বললে সুলতান তক্ষুনি ইস্পাহান দখলের নির্দেশ দিবেন। সুতরাং আমীরগণ যুক্তি করে সুলতানকে জানালেন যে, ব্যবসায়ীটির ইস্পাহানে যাওয়ার আর্থিক সঙ্গতি নেই। শুনে তখনই সুলতান ব্যবসায়ীটিকে বিপুল অর্থ দান করার হুকুম দেন।

"যদিও মিনহাজ বলিয়াছেন যে, আলী মর্দান খলজী স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং সুলতান আলা-উদ-দীন উপাধি ধারণ করেন, প্রকৃতপক্ষে তাঁহার কোন মুদ্রা এই যাবৎ

৪. Dr. Kalika Ranjan Qanungo, History of Bengal, Vol. II, The University of Dacca, 1972, p. 199.

আবিষ্কৃত হয় নাই। .. মনে হয়, তাঁহার সময়ে সোন নদীর পূর্ব পর্যন্ত বিহাত লখনৌতি রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। কুতুব-উদ-দীনের মৃত্যুর পরে দিল্লীর গোলযোগের সুযোগে হয়ত বিহার এলাকা দখল হয়। বাংলাদেশের রাঢ় এলাকার কিছু অংশও লাখনৌতির দখলে আসে; বরেন্দ্র এলাকায়ও বখতিয়ার খলজীর পূর্ব-সীমানা, অর্থাৎ উত্তরে দেবকোট ও পূর্বে করতোয়া নদী পর্যন্ত লাখনৌতির অন্তর্ভুক্ত ছিল।"[৫]

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত লাখনৌতির আমীরেরা তাঁর অত্যাচার-উৎপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে ১২১২ সালে সুলতানকে হত্যা করেন এবং নেতা বলে স্বীকার করে নেন পূর্বেকার শাসনকর্তা হুসাম-উদ-দীন ইওজ খিলজীকে।

৫. সুলতান গিয়াস-উদ-দীন ইওজ খিলজী (১২১২-১২২৭ সাল)

হুসাম-উদ-দীন ইওজ খিলজী অতঃপর সুলতান গিয়াস-উদ-দীন ইওজ খিলজী উপাধি গ্রহণ করে স্বাধীন সুলতানরূপে লাখনৌতির মসনদে আরোহণ করেন। নিঃসন্দেহে মুহম্মদ বিন বখতিয়ারের পর তিনিই ছিলেন লাখনৌতির খিলজী প্রধানদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কুশলী রাজনীতিবিদ। মসনদে আরোহণ করার পর লাখনৌতির মুসলিম রাজ্যটিকে তিনি শক্তিশালী ও সংঘবদ্ধ করেন। লাখনৌতির প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করার জন্য তিনি বসনকোট নামে একটি দুর্গ তৈরী করেন। সুলতান ইওজ খিলজী জানতেন যে, নদীনালা-বেষ্টিত পূর্ববঙ্গকে জয় করতে হলে এবং সামগ্রিকভাবে এদেশকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হলে নৌবহরের প্রয়োজন। এতদিন তুর্কীরা অশ্বারোহী বাহিনীর উপর নির্ভরশীল ছিল বলেই দেশের পূর্বাঞ্চলে অধিকার বিস্তৃত করতে সক্ষম হয় নাই। তাই সুলতান ইওজ খিলজী একটি নৌবহর গঠন করেন এবং দেশীয় নাবিকদের সাহায্যে তাকে শক্তিশালী করেন।

বাংলার মুসলমান শাসকদের মধ্যে সর্বপ্রথম সুলতান ইওজ খিলজীর মুদ্রাই আবিষ্কৃত হয়েছে। ডক্টর করিমের মতে, সুলতান গিয়াস-উদ-দীন ইওজ খিলজী গজনীর সুলতান মুহম্মদ গূরীর অনুসরণেই স্বীয় মুদ্রা জারি করেন। ইওজ খিলজীর মুদ্রায় দেখা যায়, তিনি রাজকীয় উপাধি গ্রহণ করেছিলেন এবং কোন কোন মুদ্রায় আব্বাসীয় খলিফার নামও খোদিত করেছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম খোলাখুলিভাবে সুলতান উপাধি গ্রহণ করেন। প্রজাসাধারণের মঙ্গলের জন্য সুলতান ইওজ খিলজী বেশ কিছু কাজ করেন। রাজধানী লাখনৌতির সঙ্গে উত্তরে দেবকোট এবং দক্ষিণে লাখনৌর (বীরভূম জেলার নগৌর) অর্থাৎ দুই সীমান্ত শহরের সাথে সংযোগ স্থাপন করার জন্য তিনি একটি দীর্ঘ রাজপথ নির্মাণ করেন। স্থানে স্থানে বাঁধ দিয়ে তিনি কৃষকদের ঘরবাড়ি ও ফসলাদিকে বন্যার কবল থেকে রক্ষার ব্যবস্থা করেন। এই দীর্ঘ রাজপথটির ছিল সামরিক ও

---

৫. ডক্টর আবদুল করিম, বাংলার ইতিহাস, সুলতানী আমল, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৭, পৃ. ১৩১।

বেসামরিক উভয় রূপ গুরুত্ব। তাতে করে যুদ্ধের সময় সৈন্য চলাচলের সুবিধাও যেমন হয়েছিল, তেমনি হয়েছিল জনসাধারণের যোগাযোগ ব্যবস্থায় উন্নয়ন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধাও।

মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজীর পরে সুলতান গিয়াস-উদ-দীন ইওজ খিলজীই রাজ্য বিস্তারে মনোযোগী হন এবং চতুর্দিকেই রাজ্যের সীমা বর্ধিত করেন। রাঢ় অঞ্চলে তাঁর রাজ্য দামোদর পর্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং বিহারও তাঁর দখলেই ছিল বলে মনে হয়। সকল দিক বিবেচনা করলে বলতে হয় যে, খিলজী শাসকদের মধ্যে ইওজ খিলজীই ছিলেন সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী সুশাসক। এই বাংলায় মুসলিম শাসনকে তিনি দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করে যান।

ডক্টর আবদুল করিমের অভিমত : "দিল্লীর সুলতানেরা বাংলাদেশকে সর্বদা সন্দেহের চক্ষে দেখিত। বাংলাদেশ দিল্লীর সুলতানদের দ্বারা বিজিত হয় নাই, বখতিয়ার খলজী দিল্লীর সুলতানের সাহায্যপুষ্টও ছিল না। লাখনৌতির খলজী আমীরেরা মনে করিত যে, লাখনৌতি তাহাদেরই অধিকৃত এলাকা, সুতরাং বাংলা দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার দায়িত্ব তাহাদেরই। কিন্তু তাহাদের নিজেদের অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে সুলতান কুতব-উদ-দীন আইবক লখনৌতি জয় করার সুযোগ পান এবং কুতব-উদ-দীনের উত্তরাধিকারী হিসাবে সুলতান শামস-উদ-দীন ইলতুতমিশও লাখনৌতিকে স্বীয় রাজ্যের অংশরূপে মনে করেন। তাই ইওজ খলজীর স্বাধীনতাকে ইলতুতমিশ সুনজরে দেখেন নাই, কিন্তু তবুও তাঁহার রাজত্বের প্রাথমিক অবস্থায় তিনি নিজে শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত থাকায় লাখনৌতির দিকে মনোযোগ দিতে অপারগ ছিলেন। ইলতুতমিশ প্রথমে বিরোধী আমীরদিগকে শায়েস্তা করেন এবং পরে প্রতিদ্বন্দ্বী গজনীর সুলতান তাজ-উদ-দীন এলদুজ এবং সিন্ধুর শাসনকর্তা নাসির-উদ-দীন কুবাচাকে পরাজিত করেন। ... তবুও সুলতান ইলতুতমিশ লাখনৌতির দিকে মনোযোগ দিতে পারিলেন না, কারণ ইতিমধ্যে নিতান্ত আকস্মিকভাবে দুর্ধর্ষ মোঙ্গল নেতা চেঙ্গিস খান জালাল-উদ-দীন খওয়ারিজম শাহের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া পাঞ্জাবে আগমন করেন। জালাল-উদ-দীন খাওয়ারিজম শাহ্ প্রথমে দিল্লী ও পরে মুলতান জয় করার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইলেন। ১২২৪ খ্রীস্টাব্দে তিনি ভারত উপমহাদেশের সীমা অতিক্রম করিয়া স্বদেশ অভিমুখে যাত্রা করেন এবং চেঙ্গিস খানও দিল্লী সাম্রাজ্য ত্যাগ করেন। সুতরাং সুলতান ইলতুতমিশ লাখনৌতির দিকে মনোযোগ দেন। তাঁহাকে প্রকৃতপক্ষে বদায়ুন, বারানসী, কনৌজ এবং অযোধ্যা ইত্যাদি প্রদেশ নূতনভাবে জয় করিতে হয়। প্রায় একই সময়ে, অর্থাৎ আনুমানিক ১২২৫ খ্রীস্টাব্দে সুলতান ইলতুতমিশ লাখনৌতির সুলতান গিয়াস-উদ-দীন ইওজ খলজীর বিরুদ্ধে প্রথম সৈন্যবাহিনী পাঠান এবং পরে বিপুল সৈন্যবাহিনীসহ নিজে বিহার এবং বাংলাদেশ জয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। ইওজ খলজীও সৈন্যবাহিনী এবং রণতরী

নিয়ে ইলতুতমিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন। তিনি ইলতুতমিশকে রাজমহলের নিকটে তেলিয়াগড় গিরিপথে বাধা দেন। যুদ্ধের ফলাফল নিশ্চিতভাবে জানা যায় না; মিনহাজের মতে উভয়ের মধ্যে সন্ধি হয়, যাহার ফলে ইওজ খলজী ইলতুতমিশকে ৮০ লক্ষ টাকার সম্পদ এবং ৩৮টি হাতী দিতে স্বীকার করেন। মিনহাজ আরও বলেন যে, ইওজ খলজী ইলতুতমিশের অধীনতা স্বীকার করেন এবং ইলতুতমিশের নামে খোতবা পাঠ করিতে এবং মুদ্রা জারি করিতেও স্বীকার করেন। ইলতুতমিশ মালিক আলা-উদ-দীন জানীকে বিহারের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া দিল্লীতে ফিরিয়া যান। কিন্তু ইলতুতমিশের প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইওজ খলজী মালিক আলা-উদ-দীন জানীকে বিহার হইতে তাড়াইয়া দেন। তিনি সন্ধির অন্যান্য শর্তও মানিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ। সুলতান ইলতুতুমিশ বুঝিতে পারিলেন যে, সম্মুখযুদ্ধে ইওজকে পরাজিত করা সম্ভব হইবে না; তাই তিনি এই অপমান সহ্য করিয়া ভবিষ্যতে আরও সুযোগের অপেক্ষায় রহিলেন।

সুলতান গিয়াস-উদ-দীন ইওজ খলজীও বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ইলতুতমিশ তাঁহার বিরুদ্ধে পুনরায় যুদ্ধযাত্রা করিবেন এবং সেই কারণে তিনি প্রায় এক বৎসর কাল লাখনৌতি ছাড়িয়া কোথাও যান নাই। বলিতে গেলে তিনি ইলতুতমিশের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে অযোধ্যার রাজনৈতিক পরিস্থিতি ঘোরালো হইয়া উঠে। অযোধ্যার হিন্দুরা প্রিথো নামক একজন নেতার অধীনে সংঘবদ্ধ হইয়া বিদ্রোহ করে এবং প্রথম চোটেই কয়েক হাজার মুসলমান হত্যা করে। বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া ইলতুতমিশ তাঁহার জ্যেষ্ঠ ছেলে নাসির-উদ-দীন মাহমুদকে বিশাল সৈন্যবাহিনীসহ অযোধ্যায় পাঠাইলেন। ইওজ খলজী কর্তৃক বিহার হইতে বিতাড়িত গভর্নর মালিক আলা-উদ-দীন জানীও যুবরাজের পরামর্শদাতা হিসাবে অযোধ্যায় আসেন। ইওজ খলজী মনে করিলেন যে, অযোধ্যায় ব্যতিব্যস্ত দিল্লী বাহিনীর পক্ষে বাংলাদেশ আক্রমণ করা সম্ভব হইবে না, তাই তিনি এই অবসরে পূর্ববাংলা আক্রমণ করার মনস্থ করেন। ইওজ খলজী ঘুণাক্ষরেও বুঝিতে পারেন নাই যে, ইলতুতমিশ নাসির-উদ-দীন মাহমুদকে অযোধ্যায় বিদ্রোহ দমন করার পরে লাখনৌতি আক্রমণ করার নির্দেশ দিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ইলতুতমিশ বাংলা দেশ আক্রমণ করার জন্যই স্বয়ং যুবরাজকে অযোধ্যায় পাঠাইয়াছিলেন, নতুবা অযোধ্যার বিদ্রোহ দমন করার জন্য যুবরাজকে না পাঠাইয়াও পারিতেন। সে যাহা হউক, ইওজ খলজী ১২২৭ খ্রীস্টাব্দের প্রথম দিকে পূর্ববাংলা আক্রমণ করেন। কথিত আছে যে, ইওজ খলজী লাখনৌতির প্রতিরক্ষার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ সৈন্য না রাখিয়াই বিশাল সৈন্যবাহিনীসহ পূর্ববাংলা আক্রমণ করেন। পূর্ববাংলা আক্রমণ কালেই ইওজ খলজী খবর পান যে, যুবরাজ নাসির-উদ-দীন মাহমুদ লাখনৌতি আক্রমণ করিয়াছেন। সংবাদ পাইয়া ইওজ খলজী ক্ষিপ্রগতিতে ফিরিয়া যান কিন্তু তিনি পৌঁছার আগেই লাখনৌতি শত্রুদের অধিকারে চলিয়া যায়। লাখনৌতি পৌঁছিয়াও তিনি

আবার ভুল করিলেন; সময় নিয়া আরও সৈন্য যোগাড় করার চেষ্টা না করিয়া তিনি শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হইলেন। ফলে তিনি বন্দী হইলেন এবং পরে তাঁহাকে হত্যা করা হয়।"[৬]

১২০৩/০৪ সাল থেকে আরম্ভ করে ১২২৭ সাল পর্যন্ত প্রায় ২৪ বৎসর সময়ের পরিধিতে বাংলায় মুসলিম লাখনৌতি রাজ্যের যে প্রতিষ্ঠাকাল এবং এই কালে যে পাঁচজন শাসনকর্তা এ রাজ্য প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পালন করেছিলেন, তাঁদের সকলেই ছিলেন আফগানিস্তান থেকে আগত তুর্কীদের খিলজী সম্প্রদায়ভুক্ত ইখতিয়ার-উদ-দীন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজীর সহকর্মী। দিল্লী সালতানাতের কোন সাহায্য ছাড়াই বাংলায় এই রাজ্যটি তাঁরা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। আবার এ কথাও সত্য যে, লাখনৌতি রাজ্য প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরা দিল্লী কর্তৃপক্ষের অনুমোদন লাভের জন্য এগিয়ে গিয়েছিলেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে। দুঃসাহসিকতাপূর্ণ অভিযানের মাধ্যমেই তাঁরা বাংলায় লাখনৌতি রাজ্য প্রতিষ্ঠায় সফল হয়েছিলেন। তাই নব-প্রতিষ্ঠিত রাজ্যটিকে টিকিয়ে রাখার কথা চিন্তা করেই তাঁরা দিল্লী কর্তৃপক্ষের শুভেচ্ছা-সহযোগিতার প্রয়োজন উপলব্ধি করেছিলেন। এই সময়কার পাঁচজন শাসনকর্তার মধ্যে একজনই মাত্র ছিলেন বিচিত্র চরিত্রের এক দুরাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি। তিনি হলেন চতুর্থ শাসনকর্তা আলি মর্দান খিলজী। তবুও আলি মর্দানসহ পাঁচজন শাসনকর্তাই চেয়েছিলেন তাঁদের এই নবার্জিত রাজ্যটিকে টিকিয়ে রেখে যতটুকু সম্ভব তাঁর শাসনকার্য চালাবেন।

আর একটি বিবেচ্য বিষয় হলো ঃ দিল্লী-সালতানাতও যখন প্রধানদের মধ্যকার অনৈক্যে দুর্বল এবং নব-প্রতিষ্ঠিত লাখনৌতি রাজ্যের প্রধানদের মধ্যে ঐক্যবন্ধনও সুদৃঢ় ছিল না, তখন বাংলায় এই নব প্রতিষ্ঠিত রাজ্যটি টিকে থাকল কি করে ? লাখনৌতির আশেপাশে তখন বেশ ক'টি হিন্দু রাজ্য ছিল এবং সেসব রাজ্যের রাজারা খুব দুর্বলও ছিলেন না। এর উত্তরের জন্য আমরা কিছু উদ্ধৃতির আশ্রয় নিচ্ছি।

"পাল-সাম্রাজ্যের অধঃপতন-সময়ে সেনরাজগণ যে কোন না কোন উপায়ে পাল রাজবংশের শিথিল মুষ্টি হইতে রাজদণ্ড কাড়িয়া লইয়া গৌড়মণ্ডলে একটি আগন্তুক রাজবংশের প্রতিষ্ঠাসাধনে সফলকাম হইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। এ পর্যন্ত প্রাচীন লিপিতে যাহা কিছু প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে সেনরাজ্য বাহুবলের রাজ্য বলিয়াই প্রকাশিত হইয়াছে; তাহা পাল-রাজ্যের ন্যায় প্রজাপুঞ্জের নির্বাচন-প্রণালীতে গঠিত গৌড়ীয় সাম্রাজ্য বলিয়া কথিত হইতে পারে না।"[৭]

"কিন্তু লক্ষ্মণসেন গৌড়-রাষ্ট্রের বহিঃশত্রু দমনে সমর্থ হইয়া থাকিলেও, প্রজাপুঞ্জের সহযোগিতার অভাবে, আভ্যন্তরীণ ঐক্যসাধনে এবং বিভিন্ন অংশের রক্ষার সুব্যবস্থা

৬. ডক্টর আবদুল করিম, বাংলার ইতিহাস, সুলতানী আমল, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭, পৃ. ৯৭-৯৯।

৭. শ্রী অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়, উপক্রমণিকা, গৌড়রাজমালা, পৃ. ০.৩৩।

করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন না। সেইজন্যই মহম্মদ-ই-বখতিয়ার অবাধে মগধ এবং বরেন্দ্র অধিকার করিতে পারিয়াছিলেন।"[৮]

আর "নদীয়া বিজয়ের পরে মুসলমান শাসকগণ কর্তৃক হিন্দুদের উপর অত্যাচারের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরঞ্চ মুসলমানেরা দেশে শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করিয়া জনহিতকর কাজে মনোযোগ দেন। হিন্দুরাও এই সকল জনহিতকর কাজের সুফল ভোগ করে। লাখনৌতির গভর্নরেরাও হয়ত হিন্দুদের আস্থাভাজন হওয়ার জন্য সক্রিয় চেষ্টা করেন। তাই এই আমলে সর্বপ্রথম আমরা মুসলমান শাসকদের প্রতি হিন্দুদের আস্থার প্রমাণ পাই। এক কথায় বলিতে গেলে এই আমলে লাখনৌতির মুসলিম রাজ্য লাখনৌতি রাজ্যে পরিণত হয়।"[৯]

---

৮. রমাপ্রসাদ চন্দ, গৌড়রাজমালা, পৃ. ৮২।

৯. ডক্টর আবদুল করিম, বাংলার ইতিহাস, সুলতানী আমল, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৭, পৃ. ১১০।

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলায় লাখনৌতি রাজ্যের বিস্তৃতিকাল
(১২২৭-১৩৩৭ সাল)

(ভাটিয়ালী রাগেণ গীয়তে)
হঙ জুবনী পতিএ হীন।
গঙ্গা সিনায়িবাক জাইএ দিন॥
দৈবনিয়োজিত হৈল আকাজ।
বায়ু ন ভাঙ্গএ ছোট গাছ॥
ছাড়ি দেহ কাজু মুঞি জাঙ ঘর।
সাগর মৈদ্ধে লোহাক গড়॥
হাত জোড় করিঞা মাঙ্গো দান।
বারেক মহাত্মা রাখ সম্মান॥
... ...

'শেক-শুভোদয়া' গ্রন্থের এই প্রেম-সঙ্গীতটি প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের একমাত্র নিদর্শন।

'মুসলিম বাংলা-সাহিত্য' গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ১৬-১৭) রামাই পণ্ডিতের 'শূন্য পুরাণের' অন্তর্গত 'নিরঞ্জনের রুষ্মা' সম্পর্কে ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক বলেন ঃ 'নিরঞ্জনের রুষ্মা' নামক অংশটির আভ্যন্তরীণ প্রমাণ হইতেও স্পষ্ট যে, ইহা মুসলমান তুর্কী কর্তৃক বঙ্গ বিজয়ের পরের, অন্ততঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষের দিকের রচনা। .. ইহাতে একদিকে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী 'সদ্ধর্মী'দের উপর জাজপুর, উড়িষ্যা ও মালদহবাসী বৈদিক ব্রাহ্মণদের অত্যাচার কাহিনী বর্ণনার সহিত মুসলমানদের জাজপুর প্রবেশ ও ব্রাহ্মণ্য দেব-দেবীর রাতারাতি ধর্মান্তর গ্রহণের ন্যায় একটি কাল্পনিক চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে।

নিরঞ্জনের রুষ্মা

জাজপুর পুর বাদি,   সোল শঅ ঘর বেদি,
বেদি লয় কন্নএ নগুণ।
দক্ষিণ্যা মাগিতে জায়,   জার ঘরে নাঞি পায়,
শাপ দিআ পোড়ায় ভুবন॥
মালদহে লাগে কর,   ন চিনে আপন পর .
জালের নাহিক দিশপাশ।
বলিষ্ঠ হইআ বড়,   দশ বিশ হৈয়্যা জড়,
সদ্ধর্মীরে করএ বিনাশ॥
বেদে করি উচ্চারণ,   বের্যাঅ অগ্নি ঘনে ঘন,
দেখিআ সভায় কম্পমান।
মনেত পাইআ মর্ম,   সবে বোলে রাখ ধর্ম,
তোমা বিনা কে করে পরিত্রাণ॥
এইরূপে দ্বিজগণ,   করে ছিষ্টি সংহরণ,
ই বড় হইল অবিচার।
বৈকুণ্ঠে থাকিআ ধর্ম,   মনেত পাইআ মর্ম,
মায়াত হইল অন্ধকার॥
ধর্ম হৈলা জবন রূপী,   মাথায়েত কাল টুপি
হাতে শোভে ত্রিকচ কামান।
চাপিআ উত্তম হএ   ত্রিভুবনে লাগে ভএ
খোদাএ বলিআ এক নাম। ....

৩

এই অধ্যায়ে বাংলার লাখনৌতি রাজ্যের শাসনকর্তাদের তালিকায় যাবার আগে দিল্লী-লাখনৌতির মধ্যকার সম্পর্ক প্রসঙ্গে কিছু আলোচনার দরকার। লাখনৌতির খিলজী শাসনকর্তাদের মধ্যে পঞ্চম শাসনকর্তা গিয়াস-উদ-দীন ইওজ খিলজীই সর্বপ্রথম খোলাখুলিভাবে সুলতান উপাধি গ্রহণ করেন ও লাখনৌতির সার্বভৌমত্ব দাবি করেন। বাংলার মুসলমান শাসকদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম যাঁর প্রচলিত মুদ্রা এ যাবত আবিষ্কৃত হয়েছে। তাঁর প্রচলিত কোন কোন মুদ্রায় আব্বাসীয় খলীফার নাম মুদ্রিত দেখা যায়। এর কিছুকাল পরে দিল্লীর শাসনকর্তা ইলতুতমিশও ইওজ খিলজীর মত মুদ্রায় নিজ নামের সঙ্গে আব্বাসীয় খলিফার নামও মুদ্রিত করেন। ডক্টর আই. এইচ. কোরেশীর মতে, বাগদাদের মুসলিম সাম্রাজ্য চারিদিকে বিস্তৃতি লাভ করার পর অনেক এলাকার স্বাধীন মুসলমান শাসকবৃন্দ নিজেদের শাসন মুসলিম খেলাফত ভিত্তিক করার লক্ষ্যে আইনানুগ করার উদ্দেশ্যে আব্বাসীয় খলিফার অনুমতি ছাড়াই তাঁদের নাম ব্যবহার করতেন। ইসলামী আইনজ্ঞদের মতে, খলিফা যা নিষেধ না করেন, তা বৈধ।[১] এই সুযোগে খলিফার অনুমতি ছাড়াই অনেকে খলিফার নাম নিজেদের সুবিধার্থেই ব্যবহার করতেন। লাখনৌতির সুলতান গিয়াস-উদ-দীন ইওজ খিলজী এবং দিল্লীর সুলতান ইলতুতমিশও তা-ই করেছিলেন বলে পণ্ডিতবর্গের ধারণা।

এর থেকে বোঝা যায়, লাখনৌতি কর্তৃপক্ষ দিল্লী কর্তৃপক্ষের আধিপত্য এড়িয়ে চলার মনোভাব পোষণ করতেন। দিল্লী কর্তৃপক্ষ এই মনোভাব সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন। তাই দেখা যায়, সুলতান ইলতুতমিশ দুই দুইবার লাখনৌতির বিরুদ্ধে অভিযান চালান। প্রথম অভিযানে তিনি তেলিয়াগড় গিরিপথে বাধাপ্রাপ্ত হন। তখন দুই পক্ষের মধ্যে সন্ধি হয়। তবে সে সন্ধির শর্তসমূহ লাখনৌতির সুলতান পালন করেন নাই বলেই অনেকের ধারণা। কিন্তু দ্বিতীয় অভিযানে ভুলের খপ্পরে পড়ে হেরে যান লাখনৌতির সুলতান এবং নিহত হন। ফলে লাখনৌতি থেকে খিলজী শাসনের অবসান ঘটে।

প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ্য যে, কুতুব-উদ-দীন আইবক ছিলেন গজনীর সুলতান মুইজ-উদ-দীন মুহম্মদ গূরীর এক ক্রীতদাস। কিন্তু যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী এবং সুশিক্ষাপ্রাপ্ত আইবক তাঁর সাহসিকতা ও বদান্যতার জন্য মুহম্মদ গূরীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাঁর প্রধান

---

১. ডক্টর আই, এইচ, কোরেশী, এ্যাডমিনিস্ট্রেশন অব দ্যা সালতানাত অব দিল্লী, পৃ. ২৬- উদ্ধৃত, বাংলার ইতিহাস, ডক্টর আবদুল করিম, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৭৭, পৃ. ১০৪।

সেনানায়কের পদ লাভ করেন। আইবকের বাহুবল, রণকৌশল ও বিচক্ষণতার জন্য উত্তর ভারতের অনেক রাজ্য মুহম্মদ গূরীর পদানত হয়। তরাইনের যুদ্ধে বিজয় লাভের পর মুহম্মদ গূরী আইবককে উত্তর ভারতের বিজিত রাজ্যসমূহের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন এবং রাজ্য বিস্তারের অনুমতি দেন। ফলে, অনেক রাজ্যই তিনি অধিকার করে নিয়ে দিল্লীতে স্থাপন করেন তাঁর শাসন কেন্দ্র। ১২০৬ সালে সুলতান গূরীর মৃত্যুর পর কুতব উদ-দীন আইবক উত্তর ভারতের স্বাধীন সুলতানরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। দিল্লীর তৃতীয় সুলতান ইলতুতমিশও কুতুব-উদ-দীন আইবকের মত প্রথম জীবনে ছিলেন এক ক্রীতদাস। স্বীয় প্রতিভাবলে উচ্চপদ লাভ করে তিনি প্রভুকন্যার পাণি গ্রহণ করেন। শ্বশুর ও জামাতা উভয়েই ছিলেন তুর্কীস্তানের অধিবাসী।

ইসলাম ও মুসলমান সুলতান-সামন্তদের 'ক্রীতদাস' আর এমনিতে ব্যাপক অর্থে 'ক্রীতদাস' প্রথা প্রসঙ্গে কিছু আলোচনা করা যেতে পারে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, ইসলামের মহান নবীজি হযরত মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের জন্মের হাজার হাজার বছর আগে থেকেই পৃথিবীতে চালু ছিল মনুষ্যত্বের চরম অবমাননাকারী ক্রীতদাস প্রথা। আর তা চালু ছিল তার বর্বরোচিত অমানুষিক রূপ নিয়েই। ক্রীতদাসরাও যে মানুষ, তারাও যে মানুষ হিসাবে সামান্যতম মর্যাদা পাবারও অধিকারী– এরকম কোন ধারণাই আগেকার 'সভ্য' সমাজে অস্তিত্ববান ছিল না। দাসদের প্রতি তখনকার লোকের মনোভাব সে আমলের লেখকদের রচনা থেকেই জানা যায়। জনৈক ভূস্বামী গ্রন্থকারের মতে ঃ ক্রীতদাসের আহারের পরিমাণ নির্ভর করা উচিত তাদের কাজের উপর। বছরের যে সময়ে কাজ বেশী তখন খাওয়াও বেশী, যখন কাজ কম তখন খাওয়াও কম; দুর্ভিক্ষের সময় রুগ্ন ও জীর্ণ দাসদের অনাহারে মেরে ফেলা উচিত। খামার মালিকদের প্রতি উক্ত লেখকের উপদেশ ঃ অকেজো বলদ, ঘেয়ো পশু, মরচে ধরা যন্ত্র এবং বৃদ্ধ ও রুগ্ন দাস ইত্যাদি অপ্রয়োজনীয় বস্তু নিলামে বিক্রি করে ফেলা উচিত। ঝড়ের সময় জাহাজকে হাল্কা করার উদ্দেশ্যে প্রিয় অশ্ব অথবা ক্রীতদাস কোনটিকে পরিত্যাগ করা উচিত সে সম্পর্কে মহাপণ্ডিত সিসেরো 'কর্তব্য' শীর্ষক গ্রন্থে সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করেছেন ঃ ক্রীতদাসদেরই প্রথমে সমুদ্রে নিক্ষেপ করা উচিত।"[২] সুদীর্ঘ কাল ধরে এই অমানবিক প্রথা অব্যাহতভাবে চালু থাকার ফলে মানুষ এই প্রথাকে মানব সমাজের জন্য অতি স্বাভাবিক ও অপরিহার্য প্রথা হিসাবেই ধরে নিয়েছিল।

ক্রীতদাস প্রথার পেছনে কার্যকর ছিল প্রধানত তিনটি কারণ ঃ (এক) মানুষের জন্মগত বৈষম্যের ধারণা; (দুই) সমাজে বিরাজমান কুসীদ প্রথা; এবং (তিন) আদিকাল থেকে যুদ্ধবন্দীদের প্রতি বিজয়ীদের ব্যবহারের রেওয়াজ। প্রথম কারণটির মূলে ছিল

---

২. আবদুল হালিম, ইতিহাসের রূপরেখা, প্রকাশ ভবন, ঢাকা, ১৯৬৯ সাল, পৃ. ৮১।

এই ধারণা যে, জন্মসূত্রে মানুষ সবাই সমমর্যাদার দাবিদার নয়। জন্মসূত্রেই কেউ হবে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী এবং কেউ হবে মর্যাদাহীন– মর্যাদাবানদের সেবা করায় বাধ্য। এই মর্যাদাহীনরাই হতো মর্যাদাবানদের ক্রীতদাস। দ্বিতীয় কারণটি সম্পর্কে বলা যায় ঃ গ্রীক নগর-রাষ্ট্রে শুধুমাত্র ক্রীতদাসরাই নয়, স্বাধীন শ্রমজীবী দরিদ্র মানুষও কুসীদ প্রথার কারণে অভিজাত মহাজনদের কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে তা পরিশোধে অসমর্থ হয়ে অবশেষে ক্রীতদাসে পরিণত হতো। রোমান সভ্যতায়ও অবস্থাটি ছিল প্রায় একই রকম। "রোমান যুগেও দাসেরা গোপনে টাকা জমাতে পারত এবং তা দিয়ে নিজেদের স্বাধীনতাও কিনতে পারত। তবে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দাস তার ভূতপূর্ব মনিবের অনুচর হয়ে থাকতে বাধ্য ছিল। দাস মালিকরাও এতে খুশীই ছিল কারণ, মুক্তিপণ সংগ্রহ করতে করতে ক্রীতদাসেরা প্রায়শই বুড়ো অথবা অকর্মণ্য হয়ে পড়ত; আর তাই তার মুক্তিপণে দাসপ্রভু একটা নতুন দাসও কিনতে পারত, মুফত একজন অনুচরও লাভ করত। ... যাই হোক, এসব স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দাসেরা সেনাবাহিনীতে এবং সরকারী মহলের বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত হতো এবং অবস্থার উন্নতি ঘটামাত্র অতীতের কথা ভুলে গিয়ে নিজেরাই দাস প্রভু হয়ে বসত।"[৩] তৃতীয় কারণটি ক্রীতদাস প্রথার মূল উৎস হিসাবে কার্যকর ছিল মানবেতিহাসের দীর্ঘতম কাল ধরে। যুদ্ধবন্দী হওয়ার অর্থই ছিল বিজয়ীর হাতে মৃত্যুবরণ অথবা তার দাসত্ববরণ।

এই মানবতাবিরোধী ক্রীতদাস প্রথার বিরুদ্ধে ইসলামের বিধান এবার স্মরণ করা যেতে পারে। ইসলাম চরিত্র ও আদর্শনিষ্ঠাকেই মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করেছে, জন্মসূত্র বা বংশগত অবস্থানকে নয়। দ্বিতীয়ত, ইসলামে সুদপ্রথা নিষিদ্ধ। তৃতীয়ত, যুদ্ধবন্দীদের সম্পর্কে ইসলাম-বন্দীদের মেরে ফেলার রেওয়াজকে তো বর্জন করেছেই, তদুপরি যুদ্ধবন্দীদের সঙ্গে ভাল ব্যবহারের নির্দেশও দিয়েছে। ইসলামের মহান নবীজি ও তাঁর সাহাবাগণ অব্যবস্থাজনতি কারণে বা বিরূপ অবস্থায় নিজেরা না ঘুমিয়ে এবং না খেয়েও যুদ্ধবন্দীদের খাদ্য ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের নিশ্চয়তা বিধান করেছেন। শুধু তাই নয়, ক্রীতদাস প্রথার মূলোৎপাটনের লক্ষ্যে ক্রীতদাস মুক্ত করাকে অত্যধিক পুণ্যের কাজ বলে ঘোষণা করেছেন। আর ক্রীতদাসের মালিকরা যেহেতু টাকার বিনিময়ে দাস ক্রয় করতেন, তাই তাদের ব্যয়িত অর্থের কথা চিন্তা করে সেই অর্থ পরিশোধের মাধ্যমে ক্রীতদাসদের মুক্তির বিধান দিয়েছেন। ক্রীতদাসরা যাতে মুক্তিপণ সংগ্রহ করতে পারে, তারই লক্ষ্যে ইসলাম যাকাত প্রাপকদের আটটি খাতের মধ্যে একটি খাত নির্দিষ্ট করে দিয়েছে ক্রীতদাসদের যাকাত পাওয়ার হকদার করার মধ্য দিয়ে। কিন্তু ক্রীতদাস প্রথার উচ্ছেদের লক্ষ্যে সবচাইতে কার্যকরী যে পদক্ষেপ ইসলাম

---

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২।

গ্রহণ করেছে তা হলো তাদের মর্যাদা ও অধিকারের মৌলিক পরিবর্তন সাধন। ইসলামের নবী ঘোষণা করেছেন ঃ তারা তোমাদের ভাই। সুতরাং তোমাদের কারো অধীনে যদি কোন ভাই থাকে তবে তাকে সেরূপ খাবার দেবে, যা তোমরা নিজেরা খাও; তাকে সেরূপ কাপড় দেবে, যেমনটি তোমরা পরিধান কর। তাদের এমন কোন কাজ দেবে না, যা তাদের সাধ্যের বাইরে। যদি সেরূপ কোন কাজ দাও, তবে সে কাজে তাকে তোমরা সাহায্য করবে। ... ক্রীতদাসদের প্রতি এই বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গির ফলে অন্যান্য ধর্মের ক্রীতদাসদের মধ্যে দলে দলে ইসলাম গ্রহণের হিড়িক পড়ে যায়। ইসলামের ইতিহাসে দেখা যায় এক কালের হতভাগ্য এই ক্রীতদাসেরা মুসলিম সমাজে প্রবেশ করে অত্যন্ত গৌরবজনক মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। নিজেদের প্রতিভা ও সাধনাবলে জ্ঞান চর্চা, ধর্মীয় সাধনা এবং রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে শীর্ষস্থান অধিকার করেছেন মুসলিম ইতিহাসে এরকম সাবেক ক্রীতদাসের সংখ্যা সীমাহীন ; হযরত বেলাল (রা), হযরত জায়েদ (রা), হযরত উসামা (রা) থেকে শুরু করে স্পেনবিজয়ী তারিক বিন জিয়াদ, গজনীর শাসক, এমন কি ভারতের প্রথম মুসলিম শাসক সুলতান কুতুব উদ্দীনও এঁদেরই অন্তর্গত ছিলেন।"[৪]

(ক) দিল্লীর পূর্ণ আনুগত্যকাল (১২২৭–১২৭২ সাল)

৬. নাসির-উদ-দীন মাহমুদ (১২২৭–১২২৯ সাল)

নাসির-উদ-দীন মাহমুদ ছিলেন দিল্লীর সুলতান শামস-উদ-দীনের জ্যেষ্ঠ পুত্র। কিন্তু মাত্র দুই বছরের মত সময় শাসনকার্য চালিয়ে ১২২৯ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ঐ সময়কালে সুলতান শামস-উদ-দীন ইলতুতমিশ পুত্রকে 'মালিক-উশ-শরক' বা 'পূর্বাঞ্চলের অধিপতি' খেতাবে ভূষিত করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, সুলতান ইলতুতমিশ পরলোকগত প্রিয় পুত্রের স্মৃতি রক্ষার উদ্দেশ্যে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রের নামও রাখেন নাসির-উদ-দীন মাহমুদ। এই নাসির উদ-দীন মাহমুদ পরে দিল্লীর মসনদে বসেন এবং ২০ বৎসরকাল রাজত্ব করেন।

৭. দওলত শাহ্ বিন মওদুদ (১২২৯ সালে কিছু সময়ের জন্য)

নাসির-উদ-দীন মাহমুদের অকালমৃত্যুতে লাখনৌতি আবার বিশৃঙ্খলায় পতিত হয়। সে অবস্থায় আভ্যন্তরীণ শান্তি রক্ষার জন্য দওলত শাহ্ বিন মওদুদ নামক একজন সেনানায়ক লাখনৌতিতে নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।

---

৪. অধ্যাপক আবদুল গফুর, ইসলামে ক্রীতদাস প্রথা, অগ্রপথিক, ৩রা জুলাই, ১৯৮৬, পৃ. ২৮-২৯।

৮. ইখতিয়ার-উদ-দীন বলকা খিলজী (দওলত শাহ্‌র পর কিছু সময়ের জন্য)

দওলত শাহ্ লাখনৌতিতে শাসনকার্য হস্তগত করার পর আব্বাসীয় খলিফা, দিল্লীর সুলতান এবং নিজের নামে মুদ্রা চালু করেন। কিন্তু ইখতিয়ার-উদ-দীন বলকা খিলজী নামক অন্য এক সেনানায়ক দওলত শাহ্‌র মুদ্রা প্রচলনের ঔদ্ধত্য সহ্য করতে না পেরে বিদ্রোহ করেন এবং দওলত শাহ্‌কে হয় হত্যা নয় তো বিতাড়িত করে ক্ষমতা দখল করেন। কিন্তু ঐতিহাসিক মিনহাজের ভাষ্য অনুযায়ী ১২২৯-৩০ খৃস্টাব্দে সুলতান ইলতুতমিশ নিজে লাখনৌতি আক্রমণ করে বলকা খিলজীকে বিতাড়িত করেন।

৯. মালিক আলা-উদ-দীন জানী (১ বছরেরও বেশি সময়ের জন্য)

অতঃপর সুলতান ইলতুতমিশ মালিক আলা-উদ-দীন জানীকে লাখনৌতির শাসনকর্তা নিযুক্ত করে দিল্লীতে ফিরে যান। তিনি এক বছরেরও কিছু বেশি সময় লাখনৌতির শাসনকর্তার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

১০. মালিক সইফ-উদ-দীন আইবক (প্রায় ৩ বছরের জন্য)

কোন কারণে মালিক আলা-উদ-দীন জানীকে লাখনৌতির শাসনকর্তার পদ থেকে সরিয়ে দিয়ে সুলতান ইলতুতমিশ মালিক সইফ-উদ-দীন আইবককে শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। সইফ-উদ-দীন আইবক ছিলেন কারাখিতাই সম্প্রদায়ভুক্ত তুর্কী এবং সুলতান ইলতুতমিশের ক্রীতদাস। তিনি ছিলেন অত্যন্ত দক্ষ শাসক এবং সাহসী যোদ্ধা। তাঁর শাসনকালে পূর্ববঙ্গ আক্রমণ করে অনেক হাতী হস্তগত করেন এবং সেগুলো সুলতান ইলতুতমিশের নিকট প্রেরণ করেন। তাতে মুগ্ধ হয়ে সুলতান মালিক সইফ-উদ-দীন আইবককে 'য়ুগনতৎ' খেতাবে ভূষিত করেন। ১২৩৬ সালের ২৯শে এপ্রিল সুলতান ইলতুতমিশ পরলোকগমন করলে দিল্লীতে দেখা দেয় চরম বিশৃঙ্খলা। এদিকে ঐ সময়ে লাখনৌতিতেও পরলোকগমন করেন মালিক সইফ-উদ-দীন আইবক।

১১. আওর খান (কিছু দিনের জন্য)

এই সময়ে আওর খান নামক একজন উচ্চাভিলাষী তুর্কী সেনানায়ক লাখনৌতিতে ক্ষমতা দখল করেন। দিল্লীতে তখন সুলতান ইলতুতমিশের অকর্মণ্য পুত্র রুকন-উদ-দীন ফীরূজকে সরিয়ে সুলতানা রাজিয়া মসনদে আরোহণ করেন। ঐ সময়ে বিহারের শাসনকর্তা ছিলেন তুগরল তুগান খাঁ। উচ্চাভিলাষের বশবর্তী হয়ে দিল্লীর কোন অনুমতি না নিয়েই তুগরল তুগান খাঁ লাখনৌতি আক্রমণ করেন। যুদ্ধে নিহত হন আওর খান। ফলে বিহার ও লাখনৌতির শাসন কর্তৃত্ব হস্তগত করেন তুগরল তুগান খাঁ।

তিনিও আওর খানের মত ছিলেন কারাখিতাই সম্প্রদায়ভুক্ত তুর্কী এবং সুলতান ইলতুতমিশের ক্রীতদাস।

১২. তুগরল তুগান খাঁ (১২৩৬–১২৪৫ সাল)

ইওজ খিলজীর পর তুগান খাঁর লাখনৌতি শাসনের মেয়াদই ছিল দীর্ঘকাল ব্যাপী। প্রায় ৯ বছর ধরে তিনি লাখনৌতির শাসনকর্তা ছিলেন। যদিও তিনি জোরপূর্বক লাখনৌতির শাসন ক্ষমতা হস্তগত করেন, তবু সুলতানা রাজিয়ার নিকট বহুমূল্য উপহার পাঠিয়ে সুলতানার অনুমোদন লাভ করে তিনি তাঁর ক্ষমতাকে আইনসিদ্ধ করে নেন। সুলতানা রাজিয়া তখন দিল্লীতে নিজ ক্ষমতা সংহত করতে ব্যস্ত। তাই তুগরল তুগান খাঁকে না ঘাঁটিয়ে শাসনকর্তা পদের অনুমোদন দেন এবং তুগরলকে ছত্র, লাল চাদর, নিশানাদি রাজকীয় উপহার দিয়ে পুরস্কৃত করেন। সুলতানা রাজিয়ার মৃত্যুর পরও তুগান খাঁ দিল্লীর প্রতি আনুগত্য বজায় রাখেন। যিনিই যখন দিল্লীতে সুলতান হয়ে বসতেন, তাঁর প্রতিই আনুগত্য প্রকাশ করতেন তুগরল তুগান খাঁ। তাই বলে তাঁর কোন উচ্চাভিলাষ ছিল না, তা নয়। ত্রিহুত আক্রমণ করে তুগরল তুগান খাঁ অনেক ধন-সম্পদ হস্তগত করেন এবং গঠন করেন এক বিশাল সৈন্যবাহিনী ও নৌবাহিনী এবং সেই বিশাল বাহিনীসহ দিল্লী সাম্রাজ্যের পূর্বদিকের প্রদেশগুলি অর্থাৎ অযোধ্যা, কারামাণিকপুর এবং গঙ্গা-যমুনা-দোয়াব অঞ্চল জয় করার অভিপ্রায়ে অগ্রসর হলেন। সেটা ১২৪২ সালে, আলা-উদ-দীন মাসুদ শাহ্ তখন দিল্লীর দুর্বলতম সুলতান। এলাহাবাদে পৌঁছে তুগরল তুগান খাঁ দিল্লী সুলতানের নিকট পাঠালেন বহুমূল্য উপহার। উপহারে মুগ্ধ সুলতান দূত মারফত খিলাত পাঠিয়ে তুগান খাঁকে সম্মানিত করলেন। এমনি বিচিত্র ব্যবহারের পরে তুগরল তুগান খাঁ লাখনৌতিতে ফিরে আসার জন্য তৈরি হলেন। তখনই তিনি খবর পেলেন যে, উড়িষ্যারাজ প্রথম নরসিংহদেব রাঢ় ও বঙ্গ আক্রমণ করেছেন। লাখনৌতিতে ফিরে প্রতি-আক্রমণের জন্য তিনি আবার বাহিনী পরিচালনা করলেন। যুদ্ধ হলো, পরাস্ত হয়ে পিছু হটল উড়িষ্যা বাহিনী। উল্লসিত বিজয়ী তুগরল তুগান খাঁ উড়িষ্যা বাহিনীর পশ্চাদ্ধাবন করে বাঁকুড়া জেলার কাটাসিন দুর্গ পর্যন্ত অগ্রসর হলেন অর্থাৎ উড়িষ্যা রাজ্যেরও কিছু অংশ তাঁর দখলে এসে গেল। আনন্দোৎসবে মেতে উঠল তুগান খাঁর সৈন্যরা। আর এখানেই হলো ভুল। উড়িষ্যা বাহিনী পিছু হটছিল ঠিকই, কিন্তু গোপনে নানা স্থানে থেকে যাচ্ছিল ছোট ছোট সেনাদল। তুগরল তুগান খাঁ বিজয়ের আনন্দে সুমুখ পানেই এগিয়ে যাচ্ছিলেন, নিজ রাজ্যের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার কোন ব্যবস্থাই তিনি গ্রহণ করেন নি। ফলে, লাখনৌতি বাহিনী যখন পিছনে হটে রাজধানীতে ফিরে আসা আরম্ভ করল, তখন গোপনে লুকিয়ে থাকা উড়িষ্যা বাহিনীর ছোট ছোট দলগুলি তুগান খাঁর বাহিনীকে বারবার অতর্কিত আক্রমণ করে করে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল। তাই বিজয়ী হয়েও পরাজিত হলো লাখনৌতি বাহিনী।

নাস্তানাবুদ হয়ে লাখনৌতিতে ফিরে এলেন তুগরল তুগান খাঁ এবং নরসিংহদেবের উপর প্রতিশোধ নেবার অভিপ্রায়ে দিল্লীতে সাহায্য চেয়ে পাঠালেন। উড়িষ্যারাজ এর মধ্যে দখল করে নিয়েছেন বীরভূমের লাখনৌর। হত্যা করেছে লাখনৌর-এর শাসক ফখর-উল-মুলক করিম-উদ-দীন লাখেরীসহ অনেক মুসলমানকে। রাঢ় থেকে উচ্ছেদ হলো মুসলিম শাসন। তখনই দিল্লী সুলতান কারামাণিকের শাসনকর্তা মালিক কারাকাশ খান ও অযোধ্যার শাসনকর্তা মালিক তমর খান কিরানকে বিরাট বাহিনীসহ পাঠালেন লাখনৌতির পথে। ইতিমধ্যে ১২৪৫ সালের ১৪ই মার্চ লাখনৌতি অবরোধ করলেন উড়িষ্যারাজ নরসিংহদেব। কিন্তু দিল্লী বাহিনীর এগিয়ে আসার খবর পেয়েই তিনি অবরোধ উঠিয়ে লাখনৌতি ছেড়ে চলে যান তাঁর বাহিনীসহ।

উড়িষ্যা বাহিনীর চাপমুক্ত হয়েই তুগরল তুগান খাঁ দাবি জানালেন যে, কারাকাশ খান ও তমর খান কিরানকেও তাঁদের বাহিনীসহ লাখনৌতি ছেড়ে চলে যেতে হবে। কিন্তু মালিক তমর খান এতে রাজী হলেন না। আরম্ভ হলো যুদ্ধ। লাখনৌতিতে অবরুদ্ধ তুগরল তুগান খাঁ অবশেষে সন্ধি স্থাপন করলেন এবং নিজে ধন-সম্পদ ও পরিবার-পরিজন নিয়ে দিল্লীর পথে অগ্রসর হলেন। লাখনৌতির মসনদে আরোহণ করলেন উচ্চাভিলাষী মালিক তমর খান কিরান।

১৩. মালিক তমর খান কিরান (১২৪৫–১২৪৭ সাল)

মালিক তমর খান কিরানও ছিলেন দিল্লীর অননুমোদিত শাসনকর্তা। তখনকার দিল্লীর সুলতান আলা-উদ-দীন মাসুদ শাহ্ এতই দুর্বল প্রকৃতির লোক ছিলেন যে, তিনি মালিক তমর খান কিরানকে এজন্য কোন শাস্তিও দিতে সাহসী হন নি, অথবা তুগরল তুগান খাঁর প্রতি এই অবিচারের কোন প্রতিবিধানও করতে পারেন নি। ১২৪৬ সালে সুলতান ইলতুতমিশের কনিষ্ঠ পুত্র নাসির-উদ-দীন মাহমুদ দিল্লীর সুলতান হওয়ার পর তুগরল তুগান খাঁকে অযোধ্যার শাসনকর্তা নিযুক্ত করে তাঁর প্রতি কিছুটা সুবিচার করেন। তুগান খাঁ অযোধ্যার শাসনভার গ্রহণ করার কিছুদিন পর ১২৪৭ সালে পরলোক গমন করেন। ভাগ্যের পরিহাসই বলতে হবে, লাখনৌতিতে প্রায় ২ বছর শাসনকর্তা হিসাবে শাসনকার্য চালিয়ে মালিক তমর খান কিরানও একই দিনে মৃত্যুমুখে পতিত হন। ওদিকে পরিস্থিতির সুযোগে রাঢ় অঞ্চল উড়িষ্যারাজ নরসিংহদেবের অধিকারেই থেকে যায়।

১৪. মালিক জালাল-উদ-দীন মাসুদ জানী (১২৪৭–১২৫১ সাল)

তমর খান কিরানের মৃত্যুর পর মালিক আলা-উদ-দীন জানীর পুত্র মালিক জালাল-উদ-দীন মাসুদ জানীকে লাখনৌতির শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়। মালিক জালাল-উদ-দীন মাসুদ জানীর ৪ বছর কাল শাসনের পর লাখনৌতির শাসনকর্তা নিযুক্ত হন মালিক ইখতিয়ার-উদ-দীন ইউজবুক।

১৫. মালিক ইখতিয়ার-উদ-দীন ইউজবক (১২৫১–১২৫৭ সাল)

দিল্লীর সুলতানের প্রতি বিদ্রোহ ভাবাপন্ন থাকলেও মালিক ইউজবুক দিল্লীর প্রধান উজীর গিয়াস-উদ-দীন বলবনের স্নেহভাজন ছিলেন। তিনি ছিলেন সাহসী কর্মঠ সমরনিপুণ ও সুশাসক। লাখনৌতির পঞ্চম শাসনকর্তা গিয়াস-উদ-দীন ইওজ খিলজীর পর তিনিই লাখনৌতির মুসলিম রাজ্য বিস্তারে মনোযোগী হন এবং তাতে বেশ সাফল্যও অর্জন করেন। তিনি উড়িষ্যা-রাজের হাত থেকে রাঢ় অঞ্চল পুনর্দখল করেন। এবারে দিল্লী সুলতানের বিরুদ্ধে আবার বিদ্রোহ করে সুলতান মুগীস-উদ-দীন উপাধি গ্রহণ করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তারপর ১২৫৫ সালে আরম্ভ হয় তাঁর কামরূপ অভিযান এবং এই অভিযানেই তিনি বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে ১২৫৭ সালে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

১৬. ইয্‌য্‌-উদ-দীন বলবন-ই-ইউজবুকী (১২৫৭–১২৫৯ সাল)

সুলতান মুগীস-উদ-দীন ইউজবুকের মৃত্যুর পরে লাখনৌতি আবার পুরোপুরি দিল্লীর অধীনস্থ একটি প্রদেশে পরিণত হয়। লাখনৌতির শাসনকর্তা নিযুক্ত হন ইয্‌য্‌-উদ-দীন বলবন-ই-ইউজবকী। তিনিও ছিলেন সুলতান ইলতুতমিশের ক্রীতদাস এবং মালিক জালাল-উদ-দীন মাসুদ জানীর জামাতা। দিল্লীতে ইমাদ-উদ-দীন যখন প্রধান উজীর, তখন তিনি ছিলেন রাজদরবারের আমীর। কিন্তু গিয়াস-উদ-দীন বলবন পুনরায় প্রধান উজীর হওয়ার পর তিনি দিল্লী থেকে পালিয়ে লাখনৌতি চলে আসেন এবং লাখনৌতির বিদ্রোহী শাসনকর্তা সুলতান মুগীস-উদ-দীনের অধীনে চাকুরী নেন। তারপর কামরূপে মুগীস-উদ-দীনের মৃত্যু হলে তিনি দিল্লীর অনুমতি না নিয়েই লাখনৌতির শাসনকর্তা হয়ে বসেন। পরে অবিশ্যি তিনি দিল্লীর আনুগত্য স্বীকার করেন এবং প্রকৃত প্রস্তাবে স্বাধীনভাবে লাখনৌতি রাজ্য শাসন করলেও দিল্লী সুলতানের নামে মুদ্রা প্রচলন করেন। অতঃপর ১২৫৯ সালে মালিক ইয্‌য্‌-উদ-দীন পূর্ববাংলা আক্রমণ করেন এবং তা করতে গিয়ে লাখনৌতির পঞ্চম শাসনকর্তা গিয়াস-উদ-দীন ইওজ খিলজীর মত রাজধানী রক্ষার সুব্যবস্থা না করেই পূর্ববাংলা অভিযানে অগ্রসর হন। ফলে, লাখনৌতির দুর্বল রক্ষা ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে কারা প্রদেশের শাসনকর্তা মালিক তাজ-উদ-দীন আরসালান খাঁ লাখনৌতির গদি দখল করে বসেন। লাখনৌতির অধিবাসীরা আরসালান খাঁকে বাধা দিয়েও শেষ রক্ষা করতে অসমর্থ হয়। খবর পেয়ে ইয্‌য্‌-উদ-দীন বলবন লাখনৌতির পথে ছুটে আসেন। কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত হয়ে নিহত হন।

১৭. মালিক তাজ-উদ-দীন আরসালান খাঁ (১২৫৯–১২৬৫ সাল)

মালিক তাজ-উদ-দীন আরসালান খাঁ ছিলেন খিবার আমীরের পুত্র। প্রথম বয়সে যুদ্ধে বন্দী হয়ে ক্রীতদাসরূপে বিক্রীত হন এবং কয়েকবার বিক্রীত হয়ে হয়ে অবশেষে সুলতান ইলতুতমিশের হাতে এসে পড়েন। তিনিও জালাল-উদ-দীন মাসুদ জানীর মত

কয়েকবার দিল্লীর সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। কিন্তু গিয়াস-উদ-দীন বলবনের সুপারিশে তাঁকে ক্ষমা করা হয় এবং কারা প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়। কারা প্রদেশের শাসনভার পেয়ে তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাঁর লোলুপ দৃষ্টি ছিল লাখনৌতির উপর। অবশেষে সে আশাও তাঁর পূর্ণ হয়। ১২৬৫ সালে লাখনৌতির শাসকরূপে তিনি পরলোক গমন করেন।

১৮. তাতার খান (১২৬৫–১২৬৮ সালের প্রথম দিক)

মালিক তাজ-উদ-দীন আরসালান খাঁর মৃত্যুর পর তাতার খান বিহার ও লাখনৌতির শাসন ক্ষমতা লাভ করেন। ১২৬৬ সালে দিল্লীর সুলতান নাসির-উদ-দীন মাহমুদের মৃত্যু হলে দিল্লীতে আরম্ভ হয় বলবনী সুলতানদের শাসন। উলুঘ খান বলবন সুলতান গিয়াস-উদ-দীন উপাধি গ্রহণ করে দিল্লীর মসনদে আরোহণ করেন। তাতার খান উপলব্ধি করেন যে, দিল্লীতে ক্ষমতার এই হাত বদলের ফলে সুলতান ইলতুতমিশের মৃত্যুর পর ৩০ বছর ধরে দিল্লীতে যে দুর্বল শাসন এবং তজ্জনিত অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা চলে আসছিল, তার অবসান হলো। কারণ বলবন ছিলেন সাহস, বীরত্ব, প্রশাসনিক দক্ষতা ও কূটনীতি জ্ঞানের জন্য বিখ্যাত। তাই কালবিলম্ব না করে তাতার খান ৩৬টি হাতীসহ বহুমূল্য উপহার পাঠালেন দিল্লীতে। সুলতান গিয়াস-উদ-দীন বলবনও সেই উপহার সসম্মানে গ্রহণ করে তাতার খানের দূতকে উপহারসহ বিদায় দিলেন। লাখনৌতি আবার চলে গেল দিল্লীর পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে। কিন্তু তাতার খান বেশি দিন লাখনৌতি শাসনের সুযোগ পান নি। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি পরলোক গমন করেন।

১৯. শের খান (১২৬৮–১২৭২ সাল)

তাতার খানের মৃত্যুর পর তাঁরই বংশের শের খান লাখনৌতির শাসনভার গ্রহণ করেন এবং সুলতান গিয়াস-উদ-দীন বলবনের নামে মুদ্রা প্রচলন করেন। প্রকৃত প্রস্তাবে ১২৬৬ সালে সুলতান নাসির-উদ-দীন মাহমুদের মৃত্যুর পরপরই লাখনৌতি থেকে শেষ হয়ে যায় তুর্কী শাসন। দিল্লীতে সুলতান গিয়াস উদ-দীন বলবনের মসনদ লাভের পর লাখনৌতিতেও আরম্ভ হয় ক্ষমতার পট-পরিবর্তন।

(খ) স্বাধীনতা প্রয়াসকাল (১২৭২–১৩৩৮ সাল)

ব্রাহ্মণ্য শাসন, বৌদ্ধ শাসন অথবা মুসলিম শাসন নির্বিশেষে এই হিমালয়ান উপমহাদেশে কেন্দ্রীয় রাজশক্তি যখনই দুর্বল হয়ে পড়েছে, তখনই দেখা গেছে বিভিন্ন রাজ্য বা প্রদেশের উচ্চাভিলাষী শাসনকর্তাগণ নিজেদেরকে স্বাধীন শাসক বলে গোষণা করেছেন। বাংলার শাসনকর্তার পদটির জন্য লুব্ধ আকর্ষণ ছিল অন্যান্য রাজ্য বা প্রদেশের প্রায় সকল শাসনকর্তারই, সকল প্রধান ব্যক্তিরই। তাছাড়া বাংলার

শাসনকর্তাদের মধ্যে দেখা যায়, যখনই যিনি সুযোগ পেয়েছেন, তখনই তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন এই লাখনৌতি তথা বাংলায়।

দিল্লী সালতানাতের মধ্যে অন্যান্য রাজ্য বা প্রদেশের চাইতে লাখনৌতির মর্যাদা ছিল সর্বাধিক। দিল্লী থেকে অনেক দূরে অবস্থিত হওয়ায় এবং লাখনৌতির প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক অবস্থা দিল্লী বা পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহ থেকে ভিন্ন হওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে লাখনৌতির উপর নিয়মিত কড়া নজর রাখা সম্ভবপর ছিল না। তাছাড়া লাখনৌতির বিদ্রোহ দমন করার উদ্দেশ্যে সৈন্যবাহিনীসহ ক্ষিপ্র গতিতে বাংলায় উপস্থিত হওয়া মোটেই সহজসাধ্য ছিল না। ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারনী বলেন যে, বাংলার আবহাওয়াই ছিল বিদ্রোহীদের পক্ষে সহায়ক। "এইখানে শাসকেরা স্বভাবতই বিদ্রোহী ছিল ; নূতন শাসক আসিলে অমাত্য অনুচর সকলে মিলিয়া তাঁহাকে বিদ্রোহের প্ররোচনা দিত; যদি কোন শাসক বিদ্রোহ করিতে অস্বীকার করিতেন তাহা হইলে অনুচরেরা সকলে মিলিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার চেষ্টা করিত, সুতরাং শাসককে বাধ্য হইয়া দিল্লীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে হইত।"[৫] ... এইসব কারণে দিল্লীর লোকেরা বাংলাকে অভিহিত করত "বলগামপুর" বা বিদ্রোহী এলাকা বলে।

এর আগে আমরা দেখেছি, দিল্লী কর্তৃপক্ষের দুর্বলতা বা অসুবিধাজনক অবস্থার সুযোগে লাখনৌতিতে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন চতুর্থ শাসনকর্তা আলা-উদ-দীন আলি মর্দান খিলজী, পঞ্চম শাসনকর্তা গিয়াস-উদ-দীন ইওজ খিলজী এবং পঞ্চদশ শাসনকর্তা মালিক ইখতিয়ার উদ-দীন ইউজবুক। প্রত্যেকেই নিজেদেরকে তাঁরা অভিহিত করেছেন সুলতান বলে। এইসব ঘটনা থেকে বিদ্রোহী বাংলার শাসকদের মেজাজ ও পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। কিন্তু এই চলমান অধ্যায়ে আমরা দেখব– দিল্লীতে বলবনী সুলতানদের শক্তিশালী শাসনামলেও স্বাধীনতার অগ্নিশিখা জ্বলে উঠেছে বাংলার রাজধানীতে। শুধুমাত্র লাখনৌতির শাসকেরা ও তাঁদের পাত্রমিত্রেরাই নয়, বাংলার স্বাধীনতা প্রয়াসে শরীক হয়েছেন বাংলার মানুষও। বাংলার বুকে জ্বলে উঠেছে স্বাধীনতা স্পৃহার অনির্বাণ শিখা। দিল্লী কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিতে তা ছিল বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহ দমন করতে লক্ষ লক্ষ সৈন্য নিয়ে বাংলার পানে ধেয়ে এসেছেন প্রবল পরাক্রান্ত দিল্লী অধিপতিরা। 'বিদ্রোহ' দমিত হয়েছে প্রাণ দিয়েছেন 'বিদ্রোহে'র নেতৃবর্গ, প্রাণ দিয়েছেন অগণিত মানুষ। বাংলায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দিল্লীর আধিপত্য। কিন্তু নির্বাপিত হয়নি বাংলায় প্রজ্বলিত স্বাধীনতা স্পৃহার সেই অনির্বাণ শিখা।

এই অধ্যায়ে বাংলার লাখনৌতি রাজ্যের সঙ্গে যেহেতু দিল্লী সালতানাতের সম্পর্কটাই ছিল প্রধান বিবেচ্য বিষয়, তাই দিল্লী সালতানাতের অবস্থাটা এখানে তুলে ধরা প্রয়োজন মনে করি।

---

৫. ডক্টর আবদুল করিম, বাংলার ইতিহাস, সুলতানী আমল, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৭, পৃ. ১৩১।

১২৩৬ সালে সুলতান শামস-উদ-দীন ইলতুতমিশের মৃত্যুর পর মসনদ নিয়ে আরম্ভ হয় বিশৃঙ্খলা। কুতুব-উদ-দীন আইবক ছিলেন দিল্লীর প্রথম স্বাধীন মুসলিম সাম্রাজ্যের সূচনাকারী, আর তদীয় জামাতা ইলতুতমিশ ছিলেন সে সাম্রাজ্যের প্রকৃত স্থাপনকর্তা, আইনানুমোদিত প্রথম সুলতান। তিনি ছিলেন ধার্মিক, দয়ালু, দাতা, রণনিপুণ, বিদ্যোৎসাহী ও সুযোগ্য শাসক। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর অযোগ্য পুত্র রুকন-উদ-দীন ফিরোজ মাত্র ৬ মাসের জন্য মসনদ অধিকার করেন। অতঃপর মসনদে আরোহণ করেন সুলতান ইলতুতমিশের কন্যা সুলতানা রাজিয়া। তাঁর শাসনকাল ১২৩৬ থেকে ১২৪০ সাল। এর পর সুলতান হন ইলতুতমিশ-পুত্র মুইজ-উদ-দীন বাহ্‌রাম শাহ্ (১২৪০–১২৪২ সাল) এবং পরবর্তীতে সুলতান ইলতুতমিশের অন্য দুই পুত্র সুলতান আলা-উদ-দীন মাসুদ শাহ্ (১২৪২-১২৪৬ সাল) এবং নাসির-উদ-দীন মাহমুদ শাহ্ (১২৪৬–১২৬৬ সাল)। সুলতান নাসির-উদ-দীনের রাজত্বকালে প্রকৃত শাসনভার ন্যস্ত ছিল তাঁর শ্বশুর গিয়াস-উদ-দীন বলবনের উপর।

তুর্কীস্তানের ইলবারী উপজাতির এক সর্দারের পুত্র বলবন মোঙ্গল আক্রমণকারীদের হাতে বন্দী হয়ে বাগদাদের বাজারে ক্রীতদাসরূপে বিক্রি হন। তাঁর প্রভু বসরার খাজা জামালুদ্দীন তাকে নিজ পুত্ররূপে লালন-পালন করেন। পরে দিল্লীতে নীত হলে সুলতান ইলতুতমিশ তাকে ক্রয় করেন। সেখানে বলবন নিজ প্রতিভাবলে দ্রুত উন্নতি লাভ করে সুলতানের বিখ্যাত চল্লিশ ক্রীতদাসের দলভুক্ত হন। বাহ্‌রাম শাহ্ ও মাসুদ শাহের রাজত্বকালে তিনি রাজকীয় উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন এবং জামাতা নাসির-উদ-দীন মাহমুদের রাজত্বকালে সুলতানের প্রধানমন্ত্রী ও সেনাপতিরূপে দীর্ঘ ২০ বছর রাজ্য পরিচালনা করেন। ১২৬৬ সালে সুলতান নাসির উদ্দীন মাহমুদের মৃত্যুর পর তিনি গিয়াস উদ্দীন বলবন উপাধি ধারণ করে দিল্লীর মসনদে আরোহণ করেন। বিশ বছরেরও কিছু বেশিকাল সুযোগ্য সুলতান রূপে রাজ্য শাসন করে ১২৮৭ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

এর আগেই বলা হয়েছে যে, সুলতান গিয়াস উদ্দীন বলবনের মসনদ লাভের পরেই লাখনৌতিতেও আরম্ভ হয় ক্ষমতার পট-পরিবর্তন।

২০. আমিন খান (১২৭২–?)

শের খানের মৃত্যুর পর দিল্লীর সুলতান গিয়াস-উদ-দীন বলবন আমিন খানকে লাখনৌতি রাজ্যের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। আমিন খান এতদিন ছিলেন অযোধ্যার শাসনকর্তা। আমিন খানকে সাহায্য করার জন্য সুলতান গিয়াস-উদ-দীন বলবন তুগরীলকে বাংলার সহকারী শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। লাখনৌতিতে সহকারী শাসনকর্তা নিযুক্ত করার নজীর এই প্রথম। এর দু'টি কারণ থাকতে পারে। প্রথমত, ঐ সময়ে বাংলার এই মুসলিম রাজ্যটির বেশ কিছু বিস্তৃতি ঘটেছিল। এর আগে সুলতান

ইখতিয়ার উদ-দীন ইউজবুক দক্ষিণ মান্দারন পর্যন্ত সমগ্র রাঢ় এলাকা জয় করেন। ইয্‌য্-উদ-দীন বলবন-ই-ইউজবকীও পূর্ববঙ্গের কিছু অংশ লাখনৌতি রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত করেন। এই বিস্তৃত লাখনৌতি রাজ্যটির সুশাসনের জন্য একজন সহকারী শাসনকর্তা নিয়োগের প্রয়োজন হয়তো সুলতান গিয়াস-উদ-দীন বলবন অনুভব করে থাকবেন। দ্বিতীয়ত, বিদ্রোহী ভাবাপন্ন বাংলার এই মুসলিম রাজ্যটিতে একজন শাসনকর্তা ও একজন সহকারী শাসনকর্তা নিযুক্ত করে সুলতান বলবন হয়তো আশা করেছিলেন যে, একে অন্যের বিদ্রোহাত্মক কাজে বাধা দেবে এবং লাখনৌতির ঘটনাবলী যথাসময়ে দিল্লী সুলতানের গোচরে আনবে। কিন্তু এই সহকারী শাসনকর্তা তুগরীল সুলতানের সব আশাকে নস্যাৎ করে দেন। তিনি আমিন খানের কর্তৃত্ব এড়িয়ে রাজ্যে নিজের আধিপত্য বিস্তারে সচেষ্ট হন এবং অল্পদিনের মধ্যেই আমিন খান কেন– সুলতান গিয়াস-উদ-দীন বলবনের কর্তৃত্বও অস্বীকার করে নিজেকে লাখনৌতির স্বাধীন সুলতান বলে ঘোষণা করেন। তাঁর উপাধি হয় মুগীস-উদ-দীন তুগরীল।

২১. সুলতান মুগীস-উদ-দীন তুগরীল (১২৭২–১২৮১ সাল)

সুলতান তুগরীল বা তুগরল ছিলেন মামলুক বংশীয় এবং লাখনৌতির শাসন-কর্তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। সহকারী শাসনকর্তা থাকা কালেই তিনি পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অংশে লাখনৌতির কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। ১২৭৫ সালে তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করে নিজ নামে খুতবা পাঠ করান এবং মুদ্রা প্রচলন করেন। তিনি পদ্মা নদীর দুই তীরবর্তী বর্তমান ফরিদপুর ও ঢাকা জেলার বিস্তৃত অঞ্চলের উপর নিজ কর্তৃত্ব স্থাপন করেন। বর্তমান ঢাকা নগরীর ২৫ মাইল দক্ষিণে এবং রাজবাড়ী থেকে ১০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত দুর্ভেদ্য নারকিলা দুর্গ ছিল তাঁর শক্তির অন্যতম কেন্দ্র। কথিত আছে, ত্রিপুরার রাজবংশের স্থাপনকর্তা রত্না-ফা নিজ ভ্রাতা রাজা-ফাকে বিতাড়িত করার জন্য তুগরীলের সাহায্য প্রার্থনা করেন। তুগরীল ত্রিপুরা রাজ্য আক্রমণ করে রত্না-ফাকে সিংহাস্‌ন প্রতিষ্ঠিত করেন এবং মাণিক্য উপাধিতে ভূষিত করেন। বাংলার রাঢ় অঞ্চলে অভিযান চালিয়েও সুলতান তুগরীল জাজনগর দখল করে নিজ রাজ্যসীমার বিস্তৃতি ঘটান।

সুলতান মুগীস-উদ-দীন তুগরীল ছিলেন সদাশয় এক শাসনকর্তা এবং বিভিন্ন রাজকীয় গুণের অধিকারী স্বাধীনতায় বিশ্বাসী মুক্তহস্ত এক দাতাও। এইসব গুণের জন্য বাংলার হিন্দু ও মুসলমান সকল শ্রেণীর লোকের ভালবাসা তিনি পেয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, স্বাধীনতা ঘোষণার পর দিল্লীর সুলতান গিয়াস-উদ-দীন বলবন তাঁকে ধ্বংস করার জন্য পরপর দু'বার সেনাবাহিনী পাঠান। কিন্তু দু'বারই সুলতান তুগরীল দিল্লী বাহিনীকে পরাস্ত করেন। অতঃপর সুলতান বলবন নিজেই ৭০ বছর বয়সে প্রায় ৩ লক্ষের বিরাট বাহিনী নিয়ে বাংলার পথে ধেয়ে আসেন। প্রতিজ্ঞা করে আসেন, বিদ্রোহী তুগরীলকে

ধ্বংস না করে তিনি দিল্লীতে ফিরে যাবেন না। বাংলার বুকে আরম্ভ হয় উভয় পক্ষের মরণপণ সংগ্রাম।

সুলতান গিয়াস-উদ-দীন বলবন বহুদিনের প্রচেষ্টায় সুলতান তুগরীলকে এক অতর্কিত আক্রমণে বাগে পেয়ে ধ্বংস করেন ঠিকই, কিন্তু এজন্য তাঁকে অনেক মূল্যও দিতে হয়েছিল। বলবনের লাখনৌতি অভিযানের কাহিনী অনুধাবন করিলে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের হিন্দু-মুসলমান সকলে মুগীস-উদ-দীনের পক্ষে ছিল এবং ইচ্ছা করিয়া কেহ তাঁহার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে নাই। মুগীস-উদ-দীন যে দুই দুইবার দিল্লীর বাহিনীকে পরাজিত করিতে সমর্থ হয়, তাহার মূলে ছিল সৈন্যবাহিনী এবং জনসাধারণের অকুণ্ঠ সমর্থন। ডঃ কানুনগোর মতে, "সুলতান গিয়াস-উদ-দীন বলবন শুধু একজন বিদ্রোহী তুগরলের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করেন নাই, বরং সারা বাংলাদেশের বিরুদ্ধেই তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল।"[৬]

২২. সুলতান নাসির-উদ-দীন মাহমুদ বুগরা খান (১২৮১-১২৯১ সাল)

সুলতান গিয়াস-উদ-দীন বলবনের কনিষ্ঠ ও দ্বিতীয় পুত্র বুগরা খান ১২৮১ সাল থেকে ১২৮৭ সাল পর্যন্ত দিল্লীর অধীনস্থ শাসনকর্তারূপে লাখনৌতি শাসন করেন। ১২৮৭ সালে সুলতান গিয়াস-উদ-দীনের পরলোকগমনের পর এবং এর আগে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র মোঙ্গলদের সঙ্গে যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করায় বুগরা খাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র আঠার বছর বয়স্ক কায়কোবাদ দিল্লীর সুলতানরূপে মসনদে আরোহণ করেন। এখানে উল্লেখ্য যে, সুলতান গিয়াস-উদ-দীন বলবন বুগরা খানকে দিল্লীর মসনদ দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বুগরা খান তাতে রাজী হন নাই। কায়কোবাদ দিল্লীর সুলতান হওয়ার পর বুগরা খান ১২৮৭ সালেই সুলতান নাসির-উদ-দীন মাহমুদ উপাধি গ্রহণ করে লাখনৌতিতে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। বিচিত্র চরিত্রের এই সুলতান নাসির-উদ-দীন মাহমুদ ছিলেন একজন সদাশয় শাসনকর্তা। দিল্লীতে পুত্র সুলতান, আর লাখনৌতিতে তিনি নিজে। দিল্লীতে তখন আবার মসনদ নিয়ে স্বার্থের খেলা চলছিল। কুসঙ্গীদের সঙ্গে মিশে অধঃপাতে যাচ্ছিলেন দিল্লীর তরুণ সুলতান কায়কোবাদ। আর এই সুযোগে প্রধানমন্ত্রী নিযামুদ্দীন রাজ্যের সর্বক্ষমতা নিজ হাতে গ্রহণ করার ফন্দিতে নিযুক্ত। পুত্রকে সৎপথে আনার জন্য সুলতান নাসির-উদ-দীন মাহমুদ পত্রের পর পত্র লিখলেন। কিন্তু তাতে কোন ফলোদয় না হওয়ায় নিজেই সেনাবাহিনীসহ ছুটে গেলেন দিল্লীর পথে। এই সংবাদে সুলতান কায়কোবাদও মন্ত্রীদের মন্ত্রণায় সেনাবাহিনীসহ পিতার প্রতিরোধ মানসে অগ্রসর হলেন। এ কাজে সুলতান কায়কোবাদের মন্ত্রণাদাতা ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নিযামুদ্দীন। সরযু নদীর দুই তীরে দুই পক্ষের শিবির পড়ল। সুলতান কায়কোবাদের

৬. ডক্টর আবদুল করিম, বাংলার ইতিহাস, সুলতানী আমল, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭, পৃ. ১৩৩।

সঙ্গে এসেছিলেন বিখ্যাত কবি আমীর খসরু। পিতা-পুত্রের মধ্যকার এই দৃশ্য তিনি দেখেছেন, বিস্মিত হয়েছেন, মসনদী খেলার ভয়াবহতায় শিউরে উঠেছেন। আবার মুগ্ধ হৃদয়ে এই দৃশ্যের অবসানও পর্যাবেক্ষণ করেছেন। দেখেছেন পিতা-পুত্রের মিলন দৃশ্য। তারপরও দেখেছেন, সুলতান কায়কোবাদকে মসনদে বসিয়ে তাঁকে নানারকম উপদেশ দিয়ে সুলতান নাসির-উদ-দীন ফিরে এসেছেন বাংলায়। মহাকবি আমীর খসরু এই ঘটনা বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন তাঁর কাব্য "কিরান-উস-সাদাইন" বা "দুই তারার মিলন"এ। সাধক কবি তাঁর বর্ণিত কাহিনীকে বলেছেন "শায়েরী নীস্ত্, হামা রাস্ত্" – "কবিত্ব নয়, সম্পূর্ণ সত্য"।

সুলতান নাসির-উদ-দীন মাহমুদ বিস্তৃততর লাখনৌতি রাজ্যকে চারটি ভাগে বিভক্ত করেনঃ বিহার, সাতগাঁও বা সপ্তগ্রাম, বঙ্গ এবং দেবকোট। কিন্তু দিল্লীতে সুলতান কায়কোবাদ আবার বিলাসের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেন। ফলে, ১২৯০ সালে সুলতান কায়কোবাদ ও তাঁর শিশু পুত্রকে হত্যা করে খিলজী বংশের জালাল-উদ-দীন ফিরোজ শাহ্ দিল্লীর মসনদ অধিকার করেন। এ ঘটনায় সুলতান নাসির-উদ-দীন মাহমুদের মন এত ভেঙে পড়ে যে, তিনি স্বেচ্ছায় বাংলার মসনদ ত্যাগ করে তাঁর কনিষ্ঠ তরুণ পুত্রকে সেই মসনদ দান করেন।

২৩. সুলতান রুকন-উদ-দীন কায়কাউস (১২৯১–১৩০১ সাল)

সুলতান নাসির-উদ-দীন মাহমুদের কনিষ্ঠ পুত্র সুলতান রুকন-উদ-দীন কায়কাউস লাখনৌতির স্বাধীন শাসনকর্তারূপেই লাখনৌতির মসনদে আরোহণ করেন। ওদিকে দিল্লীর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা খিলজীদের করায়ত্ত হওয়ার ফলে বহু মামলুক বংশীয় তুর্কী বাংলায় চলে আসেন। এই সময় বহু ওলী-দরবেশ বাংলায় এসে ইসলাম প্রচারে রত হন।

সুলতান কায়কাউস তাঁর রাজ্যকে দু'টি প্রদেশে বিভক্ত করেন ঃ বিহার ও লাখনৌতি। বিহার শাসনের জন্য তিনি শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন ইখতিয়ার-উদ-দীন ফিরোজ ইতগিনকে এবং লাখনৌতি প্রদেশের জন্য শাহাব-উদ-দীন জাফর খান বাহরাম ইতগিনকে। লাখনৌতি প্রদেশ তখন উত্তরে দেবকোট থেকে দক্ষিণে সাতগাঁও পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। দশ বছর রাজত্ব করে সুলতান রুকন-উদ-দীন কায়কাউস পরলোক গমন করেন। তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে ইতিহাস নীরব। অনুমানের উপর ভিত্তি করে শুধু এটুকু বলা যায় যে, হয় তিনি অপুত্রক অবস্থায় স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেন অথবা তাঁকে বলপূর্বক সরিয়ে দেওয়া হয়।

২৪. সুলতান শামস-উদ-দীন ফিরোজ শাহ্ (১৩০১–১৩২২)

১৩০০ বা ১৩০১ সাল থেকে ১৩৩৮ সাল পর্যন্ত সময়টা বাংলার ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়কালে বাংলার স্বাধীনতা প্রয়াসও সাফল্যের পথে এগিয়ে যায়। এই সময়কালের প্রধান পুরুষ সুলতান শামস-উদ-দীন ফিরোজ শাহ্। ইনিই পূর্ববর্তী সুলতান

রুকন-উদ-দীন কায়কাউসের রাজত্বকালে বিহার প্রদেশের শাসনকর্তা ইখতিয়ার-উদ-দীন ফিরোজ ইতগিন।

দিল্লীর খিলজী সুলতানদের আমলে লাখনৌতি স্বাধীনতার স্বাদ ভোগ করছিল। কিন্তু দিল্লীতে তুগলক বংশীয়রা রাজ-ক্ষমতা দখল করার পর লাখনৌতি আবার দিল্লীর অধিকারে চলে যায়। তবে দিল্লীতে সুলতান মুহম্মদ বিন তুগলকের রাজত্বকালে ১৩৩৮ সালে লাখনৌতি আবার স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয় এবং সুদীর্ঘ ২০০ বছর ধরে এই স্বাধীনতা অম্লান থাকে।

সুলতান গিয়াস-উদ-দীন বলবন লাখনৌতির সুলতান মুগীস-উদ-দীন তুগরীলকে ধ্বংস করে দিল্লীতে ফিরে যাওয়ার আগে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র বুগরা খানকে যখন লাখনৌতির শাসনভার দিয়ে যান, তখন ফিরোজ নামক দুইজন উপদেষ্টাকে লাখনৌতিতে রেখে যান। তাঁদেরই একজন বিহারের শাসনকর্তা ইখতিয়ার-উদ-দীন ফিরোজ ইতগিন, আর এই ফিরোজ ইতগিনই পরবর্তীকালের সুলতান শামস-উদ-দীন ফিরোজ শাহ্। দিল্লীতে তখন সুলতান জালাল-উদ-দীন ফিরোজ খিলজীকে হত্যা করে আল্লা-উদ-দীন খিলজী মসনদে সমাসীন।

মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজীর পরে সুলতান শামস-উদ-দীন ফিরোজ শাহ্‌র সময়ে বাংলায় মুসলিম রাজ্য সর্বাধিক বিস্তৃতি লাভ করে। এর আগে সুলতান কায়কাউসের সময়ে বঙ্গ ও সাতগাঁও মুসলিম শাসনাধীনে আসে। কিন্তু এই অন্তর্ভুক্তি সুসম্পন্ন ছিল না। সুলতান শামস-উদ-দীন ফিরোজ শাহ্‌র সময়ে বঙ্গ ও সাতগাঁও বিজয় সম্পূর্ণ হয়। আর সোনারগাঁও-এ প্রতিষ্ঠিত হয় টাকশাল। তা ছাড়াও সুলতান ফিরোজ শাহ্‌র সময়েই ময়মনসিংহ ও সিলেট পর্যন্ত লাখনৌতির সীমানা বিস্তৃত হয়। প্রত্যন্ত এলাকাসমূহ ছাড়া সমগ্র বাংলাই এ সময়ে মুসলিম অধিকারে আসে বলে ধরে নেওয়া যায়।

সুলতান ফিরোজ শাহ্‌র আমলে মুসলিম রাজ্যের বিস্তৃতিই সম্পন্ন হয়নি শুধু, সমগ্র বাংলায় তখন ইসলামের প্রচারও বৃদ্ধি পায়। সাতগাঁও ও সিলেট বিজয়ের সঙ্গে জড়িয়ে আছে দুইজন মহান দরবেশের নাম ঃ হযরত শাহ্ শফী-উদ-দীন ও হযরত শাহ্ জালাল। সুলতান শামস-উদ-দীন ফিরোজ শাহ্ এই ইসলাম প্রচারের কাজে প্রত্যক্ষভাবে উৎসাহ দেন ও সাহায্য করেন। রাজধানী লাখনৌতির তুলনায় তখন পাণ্ডুয়া ছিল অধিকতর স্বাস্থ্যকর স্থান এবং সামরিক ও যোগাযোগের দিক থেকে অধিকতর উপযোগী। তাই সুলতান ফিরোজ শাহ্ লাখনৌতি থেকে রাজধানী পাণ্ডুয়ায় স্থানান্তরিত করেন এবং তার নাম রাখেন ফিরোজাবাদ।

২৫. সুলতান গিয়াস-উদ-দীন বাহাদুর (১৩২২–১৩২৮ সাল)

সুলতান শামস-উদ-দীন ফিরোজ শাহ্‌র রাজত্বের শেষ দিক এবং তাঁর মৃত্যুর পর সুলতান গিয়াস-উদ-দীন বাহাদুরের রাজত্বকালের বিবরণী নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে

যথেষ্ট মতান্তর লক্ষ্য করা যায়। এইসব মতান্তরের প্রধান কারণ হচ্ছে সুলতান শামস-উদ-দীন ফিরোজ শাহ্‌র রাজত্বকালেই তাঁর এবং তাঁর পুত্রদের নামে মুদ্রার প্রচলন। এখানে উল্লেখ্য যে, সুলতান শামস-উদ-দীন ফিরোজ শাহ্‌র ছিল সাত পুত্র এবং পরিণত বয়সে সুলতান বাংলার মসনদে আরোহণ কালে তাঁর ছেলেরাও ছিল বেশ বয়স্ক। দেখা যায়, সুলতান শামস-উদ-দীন ফিরোজ শাহ্‌র রাজত্বকালেই তাঁর পুত্র জালাল-উদ-দীন মাহমুদ, শিহাব-উদ-দীন বুগদা ও গিয়াস-উদ-দীন বাহাদুর লাখনৌতি টাকশাল থেকে নিজ নিজ নামে মুদ্রা প্রচলন করেছেন। তাতে করে কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন যে, সুলতান ফিরোজের বিরুদ্ধে তাঁর পুত্রগণ বিদ্রোহ করেছিল। এ সম্পর্কে ডক্টর কানুনগোর মতামত সমর্থন করে ডক্টর আবদুল করিম বলেন, "ডঃ কানুনগো ঠিকই বলিয়াছেন যে, ফীরূজ শাহ্ বেশী বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন। ঐ সময়ে তাঁহার কয়েকজন বয়স্ক ছেলে ছিল। সুলতান তাঁহার উপযুক্ত ছেলেদের এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ অফিসারদের সাহায্যে রাজ্যের সীমা বৃদ্ধি করেন। তাই মনে হয় সুলতান পুত্রদিগকে মুদ্রা প্রচলন করার মত রাজকীয় ক্ষমতা ব্যবহারের সুযোগ দেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিলে বলিতে হয় যে, ফিরূজ শাহের পুত্রগণ কর্তৃক মুদ্রা প্রচলন্ তাহাদের বিদ্রোহের ফল নয়, বরং পিতা কর্তৃক পুত্রদের সঙ্গে ক্ষমতা ও অধিকার ভাগাভাগির ফল। পিতা এবং পুত্রদের সমবেত প্রচেষ্টায় লাখনৌতির মুসলিম রাজ্য অধিকতর শক্তিশালী হইয়া উঠে এবং চারিদিকে মুসলিম রাজ্য বিস্তৃতি লাভ করে।"৭

সুলতান ফিরোজ শাহ্‌র মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র গিয়াস উদ্দীন বাহাদুরও লাখনৌতির স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীন রাখেন। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পথে, মনে হয়, সুলতান গিয়াস-উ়দ-দীন বাহাদুর তাঁর অন্যান্য ভাইকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়ে নিজের পথ পরিষ্কার করে নেন। কিন্তু তাঁর কনিষ্ঠ ভাই নাসির-উদ-দীন ইবরাহীম জীবিত থেকে বাহাদুরের বিরুদ্ধে দিল্লীর সুলতান গিয়াস-উদ-দীন তুগলকের সাহায্য প্রার্থনা করেন। হৃষ্টচিত্তে দিল্লীর সুলতান এই সুযোগ গ্রহণ করেন। যুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে। বাংলার সুলতান বীরবিক্রমে যুদ্ধ করে প্রথমে দিল্লী বাহিনীকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলেন। কিন্তু পরে দিল্লী বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণে বাংলার সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। সুলতান বাহাদুর পশ্চাদপসরণের সিদ্ধান্ত নেন। কথিত আছে, হারেমের মহিলাদের সঙ্গে নিয়ে পূর্ববঙ্গের দিকে পলায়নের পথে একটি নদী পার হওয়ার সময় সুলতান বাহাদুরের সওয়ারী বালিতে আটকে যায়। ফলে বাহাদুর শত্রুদের হাতে বন্দী হন। অতঃপর লাখনৌতি অধিকার করেন সুলতান গিয়াস-উদ-দীন তুগলক। যেখানে কিছু দিন থেকে রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থা পুনর্গঠন করেন। বাংলাকে তিনি তিনটি শাসন বিভাগে বিভক্ত

---

৭. ডক্টর আবদুল করিম, বাংলার ইতিহাস, সুলতানী আমল, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭, পৃ. ১৭৩।

করেন–লাখনৌতি, সাতগাঁও ও সোনারগাঁও। নাসির-উদ-দীন ইবরাহীমকে লাখনৌতির এবং বাহ্‌রাম খানকে সাতগাঁও ও সোনারগাঁও–এর শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। অতঃপর সুলতান তুগলক বন্দী বাহাদুরকে সঙ্গে নিয়ে দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করেন। কিন্তু দিল্লী পৌঁছার আগেই দিল্লী থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত আফগানপুরে এক অস্বাভাবিক দুর্ঘটনায় সুলতান গিয়াস-উদ-দীন তুগলকের মৃত্যু হয়। দিল্লীর মসনদে সমাসীন হন সুলতান–পুত্র সুলতান মুহম্মদ বিন তুগলক।

মসনদে আরোহণের পরেই নতুন সুলতান বাংলার শাসন ব্যবস্থায় ব্যাপক রদবদল সাধন করেন। সুলতান মুহাম্মদ বিন তুগলক ছিলেন খুবই ধুরন্ধর এক শাসক; কাউকেই তিনি পুরোপুরি বিশ্বাস করতেন না। গিয়াস-উদ-দীন বাহাদুরকে তিনি মুক্তি দিলেন এবং বাহ্‌রাম খানের সঙ্গে যুগ্ম-শাসনকর্তা নিযুক্ত করে সোনারগাঁও-এ পাঠিয়ে দিলেন। শর্ত থাকল, গিয়াস-উদ-দীন বাহদুর সোনারগাঁও-এ দিল্লী সুলতানের নামে মুদ্রা প্রচলন করবেন এবং খোতবা পাঠ করবেন। তদুপরি বাহাদুর তাঁর ছেলে মুহম্মদকে দিল্লীর দরবারে পঠিয়ে দেবেন। অন্যদিকে, সুলতান মুহম্মদ বিন তুগলক লাখনৌতি থেকে নাসির-উদ-দীন ইবরাহীমকে নিয়ে এলেন দিল্লীতে এবং মালিক পিন্দর খিলজীকে কদর খান উপাধি দিয়ে লাখনৌতির শাসনকর্তা করে পাঠালেন; এবং লাখনৌতিতে মুস্তৌফী বা হিসাব-রক্ষক নিযুক্ত করে পাঠালেন মালিক আবু রাজাকে। সাতগাঁও-এর শাসনকর্তা থাকলেন মালিক ইয্‌য্‌-উদ-দীন ইয়াহিয়া, তাঁর উপাধি হলো আযম-উল-মুল্‌ক। এভাবেই সাজানো হলো বাংলার শাসন ব্যবস্থা। দিল্লীর সুলতান নিশ্চয়ই ভেবেছিলেন, এতে করে বাংলার বিদ্রোহ-সম্ভাবনা দূর হয়ে গেল। কিন্তু আবার তাতে বাদ সাধলেন সোনারগাঁও-এর যুগ্ম শাসনকর্তা গিয়াস-উদ-দীন বাহাদুর। শর্তানুযায়ী নিজ পুত্রকে তো দিল্লীতে পাঠালেনই না, অধিকন্তু দিল্লীর চাপের মুখে তিনি আবার বাংলায় ওড়ালেন স্বাধীনতার পতাকা। এবার বাহাদুরকে দমন করতে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন বাহ্‌রাম খান। শেষতক সুলতান গিয়াস-উদ-দীন বাহাদুরকে পরাজিত ও হত্যা করে বাহ্‌রাম খান দিল্লীতে এই সুখবর পাঠান। সুলতান বাহাদুরের স্বাধীনতা প্রয়াসের সমাপ্তি ঘটে ১৩২৭-২৮ সালে।

২৬ ক. বাহ্‌রাম খান (১৩২৮-১৩৩৮ সাল)

এখানে পুনরাবৃত্তি করা যেতে পারে যে, বাহ্‌রাম খান ১৩২২ সাল থেকেই গিয়াস-উদ-দীন বাহাদুরের জটিলতার সময়ে সোনারগাঁও ও সাতগাঁও-এর শাসনকর্তা হিসাবে কাজ করছিলেন। তারপর কিছুদিন গিয়াস-উদ-দীন বাহাদুরের সঙ্গে যুগ্মভাবে সোনারগাঁও-এর শাসনকর্তা এবং ১৩২৮ সালের দিকে বাহাদুরের পরাজয় ও মৃত্যুর পর এককভাবেই সোনারগাঁও-এর শাসনকর্তা থাকেন প্রায় দশ বছর, ১৩২৮ সাল থেকে ১৩৩৮ সাল পর্যন্ত। ১৩৩৮ সালে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

২৬ খ. মালিক ইয্য-উদ-দীন ইয়াহিয়া (১৩২৫-১৩৩৮ সাল)

১৩২৫ সালে সুলতান গিয়াস-উদ-দীন তুগলকের মৃত্যুর পর সুলতান মুহম্মদ বিন তুগলক মালিক ইয্যুদ-উদদীন ইয়াহিয়াকে সাতগাঁও-এর শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন; তাঁর উপাধি হয় আযম-উল-মুল্‌ক্‌। ১৩৩৮ সাল পর্যন্ত তিনি ওই পদে সমাসীন ছিলেন।

২৬ গ. কদর খান (১৩২৫-১৩৩৮ সাল)

দিল্লীর নতুন সুলতান মুহম্মদ বিন তুগলকের বাংলার শাসন ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাসের সুবাদে লাখনৌতি শাসনের দায়িত্ব ন্যস্ত হয় কদর খানের উপর। কদর খান হচ্ছে উপাধি, প্রকৃত নাম মালিক পিন্দর খিলজী।

ওদিকে বিচিত্র-চরিত্র সুলতান মুহম্মদ বিন তুগলকের হাতে পড়ে দিল্লী সালতানাতের অবস্থাও খুব নড়বড়ে হয়ে পড়ে। ১৩২৫ সাল থেকে ১৩৩৫ সাল পর্যন্ত মুহম্মদ বিন তুগলকের শাসনকালে সালতানাতের অবস্থা বেশ ভালই ছিল। ওই সময়ে সুলতান অনেক পরিকল্পনা করেন, কিন্তু সেসব পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ১৩৩৫ সালের পরে সাম্রাজ্যের নানা অংশে গোলযোগ দেখা দেয়। বিদ্রোহের পর বিদ্রোহ সংঘটিত হতে থাকে । আর সেসব বিদ্রোহ দমনের জন্য সুলতানকে ছুটে যেতে হয় স্থান থেকে স্থানান্তরে। কিন্তু বাংলার অবস্থা তখন শান্ত। বাংলার তিনটি বিভাগে ১৩৩৫ সাল থেকে ১৩৩৮ সাল পর্যন্ত এই তিন বছর শাসনকর্তাগণ নির্বিঘ্নে শাসন পরিচালনা করেন। কিন্তু ১৩৩৮ সাল থেকে বাংলার পরিস্থিতি হঠাৎ করেই বদলে যায়। ১৩৫১ সালে মৃত্যুমুখে পতিত হন দিল্লীর সুলতান মুহাম্মদ বিন তুগলক। ১৩৩৫ সালের পরে তাঁর রাজত্বের পুরো সময়টাই ছিল সুলতানের জন্য চরম দুরবস্থার সময়। তাঁর সাম্রাজ্যময় নানা দুর্বিপাক–খরা, দুর্ভিক্ষ, বিদ্রোহ। সুদূর এই বাংলায় তখন স্বাধীনতার স্পৃহা তুঙ্গে অবস্থিত। একের পর এক তিনটি বিভাগ–সোনারগাঁও, লাখনৌতি, সাতগাঁও-এ উড্ডীন হয় স্বাধীনতার পতাকা। তারপর ১৩৫২ সালে রূপলাভ করে একীভূত স্বাধীন 'বাঙ্গালা'।

এর আগেও অবিশ্যি কোন কোন সময় বাংলার শাসনকর্তাগণ স্বাধীনতা ঘোষণা করে স্বাধীন সুলতান হিসাবেই দেশ শাসন করছেন। আবার ঘটনাচক্রে দিল্লী সালতানাতের অধীনতা বরণ করেছেন। পূর্বেকার শাসনকর্তাদের মধ্যে স্বাধীন সুলতান হিসাবে লাখনৌতি রাজ্য শাসন করেছেন যাঁরা, তাঁদের মধ্যে ছিলেন আলি মর্দান খিলজী, হুসাম-উদ-দীন ইওজ খিলজী, মুগীস-উদ-দীন তুগরল, নাসির-উদ-দীন মাহমুদ বুগরা খান, রুকন-উদ-দীন কায়কাউস, শামস-উদ-দীন ফিরোজ শাহ্‌ দেহ্‌লবী এবং গিয়াস-উদ-দীন বাহাদুর। এই স্বাধীনতার পতাকা সময়ে আবার ধূলায় বিলুণ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু ১৩৩৮ সাল থেকে যে স্বাধীনতার আরম্ভ তার স্থায়িত্ব কাল ছিল পুরো দু'শ' বছর।

এই দু'শ' বছরের ইতিহাস বাংলার ইতিহাসে এক গৌরবময় অধ্যায়ের ইতিহাস। "এই সময়ে বাংলার সুলতানরা নিজেদের যোগ্যতা, শক্তি ও ঐশ্বর্যের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ নৃপতিদের অন্যতম হয়ে উঠেছিলেন। শুধু তাই নয়, তাঁরা দেশের আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থা পরিচালনায় এবং রাজার নানা কর্তব্য পালনেও অপরিসীম দক্ষতা দেখিয়ে গিয়েছেন। তার ফলে তাঁরা বাংলার জনসাধারণের আস্থা ও ভালবাসা অর্জন করেছিলেন।[৮]

(গ) প্রাক-স্বাধীন বাংলায় ইসলাম ও বাংলা ভাষা

সুপ্রাচীন দেশ এই বাংলা। 'মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য' শীর্ষক গ্রন্থের প্রণেতা ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের বক্তব্যানুসারে ঋগ্বেদের আনুমানিক কাল খ্রিস্টপূর্ব তিন হাজার বছর) শাখা 'ঐতরেয় আরণ্যকে' গ্রন্থে 'বঙ্গ' নামে এই দেশের উল্লেখ রয়েছে। এখন থেকে আরম্ভ করে খ্রিস্টীয় সপ্ত শতাব্দী পর্যন্ত প্রাচীন 'বঙ্গ', 'পুণ্ড্র', 'গৌড়', 'রাঢ়', 'সুহ্ম', 'ব্রহ্ম', 'তাম্রলিপ্ত', 'সমতট' প্রভৃতি জনপদে বিভক্ত ছিল। খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে রাজা শশাঙ্ক কর্তৃক এই জনপদগুলিকে 'গৌড়' নামে একতাবদ্ধ করার প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। শশাঙ্কের পর থেকে 'পুণ্ড্র', 'গৌড়', ও 'বঙ্গ' – এই তিন জনপদ যেন বাংলার সমার্থক হয়ে ওঠে। 'বঙ্গ' নামে বাংলার বিভিন্ন জনপদকে একতাবদ্ধ করার কাজ হিন্দু আমলে যে সাধিত হয় নাই, তা একরূপ সর্বস্বীকৃত অভিমত। এই কাজ সাধিত হয়েছিল মুসলিম শাসনামলে।

এদেশে তুর্কী শাসনামলে এর সূত্রপাত হয় এবং মুঘল শাসনামলে আকবরের রাজত্বকালে এর পূর্ণ পরিণতি ঘটে। সম্রাট আকবরের সময়েই সমগ্র বঙ্গদেশ 'সুবাহ্-ই বাঙ্গালাহ্' নামে পরিচিত হয়। ইংরেজ শাসনকালে এসে বিহার-উড়িষ্যাসহ বাঙ্গালার বিশাল আয়তন কিছুটা খর্বীকৃত হয়ে বেঙ্গল বা বাংলা নামে অভিহিত হয়। অতএব, যে বাংলাকে আমরা নিজেদের দেশ বলে গণ্য করি, বস্তুত তার সৃষ্টি-কৃতিত্ব মুসলমানদেরই প্রাপ্য।

এ প্রসঙ্গে 'বাংলা' নামের উৎপত্তির কথাও জেনে রাখা ভাল। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে আরম্ভ করে রাজা শশাঙ্কের (খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দী) সময় অবধি বাংলা যে বিভক্ত ছিল 'বঙ্গ', 'গৌড়', 'রাঢ়', 'পুণ্ড্র' প্রভৃতি জনপদে, তা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এই সমস্ত জনপদের অধিকাংশের নাম যে স্থানজ্ঞাপক না হয়ে গোষ্ঠী জ্ঞাপক ছিল, তা জানতে পারা যায় প্রাচীনতম সংস্কৃত সাহিত্যের একাধিক সাক্ষ্য থেকে। এই সমস্ত সংস্কৃত সাহিত্যে 'বঙ্গাঃ', 'গৌড়াঃ', 'রাঢ়াঃ', 'পুণ্ড্রাঃ' প্রভৃতি গোষ্ঠীবাচক বহুবচন শব্দ দেশ জ্ঞাপনার্থে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। একথা সর্ববাদীসম্মত যে, 'বঙ্গা' অর্থে

'বঙ্গজনাঃ' 'গৌড়াঃ' অর্থে 'গৌড়াজনাঃ' ইত্যাদি বুঝায়। এখন বিবেচ্য, যে অঞ্চলে 'বঙ্গ'-গোষ্ঠীর মানুষ বসবাস করত, তাই তখন 'বঙ্গ' নামে পরিচিত ছিল। সুতরাং, সংস্কৃত ভাষার 'বঙ্গ' শব্দ মূলতঃ 'বং' বা 'বঙ' গোষ্ঠীর নাম। এই 'বং'-গোষ্ঠীর নাম থেকেই 'বাংলা', 'বাঙ্‌লা', 'বাঙ্গলা', 'বাঙ্গালা' প্রভৃতি শব্দের উৎপত্তি। 'আইন-ই-আকবরী'তে আবুল ফজল 'বাংলা' শব্দের যে ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করেছেন, নানা কারণে তা-ই সঠিক ও যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়। তাঁর মতে 'বং' শব্দের সঙ্গে তদ্‌ভব 'আল্'' {সংস্কৃত 'আলি' (অল+ইন, ক); এই 'আলি' শব্দ স্বরতাত্ত্বিক নীতিতে 'ই'-স্বরের অপিনিহিত অবস্থায় 'আইল' রূপে পূর্ববঙ্গে এখনও বিদ্যমান}শব্দ যুক্ত হয়ে 'বংগাল্' শব্দের সৃষ্টি হয়েছে। ফারসী ঢঙে দেশ বুঝবার জন্য এই 'বংগাল্' শব্দ 'বন্‌গালহ্' হয়ে (যেমন– মুল্‌ক্-ই-বন্‌গালহ্) এখন 'বাংলা' রূপে ব্যবহৃত হয়। এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে আল<সংস্কৃত 'আলি' (জমিতে জল বেঁধে রাখার জন্য বাঁধ) দিয়ে বাঁধা 'বং'-গোষ্ঠীর বাসভূমি। প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার ফলে বেশ যুক্তিযুক্তভাবেই প্রমাণিত হয়েছে যে, 'বং'-গোষ্ঠীভুক্ত মানুষের বাসভূমি বাংলা বর্তমান ভাগীরথী (প্রাচীন গঙ্গার বঙ্গবাহিনী ধারা) নদীর পূর্বতীর থেকে আরম্ভ করে আসামের পশ্চিমাঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই বিশাল অঞ্চলই খর্বীকৃত হয়ে কিছুদিন আগেকার 'পূর্ব-বাংলা' বা 'পূর্ব-পাকিস্তান' এবং পরে 'বাংলাদেশ' গঠিত হয়েছে।

প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে আরম্ভ করে মুসলিম অধিকারের পূর্ব পর্যন্ত – এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যেই বাংলা ভাষা ও বাঙালী জনসমষ্টির মূল কাঠামো গড়ে ওঠে। এই সময়ের বঙ্গদেশ ছিল এক বিশাল ভূ-ভাগ। এর সীমা বর্তমান আরাকানের পশ্চিম ভাগ এবং উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ থেকে দক্ষিণে সমুদ্রবিধৌত সমগ্র অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

নৃতাত্ত্বিক বিচারে এরূপ প্রমাণিত হয়েছে যে, এই বিশার ভূখণ্ডের জনসমষ্টি প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রধানতঃ আদি-অস্ট্রেলীয় (Proto-Australoid) ও আলপাইনীয় (Alpinus), এই দুই প্রধান জনসমষ্টির সংমিশ্রণ।

উক্ত দুই জনসমষ্টির সঙ্গে প্রাগৈতিহাসিক যুগেই মঙ্গোলীয় জনসমষ্টিভুক্ত মানুষের রক্তেরও সংমিশ্রণ ঘটেছিল। বাংলার কোচ, পলিয়া, রাজবংশী, বাক্‌মা, জুমিয়া প্রভৃতি মঙ্গোলীয় জনসমষ্টিভুক্ত মানুষ। এখনও তাদের সংখ্যা বাংলায় খুব কম নয়।

এরপর খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকের দিকে বাঙালীর রক্তে এক নতুন মানব-গোষ্ঠীর রক্ত মিশতে থাকে। তখন থেকে বাংলায় আসতে থাকে সেমীয় (Semetic) গোত্রের লোক। খলীফা হারুনুর রশীদের (৭৮৬-৮০৯ খ্রিঃ) একটি মুদ্রা রাজশাহী জেলার পাহাড়পুরে আবিষ্কৃত হয়ে এই তথ্য প্রকাশ করে দিয়েছে। দেখা যায়, সেমীয় গোত্রের আরবেরা বাংলায় ধর্ম (ইসলাম) ও পণ্য প্রচার বিক্রয় করে বেড়াচ্ছেন; আমীর বা সুলতানের অধীনে চট্টগ্রাম অঞ্চলে স্থাপিত হয়েছে তাদের একটা ক্ষুদ্র শাসিতাঞ্চল

(Principality)। সুলতান বায়িজীদ বিস্তামী (মৃত্যু ৮৭৪ খ্রিঃ), মীর সৈয়দ সুলতান মাহমুদ মাহী-সওয়ার (১০৪৭ খ্রিঃ), শাহ্ মুহম্মদ সুলতান রুমী (১০৫৩ খ্রিঃ), বাবা আদম শহীদ (১১১৯ খ্রিঃ), শাহ্ নিয়ামতুল্লাহ্ বুৎশিকন্ প্রভৃতি দরবেশ বাংলায় ধর্ম (ইসলাম) প্রচার করছেন।

সেমীয় গোত্রের লোককে অনুসরণ করে আফ্রিকার নেগ্রিটো-রক্তবাহী হাবশীরাও অতঃপর এদেশে প্রবেশ করে। খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতকে জনকয়েক হাবশী সুলতান বাংলায় রাজত্বও করেন। দিল্লী ও আগরার অনুকরণে এদেশে হাবশী প্রহরী রাখার প্রথা চালু হয়েছিল খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতকেরও বহু আগে। তারাও বাঙালী রক্তের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে নেগ্রিটো রক্ত। ফলে বাঙালীদের মধ্যে এখনও ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, প্রশস্ত নাসা, কোঁকড়া চুল ও পুরু উল্টা ঠোঁটের মানুষ দেখে নেগ্রিটো রক্তের কথা মনে পড়ে।

নৃতাত্ত্বিক পরিভাষার কথা ছেড়ে দিয়ে সহজভাবে ভাবতে গেলেও স্বীকার করতে হয়– আধুনিক বাঙালী অনার্য, আর্য, মঙ্গোলীয়, সেমীয়, নিগ্রো প্রভৃতি নানা গোত্রভুক্ত মানুষের রক্ত মিশ্রণজাত এক বিচিত্র জনসমষ্টি। এই বিচিত্র সঙ্কর জনসমষ্টির ভাষার আধুনিক নাম 'বাংলা' – বাংলা ভাষা।

বাংলা ভাষা

এক সঙ্কর জনসমষ্টি 'বাঙালী'র মৌখিক ও লৈখিক ভাষা-রূপের আধুনিক নাম 'বাংলা ভাষা'। আধুনিক বাঙালীর পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা যেমন করে বাঙালীর উৎপত্তি নির্ণয় করা হয়েছে, আধুনিক বাংলা ভাষার বৈজ্ঞানিক বিচার-বিশ্লেষণ করে তেমন করেই এ ভাষার ব্যুৎপত্তি ও উৎপত্তি নির্ণীত হয়েছে। ফলে, এ কথা আজ স্পষ্ট যে বাঙালীর রক্ত-সম্পর্কের মতই তার ভাষা-সাঙ্কর্যও একটি বৈশিষ্ট্য।

বর্তমান বাংলা ভাষা প্রচলিত হওয়ার পূর্বে বাংলায় কোন্ ভাষারূপ প্রচলিত ছিল, তার কোন মুখ্য বা প্রত্যক্ষ প্রমাণ না পাওয়া গেলেও গৌণ বা পরোক্ষ প্রমাণের অভাব নেই। ডক্টর হকের মতে, খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকে রচিত 'আর্যমঞ্জুশ্রী মূলকল্প' নামক সংস্কৃত গ্রন্থে দেখা যায়, গৌড় ও পুণ্ড্রের লোকেরা 'অসুর ভাষা'-ভাষী (অসুরাণাং ভবেৎ বাচা-গৌড়-পুণ্ড্রোদ্ভবা সদা)। তখন 'গৌড়' বলতে পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ বঙ্গকে এবং 'পুণ্ড্র' বলতে' উত্তর বঙ্গ ও উত্তর-পশ্চিম আসামকে বুঝাত। সুতরাং 'অসুর-ভাষা'-ভাষী লোকেরা আসামের কিয়দাংশ নিয়ে সমগ্র প্রাচীন বঙ্গের লোক। এখনও কোল-মুণ্ডা-গোষ্ঠীর বুলির মধ্যে 'অসুর' বুলি অন্যতম। সুতরাং, 'অসুর-ভাষা'যে 'অস্ট্রিক'-বুলি, তা সহজেই বুঝতে পারা যায়। বর্তমান বাংলা ভাষা প্রচলিত হওয়ার পূর্বে আমাদের দেশে যে এই 'অসুর ভাষা' বা 'অস্ট্রিক'-বুলি প্রচলিত ছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই 'অসুর ভাষা' বা 'অস্ট্রিক'-বুলির কিছু শব্দ ও বাক্রীতি এখনও আমরা বাংলা ভাষায় ব্যবহার করি; যথা–

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত শব্দ	অস্ট্রিক গোষ্ঠীর ভাষায় ব্যবহৃত শব্দ
কুড়ি (‘বিশ’ অর্থে’)	দ্রবিড়–‘কুড়ি’
পন (‘চারি’ অর্থে)	সাঁওতালি – ‘উপুন’, ‘পুন’ বা ‘পন’
গণ্ডা (‘চারি’ অর্থে)	দ্রবিড় – ‘গণ্ড’
বঙ্গ (দেশের নাম)	দ্রবিড়– ‘বং’ (গোষ্ঠীর নাম)
ঢেঁকি (দান ভানার যন্ত্র)	মুণ্ডা – ‘ঢেঙ্কি’
মোটা (‘স্থূল’ অর্থে)	মুণ্ডা – ‘মোটো’
দা (‘দহ’ অর্থে)	কোল – ‘দা’ বা ‘দাক’ (‘জল’ অর্থে)
পপোতাক্ষ (নদীর নাম)	কোল– ‘কবদাক’ (সংস্কৃত ‘কপোতাক্ষ’)
দামোদর (নদীর নাম)	কোল– ‘দামদাক’
পোদ (নিম্নশ্রেণী হিন্দুর উপাধি)	দ্রবিড় – ‘পুণ্ড্র’

এতদ্ব্যতীত, কিছু কিছু বাংলা বাক্‌রীতি (যেমন– ‘চার’ সংখ্যার এক মান কিংবা ‘কুড়ি’ সংখ্যার এক মান ধরে গণনার রীতি), শব্দ রচনা (যেমন– ঝাঁ-ঝাঁ, খাঁ-খাঁ প্রভৃতির ন্যায় ধ্বন্যাত্মক শব্দ) ও ব্যাকরণ ব্যবস্থা (যেমন– নানা অর্থে দ্বিরুক্তির ব্যবহার) প্রভৃতিও বাংলা ভাষায় অনার্য প্রভাবসূচক। বাংলার হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে আজও কিছু কিছু অনার্য আচার-ব্যবহার প্রচলিত আছে।

এ প্রসঙ্গে বিশেষ লক্ষণীয় এই যে, বাংলা ভাষায় বিদেশী (অর্থাৎ আরবী, ফারসী, পর্তুগীজ, ইংরেজি প্রভৃতি) শব্দের সংখ্যা শতকরা মোট ৮ আট। অবশ্য খাস সংস্কৃত শব্দের সংখ্যা শতকরা ২৫ পঁচিশ থেকে ৩০ ত্রিশের বেশি নয়; বাকিগুলো প্রাকৃত বা অপভ্রংশ। কি করে যে প্রাচীন বাংলার ‘অসুর ভাষা’ এমনভাবে তলিয়ে গেল, সে ইতিহাস স্পষ্টভাবে পাওয়া না গেলেও ভাল করেই অনুমান করা যায়।

বগুড়ার মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত শিলালিপিই প্রাচীন বাংলায় আর্য ভাষার একমাত্র অভিজ্ঞান। তা প্রাচীন মাগধী বা প্রাচ্য প্রাকৃতের লক্ষণাক্রান্ত। প্রাচীন ভারতীয় আর্য কথ্যভাষা কালক্রমে ‘প্রাকৃত’ নামে পরিচিত এবং আমরা বর্তমানে যে নানা শ্রেণীর ও ধরনের প্রাকৃতের সন্ধান পাই তা সেই প্রাকৃতেরই ভিন্নতর রূপ। এই ‘প্রাকৃত ভাষা’ মগধে যে রূপ ধারণ করে, তাকে ‘প্রাচ্য প্রাকৃত’ বলা হয়। খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকে দণ্ডী যে ভাষাকে ‘গৌড়ী-প্রাকৃত’ বলে উল্লেখ করেছেন, তা-ই ‘মাগধী প্রাকৃত’ বা প্রাচ্য-প্রাকৃতেরই প্রাচ্যতর রূপ। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভাষাবিদগণ নিঃসন্দেহভাবেই প্রমাণ করেছেন যে, আধুনিক বাংলা ভাষা ‘মাগধী প্রাকৃত’ তথা ‘গৌড়ী প্রাকৃতেরই’ বিবর্তিত

রূপ। তা সে সরাসরিভাবে সংস্কৃত থেকে উদ্ভূত নয়, বর্তমান বাংলা ভাষাই তার প্রধান প্রমাণ।

যে প্রাকৃত ভাষা থেকে সংস্কৃত ভাষার উদ্ভব এবং উর্দু, পাঞ্জাবী, সিন্ধী প্রভৃতি এ উপমহাদেশের উত্তর ও পশ্চিম এলাকাসমূহের যাবতীয় ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ, সেই প্রাকৃতেরই পূর্বীরূপ থেকেই বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ সাধিত হয়েছে। বর্তমান বাংলা ভাষার উপর সংস্কৃতের প্রত্যক্ষ প্রভাব যেমন অত্যন্ত নগণ্য, তেমনই অত্যন্ত আধুনিকও বটে।

বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন

কোন ভাষারই জন্ম-তারিখ সঠিক বলা যায় না; কেননা, দিন-ক্ষণ ঠিক করে কোন ভাষার জন্ম হয় না। ভাষার সৃষ্টি হয় ধীরে ধীরে– কাল, দেশ ও পাত্রগত বিবর্তন-ধারার ক্রমিক অনুসরণে। তাই বাংলা ভাষার জন্ম-তারিখও বলা যায় না। তবে, প্রত্যেক ভাষার একটা সৃজ্যমান কাল থাকে, শতাব্দীর পর শতাব্দী, একটা অতি দীর্ঘ সময় ধরে। খ্রিস্টীয় নবম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে বাংলা ভাষা স্থায়ীরূপ লাভ করেছিল। এই চার শ' বছরই বাংলা ভাষার সৃজ্যমান কাল। বাংলা ভাষার এই সৃজ্যমান অবস্থার সামান্য নমুনা আমাদের হস্তগত হয়েছে। এই নমুনাটুকুর নাম 'চর্যাচর্য-বিনিশ্চয়'; অর্থাৎ জীবনে কি আচরণ করতে হবে আর কি করতে হবে না, তারই এক নির্দেশিকা।

ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ দ্বারা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে, চর্যাপদগুলোর ভাষা সৃজ্যমান কালের বাংলা ভাষা। এসবের ব্যাকরণ-রীতি ও বাক্ভঙ্গি একেবারেই বাংলা। চর্যাপদগুলোতে ব্যবহৃত কিছুসংখ্যক প্রবাদ বাক্যও বাংলা ভাষা ও সাহিত্য অদ্যাবধি চালু আছে। তাছাড়া নদী-নৌকা-খেয়াঘাট-পাটনী প্রভৃতির চিত্র এই পদগুলোতে যেরূপ দেখতে পাওয়া যায়, তাতে নদীমাতৃক বাংলার ছবিই সহজে মনে পড়ে। পদগুলোর অধিকাংশই বাংলার অধিবাসী সাধকের (সিদ্ধার) রচনা, যেগুলোর বিষয়বস্তু স্পষ্টতই ভক্তিমূলক। এসবে কথার তুলিকায় যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে, তা প্রায় হাজার বছরের পূর্বেকার চিত্র হলেও অদ্যাবধি কম উপভোগ্য নয়। যথা–

"উঁচা উঁচা পাবত, তহিঁ বসই শবরী বালী।
মোরঙ্গি পিচ্ছ পরহিণ, গিবত গুঞ্জরী মালী॥
উমত শবরো পাগল শবরো মা কর গুলী গুহারী।
তোহেরি নিঅ ঘরিণী নামে সহজ সুন্দারী
নানা তরুবর মৌলিলরে, গঅণত লাগেলি ডালী।
একেলী শবরী এ বন হিণ্ডই, কর্ণকুণ্ডল বজ্রধারী॥
তিঅ ধাউ খাট পড়িলা শবরো, মহাসুহে সেজি ছাইলা।
শবরো ভুজঙ্গ নৈরামনি দারী, পেম্ম রাতি পোহাইলী॥

আধুনিক বাংলায় পরিবর্তিত

উঁচু উঁচু পর্বত, তায় শবরী বালিকা বাস করে,
সে ময়ুর-পুচ্ছ পরিহিতা, তাহার গলায় গুঞ্জার মালা।
হে উন্মত্ত শবর, পাগল শবর, গোল গোহারি করো না,
তোমার নিজ গৃহিণী সহজ সুন্দরী নামে পরিচিতা।
ওরে! নানা তরুবর মুকুলিত হইল, গগণে তাহাদের ডাল লাগিল;
শবরী বালিকা এই বনে একাকিনী ভ্রমণ করে,
সে কর্ণে কুন্তল ও বজ্রধারিণী।
তিন ধাতুর খাট পড়িল, হে শবর তুমি মহাসুখে শয্যা বিছাইলে,
শবর ভূজঙ্গ (সদৃশ) আর নৈরাত্মা দারা (স্ত্রীতুল্য), উভয়ে
প্রেমে রাত্রি পোহাইল।

পদটির গূঢ়ার্থ যা-ই হউক, এতে পর্ব বাসিনী শবরী-বালিকার যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে, তা আজও কোন পর্বত-বালিকার ছবি বহন করছে। মুকুলিত তরু-সমাকীর্ণ বনানীর শ্যামল প্রচ্ছদপটে শবরী বালিকার এই ছবি কল্পনার চোখে অবলোকন করলে মনে হয়, "বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে।" এমন চিত্র-গৌরবে গরীয়ান পদ 'চর্যাচর্য-বিনিশ্চয়ে' একক নয়।

কিছুসংখ্যক চর্যাপদে শৃঙ্গার বা আদিরসও দেখা যায়। এ রস চিরকালই সাহিত্যে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে মাধুর্য সিঞ্চন করছে। বিশেষতঃ চর্যাপদগুলোর গান। গুঞ্জরী বঙ্গাল, পটমঞ্জরী, বরাড়ী, দেশাখ, ধানশী প্রভৃতি রাগ-রাগিনীতে এগুলো গীত হত। চর্যাপদগুলোর বিষয়বস্তু যা-ই হউক, এগুলো গানের বা সুরের মাধ্যমে শ্রোতার মনে রস পরিবেশন করে এসেছে।

চর্যাপদগুলোর সাহিত্যিক মূল্য আরও এক দিক থেকে সুপ্রতিষ্টিত। সে দিকটি হল – পরবর্তী সাহিত্যে চর্যাপদের প্রভাবের দিক। সে প্রভাব যথেষ্ট ও প্রচুর। এর প্রধান প্রমাণ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'। এ পুস্তক আবিষ্কৃত না হলে চর্যাপদ যে সৃজ্যমান ভাষার যুগে রচিত হয়েছিল, একথা শুধুমাত্র কল্পনার ব্যাপার হয়ে দাঁড়াত।

চর্যাপদগুলোতে কিছু কিছু হেঁয়ালীপূর্ণ কথা ব্যবহৃত হয়েছে। বাংলার আউল, বাউল, মারফতী ও মূর্শিদা গানে হেঁয়ালীপূর্ণ কথায় ভাব প্রকাশের প্রচেষ্টা বিশেষ লক্ষণীয়। একে চর্যার প্রভাব বলে মনে করার কারণ আছে।

বাংলা সাহিত্যে এই যে গানের ধারা প্রবাহিত হল, তা বৈষ্ণব ও শাক্তপদাবলী হতে আরম্ভ করে রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল পর্যন্ত চলে এসেছে। তদুপরি, চর্যাপদগুলো পরবর্তী

বাংলা কবিতায় গঠনের দিকে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে। আমরা দেখি চর্যাপদে ব্যবহৃত ছন্দ পরবর্তীকালে পয়ার ও লাচাড়ি ছন্দে বিবর্তিত হয়েছে। অধিকন্তু, এই গানগুলো অন্ত্যানুপ্রাস ও ভণিতাযুক্ত। চর্যাপদের বহু পরে রচিত বাংলা-ঘেঁষা সংস্কৃত কাব্য 'গীতগোবিন্দ' ব্যতীত আর কোন সংস্কৃত কাব্যে চরণের শেষে অন্ত্যানুপ্রাস ও গানের শেষে ভণিতা নেই। কিন্তু, পরবর্তী যুগের সমস্ত বাংলা কাব্যে চরণের শেষে অন্ত্যানুপ্রাস ও পদের শেষে ভণিতা ব্যবহৃত হয়েছে।

এভাবে চর্যাপদগুলো বাংলা সাহিত্যে একক আসনের অধিকারী। এগুলো আবিষ্কৃত না হলে বাংলা ভাষা একটা ভুঁইফোড় ভাষায় পরিণত হত।

(ঘ) বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্মেষকালের রূপরেখা

স্মর-গরল-খন্ডনং শিরসি মন্ডনম্
দেহি পদ-পল্লব মুদারম্।
জ্বলতি ময়ি দারুণো মদনকদনারুণো–
হরতুতদুপাহিত-বিকারম॥

হে প্রিয়ে! কামবিষবিনাশক তোমার ওই মনোহর পদপল্লব আমার মস্তকে স্থাপন কর। আমার অন্তর দারুণ মদনারুণে জ্বলছে, তোমার চরণ স্পর্শে সে বিকার দূরীভূত হোউক।

মহারাজা লক্ষণসেনের অন্যতম রাজকবি জয়দেব রচিতশ্রীগীত গোবিন্দ থেকে উদ্ধৃতাংশ—সেই বিখ্যাত কবিতাংশ যার মধ্যকার এক চরণ 'দেহি পদপল্লব মুদারম্'। ভোগবিলাসপূর্ণ সেন-রাজসভার মেজাজের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এক মানস প্রকাশ। দেশের একদিকের চিত্র।

অন্যদিকে দেশের আপামর জনসাধারণের কবিরা তাঁদের রচিত চর্যাপদে প্রকাশ করছেন জনগণেরই দুঃখভরা আর্তি ও অভাব-দারিদ্রভরা ঘর-সংসারের দৃশ্যঃ

টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী।
হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী॥
বেঙ্গ সংসার বড় হিল জাঅ।
দুহিল দুধু কি বেন্টে ষামাঅ॥ (চর্যা ঃ ৩৩)

টিলায় আমার ঘর, প্রতিবেশী নেই। হাঁড়ীতে ভাত নেই, নিত্যই ক্ষুধিত (অতিথি)। (অথচ আমার) ব্যাঙের সংসার বেড়েই চলেছে। দোয়ানো দুধ আবার বাঁটে ঢুকে যাচ্ছে (অর্থাৎ যে খাদ্য প্রস্তুত, তাও নিমিষে শেষ হয়ে যাচ্ছে)।

অভাব-ক্ষুধা-বেদনার আক্ষেপ-পীড়িত জীবনের বাস্তব করুণ এক চিত্র এতে পরিস্ফুট। অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ভারত বিদ্যা' বিভাগের অধ্যাপক শ্রী অতীন্দ্র মজুমদার তাঁর রচিত 'চর্যাপদ' গ্রন্থে বলেন, "একদিকে সামাজিক গোঁড়ামি, ঐশ্বর্যবিলাস এবং কামবাসনার সোৎসাহ আতিশয্য, কাব্য-কবিতাগুলোর অধিকাংশই যৌন-কামনাবাসনায় মদির ও মধুর; রাজসভার চরিত্র ও আবহাওয়া চূড়ান্ত লাম্পট্য, চারিত্রিক অবনতি, তরল রুচি ও দেহগত বিলাস এবং ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত দুর্নীতির কলঙ্কে মলিন, ... অন্যদিকে নিদারুণ দারিদ্র্য, ক্ষুধা, অভাব, শোষণ, বর্জন, যন্ত্রণা ও মৃত্যু। .... সমস্ত বাংলা দেশই যেন এই অন্ধকারের সুকঠোর পেষণে মৃত্যুযন্ত্রণায় অভাব-দৈন্য পীড়িত পার্বতীর মতো করুণ কণ্ঠে ক্রন্দন করছে–"গই ভবিত্তি কিল কা হমারী!" গই ভবিত্তি কিল কা হমারী! কি গতি হবে আমার! এমনি এক রাষ্ট্রীয় সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে তের শতকের প্রারম্ভে শুরু হয়েছিল বাংলায় মুসলিম বিজয়।

মুসলিম বিজয়ের আগে এদেশে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের স্বরূপটা কেমন ছিল —এ সম্পর্কে এখানে তুলে ধরছি ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর বক্তব্যঃ "জানি না কত দিন বঙ্গবাণী জন্মিয়া ঘরের কোণে লাজুক বধূটির মত নিরিবিলি বাস করিয়াছিল। সেদিন বাঙ্গালার অতি স্মরণীয় সুপ্রভাত যেদিন সে সাহিত্যের বিস্তীর্ণ আসরে দেখা দিল। বাস্তবিক সেদিন বাঙ্গালীর এক নবযুগের পুণ্যাহ। সেদিন তাহার আকৃতি শুধুই কবিতাময়ী, তাহার প্রতি চরণক্ষেপে বিচিত্র ছন্দের লীলাভঙ্গী, তাহার কণ্ঠে নানা মন-মাতান রাগরাগিনী। প্রথমে উচ্চবর্ণেরা বলিয়া উঠিলেন, 'ভ্রষ্টা, অস্পৃশ্যা'। কিন্তু আবার এমন দিন আসিল, যেদিন ব্রাহ্মণ তাঁহার সংস্কৃত আভিজাত্য ভুলিয়া বঙ্গবাণীর লালিত্যভরা রাঙা পায়ে বিকাইতে চাহিলেন।

যাঁহারা বলিয়াছিলেন– 'অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতানি চ। ভাষায়াং মানবঃ শ্রুত্বা রৌরবং নরকং বৃজেৎ", নিশ্চয় তাঁহারা বাঙ্গালা ভাষাকে আবাহন করিয়া আনেন নাই। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিপক্ষেরাই সনাতন পন্থিগণকে বিমোহিত করিয়া বেদমার্গ হইতে ভ্রষ্ট করিবার জন্যই এই মোহিনী বঙ্গবাণীর সাধনা করিয়াছিল। পরে স্বার্থের খাতিরে লৌকিক দেবতার পূজকেরাও তাহাদের সহিত যোগ দিয়াছিল।

ধর্মের দলাদলিতে লৌকিক ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি বা পুষ্টি পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাসে নূতন কথা নহে। এই ভারতবর্ষেই আমরা দেখিতে পাই ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বৌদ্ধ ধর্মে পালি সাহিত্যের উৎপত্তি। .... নূতন ধর্মপ্রচারকগণ নিজেদের মত সর্বসাধারণের হৃদয়গ্রাহী করিবার জন্য প্রচলিত ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করেন। প্রাচীন দল সাধারণের উপর নিজেদের সাবেক দখল বজায় রাখিবার জন্য চলিত ভাষা ব্যবহার করিতে বাধ্য হয়। এইরূপ প্রতিদ্বন্দ্বী ধর্মের ঘাত-প্রতিঘাতেই বাঙ্গালা সাহিত্যের উৎপত্তি হইয়াছিল।" (বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা, প্রথম খণ্ড, ১৯৫৩, পৃঃ ১-২)।

বাংলায় ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরুত্থানের আগে সহজিয়া বৌদ্ধ তান্ত্রিকগণ তাঁদের মত প্রচার করেন। এ সময়েই বাংলার পশ্চিমাঞ্চলে সদ্ধর্মের ও পূর্বাঞ্চলে নাথ মতবাদের উৎপত্তি হয়। চুরাশিজন সহজিয়া বৌদ্ধাচার্যের মধ্যে মীননাথ, লুয়ীপা, বিরুপা, ধামপা প্রভৃতি কয়েকজন ছিলেন বাঙ্গালী। এঁদের মধ্যে মীননাথকেই 'বঙ্গের আদি কবি' বলে অধিকাংশ পন্ডিতের ধারণা। তাঁর একটি পদ হচ্ছে,ঃ কহন্তি পরমার্থের বাট। কর্ম্মকু রঙ্গ সমাধিক পাট॥ কমল বিকসিল কহিহ্ ন জমরা। কমল মধু পিবিবি ধোকে ন ভমরা॥

মীননাথের অভ্যুদয়কাল সম্পর্কে অধ্যাপক সিলভঁা লেভী সপ্তম শতক নির্দেশ করেছেন এবং এটাই গ্রহণীয় হয়েছে পণ্ডিতদের দ্বারা। তাহলে ওই সময়কার লৌকিক ভাষার একটা নমুনা উপরোক্ত মীননাথের পদটি থেকে পাওয়া যাচ্ছে। তখনকার লোকভাষার আরও নমুনা পাওয়া যায় ডাক ও খনার বচন থেকে। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ একটি ডাকের বচনে সে সময়কার ভাষার নমুনা দিয়েছেনঃ "বর সুণ গোহালী কিমু দুঠ্য বলঙ্গে"-আজকের বাংলায় তা দাঁড়ায় "শূন্য গোয়াল ভাল, দুষ্ট গরু ভাল নয়।" ওইসব বচনে ব্যবহৃত ভাষা এবং চর্যাপদের ভাষা হচ্ছে আজকের বাংলা ভাষার পূর্বরূপ সৃজ্যমানকালের ভাষা। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের কথায়, "খ্রীস্টীয় নবম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে বাংলা ভাষা স্থায়ী রূপ লাভ করিয়াছিল। এই চারিশত বৎসরই বাংলা ভাষার সৃজ্যমানকাল। এই সময়কার একেবারেই গোড়ার দিকে বঙ্গদেশে 'সংস্কৃত' ছাড়া আরও দুইটি ভাষা প্রচলিত ছিল — তাহার একটি 'সৌরসেনী-প্রাকৃত' বা 'সৌরসেনী-অপভ্রংশ' আর একটি 'মাগধী-প্রাকৃত' বা 'মাগধী অপভ্রংশ'। এই 'মাগধী-অপভ্রংশেরই' বিবর্তিত রূপ 'বাংলা ভাষা'। ..... ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ দ্বারা নিঃসন্দেহভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে, চর্যাপদগুলোর ভাষা সৃজ্যমানকালের বাংলা ভাষা।" (মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য, ১৯৫৭, পৃঃ ৮)।

এসব মতামত থেকে আমরা মুসলিমদের বাংলা বিজয়ারম্ভের প্রাক্কালে এদেশের লৌকিক ভাষার নমুনা সম্পর্কে অবহিত হচ্ছি। অতঃপর এদেশে আরম্ভ হয়েছে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার হাতবদল— ব্রাহ্মণ্যবাদী শাসনের পরিবর্তে মুসলিম শাসন। ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই পরিবর্তনের ফলে, ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের কথায়, "১২০৩ খ্রীস্টাব্দেই তুর্কী বীর ইখ্‌তিয়ারু-দ্-দীন মুহম্মদ বখ্‌তিয়ার খল্‌জী হিন্দু রাজা লক্ষ্মণ সেনকে লখ্‌নৌতী হইতে বিতাড়িত করিয়া, বাংলায় সংস্কৃত চর্চার মূলে কুঠারাঘাত হানিয়া, বাংলা চর্চার পথ উন্মুক্ত করেন।" (প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩)।

তুর্কী আমলে আরও একটি বিষয়ে সৃজ্যমান কাল এল; সেটা বাংলায় ইসলামী পরিবেশের সৃজ্যমান কাল। বাংলায় মুসলিম বিজয়ারম্ভের বেশকিছু আগে থেকেই যে এদেশে ইসলামের আলো এখানে-ওখানে জ্বলে উঠেছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই আলো জ্বালিয়ে যাচ্ছিলেন আরব-পারসিক বণিক ও ধর্ম প্রচারক দরবেশগণ। রাষ্ট্রীয়

অধিকার লাভের পর এই প্রচারণা আরও জোরদার হয়েছিল নিঃসন্দেহে। ফলে, এদেশে গড়ে উঠছিল একটা ইসলামী পরিবেশ। ডক্টর এনামুল হক বলেন, "এই পরিবেশ শুধু মুসলমানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, এদেশের অমুসলমানেরাও এই আবহাওয়ায় ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতেছিল। এই পরিবেশে রচিত রামাই পন্ডিতের 'শূন্য পুরাণের' অন্তর্গত 'নিরঞ্জনের রুষ্মা' শীর্ষক কবিতাটি এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।.....'নিরঞ্জনের রুষ্মা' নামক অংশটির আভ্যন্তরীণ প্রমাণ হইতেও স্পষ্ট যে, ইহা মুসলমান তুর্কী কর্তৃক বঙ্গ-বিজয়ের পরের, অন্ততঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষের দিকের রচনা। ..... বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী 'সদ্ধর্মী'দের উপর জাজপুর, উড়িষ্যা ও মালদহবাসী বৈদিক ব্রাহ্মণদের অত্যাচারের কাহিনী বর্ণনার সহিত মুসলমানদের জাজপুর প্রবেশ ও ব্রাহ্মণ্য দেব-দেবীদের রাতারাতি ধর্মান্তর গ্রহণের ন্যায় একটি কাল্পনিক চিত্র অংকিত হইয়াছে। .... 'ইসলামী পরিবেশে'র একটা অপরিণত রূপ ইহাতে ফুটিয়া উঠিয়াছে ....।" (প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫-১৬)।

'শূন্য পুরাণ"স্থ 'নিরঞ্জনের রুষ্মা' থেকে একটি উদ্ধৃতাংশ ত্রয়োদশ শতকের শেষের দিককার ভাষার একটা নমুনা ও ইসলামী পরিবেশের কিছুটা ধারণার উপর আলোকপাত করবে ঃ

"ব্রহ্মা হৈল্যা মহামদ বিষ্ণু হৈল্যা পেকাম্বর
আদম্ফ হৈল্যা শুলপাণি।
গণেশ হৈল্যা গাজী কার্তিক হৈল্যা কাজী
ফকির হৈল্যা যথ মুনি॥

....

আপনি চন্ডিকা দেবী তিঁহ হৈল্যা হায়া বিবি
পদ্মাবতী হৈল্যা বিবি নূর।
জথেক দেবতাগণ হয়্যা সবে একমন
প্রবেশ করিলা জাজপুর॥
দেউল দেহারা ভাঙ্গে কাড়্যা ফিড়্যা খাএ রঙ্গে
পাখড় পাখড় বলে বোল।
ধরিআ ধর্ম্মের পাএ রামাঞি পন্ডিত গাএ
ই বড় বিসম গন্ডগোল॥"

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সেই ইসলামী পরিবেশ এদেশে সৃষ্ট হয়েছিল ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে প্রধান ব্যক্তিবর্গের সজ্ঞান প্রয়াসের ফলেই। মানুষের সামগ্রিক উন্নয়ন, আধ্যাত্মিক ও পার্থিব অগ্রগতি এবং বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশের লক্ষে ইসলাম দিয়েছে শিক্ষা ও

জ্ঞান অর্জনের জন্য জোর তাগিদ। দায়িত্বশীল জ্ঞানবান মুসলমানগণ কোরআন হাদীসের অনুজ্ঞাসমূহ মেনে চলবেন— এই-ই তো স্বাভাবিক। এদেশে মুসলিম শাসনামলের প্রাথমিককালে শিক্ষা-সংস্কৃতির অভূতপূর্ব প্রসার ও উন্নতি এই অনুজ্ঞা পালনেরই পুরস্কার। ডক্টর এম, এ, রহিমের কথায়, "মুসলমানরা খেলাফত যুগের খ্যাতনামা পূর্বসূরীদের নিকট থেকে একটি মূল্যবান শিক্ষা পদ্ধতি ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করে। যেখানেই তারা গিয়েছে, সেখানেই তারা শিক্ষা ও জ্ঞানের ঐতিহ্য বহন করে নিয়ে গেছে"। এই ঐতিহ্য নিয়েই মুসলমানরা এসেছিল ভারতবর্ষে, এসেছিল বাংলায়।

প্রকৃত প্রস্তাবে মসজিদই ছিল মুসলমানদের যাবতীয় ক্রিয়াকাণ্ডের মূল কেন্দ্র; আল্লাহ্‌র এবাদত ছাড়াও মসজিদে থাকত সর্বস্তরের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা। মসজিদের ইমামরা ছিলেন সমাজের সর্বস্বীকৃত বিদ্বান ব্যক্তি। এবং শিক্ষা দানের দায়িত্ব পালনে তাঁদের সঙ্গী হতেন অন্যান্য সুশিক্ষিত আলেম-উলামাগণ। এমনি করে মসজিদকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠত নিম্ন থেকে উচ্চতম স্তর পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ শিক্ষার এক-একটি প্রতিষ্ঠান। প্রাথমিক শিক্ষাদানের জন্য ছিল মক্তব; মসজিদেও মক্তবের ব্যবস্থা থাকত, স্থাপিত হত অন্যত্রও। সেসব মক্তবে শিক্ষা দেওয়া হত কোরআন তেলাওয়াত, প্রারম্ভিক গণিত, ব্যাকরণ, ইতিহাস।

কোন বিখ্যাত আলেম বা জ্ঞানী সাধককে কেন্দ্র করেও গড়ে উঠত এক-একটি উচ্চতর জ্ঞানালয়। তফসীর, হাদীছ, ফিকাহ, সাহিত্য প্রভৃতিতে সম্যক ব্যুৎপত্তি লাভই থাকত সেসব জ্ঞান-কেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের লক্ষ্য; অনেকটা আজকের দিনের একাডেমী বা সেমিনারির মত।

এসব শিক্ষা ব্যবস্থার পাশাপাশি ছিল মাদ্রাসার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা। ডক্টরর মোহর আলীর কথায়, "By the fifth century of Islam madrasas came into existence as parallel institutions of higher education, the most notable example being the Nizamiya Madrasa of Baghdad, founded......in 1065" (History of the Muslims of Bengal, Vol. 1. B, 1985, P. 826). এ. এল. তিবাবীর উদ্ধৃতি দিয়ে ডক্টর আলী আরও বলেন, "The madrasa merely supplemented, but never supplanted, the mosque as an educational institution. Gradually the madrasa acquired in practice a status of 'sanctity' not much inferior to that of the mosque, and teachers and students moved freely from one to the other according to their inclination or needs." (ibid, P. 826). শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে মাদ্রাসা মসজিদ-কেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার স্থলাভিষিক্ত ছিল না, ছিল পরিপূরক মাত্র। তারপর

কালক্রমে মসজিদ মাদ্রাসা এবং অন্যান্য শিক্ষা কেন্দ্রে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের থাকা খাওয়া ও প্রয়োজনীয় আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা করা হত।

ইসলামের এই শিক্ষা ব্যবস্থা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অনুসরণ করে বাংলার মুসলিম শাসনকর্তা ও আমীর-ওমারা ও শেখ-উলামাগণ প্রথম থেকেই দেশের নানা স্থানে প্রতিষ্ঠিত মসজিদ মাদ্রাসার মাধ্যমে শিক্ষা ও জ্ঞান বিস্তারে মনোযোগী হন। তার ফলে এদেশে গড়ে ওঠে নানা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান; এবং সে সবের ব্যয়ভার বহন করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন দেশের নানা স্তরের শাসনকর্তাগণ ও অবস্থাপন্ন ব্যক্তিবর্গ। সূফী-সাধকগণের খানকাগুলোকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে শিক্ষা-কেন্দ্র। রচিত হতে থাকে আরবী ও ফারসী ভাষায় নানাবিধ গ্রন্থ। এখানে উল্লেখ্য যে, অমুসলিম অধ্যুষিত একটি দেশের কর্তৃত্বে প্রতিষ্ঠিত মুসলিম শাসন-কর্তৃপক্ষ স্বাভাবিকভাবেই প্রথমে যুগপৎ একটি ইসলামী সমাজ ও তাকে ভিত্তি করে একটি ইসলামী পরিবেশ গড়ে তুলতে চাইবেন। ওই সময়ে এদেশের মুসলিম সমাজের অধিকাংশই ছিল বহিরাগত। আর তাই এদেশের প্রচলিত ভাষা তখনো তাঁদের মাতৃভাষা হয়ে উঠতে পারেনি। এমনি একটি সমাজের প্রয়োজন মেটাতে আরবী-ফারসী ভাষাতেই গ্রন্থাদি রচিত হত।

ঐতিহাসিক মিনহাজ বলেন যে, লখ্নৌতি রাজ্য প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই ইখতিয়ারু-দ্-দীন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী ও তাঁর আমীরগণ রাজ্য জুড়ে মসজিদ-মাদ্রাসা ও খানকাহ্ নির্মাণ করেন। সুলতান গিয়াস উদ্দিন ইওয়াজ খলজী (১২১২-১২২৭ সাল) লখ্নৌতিতে একটি মসজিদ, একটি মহাবিদ্যালয় এবং একটি সরাইখানা নির্মাণ করেন। উদাহরণ হিসাবে এসব বলা হল। প্রকৃত প্রস্তাবে মুসলিম বিজয়ের আরম্ভকাল থেকেই শিক্ষিত সংস্কৃতিবান একটি অভিজাত শ্রেণী গড়ে তোলার জন্য এবং উলামা সুফী ধর্মপ্রচারকদের সমাগমে রাজধানীকে কেন্দ্র করে ইসলামী সংস্কৃতির পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য আরম্ভ হয়েছিল এক বিপুল আয়োজন। কালক্রমে বাংলার মসনদে উপবেশন করেছেন বিভিন্ন শাসক, বিভিন্ন সুলতান। কিন্তু সবাই ইসলামী সমাজ ও শিক্ষা সংস্কৃতি গড়ে তোলার এ প্রয়াসকে অব্যাহত রেখেছেন। সর্বোপরি এর পেছনে সুফী সাধকদের অবদান তো ছিলই। শেখ শরফ-উদ-দীন আবু তাওয়ামা ছিলেন মুসলিম বাংলার প্রথম যুগের একজন খ্যাতনামা সুফী সাধক ও বিদ্বান ব্যক্তি। সোনারগাঁও-এ তাঁর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি ছিল ওই যুগের এক আলোকোজ্জ্বল জ্ঞান-কেন্দ্র। পাড়ুয়ার সেই বিখ্যাত সূফী সাধক ও সুপণ্ডিত শেখ আলাউল হক তাঁর নির্বাসনের দু'টি বছর সোনারগাঁও-এ কাটান। এখানে তিনি গড়ে তোলেন একটি বিখ্যাত খানকাহ। তাঁর পৌত্র শেখ বদরুল ইসলাম এবং প্রপৌত্র শেখ জাহিদও তাঁদের নির্বাসনকাল কাটান এই সোনারগাঁও-এ। এসব জ্ঞান সাধকের উপস্থিতিতে সোনারগাঁও-এর ইসলামী শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চার উদ্দীপনা অব্যাহত থাকে।

মুসলিম বাংলার দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল সাতগাঁও ছিল শিক্ষা সংস্কৃতির আর একটি প্রসিদ্ধ কেন্দ্র। সাতগাঁও-এর ত্রিবেনীতে দু'টি মাদ্রাসা স্থাপনের উল্লেখ পাওয়া যায়। একটি সুলতান রুকন-উদ-দীন কয়কাউসের রাজত্বকালে ১২৯৩ সালে নির্মিত হয়েছিল; অন্যটি ছিল সুলতান শামস-উদ-দীন ফিরোজ শাহের রাজত্বকালে ১৩১৩ সালে নির্মিত 'দারুল খয়রাত' মাদ্রাসা। এসব মাদ্রাসাকে কেন্দ্র করে সেখানে গড়ে উঠেছিল ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র। বীরভূম জেলার নগোর ছিল আর একটি শিক্ষাকেন্দ্র। এখানে তরুণ বয়সে শিক্ষালাভ করেছিলেন সুলতান গিয়াস-উদ্-দীন আজম শাহ এবং তাঁরই সহপাঠী হিসাবে বিখ্যাত সূফী সাধক শেখ নূর কুতুব-উল-আলম। সুলতান হোসেন শাহ্র আমলে ১৫০২ সালে বাঁকড়া বিষ্ণুপুরের মান্দারনে প্রতিষ্ঠিত হয় একটি মাদ্রাসা। এই মাদ্রাসাকে কেন্দ্র করেও গড়ে উঠেছিল ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির আর একটি কেন্দ্র। এমনি করে বিখ্যাত সব জ্ঞান কেন্দ্র গড়ে ওঠে পান্ডুয়ায়, রাজশাহী জেলার বাথায়, রংপুর, চট্টগ্রাম এবং সিলেটে। ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রসারের প্রভাব হিন্দু সমাজের উপরও পড়েছিল। বলা যায়, মুসলিম শাসনামলেই অব্রাহ্মণ হিন্দু সমাজ বহুদিনের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের পথে এগিয়ে যায়। ব্রাহ্মণ শ্রেণীর জন্য টোল প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি আগেই চালু ছিল। উত্তরবঙ্গে প্রতিষ্ঠিত ছিল একটি সংস্কৃত ভাষাভিত্তিক জ্ঞান-কেন্দ্র। সেখানে মুসলিম শাসনামলে শিক্ষালাভ করেছিলেন কবি কৃত্তিবাস। এই শাসনামলেই নবদ্বীপ হয়ে ওঠে হিন্দুদের জন্য একটি বিখ্যাত সংস্কৃতির জ্ঞান-কেন্দ্র। ব্রাহ্মণ্য-বৌদ্ধ তথা আর্য শাসনামলের বিপরীতে মুসলিম শাসনামলে আরবী-ফারসী ভাষায় সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকাণ্ডের পাশাপাশি বাংলা ভাষায় সাহিত্য কর্ম কি করে শুধুমাত্র প্রশ্রয়ই পেল না, অধিকন্তু শাসন কর্তৃপক্ষের পৃষ্ঠপোষকতাও পেল—এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, মুসলিম শাসনকর্তাগণ তাঁদের বিজিত রাজ্যে স্থায়ী ও শক্তিশালী সরকার প্রতিষ্ঠার মানসে ব্যাপক জনসমর্থনের রাজনৈতিক দিকটা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন বলে ধরে নেয়া যায়। তাঁরা নিশ্চয়ই জানতেন, অধিকাংশ জনসাধারণ ধর্ম শিক্ষা সংস্কৃতির ব্যাপারে আগেকার শাসকদের প্রতি মোটেই খুশী ছিলেন না। অধ্যাপক অতীন্দ্র মজুমদারের কথায়, "গোটা সমাজ তখন তিনটি বৃহৎ প্রাচীরের দ্বারা বিভক্ত— সবার উপরে ব্রাহ্মণ, মাঝে অগণিত শূদ্র পর্যায়ের সাধারণ লোক আর সবার পিছে সবার নীচে সমস্ত রকম সামাজিক অধিকার ও মানবিক মর্যাদা থেকে বঞ্চিত অস্পৃশ্য দীন ও নিরন্তর দুঃখের দাহনে দগ্ধ অন্ত্যজ ও ম্লেচ্ছ সম্প্রদায়। প্রত্যেকটি বর্ণের মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য দূরতিক্রম্য বাধার প্রাচীর। .... এর পরিণতি তাই শেষ পর্যন্ত দাঁড়ালো ব্রাহ্মণ এবং অব্রাহ্মণের মধ্যে একটা গুপ্ত বিরোধ এবং অবিশ্বাস। এই বিরোধ, অবিশ্বাস, ঘৃণা এবং অপমানের ধূমকলঙ্কে মলিন পরিবেশ সেদিন বাঙলার সমাজ জীবনকে ঘোলাটে করে তুলেছিল।" প্রাক-মুসলিম আমলে ধর্ম

শিক্ষা সংস্কৃতির একমাত্র বাহন ছিল সংস্কৃত ভাষা এবং রাজসভার ভাষা হিসাবেও তার ছিল একচ্ছত্র আধিপত্য। দেশের মানুষের মুখের ভাষা ছিল অবহেলিত ও ঘৃণিত। আর সে ভাষা চর্যাপদের আর্তি বাহন করে ততদিনে 'নিরঞ্জনের রুস্মা'র বর্ণনায় বাংলা ভাষায় স্থায়ীরূপ লাভ করেছে। এই বাংলা ভাষাকে মর্যাদাদানের মাধ্যমে বৃহত্তর জনসাধারণের হৃদয় জয় করার ভাবনাটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। তদুপরি, তদানীন্তন বাংলার মুসলিম সমাজের সাধারণ জনগোষ্ঠীর বোধগম্যতার জন্যও আরবী-ফারসীর বদলে নিত্যদিনের ভাষা বাংলায় শিক্ষা ও সাংস্কতিক কর্মাদি সম্পন্ন করার প্রয়োজনীয়তাও দেখা দিয়েছিল। এসব বিবেচনায়ই রাজশক্তির পক্ষ থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জন্য ছিল উদার পৃষ্ঠপোষকতা।

বাংলার মুসলিম শাসনামলকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায়ঃ (১) তের শতকের আরম্ভ থেকে চৌদ্দ শতকের প্রায় মাঝামাঝি পর্যন্ত তুর্কী আমল, (২) মধ্য-চৌদ্দ শতক থেকে ষোল শতকের মধ্যকাল পেরিয়ে স্বাধীন সুলতানী আমল, এবং (৩) ষোল শতকের মধ্যকালের কিছু পর থেকে ইংরেজ শাসনারম্ভের পূর্ব পর্যন্ত মুঘল আমল। এই তিনটি আমলের মধ্যে প্রথম আমলটি রাজ্যের সুপ্রতিষ্ঠায় ও রাজ্য বিস্তারেই শাসন-কর্তৃপক্ষ নিয়োজিত ছিল; এবং রাজ্যের সুপ্রতিষ্ঠার লক্ষেই সচেতনভাবে গড়ে তোলা হয়েছিল ইসলামী সমাজ ও একটা ইসলামী পরিবেশ। তদনুসারী একটা শিক্ষা ব্যবস্থাও গড়ে তোলা হয়েছিল এদেশে। প্রথম আমলে ক্ষেত্র প্রস্তুত হচ্ছিল। কিন্তু সাহিত্য-সংস্কৃতির সত্যিকারের বিকাশ আরম্ভ হয়েছিল দ্বিতীয় আমল অর্থাৎ স্বাধীন সুলতানী আমলে সূচনাকালের কিছু পর থেকেই। এই আমলে ইলিয়াস শাহী বংশ, বিশেষ করে 'পরবর্তী ইলিয়াস শাহী বংশ' এবং হোসেন শাহী বংশের শাসনকালে শিল্প-সাহিত্যের প্রতি সুলতানী পৃষ্ঠপোষকতা ছিল প্রত্যক্ষ। এসব আমলে কবি সাহিত্যিকরা সসম্মানে বরিত হতে থাকেন শাহী দরবারে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, তখন শাহী দরবারের এই পৃষ্ঠপোষকতা ও সম্মান লাভ করে যাঁরা সহিত্য কর্মে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে মুসলিম গুণীজনদের পাশাপাশি হিন্দু গুণীজনেরাও ছিলেন। ফলে, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি হল তার অবদানে উজ্জ্বল হয়ে উঠল বাংলার স্বাধীন সুলতানী আমল। এই আমলে স্মরণীয় ব্যক্তিত্বের মধ্যে রয়েছেন-কৃত্তিবাস, বিজয়গুপ্ত, কবীন্দ্র পরমেশ্বর, ধ্রুবানন্দ, মিশ্র, বৃন্দাবন দাস প্রভৃতি এবং শাহ মুহম্মদ সগীর, শেখ কবীর, জৈনুদ্দিন, সাবিরিদ খান, শেখ ফয়জুল্লাহ্ প্রভৃতি কবি। এসব গুণীজনের অবদানে সুলতানী আমলে ইসলামের মহিমান্বিত মানবিক উদারতার সঞ্জীবনী ধারায় সিক্ত বাংলার মাটিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হল বাংলা ভাষা ও সাহিত্য।

চতুর্থ অধ্যায়

স্বাধীন বাঙ্গালা (১৩৩৮-১৫৩৮ সাল)

(ক) বাঙ্গালায় ভিন্ন ভিন্ন স্বাধীন জনপদ (১৩৩৮-১৩৫২ সাল)

'শেক-শুভোদয়া' গ্রন্থে ধৃত প্রেম-সঙ্গীতটির বাকী অংশ ঃ

(ভাটিয়ালী রাগেণ গীয়তে)
হঙ জুবনী পতিএ হীন।
গঙ্গা সিনায়িবাক জাইএ দিন॥
....
নয়ান বহিঞাঁ পড়ে নীর নিতি।
জীএ ন প্রাণী পালা এ ন ভীতি॥
আশে পাশে স্বাস করে উপহাস।
বিনা বায়ুতেঁ ভাঙ্গে তালের গাছ॥
ভাঙ্গিল তাল লুম্বিল রেখা।
চলি জাহ সখি পলাইল শঙ্কা॥

আমি পতিহীন যুবতী; দিনে গঙ্গায় স্নানার্থে যাইয়া থাকি।...... নয়ন বহিয়া অশ্রু ঝরে, প্রাণ জীবিত থাকিতে চায় না, মন হইতে ভয়ও পলায় না। আশেপাশে (দীর্ঘ) শ্বাস উপহাস করে, বিনা বায়ুতে তালের গাছ ভাঙ্গিয়া যায়। তালের গাছ ভাঙ্গিল, (চিন্তার) রেখা লম্বা হইয়া দেখা দিল। সখি, এইবার চলিয়া যাও, আশঙ্কা পলাইয়া গেল।

সোনারগাঁও

২৭. সুলতান ফখর-উদ-দীন মুবারক শাহ্ (১৩৩৮-১৩৪৯)

১৩৩৮ সালে সোনারগাঁও-এর শাসনকর্তা বাহ্‌রাম খানের মৃত্যুর পর তাঁর সিলাহ্‌দার (বর্ম-রক্ষক) ফখর-উদ-দীন শাসন ক্ষমতা দখল করে সোনারগাঁওকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করেন। সোনারগাঁও রাজ্যের স্বাধীন সুলতান হিসাবে তিনি অভিহিত হন সুলতান ফখর-উদ-দীন মুবারক শাহ্ বলে। দিল্লী সালতানাত তখন সুলতান মুহম্মদ বিন তুগলকের খামখেয়ালিপনার পরিণামে এবং নানা রকম দুর্বিপাকে দুর্বল। কাজেই দিল্লী থেকে বাংলার পথে ধেয়ে এল না কোন বিরাট দুর্জয় বাহিনী। তবুও নিরাপদ রইল না সুলতান ফখর-উদ-দীন মুবারক শা'র এই নব-ঘোষিত স্বাধীনতা। বাংলার অন্য দুটি বিভাগ লাখনৌতি ও সাতগাঁও-এ তখনো দিল্লী সুলতান কর্তৃক নিয়োজিত শাসনকর্তারাই ক্ষমতাসীন ও দিল্লীর অনুগত ছিলেন। সোনারগাঁও-এর খবর পেয়ে লাখনৌতির শাসনকর্তা কদর খান ও হিসাব রক্ষক হুসাম-উদ-দীন আবু রাজা, সাতগাঁও-এর শাসনকর্তা আযম-উল-মুল্‌ক্ বা আযম মালিক ইয্‌যুদ্দীন ইয়াহিয়া এবং বাংলার বাইরের কারা অঞ্চলের শাসনকর্তা ফিরোজ খান এক সঙ্গে ফখর-উদ-দীনকে দমন করার জন্য সোনারগাঁও আক্রমণ করেন। সুলতান ফখর-উদ-দীন তাঁদের মুকাবিলা করেন, কিন্তু যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন গিয়ে ময়মনসিংহের মধুপুর জঙ্গলে। খুব সম্ভব, ইয্‌যুদ্দীন ইয়াহিয়া যুদ্ধে নিহত হয়েছিলেন। সোনারগাঁও পুনরাধিকার করে সেখানে থেকে যান কদর খান। রাজধানীর বিপুল ধন-সম্পদ তাঁর হস্তগত হয়। সেসব নিয়মানুযায়ী দিল্লীতে না পাঠিয়ে নিজের কাছেই রেখে দেন ধনলিপ্‌সু কদর খান। এমন কি, সেনাবাহিনীর লোকেরাও রীতি অনুযায়ী তাদের হিস্যা থেকে বঞ্চিত হয়। ক্রমে এগিয়ে আসে বর্ষাকাল। কোন নৌবহর না থাকায় কদর খানের প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে বর্ষাকালটি ছিল খুবই বিপজ্জনক। মধুপুরের আশ্রয় থেকে ফখর-উদ-দীন মুবারক শাহ্ যে সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন, বর্ষার আগমনে সে সুযোগও তিনি পেয়ে যান। তাছাড়াও ফখর-উদ-দীন মুবারক শাহ্ জানতেন, সৈন্যদের প্রাপ্য ধন-সম্পদ থেকে হিস্যা না দেওয়ায় কদর খানের নিজের সৈন্যরাই তাঁর প্রতি আর তেমন অনুগত নেই। গোপনে মুবারক শাহ্ নিশ্চয়ই কদর খানের সৈন্যদের এই ক্রোধাগ্নিতে কিছুটা ঘৃত সংযোগ ঘটিয়ে থাকবেন।

বর্ষাকালেই ফখর-উদ-দীন মুবারক শাহ্ আক্রমণ করলেন সোনারগাঁও। কদর খান পরাজিত হলেন। কথিত আছে, নিজ সৈন্যদের হাতেই নিহত হন অর্থলোভী কদর খান। সোনারগাঁও-এর মসনদে আবার আরোহণ করেন সুলতান ফখর-উদ-দীন মুবারক শাহ্।

লাখনৌতি ও সাতগাঁও

সোনারগাঁও-এর প্রথম যুদ্ধে ফখর-উদ-দীনের পরাজয় এবং সেখানে কদর খানের ক্ষমতা দখলের পর আলী মুবারক নামক কদর খানের এক কর্মচারী লাখনৌতির প্রশাসন দেখাশোনা করতে থাকেন। এর পরবর্তী ঘটনা কদর খানের সঙ্গে ফখর-উদ-দীন মুবারক শা'র দ্বিতীয় বার যুদ্ধ এবং এই যুদ্ধে কদর খানের পরাজয় ও মৃত্যু। এখানে দু'জন ঐতিহাসিকের বক্তব্য তুলে ধরতে চাই। ডক্টর আবদুল করিম বলেন, সোনারগাঁও-এ কদর খানের মৃত্যুর খবর পাইয়া লখনৌতিতে তাঁহার সৈন্যাধ্যক্ষ (আরিজ) আলী মুবারক সুলতান আলা-উদ-দীন আলী শাহ্ উপাধি ধারণ করিয়া লাখনৌতির সিংহাসনে আরোহণ করে। অন্যসূত্রে বলা হইয়াছে যে, আলী মুবারক প্রথমে সুলতান মোহাম্মদ বিন তুগলকের নিকট কদর খানের মৃত্যু সংবাদ জানায় এবং নূতন গভর্নর নিযুক্তির প্রার্থনা জানায়। ফলে মালিক ইউসুফ নামক এক ব্যক্তিকে লাখনৌতির গভর্নর নিযুক্ত করিয়া পাঠান হয় কিন্তু পথিমধ্যে মালিক ইউসুফের মৃত্যু হয়। এই খবর লাখনৌতিতে পৌঁছালে আলী মুবারক নিজে সিংহাসনে আরোহণ করেন। কথিত আছে যে, সোনারগাঁও-এর সুলতান ফখর-উদ-দীন মুবারক শাহ মুখলিস নামক একজন সেনাপতিকে লাখনৌতি আক্রমণের জন্য পাঠাইয়াছিলেন কিন্তু আলী মুবারক তাঁহাকে পরাজিত করেন। অতঃপর সোনারগাঁও এবং লাখনৌতির মধ্যে প্রায় প্রতি বছর যুদ্ধ চলিত। কথিত আছে যে, ফখর-উদ-দীনের নৌ-বাহিনী থাকায় তিনি বর্ষাকালে লাখনৌতি আক্রমণ করিতেন; অন্যপক্ষে আলী শাহ স্থলযুদ্ধে শক্তিশালী হওয়ায় তিনি শীতকালে সোনারগাঁও আক্রমণ করিতেন, কিন্তু কেহ কাহাকেও পরাজিত করিতে পারেন নাই।"[১]

মতান্তরে সোনারগাঁও-এ কদর খানকে পরাজিত করে ফখর-উদ-দীন মুবারক শাহ্ লাখনৌতিও অধিকার করেছিলেন, কিন্তু সে অধিকার রক্ষা করতে পারেন নি। 'তারিখ-ই-মুবারক শাহী'র সাক্ষ্যমতে শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায় বলেন, "ফখর-উদ-দীন লাখ্নৌতি অধিকার করে সেখানে নিজের ভৃত্য মুখলিসকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। আলী মুবারক কিন্তু বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে মুখলিসকে বধ করে লাখ্নৌতি

১. ডক্টর আবদুল করিম, বাংলার ইতিহাস, সুলতানী আমল, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭, পৃ. ১৮২-১৮৩।

অধিকার করেন; তিনি নিজেকে স্বাধীন সুলতান হিসাবে ঘোষণা করার বিন্দুমাত্র অভিপ্রায় না দেখিয়ে দিল্লীশ্বর মুহম্মদ তোগলকের কাছে লাখনৌতির একজন শাসনকর্তা নিযুক্ত করার আবেদন জানিয়ে চিঠি পাঠান; মুহম্মদ তোগলক কর্তৃক নিযুক্ত শাসনকর্তা য়ুসুফ বাংলায় এসে পৌঁছবার আগেই তাঁর মৃত্যু হয় এবং উন্মাদ মুহম্মদ তোগলক তাঁর জায়গায় আর কাউকে নিযুক্ত করেননি। তখন আলী মুবারক বাধ্য হয়ে সিংহাসনে বসলেন এবং আলাউদ্দীন আলী শাহ্ নাম নিলেন। কারণ তাঁর শত্রু ফখরুদ্দীন অনবরত লাখনৌতি অধিকারের চেষ্টা করছেন; লাখনৌতিতে কোন শাসনকর্তা নেই, অতএব আলী মুবারকের সে আক্রমণ ঠেকাতে হবে। কিন্তু লোকে রাজা ভিন্ন কারও নির্দেশ সহজে মানবে না, তাই বাধ্য হয়ে তিনি রাজা হলেন। আলী মুবারক যে সত্যিকারের বীর, নিঃস্বার্থপরায়ণ এবং কর্তব্যনিষ্ঠ ছিলেন, তা 'তারিখ-ই-মুবারক শাহী'তে বর্ণিত তাঁর এই ইতিহাস থেকে মনে হয়।"[২]

এর মধ্যেই বাংলার রাষ্ট্রনৈতিক বিশৃঙ্খলায় হাজী ইলিয়াস নামে এক তৃতীয় ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটে। তিনি ছিলেন আলা-উদ-দীন আলীর সঙ্গে সম্পর্কিত। কিন্তু সে-সম্পর্কটা যে কি, তা নিয়ে মতভেদ আছে। 'আইন-ই-আকবরী'র মতে হাজী ইলিয়াস ছিলেন বাংলার অন্যতম আমীর, 'রিয়াজ-উস-সালাতীন'-এর মতে আলাউদ্দীন আলী শাহ্র ধাত্রীমাতার পুত্র এবং বুকাননের মতে আলী শাহ্র কর্মচারী। এসবের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন ইতিহাস 'তারিখ-ই-মুবারকশাহী' অনুযায়ী "মালিক ইলিয়াস হাজীর বহু সমর্থক ছিল। তিনি লাখনৌতির আমীর ও মালিকদের এবং জনসাধারণের সঙ্গে যোগ দিয়ে আলাউদ্দীনকে বধ করেন এবং সুলতান শামসুদ্দীন নাম নিয়ে সিংহাসনে আরোহণ করেন।"[৩] কিন্তু এই শেষ অবস্থার আগে লাখনৌতির অধিকার নিয়ে হাজী ইলিয়াস ও আলাউদ্দীন আলী শাহ্র মধ্যে সংঘর্ষও হয়েছিল এবং তাতে জয়ী হয়েছিলেন আলা উদ্দীন আলী শাহ্। স্যার যদুনাথ সরকারের কথায়, "He (Alauddin Ali Shah) did not long remain in peace, for his foster-brother llyas who arrived from Delhi at this time entered into a contest with him for the throne of Lakhnawati but worsted in the fight, retired to South Bengal where he carved out an independent Kingdom, issuing coins in his name from 743 AH, onwards. Bengal was thus broken up again into three parts with Fakhruddin, llyas and Ali Shah ruling respectively in the eastern, southern and western parts,..... Ali Shah reigned till 743 A H/1342 AD when he either died or was slain by his brother llyas Shah. His rival Fakhruddin continued his rule in Sonarganw for a few years more,

২. শ্রী সুখময় মুখোপাধ্যায়, বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৮০, পৃ. ১৪।
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬।

pushing his arms to the south until Chittagong was annexed to his territory. The Sultan connected this outpost of Muslim power situated in the remote south-eastern corner of India with a road running from Chandpur opposite Sripur and adorned the city with mosques and tombs."[8]

এভাবে আলাউদ্দীন আলী শাহ্‌র মৃত্যুর পর বাংলার লাখনৌতি ও সাতগাঁও-এর সুলতান হিসাবে অভিহিত হন সুলতান শামস-উদ-দীন ইলিয়াস শাহ্ এবং সোনারগাঁও-এর সুলতান হিসাবে নিজ অধিকার রক্ষা করে চলেন সুলতান ফখর-উদ-দীন মুবারক শাহ্।

সুলতান ফখর-উদ-দীন মুবারক শাহ্ ফকীর-দরবেশগণকে খুবই শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর ১১ বছরের রাজত্বকালে ফকীর-দরবেশগণ নানারকম সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতেন। সোনারগাঁও রাজ্যে নৌকাযোগে তাঁদের ভ্রমণে কোন পয়সা-কড়ি লাগতো না। এমন কি সুলতানের নির্দেশক্রমে তাঁদেরকে প্রয়োজনীয় হাত-খরচাও দেওয়া হতো। কিন্তু তাঁর জীবনে একটা করুণ ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল এই ফকীর-প্রীতি থেকেই। তিনি শায়দা নামক এক ফকীরকে সোদকাওয়ান-এর শাসন-দায়িত্বে নিয়োজিত করেন। কিন্তু সুলতান যখন তাঁর কোন এক শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে রাজধানী থেকে বাইরে যান, তখন ফকীর শায়দা বিদ্রোহ করে সুলতানের পুত্রকে হত্যা করে বসেন। খবর পেয়ে সুলতান সোদকাওয়ানে ছুটে যান। ফকীর তখন সোনারগাঁয়ে পালিয়ে আসেন। কিন্তু সুলতান-পুত্রকে হত্যার সংবাদ তখন রাজ্যময় ছড়িয়ে গেছে। সোনারগাঁও-এর লোকজন ফকীর শায়দাকে ধরে ফেলে হত্যা করে। সঙ্গে নিহত হন আরও কয়েকজন ফকীর। তবে ফকীর শায়দা সোনারগাঁও শহরে পালিয়ে এসেছিলেন কি-না, তাতে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতান্তর আছে। আমাদের মনে হয়, ফকীর শায়দা সোনারগাঁও শহরে পালিয়ে আসেন নি, পালিয়েছিলেন হয়তো সোনারগাঁও রাজ্যেরই কোন এক স্থানে এবং সেস্থানেই লোকজন তাঁকে ধরে ফেলে হত্যা করে। স্বাধীন সোনারগাঁও-এর সুলতান ফখর-উদ-দীন মুবারক শাহ্‌র সময়ে চট্টগ্রাম সর্বপ্রথম মুসলিম অধিকারে আসে। সতেরো শতকের কবি মোহাম্মদ খানের বক্তব্যানুসারে, কদল খান গাজী পীর 'অসংখ্য রিপুদল' বিনাশ করে চট্টগ্রামে এক আল্লা'র মহিমা প্রকাশ করেন, কদল খান গাজী পীরের সঙ্গে ছিলেন বদর আলম প্রমুখ 'একাদশ মিত্র'। বাংলার নানা অঞ্চলে ইসলাম প্রচারের কাহিনী পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, হয় প্রথমে সূফী সাধকরা ইসলাম প্রচারের কাজে বিধর্মীদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হলে মুসলমান শাসকেরা

4. Sir Jadunath Sarkar, History of Bengal, Vol. II, The University of Dacca, 1912, P. 99.

তাঁদের সাহায্যে এগিয়ে যেতেন, অথবা মুসলমান শাসকদের সঙ্গে সীমান্তবর্তী বিধর্মী রাজাদের সংঘর্ষ বাঁধলে সূফী সাধকরা সেসব যুদ্ধে সামিল হতেন। হুগলী জেলার ত্রিবেণী এলাকায়, সিলেটে এবং চট্টগ্রামে মুসলিম বিজয়ের ঘটনাবলীতে উপরোক্ত বক্তব্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। "প্রকৃত পক্ষে, চতুর্দশ শতক বাংলাদেশে ইসলাম ধর্ম প্রচার এবং মুসলমান শাসন বিস্তারের ইতিহাসে এক স্বর্ণযুগ। যদিও ত্রয়োদশ শতকের গোড়ার দিকে বখতিয়ার খলজী লাখনৌতিকে কেন্দ্র করিয়া বাংলাদেশে প্রথম মুসলমান রাজ্যের গোড়াপত্তন করেন, দিল্লীর কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত বাংলার মুসলমান শাসকদের সংঘর্ষ এবং দিল্লীর সরকারের দুর্বলতার ফলে প্রথম একশত বৎসর বাংলাদেশেও মুসলমানেরা বিশেষ রাজ্য বিস্তার করিতে পারে নাই। কিন্তু চতুর্দশ শতক হইতে, অর্থাৎ বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশে মুসলমানদের আগমন বাড়িতে থাকে এবং সূফী সাধকরা অধিক সংখ্যায় আগমন করিতে থাকেন।"[৫]

অনেকে কদল খান গাজীকে সুলতান ফখর-উদ-দীন মুবারক শাহ্র সেনাপতি মনে করে থাকেন। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডক্টর আবদুল করিম তা মনে করেন না। তাঁর কথায়, "এখানে স্মরণ রাখা দরকার যে, কোন সেনাপতির পক্ষে পরবর্তী জীবনে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধন অসম্ভব নয়, যেমন ত্রিবেণীর জাফর খান গাজী, বাগেরহাটের খান জাহান আলী এবং রংপুর জিলার কাঁটাদুয়ারের শাহ্ ইসমাইল গাজী সম্পর্কে অনেকে মনে করিয়া থাকেন। চট্টগ্রামে কদল খান গাজী ও পীর বদর আলমের সমাধি ভবন দৃষ্ট হয়। চট্টগ্রামের একটি এলাকা কদল খান গাজীর নামানুসারে কাতালগঞ্জ নামে পরিচিত। চট্টগ্রামের লোকেরা কদল খান গাজীকে সূফীরূপে এখনও ভক্তি সহকারে স্মরণ করিয়া থাকে।"[৬] ডক্টর আবদুল করিমের মতে, সূফী কদল খান গাজী তাঁর সঙ্গী ও শিষ্যদের নিয়ে চট্টগ্রামে ইসলাম প্রচারে রত হন এবং তাতে করে বিধর্মীদের সঙ্গে সংঘর্ষ আরম্ভ হলে সুলতান ফখর-উদ-দীন তাঁদের সাহায্যে এগিয়ে আসেন। আর এভাবেই চট্টগ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয় মুসলমান অধিকার। এই বিজয়ের সময়কাল হচ্ছে ১৩৩৮ সাল থেকে ১৩৪৬ সাল।

সুলতান ফখর-উদ-দীনের শাসনামলের আর একটি স্মরণীয় ঘটনা হচ্ছে ইব্নে বতুতার বাংলা সফর। মরক্কোর অধিবাসী বিশ্ব পর্যটক ইব্নে বতুতা সম্ভবত ১৩৪৬ সালে বাংলার চট্টগ্রাম বন্দরে পদার্পণ করেন। চট্টগ্রাম থেকে তিনি হযরত শাহ্জালাল রহমতুল্লাহি আলাইহের সঙ্গে সাক্ষাত করতে নদীপথে সিলেট যান। সেখানে কিছুদিন অবস্থানের পর নদীপথেই আসেন সোনারগাঁও-এ। সোনারগাঁও-এ অবস্থান শেষে জাহাজ-যোগে তিনি চলে যান জাভায়।

---

৫. ডক্টর আবদুল করিম, বাংলার ইতিহাস, সুলতানী আমল, বাংলার একাডেমী, ১৯৭৭, পৃ. ১৮৭।

৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৭-১৮৮।

ইব্‌নে বতুতা তাঁর সফরনামায় বাংলার অবস্থা বর্ণনা করে গেছেন। কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক হলেও এখানে তাঁর বর্ণনার কিছু বিবরণী তুলে ধরছি।

ইব্‌নে বতুতার সামনেই একজন সুন্দরী দাসী কেনা হয়েছিল সাত টাকায়। মোহাম্মদ আল্ মাশহাদী নামক মরক্কোর এক ভদ্রলোক কিছু দিন এদেশে বসবাস করেছিলেন। তিনি ইব্‌নে বতুতাকে বলেন যে, তাঁর তিনজনের একটি পরিবারের জন্য বছরে মাত্র সাত টাকা খরচ করতে হতো। ইব্‌নে বতুতা আরও বলেন যে, খাদ্যশস্যের প্রাচুর্যের জন্য বিদেশী লোকেরা একদিকে বাংলাকে যেমন পছন্দ করত, অন্যদিকে এদেশের জলবায়ুকে মোটেই পছন্দ করত না। তাই তারা বাংলাকে বলত "দোজখ-পুর-আয নিমত" বা ধন -সম্পদে পরিপূর্ণ দোজখ।

ইব্‌নে বতুতা বাংলায় সূফী-সাধক ও ফকীর-দরবেশদের যথেষ্ট প্রতিপত্তির কথা উল্লেখ করেছেন। সুলতান ফখর-উদ-দীন মুবারক শাহ্ ফকীর-দরবেশদের প্রতি ছিলেন খুবই শ্রদ্ধাশীল। নৌকায় যাতায়াত করতে তাঁদের কোন পয়সা-কড়ি লাগতো না। যাদের আহার বাসস্থানের সংস্থান থাকত না, তাঁদের জন্য সে ব্যবস্থা করা হতো। তাঁরা কোন শহরে প্রবেশ করলে প্রত্যেককে দেওয়া হতো আধা দিনার। ইব্‌নে বতুতা চট্টগ্রাম বন্দরে অনেক জাহাজ দেখেছিলেন। তাছাড়া সিলেট থেকে নদীপথে সোনারগাঁও-এ আসার সময় ইব্‌নে বতুতা নদীর দুই তীরের অপূর্ব শোভা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। নদী তীরে তিনি দেখেছেন দিগন্ত বিস্তারী শস্যক্ষেত্র, সবুজ-শোভিত গ্রাম; দেখেছেন বাংলার জমজমাট হাট-বাজার।

২৮. সুলতান ইখতিয়ার-উদ-দীন গাজী শাহ্ (১৩৪৯-১৩৫২ সাল)

১৩৪৯ সালে সুলতান ফখর-উদ-দীন মুবারক শাহ্‌র মৃত্যুর পর তাঁর বালক পুত্র ইখতিয়ার-উদ-দীন গাজী শাহ্ সোনারগাঁও-এর মসনদের অধিকারী হন। এই বালক সুলতান সম্পর্কে ইতিহাস নীরব। তবে যতটুকু ধারণা করা যায়, তাতে মনে হয় এই বালক সুলতানকে সরিয়ে দিয়েই ১৩৫২ সালে লাখনৌতি সাতগাঁও-এর সুলতান শামস-উদ-দীন ইলিয়াস শাহ্ সোনারগাঁও এলাকাও নিজ অধিকার ভুক্ত করে নেন। ইলিয়াস শাহ্‌র আগে বাংলার কোন মুসলমান সুলতানই সমগ্র বাংলার অধীশ্বর ছিলেন না। এই গৌরবের প্রথম অধিকারী সুলতান ইলিয়াস শাহ'ই। এজন্যই ঐতিহাসিক আফীফ ইলিয়াস শাহ্‌কে 'শাহ্-ই-বাঙ্গালা' 'শাহ্-ই-বাঙ্গালীয়ান' এবং 'সুলতান-ই-বাঙ্গালা' উপাধিসমূহে অভিহিত করেন। এদিক থেকে সুলতান ইলিয়াস কর্তৃক সোনারগাঁও অধিকার বাংলার ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

শুধু মুসলমান সুলতান কেন, এর আগে কখনো বাঙ্গালা অথবা বঙ্গের বা বাংলার বিভিন্ন জনপদ একীভূত শাসনাধীনে আসেনি। "গৌড় নামে বাংলার সমস্ত জনপদকে

ঐক্যবদ্ধ করার যে চেষ্টা শশাঙ্ক, পাল ও সেন রাজারা করেছিলেন, তাতে কাজ হলো না। যে বঙ্গ ছিল আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক থেকে ঘৃণিত ও অবজ্ঞাত, যা ছিল পাল ও সেনদের আমলে কম গৌরবের ও আদরের–সেই বঙ্গ নামেই শেষ পর্যন্ত তথাকথিত পাঠান আমলে বাংলার সমস্ত জনপদ ঐক্যবদ্ধ হল।" এর আগে ১৩৫১ সালে দিল্লীর সুলতান মুহম্মদ বিন তুগলকের মৃত্যু হয়েছে। দিল্লীর সুলতান হয়েছেন তাঁরই পিতৃব্য-পুত্র ফিরোজ শাহ্।

(খ) একীভূত স্বাধীন বাঙ্গালা সালতানাত (১৩৫২-১৫৩৮ সাল)

বাংলার মুসলমান কবিগণের মধ্যে শাহ্ মুহম্মদ সগীরই প্রাচীনতম। সুলতান গিয়াস-উদ-দীন আজম শাহের রাজত্বকালে তিনি রচনা করেন 'য়ুসুফ-জুলিখা' কাব্য। কবির রাজ-বন্দনার অংশ বিশেষ নিচে মূল বানানেই উদ্ধৃত হলো।

রাজ রাজস্বর মৈদ্ধে ধার্মিক পণ্ডিত।
দেব অবতার নির্প জগত বিদিত॥
মনুষ্যের মৈদ্ধে জেহ্ন ধর্ম্ম অবতার।
মহা নরপতি গ্যেছ পিরথিম্বীর সার॥
ঠাই ঠাই ইচ্ছে রাজা আপনা বিজএ।
পুত্র সিস্য হন্তে তিঁহ মাগে পরাজএ॥
মোহাজন বাক্য ইহ পূরন করিআ।
লইলেন্ত রাজ্য পাট বঙ্গাল গৌড়িআ॥
করুনা হীদএ রাজা পুণ্যবন্ত তর।
সব গুনে অসীম অতুল্য মনুহর॥
....
জাবত জীবন মুঞি দেখিলুঁহি কাম।
তান ভক্তি বিনা ধিক নাহি আর ধাম॥
মোহাম্মদ ছগীর তান আজ্ঞাক অধীন।
তাহান আছুক জস ভুবন এ তিন॥

(ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক)

২৯. সুলতান শামস-উদ-দীন ইলিয়াস শাহ্ (১৩৪২-১৩৫৭ সাল)

শ্রী সুখময় মুখোপাধ্যায় আলা-উদ-দীন আলী শাহ্ ও ইলিয়াস শাহ্র প্রচলিত শিলালিপি ও মুদ্রার সাক্ষ্যে বলেন,"ইলিয়াস শাহের রাজত্বের প্রাচীনতম তারিখ ৭৪৩

৭. ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়-এর 'বাঙালীর ইতিহাস (আদি পর্ব)'-এর সংক্ষেপে 'বাঙালীর ইতিহাস' সুভাষ মুখোপাধ্যায়, নিউ এজ সংস্করণ, ১৯৬০, কলিকাতা, পৃ. ২২।

হিজরার ২রা শাবান। ঐ তারিখে উৎকীর্ণ তাঁর একটি শিলালিপি পাওয়া যায়। ৭৪৩ থেকে ৭৫৮ হিজরা পর্যন্ত ইলিয়াস শাহের মুদ্রা পাওয়া যাচ্ছে। অতএব ৭৪৩ হিজরার শাবান মাসের আগেই যে আলাউদ্দীন আলী শাহ্‌র রাজত্ব শেষ হয়েছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাঁর রাজত্ব কবে আরম্ভ হয়েছিল, তা'ও অনুমান করা কঠিন নয়। ৭৪২ হিজরায় সর্বপ্রথম আলাউদ্দীন আলী শাহের মুদ্রা পাওয়া যাচ্ছে। ঐ বছরেই তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। ৭৩৯ হিজরায় ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ্ বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তারপর কদর খান কর্তৃক বিদ্রোহ দমন, কদর খানের হত্যা, ফখরুদ্দীন কর্তৃক লাখনৌতি অধিকার, সেখানে মুখলিসকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করা, আলী শাহ্ কর্তৃক মুখলিসকে বধ ও লাখনৌতি পুনরাধিকার, মুহম্মদ তোগলকের কাছে শাসনকর্তা নিয়োগ করতে চিঠি লেখা, মুহম্মদ তোগলক কর্তৃক শাসনকর্তা নিয়োগ, সেই শাসনকর্তার মৃত্যু, অতঃপর মুহম্মদ তোগলকের কিছুকাল নতুন শাসনকর্তা নিয়োগে অবহেলা এবং তার ফলে আলী শাহের সিংহাসনে আরোহণ–এই ঘটনাগুলি ঘটেছিল বলা হয়েছে। এত ঘটনা ঘটতে ৩/৪ বছরের কম সময় লাগবার কথা নয়। অতএব আলী শাহ্ ৭৪২ হিজরায় সিংহাসনে আরোহণ করেন বলে ধরা যায়। পরবর্তীকালের ইতিহাস গ্রন্থগুলিতে লেখা আছে যে, আলী শাহ্ এক বছর কয়েক মাস ('রিয়াজ'-এর মতে এক বছর পাঁচ মাস) রাজত্ব করেন। এই কথাই সত্য বলে মনে হয়। সুতরাং আলাউদ্দীন আলী শাহ্ ৭৪২ হিজরার গোড়ার দিকে সিংহাসনে আরোহণ করেন বলে অনুমান করা যায়।"[৮]

শ্রী মুখোপাধ্যায় আরও বলেন, "ইলিয়াস শাহ ৭৪৭ হি. বা ১৩৪৬ খ্রী. মধ্যেই সাতগাঁও অঞ্চল জয় করেছিলেন; কারণ ৭৪৭ হিজরায় সাতগাঁওয়ের টাকশাল থেকে তাঁর মুদ্রা প্রকাশিত হয়েছিল।"[৯]

মসনদে আরোহণ করেই শামস-উদ-দীন ইলিয়াস শাহ্ রাজ্য বিস্তারে মনোনিবেশ করেন। ১৩৫০ সালে তিনি নেপালে অভিযান চালিয়ে সফল হন। দুর্গম নেপালে অভিযান করা তখনকার দিনে ছিল খুবই দুঃসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু ইলিয়াস শাহ্ এই দুঃসাধ্য কার্য সাধন করেছিলেন। এর থেকেই তাঁর শক্তিমত্তা ও মনের দৃঢ়তার পরিচয় মেলে। 'তারিখ-ই-ফিরিশতা'ও 'তাবকাত-ই-আকবরীর' সাক্ষ্য অনুযায়ী শামস-উদ-দীন ইলিয়াস শাহ্ জাজনগর অর্থাৎ উড়িষ্যায় সফল অভিযান চালিয়েছিলেন। তিনি ত্রিহুতও অধিকার করে নিয়েছিলেন। 'সিরাত-ই-ফিরোজশাহী' অনুযায়ী ইলিয়াস শাহ্ চম্পারণ, গোরক্ষপুর ও কাশী জয় করে এক বিরাট ভূখণ্ড তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। তারপর ৭৫৩ হিজরায় বা ১৩৫২-৫৩ সালে তিনি সুলতান ফখর-উদ-দীন মুবারক শাহ্‌র পুত্র

---

৮. শ্রী সুখময় মুখোপাধ্যায়, বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৮০, পৃ. ১৫-১৬।

৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১।

ইখতিয়ার-উদ-দীন গাজী শাহ্‌র কাছ থেকে জয় করে নেন সোনারগাঁও রাজ্য তথা পূর্ববঙ্গ। এর ফলে ইলিয়াস হলেন সমগ্র বাংলাদেশেরই শাহ্ বা 'শাহ্ -ই-বাঙ্গালা'।

ইলিয়াস শাহ্‌র এসব সাফল্যকালে দিল্লী সালতানাতের অবস্থা খুবই নাজুক ছিল। সাম্রাজ্যের অরাজকতা নিয়ে দিল্লীতে সুলতান মুহম্মদ বিন তুগলক তখন খুবই ব্যতিব্যস্ত। বাংলার দিকে নজর দেওয়ার অবকাশ ছিল না মুহম্মদ বিন তুগলকের। এমনি অবস্থায় ১৩৫১ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। দিল্লীর মসনদে আরোহণ করেন তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র ফিরোজ শাহ্ তুগলক। দিল্লী সালতানাতে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করেই সুলতান ফিরোজ শাহ্ তুগলক সুলতান ইলিয়াস শাহ্‌কে দমনের উদ্দেশ্যে যুদ্ধযাত্রা করেন। এখানে উল্লেখ্য যে, ফিরোজ শাহ্ যখন বাংলার পথে অগ্রসর হচ্ছিলেন, তখন দিল্লী সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরেই চলছিল বাংলার সুলতান ইলিয়াস শাহ্‌র আক্রমণ। অতএব ধরে নেওয়া যায় যে, সুলতান ফিরোজ শাহ্ তুগলক বাধ্য হয়ে বাংলার সুলতানকে স্বীয় সাম্রাজ্য থেকে বিতাড়নের জন্য এবং সম্ভব হলে বাংলার হৃত রাজ্য পুনর্দখলের জন্য সুলতান ফিরোজ শাহ্ বাংলার পথে অভিযান পরিচালনা করেন। দুই সুলতানের মধ্যে এই যে সংঘর্ষ, তা ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে।

এই সংঘর্ষের বিবরণ তিনটি ইতিহাস গ্রন্থে উল্লিখিত হয়ে আছে। ওই তিনটি ইতিহাস হচ্ছে—জিয়াউদ্দীন বারনী রচিত 'তারিখ-ই-ফিরোজশাহী' শামস-ই-সিরাজ আফিফ রচিত 'তারিখ-ই-ফিরোজশাহী এবং অজ্ঞাতনামা কোন ব্যক্তি কর্তৃক স্বয়ং ফিরোজ শাহ্‌র নির্দেশে রচিত 'সিরাত-ই-ফিরোজশাহী'। তিনটিই ফিরোজ শাহের অনুগত লোকের লেখা। সুতরাং যে ক্ষেত্রে জয়-পরাজয়ের প্রশ্ন জড়িত, সেক্ষেত্রে তাঁদের উক্তি একদেশদর্শিতা-দোষে দুষ্ট হয়ে পড়েছে।"[১০]

ইতিহাস তিনটির মূল বক্তব্য হচ্ছে, বাংলার সুলতান অপরাধী এবং যুদ্ধক্ষেত্রেও খুব একটা সাহসী নন। দিল্লীর সুলতান নেহায়েত মানবতার কারণেই পরাজিত ইলিয়াস শাহ্‌র সঙ্গে সন্ধি করে দিল্লী ফিরে গেছেন ..... ইত্যাদি। এই দুই সুলতানের যুদ্ধ প্রসঙ্গে শ্রীমুখোপাধ্যায় বিভিন্ন ঘটনার বিশ্লেষণ করে বলেন," আসল কথা, ফিরোজ শাহের সঙ্গে সংঘর্ষে ইলিয়াস শাহ্ পরাজিত হন নি। পলায়নও করেননি; তিনি উচ্চাঙ্গের রণকৌশল অনুসারেই কাজ করেছিলেন। ফিরোজ শাহকে সৈন্যবাহিনী সমেত নিজের রাজ্যে অনেক দূর প্রবেশ করতে দিয়ে তিনি একডালা দুর্গে আশ্রয় নিয়ে কালক্ষেপণ করছিলেন। তিনি জানতেন যে, বর্ষার আগে ফিরোজ শাহ্ একডালা দুর্গ জয় করতে পারবেন না। তারপর বর্ষা উপস্থিত হলে ফিরোজ শাহের বাহিনী অসহায় হয়ে পড়বে। তখন তিনি অতি সহজেই তাদের পরাজিত করতে পারবেন। ... পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ

---

১০. প্রাগুক্ত, পৃ: ২৪।

থেকে বোঝা যায় যে, কোন পক্ষই এই যুদ্ধে চূড়ান্তভাবে জয়ী হতে পারেন নি। ফিরোজ শাহ্ কয়েকজন বন্দী, কিছু লুটের মাল ও কয়েকটি হাতী ভিন্ন আর কিছুই এই যুদ্ধ থেকে লাভ করতে পারেননি। তাঁর পক্ষেও নিশ্চয় কিছু ক্ষতি হয়েছিল, যার কথা পূর্বোক্ত লেখকরা চেপে গিয়েছেন। ... কিন্তু ফিরোজ শাহ্ এই যুদ্ধেই ইলিয়াস শাহের বলবীর্যের পরিচয় পেয়েছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন যে, ইলিয়াসকে পর্যুদস্ত করা বা একডালা দুর্গ জয় করা দুই-ই তাঁর পক্ষে অসম্ভব, উপরন্তু বর্ষাকাল এলে তাঁর বাহিনীর শোচনীয় বিপর্যয় ঘটবে। তাই তিনি হাতী জয়ের দ্বারাই যুদ্ধ জয় হয়েছে এই জাতীয় কথা বলে কোন রকমে নিজের মান বাঁচিয়ে বাংলাদেশ থেকে সসৈন্যে প্রস্থান করলেন। পরে প্রচারের মধ্য দিয়ে তিনি নিজের গ্লানি গোপন করেছিলেন।"[১১] যাই হোক, অবশেষে সন্ধি চুক্তির মাধ্যমে এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের অবসান সূচিত হয়। সুলতান ফিরোজ বাংলা পুনর্দখল করতে পারেননি সত্য, কিন্তু ইলিয়াস শাহ্ কর্তৃক অধিকৃত দিল্লী-সাম্রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা পুনর্দখল করে সুলতান ফিরোজ শাহ্ ইলিয়াস শাহ্‌র উচ্চাভিলাষ রোধ করতে সমর্থ হন।

অতঃপর ইলিয়াস শাহ্ পরবর্তী সময়ে স্ব-রাজ্যের বিস্তার সাধন করেন। তার মধ্যে কামরূপের কিছু অংশে বাংলার অধিকার প্রতিষ্ঠা উল্লেখযোগ্য। সুলতান ইলিয়াস শাহ্ বাংলার মর্যাদা রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে দিল্লীর সঙ্গেও সম্পর্কের উন্নতি বিধান করেন। তিনি মালিক তাজ-উদ-দীন ও অন্যান্য কয়েকজন অমাত্যের মাধ্যমে দিল্লীতে ফিরোজ শাহ্ তুগলকের নিকট উপহার প্রেরণ করেন। দিল্লীর সুলতান সসম্মানে বাংলার দূতকে গ্রহণ করেন ও বিনিময়ে নিজের দূতের মাধ্যমে মূল্যবান উপহার বাংলায় প্রেরণ করেন। কিন্তু দূত বাংলায় পৌঁছাবার আগেই ৭৫৯ হিজরীতে (১৩৫৭ সালে) সুলতান শামস-উদ-দীন ইলিয়াস শাহ্ পরলোক গমন করেন।

সূফী-দরবেশগণের প্রতি পরম শ্রদ্ধাশীল এই সুলতান ইলিয়াস শাহ্‌র সমসাময়িক তিনজন বিখ্যাত সূফী হচ্ছেন– শেখ আখী সিরাজ উদ্দীন উসমান (রহ), তাঁর শিষ্য শেখ আলা-উল-হক (রহ) এবং শেখ রেজা বিয়াবানী (রহ)। কথিত আছে, ফিরোজ শাহ্‌র সঙ্গে যুদ্ধে একডালা দুর্গে যখন ইলিয়াস শাহ্ অবরুদ্ধ, তখন হযরত শেখ রেজা বিয়াবানীর মৃত্যু হয়। সমস্ত বিপদ উপেক্ষা করে ছদ্মবেশে সুলতান ইলিয়াস শাহ্ সূফী সাহেবের জানাজায় শরীক হন।

একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বাংলার সুলতানদের মধ্যে ইলিয়াস শাহ্ ছিলেন একজন গৌরবমণ্ডিত সুদক্ষ শাসনকর্তা। দীর্ঘ পনের বছর স্বাধীন বাঙ্গালার প্রতিষ্ঠা-মূল সুদৃঢ় করে ১৩৫৭ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। শ্রীমুখোপাধ্যায়ের কথায়, "প্রথম

---

১১. প্রগুক্ত, পৃ. ৩৩-৩৪।

জীবনে যিনি একজন নগণ্য ব্যক্তি ছিলেন, তিনিই পরবর্তীকালে এক বিরাট রাজ্যের অধীশ্বর হয়েছিলেন এবং জয়ের পর জয়ের মুকুট পরে, প্রবল শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করে নিজের গৌরবের পতাকা উড়িয়েছিলেন। এই রকম অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ক্ষণজন্মা ব্যক্তির আবির্ভাব শুধু এদেশে নয়, অন্য দেশেও খুব কমই হতে দেখা গিয়েছে।”[১২] তাঁর প্রতিষ্ঠিত ইলিয়াস শাহী বংশের সুলতানগণ বাংলার ইতিহাসকে গৌরবমণ্ডিত করে গেছেন।

৩০. সুলতান সিকান্দার শাহ্ (১৩৫৭ – ১৩৯৩ সাল)

পিতার মৃত্যুর পর সিকান্দার শাহ্ বাঙ্গালার মসনদে আরোহণ করেন। তিনি ছিলেন পিতার উপযুক্ত পুত্র। তাঁর সুদীর্ঘকালের শাসন তাই প্রমাণ করে। বাংলার আর কোন সুলতান বা শাসনকর্তা এত দীর্ঘকাল এদেশ শাসন করেন নি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই অনন্যসাধারণ সুলতানের সম্পর্কে বিশেষ কোন তথ্যই জানা যায় না। ইতিহাস গ্রন্থে যা উল্লিখিত আছে তা হচ্ছে দিল্লীর সুলতান ফিরোজ শাহ্ কর্তৃক দ্বিতীয় বারের মত বাংলায় যুদ্ধাভিযান। এই অভিযানে ফিরোজ শাহ্র বাহিনীতে ছিল ৭০,০০০ ঘোড়সওয়ার, ৪৭০টি রণহস্তী এবং অনেক নৌকা। এখানে প্রশ্ন জাগতে পারে, সুলতান ইলিয়াস শাহ্র সঙ্গে উপঢৌকন বিনিময়ের পরে পরেই কেন দিল্লীর সুলতান বাংলায় অভিযান পরিচালনা করেন। “পরবর্তীকালে লেখা ইতিহাস গ্রন্থগুলিতে ফিরোজ শাহের এই দ্বিতীয় বঙ্গাভিযান সম্বন্ধে নতুন কথা পাওয়া যায়। ‘তারিখ-ই-মুবারক শাহী’তে লেখা আছে যে, ৭৫৯ হিজরার শেষ দিকে বাংলাদেশ থেকে দূতেরা ফিরোজ শাহের দরবারে উপঢৌকন নিয়ে এসেছিল এবং তারপর ফিরোজ শাহ বাংলাদেশে অভিযান করেন। এ কথা সত্য বলেই মনে হয়। তা হলে বলতে হবে, ফিরোজ শাহের অভিযানের প্রস্তুতি তার আগেই সম্পূর্ণ হয়েছিল, কিন্তু ফিরোজ শাহ বাংলার রাজদূতদের কিছুই বুঝতে দেন নি এবং তারা চলে যাবার পরে তিনি বাংলার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। ... ফিরোজ শাহের প্রথম বঙ্গাভিযানের সঙ্গে দ্বিতীয় বঙ্গাভিযানের তুলনা করলে বোঝা যায়, দ্বিতীয় অভিযানের সময়ে ফিরোজ শাহ বেশি তৈরী হয়ে এসেছিলেন। প্রথম অভিযানটি ‘তবকাৎ-ই-আকবরী’র উক্তি অনুসারে পুরো এক বছরও স্থায়ী হয়নি এবং ফিরোজ শাহ বর্ষা আসার সম্ভাবনা দেখা মাত্র পশ্চাদপসরণ করেছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় অভিযান দু’বছর সাত মাস স্থায়ী হয়েছিল। এর আসা-যাওয়ার সময়টুকু বাদ দিলে দেখা যায় ফিরোজ শাহ প্রায় দু’বছরের মত সময় বাংলাদেশে ছিলেন। বর্ষাও এবার তাঁকে নিরস্ত করতে পারে নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও সিকন্দর শাহ ভেঙে পড়েন নি। ইলিয়াস শাহের সঙ্গে ফিরোজ শাহের তবু একবার সম্মুখযুদ্ধ হয়েছিল এবং তাতে ফিরোজ শাহ নামমাত্র জয়লাভ করেছিলেন।

১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯।

কিন্তু সিকন্দর এই জাতীয় নামমাত্র পরাজয়ও কোন সময় বরণ করেন নি। সুতরাং সিকন্দর শাহের কৃতিত্ব ইলিয়াস শাহের চেয়েও বেশি।"[১৩]

ফিরোজ শাহের এই দ্বিতীয় বঙ্গাভিযানও সন্ধির মাধ্যমে শেষ হয়েছিল। তাতে বাংলার স্বাধীন সত্তা রক্ষা পেয়েছিল। প্রফেসর রায়-এর কথায়, "A violent storm suddenly burst over Bengal, but its ruler, though new on the throne, met it with cool courage and unbending resolution. He adopted his father's wise policy of avoiding pitched battles and fell back on the fort of Ekdala with his full force.

There lie at present in what had once been a large fortress city, beautified with villas and mosques, only a few mounds and earth-works, silted-up tanks and reservoirs; ploughshares have now obliterated the very outlines of this fort. Yet this was the rampart against which the Delhi army dashed itself in vain again in 1359 AD"[১৪]

বাংলার জন্য গৌরবের নিদর্শন এই একডালা দুর্গটি বর্তমান মালদহ্ জেলার অন্তর্গত প্রাচীন গৌড় নগরীর পাশেই অবস্থিত ছিল। সিকান্দার শাহ্ সম্পর্কে যেহেতু তথ্যাদির অভাব রয়েছে, তাই তাঁর সম্পর্কে এই বলা যায় যে, তাঁর রাজত্বের প্রথম দিকেই দিল্লীর সুলতান ফিরোজ তুগলক বাংলা আক্রমণ করেন। কিন্তু সুলতান সিকান্দার শাহ্ পিতার রণনীতি অনুসরণ করে একডালা দুর্গে আশ্রয় নিয়ে দিল্লীর আক্রমণ প্রতিহত করেন। দিল্লীর প্রথম অভিযানের মত এই দ্বিতীয় অভিযানও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এখানে আবারও উল্লেখ্য যে, 'তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী' দিল্লীস্থ ঐতিহাসিক আফিফের রচনা এবং 'তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী'তে চিত্রিত বাংলার সুলতানের ব্যবহার ও কার্যাবলী মোটেই নিরপেক্ষ নয়। দিল্লী কর্তৃপক্ষ দ্বারা প্রভাবিত সেই ইতিহাসে দিল্লীর সুলতানকেই ঔজ্জ্বল্যমণ্ডিত করা হয়েছে, আর কালিমালিপ্ত করা হয়েছে বাংলার সুলতানকে।

কিন্তু সুলতান সিকান্দার শাহ্ ছিলেন সুনিপুণ ও প্রজারঞ্জক এক শাসনকর্তা। সিকান্দার শাহ্ও সূফী-দরবেশকে খুবই ভক্তি-শ্রদ্ধা করতেন। শেখ শরফ-উদ-দীন ইয়াহিয়া মানেরীর সঙ্গে সুলতানের ছিল গভীর সৌহার্দ্য। সূফী শেখ আলা-উল-হকের সঙ্গেও তাঁর হৃদ্যতা ছিল। কিন্তু ক্রমে তাঁদের মধ্যে জন্ম নেয় মতবিরোধ। কথিত আছে, শেখ আলা-উল-হক তাঁর খানকায় ছাত্র-পথিক ও ভিক্ষুকদের জন্য বিপুল অর্থ ব্যয় করতেন। তিনি এত অর্থ ব্যয় করতেন যে, সুলতানের পক্ষেও এত ব্যয় করা সম্ভব

১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০-৫১।

১৪. Nirod Bhushan Roy, History of Bengal, Vol. 11, The University of Dacca, 1972, P. 112.

হতো না। তাই সুলতান ঈর্ষান্বিত হয়ে শেখ আলা-উল-হককে পাণ্ডুয়া ছেড়ে সোনারগাঁও-এ চলে যেতে বলেন। তদনুযায়ী শেখ আলা-উল-হক চলে আসেন সোনারগাঁও-এ। আর সোনারগাঁও-এর নব-নির্মিত খানকায় শেখ অর্থ ব্যয়ের পরিমাণ আরও বাড়িয়ে দেন।

পাণ্ডুয়ায় আদিনা মসজিদ নির্মাণ সুলতান সিকান্দার শাহ্‌র সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। এই বিরাট মসজিদ নির্মিত হয় ১৩৬৪ সাল থেকে আরম্ভ করে ১৩৭৪ সালের মধ্যে। তার নির্মাণ কাজ শেষ করতে ১০ বছরই লেগেছিল। মসজিদটি ৫০৭১২ ফুট দীর্ঘ এবং ২৮৫১২ ফুট প্রস্থ।

সুলতান সিকন্দর শাহ্‌র মৃত্যু হয় এক নাটকীয় ঘটনার মধ্য দিয়ে। সুলতানের প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে সতেরটি পুত্র এবং দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভে মাত্র একটি, গিয়াস-উদ-দীন। সকল পুত্রের মধ্যে এই গিয়াস-উদ-দীনই ছিলেন জ্ঞানে-গুণে শ্রেষ্ঠ এবং পিতার পরম স্নেহভাজন। কিন্তু বিমাতার চক্রান্তে গিয়াস-উদ-দীন রাজধানী গৌড় ছেড়ে গোপনে চলে আসেন সোনারগাঁও-এ। সোনারগাঁও-এ এসে সেনাবাহিনী গড়ে তোলেন এবং এগিয়ে যান পিতৃ-সিংহানস দখল করতে। পিতা সিকান্দার শাহ্‌ও রাজকীয় বাহিনী নিয়ে স্নেহভাজন পুত্রের মুকাবিলা করেন। যুদ্ধ আরম্ভ হয়। সেই যুদ্ধে নিহত হন সুলতান সিকান্দার। খবর পেয়ে বিজয়ী পুত্র ছুটে এসে মুমূর্ষু পিতার মস্তক কোলের উপর রাখলেন। মৃত্যুপথযাত্রী পিতার চোখে যেন পুত্রের মঙ্গল কামনার দৃষ্টি। পুত্রকে যেন শুভাশীষ জানিয়েই পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন পিতা।

৩১. সুলতান গিয়াস-উদ-দীন আজম শাহ্ (১৩৯৩ – ১৪১০/১১ সাল)

রিয়াজ-উস-সালাতীনে বলা হয়েছে, বিমাতার চক্রান্তই গিয়াস-উদ-দীনকে পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে বাধ্য করে। যুদ্ধে পিতার মৃত্যু হলেও তার জন্য গিয়াস-উদ-দীন সম্পূর্ণ দায়ী ছিলেন না। সৈন্যদের প্রতি তাঁর নির্দেশ ছিল; সুলতানকে কোন রকমেই আহত না করে তাঁকে নিরস্ত্র করতে হবে। কিন্তু কোন এক সৈনিক তাঁকে চিনতে না পেরে বর্শাবিদ্ধ করে। তাতেই তিনি নিহত হন। সে যাক, মসনদে আরোহণ করে সুলতান গিয়াস-উদ-দীন আজম শাহ্ ন্যায়-বিচারক ও সুশাসকরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

উল্লেখ্য যে, তাঁর এই প্রসিদ্ধি রাজ্য বিস্তারের জন্য নয়; তাঁর এই প্রসিদ্ধি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, বিদ্বান ও কবিদের পৃষ্ঠপোষণ, সূফী-সাধকদের প্রতি ভক্তি, ইসলামী সভ্যতার কেন্দ্রস্থলে মাদ্রাসা স্থাপন ও চীন সম্রাটের সঙ্গে দূত বিনিময়ের জন্য। তাঁর ন্যায়বিচারের কাহিনী আজও নানা গল্পে প্রচলিত আছে। তাঁর চরিত্রে ঘটেছিল অনেক গুণের সমাবেশ। তিনি ছিলেন কবি। ফারসী ভাষায় কবিতা লিখতেন। একবার ইরানের বিখ্যাত কবি হাফিজকে বাংলায় আসবার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। মহাকবি হাফিজ বাংলায় না এলেও আজম শাহ্‌র রচিত অসম্পূর্ণ কবিতার পাদপূরণ করে পাঠিয়েছিলেন।

সুলতান গিয়াস-উদ-দীন আজম শাহ্ পবিত্র মক্কা মোয়াজ্জমা ও মদীনা মুনাওয়ারায় বহু অর্থ ব্যয়ে মাদ্রাসা স্থাপন করেন। এই দুই পবিত্র স্থানের অধিবাসীদের মধ্যে বিলি করার জন্য বহু অর্থও তিনি প্রেরণ করতেন। সেখানে তিনি সরাইখানা স্থাপন ও খাল খননের ব্যবস্থাও করেন। তাঁর সমসাময়িক সূফীদের মধ্যে সূফী শেখ আলা-উল-হকের পুত্র ও শিষ্য সূফী শেখ নূর কুতব-ই-আলম ছিলেন সমধিক প্রসিদ্ধ। শেখ আলা-উল-হকের ইন্তিকালের পর শেখ নূর কুতব-ই-আলম বাংলার সূফীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। সুলতান আজম শাহ ছিলেন শেখ নূর কুতব-ই আলমের সহপাঠী। তাঁরা উভয়ে শেখ হামীদ-উদ-দীন কুন্‌জনশীন নাগৌরীর নিকট শিক্ষালাভ করেন। উভয়ের খান্দানের মধ্যে বজায় ছিল সদ্‌ভাব ও সম্প্রীতি। শেখ নূর কুতব-ই-আলমের ভাই আজম খান ছিলেন আজম শাহ্‌র উজীর। সুলতান প্রায়ই শেখ নূর কুতব-ই-আলমের নিকট বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ ও উপদেশ চাইতেন। বিহারের মওলানা মুজাফ্‌ফর শাম্‌স্ বলখীর সঙ্গেও সুলতানের ছিল ভক্তিপূর্ণ সম্পর্ক। মওলানা বলখী ছিলেন সূফী শেখ শরফ-উদ-দীন ইয়াহিয়া মানেরীর শিষ্য। মাওলানা বলখীও চিঠিপত্রের মাধ্যমে সুলতানকে ধর্ম ও রাজ্য শাসন ব্যাপারে উপদেশ দিতেন। সুলতান আজম শাহ্‌র প্রতি মওলানা বলখীর অন্যতম উপদেশ ছিল ঃ

"মহান আল্লাহ বলেছেন ঃ বিশ্বাসীগণ, তোমাদের উম্মাহ্‌র বাইরে কারও সঙ্গে মিত্রতা করো না। তফসীরে বলা হয়েছে যে, বিশ্বাসীরা অবিশ্বাসী এবং অপরিচিত লোকদিগকে বিশ্বস্ত কর্মচারী বা উজীর হিসাবে নিযুক্ত করে না। .... এতে সুবিধা হয় না, বরং বিদ্রোহ ও গোলযোগ হয়। ... ... আল্লাহ বলেছেন, তারা শুধু তোমার ধ্বংস কামনা করে। ... ... বিধর্মীদের সামান্য কাজে নিয়োগ করা যায় কিন্তু ওয়ালি (শাসনকর্তা) নিযুক্ত করা উচিত নয়। ... ... আল্লাহ্ বলেছেন, আল্লাহ্‌কে উপেক্ষা করে বিধর্মীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা উচিত নয়। যদি কেউ তা করে, সে আল্লাহ্‌র নিকট থেকে সাহায্য পাবে না, শুধু বিধর্মীদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সতর্ক বাণীই পাবে। যারা মুসলমানদের উপর বিধর্মীদের কর্তৃত্ব প্রদান করে তাদের বিরুদ্ধে কোরান হাদীস ও ইতিহাসে অনেক সতর্ক বাণী রয়েছে। ... . ইত্যাদি।" (জার্নাল অব দি বিহার রিসার্চ সোসাইটি, ভল্যুম ৪২, ২য় খণ্ড, ১৯৫৬, পৃ. ১০-১১ উদ্ধৃত, বাংলার ইতিহাস, ডক্টর আবদুল করিম)।

উপরোক্ত উপদেশ-পত্র থেকে বোঝা যায়, সূফীগণ মুসলমান রাজ্যে হিন্দুগণকে উচ্চপদে নিয়োগের বিরোধী ছিলেন। ডক্টর আবদুল করিমের কথায়, "সুলতান শামস-উদ-দীন ইলিয়াস শাহের সময়ে হিন্দুরা উচ্চপদ লাভ করিতে থাকে। হিন্দু সৈনিক ও সেনাপতিরা মুসলমানদের সঙ্গে মিলিতভাবে দিল্লীর সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধও করে। মনে হয় ইলিয়াস শাহী আমলে এই নিয়ম চলিতে থাকে এবং আজম শাহের সময়েও

হিন্দুরা উচ্চপদ এমন কি উজীর পদেও নিযুক্ত হয়। রাজা গণেশের নাম উল্লেখযোগ্য; তিনি আজম শাহের সময়ে উচ্চপদ লাভ করেন। আজম শাহ্ মুজফফর শামস্ বলখীর উপদেশ গ্রহণ করেন কি-না বলা যায় না। তবে পরবর্তী ঘটনাবলীতে দেখা যায় যে মওলানা সাহেবের উক্তি যথার্থ। হিন্দু উচ্চপদস্থ কর্মচারীরাই ইলিয়াস শাহী বংশ নিধন করেন এবং গণেশ এই ব্যাপারে নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ইলিয়াস শাহী বংশকে ধ্বংস করিয়া গণেশ ক্ষমতা দখল করেন এবং স্বীয় বংশের প্রতিষ্ঠা করেন।"[১৫]

রিয়াজ-উস-সালাতীনের ভাষ্য অনুযায়ী, রাজা গণেশের ষড়যন্ত্রে ১৪১০/১১ সালে সুলতান গিয়াস-উদ-দীন আজম শাহ্ নিহত হন। মুসলিম রাজশক্তির সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে মুসলিম শাসনকর্তার প্রতি আনুগত্যের আবরণে সেই শাসনকর্তা ও রাজশক্তিকে ধ্বংস করার কাজে হিন্দু প্রধানদের এমনি চরিত্রের প্রকাশ বাংলায় এই-ই প্রথম।

সুলতান গিয়াস-উদ-দীন আজম শাহ্ সম্পর্কে অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় বলেনঃ "বাংলার সমস্ত স্বাধীন সুলতানদের মধ্যে তাঁর মত আকর্ষণীয় চরিত্র বোধ হয় আর কারও নেই। লোকরঞ্জক ব্যক্তিত্বের দিক দিয়ে তাঁর তুলনা হয় না। তাঁর চরিত্রে নানারকম বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ হয়েছিল। এই সুলতানের যে সমস্ত কার্যকলাপের বিবরণ পাওয়া যায়, প্রায় প্রত্যেকটির মধ্যে একটি উন্নত বৈচিত্র্যপ্রিয় রুচিবান বিদগ্ধ মনের পরিচয় মেলে। এর জীবনের কোন কোন ঘটনা এতই বিচিত্র যে, সেগুলি থেকে একে রূপকথার রাজপুত্রের সমপর্যায়ভুক্ত বলে মনে হয়।"[১৬]

৩২. সুলতান সাইফ-উদ-দীন হামজা শাহ্ (১৪১০/১১-১৪১১/১২ সাল)

সুলতান গিয়াস-উদ-দীন আজম শাহ্র মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সাইফ-উদ-দীন হামজা শাহ্ বাংলার মসনদে আরোহণ করেন। ফিরোজাবাদ, সাতগাঁও এবং মুয়াজ্জমাবাদের টাকশাল থেকে উৎকীর্ণ মুদ্রা থেকে এবং তাবকাত-ই-আকবরী, তারিখ-ই-ফিরিশ্তা ও রিয়াজ -উস-সালাতীনের উল্লেখ থেকে জানা যায় যে, তিনি সুলতান-উস-সালাতীন বা সুলতানদের সুলতান উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। ঐতিহাসিক ফিরিশতার মতে, সুলতান হামজা শাহ্ ছিলেন সাহসী, উদার এবং ধৈর্যশীল। কিন্তু হামজা শাহ্ বেশি দিন রাজত্ব করতে পারেন নি। কারণ, উজীর রাজা গণেশের চক্রান্তে সুলতানের ক্রীতদাস শিহাব-উদ-দীন তাঁকে হত্যা করে নিজেই মসনদ অধিকার করে।

---

১৫. ডক্টর আবদুল করিম, বাংলার ইতিহাস, সুলতানী আমল, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭, পৃ. ২৪২-২৪৩।

১৬. শ্রী সুখময় মুখোপাধ্যায়, বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৮০, পৃ. ৬০।

পঞ্চম অধ্যায়

ব্রাহ্মণ্য পুনরুত্থান-প্রয়াসকাল
(১৪১২-১৪১৮ সাল)

শ্রীমান নৃসিংহস্য মহাত্মনো বৈ যশঃ প্রসূনে
স্ফুটিতে মনোজ্ঞে।
তৎসৌরভ ব্যূহবিমোহিতাত্মা রাজা গণেশেরা বহু শাস্ত্রদর্শী॥
....
গ্রহপক্ষাক্ষিশশধৃতমিতে শাকে সুবুদ্ধিমান্।
গণেশো যবনং জিত্বা গৌড়ৈকচ্ছত্রধ্বগভৃৎ॥
(বাল্যলীলাসূত্র)

সেই নরসিংহের যশ ঘোষে ত্রিভুবন।
সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত অতি বিচক্ষণ॥
যাঁহার মন্ত্রণাবলে শ্রীগণেশ রাজা।
গৌড়ের বাদশাহ মারি গৌড়ে হৈল রাজা।
(অদ্বৈতপ্রকাশ)

প্রভাকরের পুত্র নরসিংহ নাড়িয়াল।
গণেশ রাজার মন্ত্রী লোকে ঘোষে সর্ব্বকাল॥
....
দৈবে শ্রীইট্ট হৈতে শ্রীগণেশ রাজা।
নরসিংহ নাড়িয়ালে করিলেক পূজা॥
(প্রেমবিলাস)

"বাংলা দেশের 'মধ্যযুগের' ইতিহাসে যাঁদের নাম ভাস্বর অক্ষরে লেখা রয়েছে, রাজা গণেশ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। একক কৃতিত্বের দিক দিয়ে গণেশের সঙ্গে খুব কম লোকেরই তুলনা চলতে পারে। ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলা ছিল মুসলমানদের অধিকারে। এর মধ্যে কোন কোন সময় অঞ্চল বিশেষে হিন্দুদের প্রাধান্য স্থাপিত হয়েছে বটে, কিন্তু সমগ্র বাংলার সিংহাসন অধিকার এই একটিমাত্র হিন্দুর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে গণেশ বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গের মত আবির্ভূত হয়ে অসাধ্য সাধন করেছিলেন, প্রবল বিরুদ্ধশক্তির বাধাকে জয় করে বাংলায় হিন্দু রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। গণেশের কীর্তির অসামান্যতা সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মধ্যে দ্বিমত নেই।"[১]

শ্রী মুখোপাধ্যায়ের উপরোক্ত মন্তব্যের যথার্থতা প্রশ্নাতীত। রাজা গণেশের এই যে অসাধ্য সাধন, তার সূত্রপাত হয়েছিল ইলিয়াস শাহী সুলতান গিয়াস-উদ-দীন আজম শাহ্‌র রাজত্বের শেষ দিকেই। "সুলতান গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ্‌র মৃত্যুর প্রসঙ্গে আমরা রাজা গণেশের প্রথম উল্লেখ পাচ্ছি এবং গিয়াসুদ্দীনের পরবর্তী সুলতানদের সময়ে তাঁকে বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন দেখতে পাচ্ছি। এই ক্ষমতারই পরিণতি হয়েছিল বাংলার সিংহাসন অধিকার করার মধ্যে। এক হিন্দু জমিদারের এতখানি ক্ষমতা অর্জন সত্যিই বিস্ময়ের বিষয়। আপাতদৃষ্টিতে এই ব্যাপারকে একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনামাত্র মনে হয়; কিন্তু ঐ সময়ের ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য রাখলে ঘটনাটিকে বিচ্ছিন্ন বলে মনে হবে না।"[২] এর ব্যাখ্যা হিসাবে শ্রী মুখোপাধ্যায় ওই সময়ে বাংলার হিন্দু জমিদারদের শক্তির কথা উল্লেখ করেছেন। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় দিল্লীর ফিরোজ শাহ্ তুগলক যখন বাংলার বিদ্রোহী সুলতান ইলিয়াস শাহ্‌কে দমন করতে বংলাদেশে প্রথম যুদ্ধাভিযান চালান, তখন বাংলার হিন্দু জমিদারগণ ইলিয়াস শাহ্‌র পক্ষ নিয়ে যুদ্ধ করেন। 'তারিখ-ই-মুবারক শাহী' অনুযায়ী সহদেব নামে একজন হিন্দু ইলিয়াস শাহ্‌র পক্ষ নিয়ে যুদ্ধ করে প্রাণ দেন।

কিন্তু মুসলিম অধিকৃত বাংলার হিন্দু জমিদারদের প্রভূত শক্তি ছাড়াও বাংলার পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলোর পরিস্থিতিও আমাদের বিবেচনা করতে হবে। এখানে উল্লেখ্য, গিয়াস-উদ-দীন আজম শাহ্‌র রাজত্বের শেষার্ধে বিখ্যাত সূফী হযরত মুজাফ্‌ফর শাম্‌স্ বল্‌খী একটি চিঠিতে সুলতানকে কুরআন হাদীসের উক্তি উদ্ধৃত করে বিধর্মীদের সম্বন্ধে

১. শ্রী সুখময় মুখোপাধ্যায়, বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৮০, পৃ. ৯৮।

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫।

সাবধান হতে উপদেশ দিয়েছিলেন। এই চিঠির অংশ বিশেষ সুলতান গিয়াস-উদ-দীন আজম শাহ্র বিবরণীতে উদ্ধৃত হয়েছে। সুলতানকে লেখা সূফী সাহেবের অন্যান্য চিঠি থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, সুলতানের দরবারে ততদিনে হিন্দু প্রধানদের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে উঠেছিল। তদুপরি, সুলতানের রাজ্যের পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলোর স্বরূপ কি ছিল ?

১২২৭ সাল থেকে ১২৮৭ সালের মধ্যে বাংলার রাষ্ট্রীয় অবস্থা সম্পর্কে বলতে গিয়ে ডক্টর কানুনগো বলেন,"Here in Bengal the political maxim gained ground that whosoever could kill or oust the reigning ruler should be acknowledged without demur as its legitimate master and the Bengalees whether Turks or Hindus remained generally indifferent to the fate of their rulers and enunciated a constitutional principle of their own that the loyalty of a subject was due to the masnad (throne) and not to the person who happened to occupy it ... Another notable feature of the history of this period was the beginning of a sort of rapprochment between the conquerors and their Hindu subjects. The exodus of upper-class Hindus on a wide scale from the Muslim territory gradually stopped, and now for the first time we come across references to Hindus as a respectable class of inhabitants in the Muslim capital."[৩]

পার্শ্ববর্তী রাজ্যসমূহের কথা বলতে গিয়ে ডক্টর কানুনগো বলেন, "But on the whole the fortune of Islam at this period was at a stand still and the Muslim power of Lakhnawati suffered relative decay in comparison with the Hindu powers in Kamrup, East Bengal and Orissa. The ancient Hindu principalities in Kamrup (Kamta Hajo) were supplanted by a powerful confederacy of Bara-Bhuyans' of immigrant Mongoloid tribes. Under the impulse of a Neo-Hinduism the Koch, Mech, Tharu and other Mongoloid tribes assumed the role of Kshatriyas and proved an effective barrier to the progress of Muslim arms in the tract between the Karatoya and the Subarnasri rivers for about a century : and further east the Shan invaders from Upper Burma under their kings Sukhapha and his son Sutepha (1268-1281) laid the foundations of Ahom kingdom of Gauhati. Hinduism with its wonderful vitality and elasticity strangled the Buddhism of the Shans

৩. Dr. Kalika Ranjan Qanungo, History of Bengal, Vol. II. The University of Dacca. 1972, PP. 42-43.

who now formed the second line of defence against Islam ... The greatest and the most direct menace to the Muslim power of Lakhnawati was the mighty Eastern Ganga empire of Orissa. A feudatory of the Gangas who had his seat at Jajpur ... proved more than a match for the Mamluk rulers of Lakhnawati."[8]

ডক্টর কানুনগোর উপরোক্ত মন্তব্য পরবর্তীকালের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। পরবর্তীকালে পূর্ববঙ্গ মুসলিম অধিকারে চলে এসেছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু মুসলিম রাজ্যটির পার্শ্ববর্তী পূর্বাঞ্চলীয় গঙ্গা রাজ্য, আসামের কামরূপ রাজ্যাদি ইসলাম বিরোধী শক্তি হিসাবে বিদ্যমান ছিল এবং ইলিয়াস শাহী সুলতানদের রাজ্য বিস্তারের আশঙ্কা তাঁদের পুরোপুরিই বহাল ছিল। বাংলার মুসলিম রাষ্ট্রশক্তির ধ্বংস কামনাও তাই তাঁদের মনে জাগরূক থাকা খুবই স্বাভাবিক ছিল। ঠিক তেমনি, মুসলিম রাষ্ট্রশক্তিকে বাস্তবতার নিরিখে মেনে নিলেও মুসলিম অধিকৃত বাংলার হিন্দু প্রধানগণ যে কোন সুযোগে বাংলায় হিন্দুশক্তির পুনরুত্থানকে স্বাগত জানাবেন না, তা কি করে ভাবা যায়? মুসলিমদের যদি মুসলিম রাষ্ট্রশক্তির প্রতি অনুরাগ থাকে, তাহলে হিন্দুদের হিন্দু রাষ্ট্রশক্তির প্রতি অনুরাগ থাকবে না কেন?

রাজা গণেশ ছিলেন মুসলিম অধিকৃত বাংলার এমন এক শাক্তিশালী হিন্দু জমিদার, যিনি হিন্দু হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের স্বপ্নই হয়তো দেখতেন। রাজা গণেশের স্বপ্ন হয়তো মিলে গিয়েছিল কামরূপ ও উড়িষ্যার হিন্দু রাজ্যগুলির মিলিত আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে। সুলতান গিয়াস-উদ-দীন আজম শাহ্ কামতা ও কামরূপ রাজ্যে ব্যর্থ অভিযান চালিয়েছিলেন। তেমনি ব্যর্থ অভিযান চালিয়েছিলেন উড়িষ্যার গঙ্গারাজ শিবসিংহের বিরুদ্ধে। "অসমীয়া বুরঞ্জীর সাক্ষ্য বিশ্বাস করলে বলতে হয় যে, গিয়াসুদ্দীনের কামতা-রাজ্য জয়ের অভিযান ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। কয়েকটি বুরঞ্জীতে লেখা আছে যে, অহোম্-রাজ সুদঙ্গফা (১৩৯৭-১৪০৭ খ্রী.) কামতা-রাজের উপরে অপ্রসন্ন হয়ে তাঁর রাজ্য আক্রমণ করেছিলেন, কারণ তাঁর স্ত্রী গুপ্ত প্রণয়ী তাই-সুলাইকে কামতা-রাজ আশ্রয় দিয়েছিলেন। এইভাবে কামতা-রাজ্য একদিক থেকে অহোম-রাজ কর্তৃক আক্রান্ত হলে বাংলার সুলতান সুযোগ বুঝে কামতা-রাজ্য আক্রমণ করেন। কামতা-রাজ তখন বিপদ দেখে অহোম্-রাজের সঙ্গে তাঁর কন্যা ভাজনীর বিবাহ দিয়ে তাঁর সঙ্গে সন্ধি করলেন এবং অহোম-রাজ ও কামতা-রাজ তখন এক সঙ্গে বাংলার সুলতানের বিরুদ্ধে তাঁদের সেনাবাহিনী সমবেত করে রুখে দাঁড়ালেন। তার ফলে বাংলার সুলতানের সৈন্যবাহিনীকে করতোয়া নদীর এপার পর্যন্ত গিয়েই ক্ষান্ত হতে হলো। বলা বাহুল্য যে, এই সময়ে গিয়াস-উদ-দীন আজম শাহ্ বাংলার সুলতান ছিলেন। সমসাময়িক কবি

৪. Ibid, P. 43.

বিদ্যাপতির বিভিন্ন গ্রন্থ পড়লে মনে হয়, তাঁর পৃষ্ঠপোষক রাজা শিবসিংহ গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ্‌কে পরাজিত করেছিলেন। ... ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতি শিবসিংহের কাছে যদি গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ্ পরাজিত হয়ে থাকেন, তাহলে বলতে হবে ঐ সময়ে তাঁর সামরিক শক্তি একেবারে দৈন্য দশায় এসে পৌঁছেছিল। এর আগেকার দীর্ঘবিলম্বিত এবং অনেকাংশে ব্যর্থ সমর প্রচেষ্টাগুলিই বোধ হয় এর প্রধান কারণ। শিবসিংহের সঙ্গে রাজা গণেশের বন্ধুত্ব ছিল। গণেশের অভ্যুত্থানে সাহায্য করার জন্যই সম্ভবত শিবসিংহ গৌড়েশ্বরের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন।"[৫]

তাছাড়া সুলতানের দরবারীদের সম্পর্কে স্যার যদুনাথ সরকারের মন্তব্য হচ্ছে ঃ

"We can well imagine that during Sikandar Shah's long reign of 35 years' his wealth and life of pleasure and inactivity had thoroughly sapped the energies of the Bengal Sultanate, and that in the declining years of his son Ghiyasuddin Azam Shah (say, after 800 AH) the nobles became all powerful in the state and pulled down and set up princes on the throne at their own will. Among these king makers the leader was Rajah Ganesh (variant of the name, Kans)."[৬]

মুসলিম অধিকৃত বাংলার ভেতরের ও বাহিরের হিন্দু শক্তির সম্ভাব্য মনোবাসনা, দরবারীদের শিথিল রাজানুগত্য এবং দরবারে হিন্দু প্রধানদের উপস্থিতি, সুলতান আজম শাহ্‌র সৈন্যবাহিনীর ক্ষয়িষ্ণু দুর্বলতা এবং সর্বোপরি সুলতানের স্বভাব-প্রকৃতি সব মিলে হযরত মুজাফ্ফর শাম্স্ বল্খীকে চিন্তিত করে তুলেছিল নিশ্চয়। এক চিঠিতে হযরত বল্খী সুলতানকে লিখেছিলেন, "তুমি রাজা এবং যুবক । অতীতে কিছুকাল তুমি সুখ এবং আমোদ-প্রমোদে নিমগ্ন ছিলে, কিন্তু এখন তুমি পবিত্র ও ধর্মনিষ্ঠ জীবন কামনা করছ।"[৭] তাই বৃদ্ধ সূফী সাহেব অনেক চিঠির একটিতে দরবারে হিন্দু প্রধানদের সম্পর্কে সাবধান ও উপদেশ বাণী দিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে ডক্টর আবদুল করিমের মন্তব্য হচ্ছে ঃ "মুসলমান সুফীরা মুসলমান রাজ্যে হিন্দুদের উচ্চপদে নিযুক্তির বিরোধী ছিলেন। ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে যে, সুলতান শামস-উদ-দীন ইলিয়াস শাহের সময়ে হিন্দুরা উচ্চপদ লাভ করিতে থাকে। হিন্দু সৈনিক ও সেনাপতিরা মুসলমানদের সঙ্গে মিলিতভাবে দিল্লীর সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধও করে। মনে হয় ইলিয়াস শাহী আমলে এই নিয়ম চলিতে থাকে এবং আজম শাহের সময়েও হিন্দুরা উচ্চপদ এমন কি উজীর পদেও

---

৫. শ্রী সুখময় মুখোপাধ্যায়, বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৮০, পৃ. ৭৯-৮০।

৬. Sir Jadunath Sarkar, History of Bengal, Vol. II, The University of Dacca, 1972, P.116.

৭. শ্রী সুখময় মুখোপাধ্যায়, বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৮০, পৃ. ৬৭।

নিযুক্ত হয়। রাজা গণেশের নাম উল্লেখযোগ্য; তিনি আজম শাহের সময়ে উচ্চপদ লাভ করেন। আজম শাহ মুজফফর শমস বলখীর উপদেশ গ্রহণ করেন কিনা বলা যায় না। তবে পরবর্তী ঘটনাবলীতে দেখা যায় যে, মওলানা সাহেবের উক্তি যথার্থ। হিন্দু উচ্চপদস্থ কর্মচারীরাই ইলিয়াস শাহী বংশ নিধন করেন এবং গণেশ এই ব্যাপারে নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ইলিয়াস শাহী বংশকে ধ্বংস করিয়া গণেশ ক্ষমতা দখল করেন এবং স্বীয় বংশের প্রতিষ্ঠা করেন।"[৮]

শ্রী মুখোপাধ্যায়ের মতে, অবিশ্যি সুলতান গিয়াস-উদ-দীন আজম শাহ্ সূফী সাহেবের উপদেশ মত কাজ করেছিলেন এবং তাতে করে ভ্রান্ত নীতি (ধর্মান্ধতা) অনুসরণ করেছিলেন। তাঁর কথায়, "রাজা গণেশের অভ্যুত্থান কেবলমাত্র তার ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাষের দরুন ঘটেনি। হিন্দুদের সম্বন্ধে গিয়াসুদ্দীন যে ভ্রান্ত নীতি অনুসরণ করেছিলেন, সেই নীতিই এজন্য দায়ী। তবে যতদূর মনে হয়, গিয়াসুদ্দীন তাঁর রাজত্বের প্রথম দিকে এই ভ্রান্ত নীতি অনুসরণ করেননি, শেষের দিকে করেছিলেন; এবং তারই ফলে এই মহান নৃপতির রাজত্ব ও জীবন এক করুণ পরিসমাপ্তির মধ্যে পর্যবসিত হয়েছিল।"[৯]

মুসলিম অধিকৃত বাংলার তদানীন্তন ভেতরের ও বাইরের হিন্দু-মনোভাবের প্রেক্ষিতে এবং সুলতানী দরবারের চারিত্রিক পরিচয়ের বিবেচনায় আমাদের সিদ্ধান্তটা একটু অন্য রকমের। হিন্দু শক্তি পুনরুত্থানের ক্ষেত্র বাংলার সুলতান দরবারে অনেক দিন ধরেই প্রস্তুত হচ্ছিল। তারই সব লক্ষণ ধরা পড়েছিল হযরত মুজাফ্ফর শামস বল্খীর দৃষ্টিতে। তিনি শেষ উপদেশ দিয়েছিলেন। সুলতান গিয়াস-উদ-দীন আজম শাহ্র চৈতন্যোদয়ও হয়তো ঘটেছিল। কিন্তু ততদিনে বহু বিলম্ব হয়ে গেছে। তাই সুলতানের জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই আঘাত হানলেন ব্রাহ্মণ্য শক্তির পুরোধা রাজা গণেশ। নিহত হলেন সুলতান গিয়াস-উদ-দীন আজম শাহ্। সুলতান হলেন নিহত সুলতানের পুত্র সাইফ-উদ-দীন হামজা শাহ্। দু'বছর যেতে না যেতেই আবার হানা হলো আঘাত। এবার তরুণ সুলতানের হত্যাকারী সুলতানেরই ক্রীতদাস শিহাব-উদ-দীন। হত্যা করালেন রাজা গণেশ। আপাত দৃষ্টিতে শেষ হয়ে গেল ইলিয়াস শাহী বংশের রাজত্ব। "সৈফুদ্দীন হাম্জা শাহের মৃত্যুর পর বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতা কার্যত রাজা গণেশের হাতে এল। কিন্তু নামে রাজা হলেন অন্য ব্যক্তি। তাঁর নাম শিহাবুদ্দীন বায়াজিদ শাহ্।"[১০]

---

৮. ডক্টর আবদুল করিম, বাংলার ইতিহাস, সুলতানী আমল, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭, পৃ. ২৪২-২৪৩।
৯. শ্রী সুখময় মুখোপাধ্যায়, বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৮০, পৃ. ৮৪।
১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩।

৩৩. সুলতান শিহাব-উদ-দীন বায়েজীদ শাহ্ (১৪১১/১২ -১৪১৪/১৫ সাল)

প্রভুহন্তা শিহাব-উদ-দীন সুলতান ছিলেন মোট তিন বছরের মত। তাঁর মুদ্রাগুলো পাণ্ডুয়া, সাতগাঁও ও মুয়াজ্জমাবাদের টাকশাল থেকে উৎকীর্ণ হয়েছিল। "সম্ভবত শিহাবুদ্দীন গণেশের বিরুদ্ধে যাবার চেষ্টা করাতেই গণেশ তাকে আক্রমণ ও বধ করেছিলেন।"[১১]

৩৪. সুলতান আলা-উদ-দীন ফিরোজ শাহ্ (অল্পদিন)

বায়েজীদ শাহ্র মৃত্যুর পরে কিছুদিনের অবস্থাটা বেশ ঘোলাটে। কোন ইতিহাসে বায়েজীদ শাহ্র পরবর্তী সুলতানের নাম পাওয়া যায় না। কিন্তু বায়েজীদ শাহ্র রাজত্বের শেষ বছরে আলা-উদ-দীন ফিরোজ শাহ্ কর্তৃক উৎকীর্ণ মুদ্রা পাওয়া যায়, যাতে তিনি নিজেকে বায়েজীদ শাহ্র পুত্র বলে দাবি করেছেন। মুদ্রাগুলি উৎকীর্ণ করা হয়েছিল সাতগাঁও ও মুয়াজ্জমাবাদের টাকশাল থেকে, ফিরোজাবাদ বা পাণ্ডুয়ার টাকশাল থেকে নয়। তাই ডক্টর আবদুল করিম মনে করেন ঃ গণেশ বায়েজীদকে হত্যা করার পর আলা-উদ-দীন ফিরোজ শাহ্ কোন রকমে ফিরোজাবাদ থেকে পালিয়ে গিয়ে সৈন্যদের সহায়তায় পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গে স্বীয় কর্তৃত্ব স্থাপনের চেষ্টা করেন। কিন্তু গণেশ তাকে আক্রমণ করে পরাস্ত করেন। এবার বাংলার মসনদে অধিষ্ঠিত হন গণেশ নিজেই।

৩৫. রাজা গণেশ (১৪১৪/১৫ -১৪১৬ সাল)

ঐতিহাসিক সুখময় মুখোপাধ্যায়ের মতে, একক কৃতিত্বের দিক দিয়ে গণেশের সঙ্গে খুব কম লোকের তুলনা চলতে পারে। ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলা ছিল মুসলমানদের অধিকারে। এর মধ্যে কখনো কোথাও হিন্দুদের প্রাধান্য স্থাপিত হয়েছে বটে, কিন্তু সমগ্র বাংলার সিংহাসন অধিকার করার কৃতিত্ব একমাত্র গণেশেরই।

সুলতান সিকান্দার শাহ্র সময় থেকেই বাংলার রাজধানীতে আরম্ভ হয় দলীয় কোন্দল। তারই প্রভাবে হয়তো অনিবার্য হয়ে ওঠে গিয়াস-উদ-দীন আজম শাহ্র সঙ্গে তাঁর পিতা সুলতান সিকান্দারের যুদ্ধ। গিয়াস-উদ-দীন আজম শাহ্ মসনদ লাভ করেন। সে সময়েই ভাতুড়িয়ার প্রাচীন জমিদার বংশের সন্তান রাজা গণেশ সুলতানের প্রশাসনে উচ্চপদ লাভ করেন এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হন। রাজা গণেশের পরবর্তী কার্যাবলীর রূপরেখা সুলতান গিয়াস-উদ-দীন আজম শাহ্, সাইফ-উদ-দীন হামজা শাহ্ এবং বায়েজীদ শাহ্ ও তদীয় পুত্র আলা-উদ-দীন ফিরোজ শাহ্র নিহত হওয়ার মধ্য দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে। রাজা গণেশের এই কৃতিত্বের পেছনে যে রাজধানীর আমীরজনদের

---

১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫।

দলীয় কোন্দল যথেষ্ট কার্যকরী ছিল তা ধারণা করা যায়। অবিশ্যি ক্ষমতা কুক্ষিগত করার পর রাজা গণেশ যখন নিজ মুখোশ খুলে ফেলে নিজেই সিংহাসনে বসলেন তখন আমীরজনদের বোধোদয় হয়। কিন্তু গণেশের বিরোধিতা করার ক্ষমতা তখন আর তাদের হাতে ছিল না। রাজা গণেশ তখন দনুজমর্দনদেব উপাধি গ্রহণ করে বাংলার সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত ।

"কিন্তু নেতৃত্ব আসিল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে। রাজনীতিতে যাঁহার কোন আসক্তি ছিল না, যিনি পার্থিব ভোগবিলাসে বিমুখ, সেই জ্ঞানবৃদ্ধ দরবেশ নূর কুতব আলম যখন দেখিলেন যে, দেশের মুসলমান আমীর-ওমরাহ্‌রা হতবল, তখন তিনি পার্শ্ববর্তী স্বাধীন রাজ্য জৌনপুরের সুলতান ইবরাহীম শর্কীকে বাংলাদেশ আক্রমণের আমন্ত্রণ জানাইলেন। গণেশ কর্তৃক মুসলমানদের উৎপীড়ন বিশেষ করিয়া মুসলমান দরবেশদের উপর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া তিনি রাজনৈতিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিলেন। ইবরাহীম শর্কী বাংলাদেশ আক্রমণ করেন। এই সংবাদ পাইয়া গণেশ ভীত হইয়া পড়েন এবং নিজের ছেলেকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করিয়া তাঁহার হাতে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া তিনি নূর কুতব আলমের সঙ্গে সমঝোতা করিয়া ফেলেন। রাজনীতিবিদ গণেশ যে চাতুরী করিলেন, তাহা নূর কুতব আলম বুঝিতে পারিলেন না। তিনি সরলভাবে যদুকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন এবং একজন মুসলমানকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত দেখিয়া তিনি ইবরাহীম শর্কীকে ফিরিয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু ইবরাহীম শর্কী ফিরিয়া গেলে নূর কুতব আলম দেখিলেন যে, যদিও একজন মুসলমান সিংহাসনে অধিষ্ঠিত, সমস্ত ক্ষমতা গণেশের হাতেই এবং মুসলমানদের উপর অত্যাচারও পূর্বের মতই চলিতেছে।"[১২]

নূর কুতব-ই-আলমের ইন্তিকালের পর এ সত্য আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। রাজা গণেশ যদুকে শুদ্ধির মাধ্যমে আবার হিন্দু ধর্মে ফিরিয়ে আনেন এবং তাঁকে মসনদ থেকে সরিয়ে নিজেই আবার তাতে আরোহণ করেন। এবারে প্রায় ১৪ মাস রাজত্ব করার পর তিনি নিহত হন। নিহত হন অস্বাভাবিকভাবেই। যদুকে হিন্দু করেই তিনি ক্ষান্ত হন নি। তাঁকে কারারুদ্ধও করে রাখেন এবং যদুও কারাগার থেকে পালিয়ে পিতাকে গোপনে হত্যার ব্যাপার সমাধা করেন। অবিশ্যি যদু সঙ্গে সঙ্গে সিংহাসনে আরোহণ করেন নি। কারণ দরবারের ষড়যন্ত্র ততদিনে দৃঢ়মূল হয়ে গেছে। কাজেই রাজা গণেশের মৃত্যুর পর বাংলার সিংহাসনে বসেন তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র মহেন্দ্রদেব। তবে মহেন্দ্রদেবের রাজত্বকাল ছিল মাস দুয়েকের বেশি নয়। এর মধ্যে যদুসেন আবার ইসলাম ধর্মে ফিরে আসেন এবং মহেন্দ্রদেবের স্থলে নিজে মসনদে আরোহণ করেন। অভিহিত হন জালাল-উদ-দীন মুহম্মদ শাহ্ বলে।

---

১২. ডক্টর আবদুল করিম, বাংলার ইতিহাস, সুলতানী আমল, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭, পৃ. ২৮৫-২৮৬।

ষষ্ঠ অধ্যায়

আবার সালতানাত আমল
(১৪১৮-১৪৩৫/৩৬ সাল)

বিদ্যাসু তাসু বিনয়ী প্রণয়ী গুণেষু।
গৌড়াধিপাদুপচিতপ্রচুরপ্রতিষ্ঠঃ।
সোহহং যথামতি বৃহস্পতিরাতনোমি
ব্যাখ্যাবৃহস্পতিমলংকৃতিকাব্যলিঙ্গম॥

(গৌড়াধিপের কাছে প্রতিষ্ঠা লাভের
উল্লেখমূলক বৃহস্পতি মিশ্রের শ্লোক)

আরবী ভাষায় লোকেঁ ন বুঝে কারণ।
সভানে বুঝিতে কৈলুঁ পয়ার রচন॥
যে বলে বলৌক লোকেঁ করিলুঁ লিখন।
ভালে ভাল মন্দে মন্দ ন যাএ খণ্ডন॥
রচিলেক মোজাম্মিলে পঞ্চালি সুছন্দ।
দেশি ভাষে রচিলুং মাঝে মৃদু মন্দ॥
নীতি শাস্ত্র-বার্তা যে জন পঢ়এ শুনএ।
আপ্তযশ বাঢ়ে জান দারিদ্র্য খণ্ডএ॥

(কবি মোজাম্মিল)

৩৬. সুলতান জালাল-উদ-দীন মুহম্মদ শাহ্ (১৪১৮-১৪৩৩ সাল)

সুলতান ইবরাহীম শর্কীর বাংলা আক্রমণের সময় রাজা গণেশ তাঁর ১২ বছর বয়স্ক পুত্র যদুকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হতে দিয়ে সিংহাসন ছেড়ে সরে দাঁড়ান। প্রায় দুই বছর যদু ছিলেন সিংহাসনে আসীন। তারপর তাঁকে সরিয়ে আবার রাজা গণেশের সিংহাসনারোহণ এবং প্রায় ১৪ মাস পর মৃত্যুবরণ। অতঃপর মাস দুয়েক মহেন্দ্রদেবের রাজত্বকাল এবং তারপর আবার যদুর মসনদ লাভ।

ঐতিহাসিকেরা সুলতান জালাল-উদ-দীন মুহম্মদ শাহ্‌কে সুশাসকরূপে প্রশংসা করেছেন। পাণ্ডুয়া থেকে গৌড়ে তিনি রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। দ্বিতীয় বার মসনদে বসেই তিনি যেসব ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তাঁকে অর্থের লোভে শুদ্ধির বিধান দিয়েছিলেন, আর্থিকভাবে তাদের শাস্তি বিধান করেন। প্রশাসনে তিনি দলাদলির ঊর্ধ্বে থেকে সুশাসনের ব্যবস্থা করেন। এর আগে রাজা গণেশ শেখ নূর কুতব-ই-আলমের পুত্র পৌত্রদিগকে সোনারগাঁও-এ নির্বাসিত করেছিলেন। হত্যা করিয়াছিলেন পুত্র শেখ আনোয়ারকে। কিন্তু সুলতান জালাল-উদ-দীন নূর কুতব-ই-আলমের পৌত্র শেখ জাহিদকে আবার সসম্মানে রাজধানীতে ফিরিয়ে আনেন। ঐতিহাসিক ইব্‌নে হজরের ভাষ্য অনুসারে, সুলতান জালাল-উদ-দীন একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান হিসাবে রাজ্য শাসন করেন, ইসলামের প্রতিষ্ঠাকল্পে নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা কর্তৃক ধ্বংসকৃত মসজিদ, মাদ্রাসা পুনর্নির্মাণ করেন এবং ইমাম আবু হানিফার মতবাদ গ্রহণ করেন। তার আগে বাংলার সুলতানেরা মুদ্রায় কলেমা খোদাই করাতেন না। সুলতান জালাল উদ-দীন মুদ্রায় কলেমা খোদাই করার রীতি চালু করেন।

নিষ্ঠাবান মুসলমানের জীবন যাপন করলেও সুলতান পরধর্মের প্রতি ছিলেন উদার। শাসক হিসাবে তিনি যোগ্যতার পরিচয় দেন, রাজ্য বিস্তার করে নিজ শৌর্যের পরিচয় দেন এবং চীন-সম্রাট ও মিসরের খলীফা প্রমুখের সঙ্গে দূত বিনিময়ের মাধ্যমে সৌহার্দ্য বজায় রাখেন। আরাকানের রাজাকে স্বীয় সিংহাসন পুনরুদ্ধারে সাহায্য করে তিনি মহানুভবতার পরিচয় দেন। আরাকানের ইতিহাসে সুলতান জালাল-উদ-দীন মুহম্মদ শাহ্‌র রাজত্বের একটি ঘটনা জানা যায়, যার থেকে প্রমাণিত হয় যে, তিনি ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার পর তাতে একনিষ্ঠ ছিলেন। ঘটনাটি হচ্ছে ঃ

> আরাকান দেশের এক রাজা ব্রহ্মরাজের নিকট রাজ্য হারিয়ে বাংলার সুলতানের শরণাপন্ন হন। বাংলার সুলতান তাঁকে সাহায্য করতে সম্মত হয়ে ওয়ালি খান নামক এক সেনাপতিকে বাহিনীসহ আরাকান-রাজের সঙ্গে প্রেরণ করেন। কিন্তু ওয়ালি

খান বিশ্বাসঘাতকতা করে ব্রহ্মরাজের সঙ্গে যোগ দিয়ে আরাকান-রাজকে বন্দী করেন। আরাকান-রাজ কোনক্রমে পালিয়ে এসে বাংলার সুলতানকে সব কিছু জানান। তখন সুলতান বিশ্বাসী অন্য এক সেনাপতির উপর আরাকান উদ্ধারের দায়িত্ব অর্পণ করেন। এইবার আরাকান-রাজ যুদ্ধে জয়লাভ করে নিজ রাজ্য উদ্ধার করেন। তবে সুলতানের এই উপকারের বিনিময়ে আরাকান-রাজকে সুলতানের আনুগত্য স্বীকার করতে হয়। তখন থেকেই আরাকানের রাজাদের মুদ্রার উপরে ফার্সী অক্ষরে মুসলমানী নাম খোদাই করার প্রথাও চালু হয়।

যদু সেনের ইসলাম গ্রহণের কারণ যাই হোক না কেন, ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর ইসলামে তাঁর গভীর নিষ্ঠারই প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁর আগে প্রায় ২০০ বছর ধরে মুসলিম সুলতানেরা বা শাসনকর্তারা বাংলায় তাঁদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। কিন্তু তাঁদের কেউই মুদ্রায় কলেমা খোদাই করাতেন না। মুদ্রায় কলেমা খোদাই করার প্রথম কৃতিত্ব সুলতান জালাল-উদ-দীন মুহম্মদ শাহ্‌র । শুধু তাই নয়, অন্য এক ব্যাপারেও এই সুলতান নতুনত্ব দেখিয়েছিলেন। তাঁর পূর্ববর্তী সুলতানরা সকলেই বাগদাদের খলীফার আনুগত্য স্বীকার করতেন এবং কখনও তাদের মুদ্রায় বা শিলালিপিতে নিজেদেরকে 'খলীফার সহায়ক' বলে অভিহিত করতেন। সুলতান জালাল উদ-দীনও প্রথমদিকে তাই করেছেন। কিন্তু তাঁর রাজত্বের শেষ দিককার মুদ্রা ও শিলালিপিতে তিনি 'খলীফাতুল্লাহ' উপাধি ধারণ করেছেন অর্থাৎ নিজেকে আল্লাহর খলীফা' বলে দাবি করেছেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আহমদ শাহ্‌ বয়স কম বলে এই উপাধি ধারণ করেননি, কিন্তু আহ্‌মদ শাহ্‌র পরবর্তী সুলতানদের মধ্যে অনেকেই এই উপাধি ধারণ করেছিলেন।

সমসাময়িক আরবী গ্রন্থকার ইব্‌ন হজরের (১৩৭২-১৪৪৯ খৃ.) লেখা 'ইন্‌বাউল গুমর' থেকে জানা যায় যে, সুলতান জালাল-উদ-দীন মুহম্মদ শাহ্‌ ইসলামের উন্নতি সাধন করেন। ইসলামের উন্নতির জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। রাজা গণেশ কর্তৃক ধ্বংসকৃত মসজিদগুলির পুনর্নির্মাণ ও সংস্কার সাধন করেন এবং ইমাম আবূ হানিফার মতবাদ গ্রহণ করেন। পবিত্র মক্কা মুয়াজ্জমায় তিনি অনেকগুলি ভবন, বিশেষ করে একটি সুন্দর মাদ্রাসা তৈরী করান। এ ব্যাপারে তিনি ছিলেন সুলতান গিয়াস-উদ-দীন আজম শাহ্‌র অনুসারী। ৮৩২ হিজরায় তিনি মক্কাবাসীদের দান করার জন্যও অনেক অর্থ পাঠিয়েছিলেন। পরে মিসরের খলীফার কাছে উপহার প্রেরণ করেন এবং নিজের স্বীকৃতির জন্য মিসরের খলীফার অনুমোদন প্রার্থনা করেন। মিসরের খলীফা এই স্বীকৃতি প্রদান করে বাংলার সুলতানকে সম্মান-পরিচ্ছদ পাঠান। এটা ঘটেছিল সুলতান জালাল-উদ-দীন মুহম্মদ শাহ্‌র 'খলীফাতুল্লাহ্‌' উপাধি গ্রহণের আগের বছর। তাতে অনুমিত হয় মিসরের খলীফার অনুমোদন লাভের পরেই তিনি 'খলীফাতুল্লাহ্‌' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন।

এ প্রসঙ্গে ডক্টর এম. এ. গফুরের আলোচনা (J A S P, Vol. VII1. No.1, 1963, P. 62, 65) উল্লেখযোগ্য। তার কিছু উদ্ধৃতাংশের বাংলা অনুবাদ নিচে দেওয়া হলো।

"জলালুদ্দীন কি খলীফার কাছে স্বীকৃতি (investiture) চেয়েছিলেন ? রাজ্যে নিজের অবস্থাকে সুদৃঢ় করার জন্য তা চাইতে তিনি পারতেন। কিন্তু তা চাইলে ও পেলে তিনি নিজের মুদ্রায় খলীফার নাম উৎকীর্ণ করে বিষয়টি প্রচার করতেন। কিন্তু জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহের কোন মুদ্রায় খলীফার নাম কোন দিনই উৎকীর্ণ করা হয়নি। অপর দিকে তাঁর মুদ্রা ও শিলালিপিতে তিনি নিজেই 'খলীফা' উপাধি ধারণ করেছেন। আশ্চর্যের বিষয়, আব্বাসী খলীফার সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের পরেই জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ্ 'খলীফা' উপাধি গ্রহণ করেছেন। প্রথম জলালুদ্দীনের মুদ্রায় 'খলীফা' উপাধি দেখা যায় ৮৩৪ হিজরায়। ইব্‌ন হজর আসকালানি খুব স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, ৮৩৩ হিজরায় সুলতান জলালুদ্দীনের কাছে আব্বাসী খলীফার দূত আসে।

"আল-সখাওয়ী লিখেছেন, তিনি (জলালুদ্দীন) খলীফার কাছে 'অহ্দ্' চান। খলীফা তা দেন–একজন সম্ভ্রান্ত লোক মারফত সম্মান-পরিচ্ছদ পাঠিয়ে। 'অহ্দ্' মানে বিভূষণ (investiture) নয়, খলীফার সঙ্গে কোন সম্প্রদায়ের চুক্তি যে তারা বিশ্বস্তভাবে নিজেদের কর্তব্য পালনের বিনিময়ে বাধ্যতামূলক একটি প্রতিশ্রুতি লাভ করবে। বিভূষণ উৎসবের পরে এই চুক্তি করা হয়।

"ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বাগদাদের পতনের পরে খলীফার ভূমিকার গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়। চতুর্দশ শতাব্দীর তিনজন সুন্নী আইনবিদ বদরুদ্দীন ইবনে জমা, ইব্‌ন্ তয়মিয়া এবং ইব্‌ন্ খলদুনের লেখা থেকে তা বোঝা যায়। চতুর্দশ শতাব্দীতে পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতির ফলে খলীফা নিয়মতান্ত্রিক প্রধানে পর্যবসিত হন। তাঁর সব ক্ষমতা শাসক সুলতানের হাতে চলে যায়। একে আইনসঙ্গত রূপ দেওয়ার জন্য ইব্‌ন জমা খলীফার সব ক্ষমতা শাসকের কাছে হস্তান্তরিত করার বিধান লিপিবদ্ধ করেন।

"এই বিধান অনুসারে যাঁর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়, তিনি আব্বাসী খলীফা হিসাবে পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রয়োগ করতে পারতেন অর্থাৎ বিচারক ও শাসনকর্তা নিয়োগ করতে এবং সৈন্যবাহিনী ও কোষাগারের অধ্যক্ষ হতে পারতেন। ইব্‌ন জমা লিখেছেন যে, দূরে দূরে ছড়ানো ইসলামী রাজ্যগুলিকে একসূত্রে আবদ্ধ করার জন্য এ রকম করা দরকার হয়ে পড়েছিল। খলীফা নির্বাচন এই প্রক্রিয়াকেই 'অহ্দ্' বলা হতো।

"... আমরা এখন যুক্তিসঙ্গতভাবে ধরে নিতে পারি যে, সুলতান জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ্ আশরাফ বার্‌সবায়ের মারফৎ মিশরের খলীফার কাছে তাঁর প্রতি খলীফার অধিকার হস্তান্তর চেয়েছিলেন। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী জৌনপুরের সুলতান মুদ্রায় মিশরের আব্বাসী

খলীফার নাম খোদাই করতেন। বাংলার সুলতান এখন তাঁর উপর টেক্কা মারলেন। তিনি এখন নিজেকে 'খলীফৎ আমীর আল-মু'মিনিন' না বলে সোজাসুজি 'খলীফৎ আল্লাহ' বলতে লাগলেন।"[১]

এখানে উল্লেখ্য যে, সুলতান জালাল-উদ-দীন মুহম্মদ শাহ্‌র পরে 'খলীফাতুল্লাহ' উপাধি ধারণকারী সুলতানের মধ্যে রয়েছেন নাসির-উদ-দীন মাহমুদ শাহ, রুকন-উদ-দীন বারবক শাহ্‌, শামস-উদ-দীন ইউসুফ শাহ, জালাল-উদ-দীন ফতেহ্‌ শাহ্‌ (এরা সবাই-পরবর্তী ইলিয়াস শাহী-বংশের সুলতান) এবং আলা-উদ-দীন হোসেন শাহ্‌। সুলতান নাসির-উদ-দীন মাহমুদ শাহ্‌ এই উপাধি ধারণ করেন মুদ্রা ও শিলালিপিতে, রুকন-উদ-দীন বারবক শাহ্‌ কেবল মুদ্রায় এবং অন্যেরা কেবল শিলালিপিতে তা ধারণ করেন। অবিশ্যি "জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ্‌ প্রথম নিজেকে 'খলীফৎ আল্লাহ' বলেছিলেন। কারণ তিনিই ছিলেন মিসরের খলিফা কর্তৃক নিযুক্ত মূল খলিফা, পরবর্তী বাংলার সুলতানরা জলালুদ্দীনকে দেওয়া মিসরের খলিফার দলিল অনুসারে খলিফা হয়েছিলেন, তাই তাঁরা স্পষ্টভাবে নিজেদের 'দলিল ও প্রমাণ মতে আল্লার খলিফা' বলেছেন।"[২]

পররাষ্ট্রনীতিতে সুলতান জালাল-উদ-দীন মুহম্মদ শাহ্‌ খুবই দক্ষতা ও বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছিলেন। সুলতান গিয়াস-উদ-দীন আজম শাহ্‌র অনুসরণে চীন সম্রাটের সঙ্গে দূত বিনিময়, মক্কায় অনেক ভবন নির্মাণ ও মাদ্রাসা স্থাপন এবং মক্কাবাসীদের জন্য আর্থিক সাহায্য প্রেরণ, তৈমুরী খলীফা শাহ্‌রুখ ও মিশরের খলীফা আশরাফ বারসবার সঙ্গে দূত বিনিময় প্রভৃতি কাজ থেকে তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচয় পাওয়া যায়। তাতে করে দেশের অভ্যন্তরে মুসলিম জনসাধারণ যেমন খুশী হয়, তেমনি বহির্জগতের সমর্থনও তিনি লাভ করেন। "শাহরুখের নিকট দূত পাঠাইয়া রাজনৈতিক বিজ্ঞতার পরিচয় দেন। ইহার ফলে সুলতান ইবরাহীম শর্কীর সহিত দ্বন্দ্বে তাঁহার হাত শক্তিশালী হয়। মিশরের খলিফার নিকট দূত প্রেরণ এবং মুদ্রায় ও শিলালিপিতে উৎকীর্ণ তাঁহার উপাধি বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, তিনি ইহার দ্বারা দ্বিবিধ ফল লাভ করেন। প্রথমত, মুসলিম জাহানে তাঁহার মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং ইবরাহীম শর্কীর সহিত দ্বন্দ্বে তিনি আইনের দিক দিয়া শক্তিশালী হন এবং দ্বিতীয়ত, তাঁহার স্বরাজ্যেও তাঁহার মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। বাংলা দেশের তিনিই প্রথম আমীর এবং তিনিই প্রথম খলীফা।"[৩]

---

১. শ্রী সুখময় মুখোপাধ্যায়, বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর, তৃতীয় সংস্করণ ১৯৮০, পৃ. ১৬১-১৬২।

২. শ্রী সুখময় মুখোপাধ্যায়, বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর, তৃতীয় সংস্করণ ১৯৮০, ষষ্ঠ অধ্যায়, পৃ. ৭৬।

৩. ডক্টর আবদুল করিম, বাংলার ইতিহাস, সুলতানী আমল, বাংলা একাডেমী ১৯৭৭, পৃ. ৩০৩-৩০৪।

সবশেষে বলতে হয়, সুলতান জালাল-উদ-দীন মুহম্মদ শাহ্ ছিলেন একজন বিচক্ষণ শাসক। হিন্দু-মুসলমান সকলের প্রতি তিনি সমভাবে ব্যবহার করতেন, নিষ্ঠাবান মুসলিম সুলতান রূপে জীবন যাপন করলেও হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের প্রতিও তিনি ছিলেন সহৃদয়।

৩৭. সুলতান শামস-উদ-দীন আহমদ শাহ্ (১৪৩৩-১৪৩৫/৩৬ সাল)

১৪৩৩ সালে সুলতান জালাল-উদ-দীন মুহম্মদ শাহ্র মৃত্যুর পর বাংলার মসনদে আরোহণ করেন তদীয় অল্পবয়স্ক পুত্র সুলতান শামস-উদ-দীন আহ্মদ শাহ্। তখন তাঁর বয়স মাত্র ১০ বছর। মাত্র তিন বছরকাল রাজত্ব করার পর রাজধানীতে আবার শুরু হয় নতুন ষড়যন্ত্র। এই ষড়যন্ত্র হয়তো পূর্ববর্তী ষড়যন্ত্রেরই পরিণাম এবং এই ষড়যন্ত্রে তরুণ সুলতান আহ্মদ শাহ্ নিজ ক্রীতদাসের হাতে নিহত হন। তাঁর নিহত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রাজা গণেশের বংশীয় শাসনেরও অবসান হয়। এখানে স্মরণীয় যে, রাজা গণেশ বাংলায় ব্রাহ্মণ্য শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যেমন ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে এবং হযরত নূর কুতব-ই-আলমের বিপক্ষে কূটনীতি চালিয়ে নিজেকে এবং নিজ বংশকে রাজাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন, তেমনি ইলিয়াস শাহী পক্ষীয় আমীরগণও হয়তো গণেশ বংশের ধ্বংসের অভিপ্রায়ে পূর্ব থেকে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। সুযোগ্য সুলতান জালাল-উদ-দীন মুহম্মদ শাহ্র সময়ে সেই ষড়যন্ত্র চাপা থাকলেও তাঁর বালক পুত্রের শাসনামলে তা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। আর তারই শিকার হয়ে নিহত হন তরুণ সুলতান শামস-উদ-দীন আহ্মদ শাহ্।

সপ্তম অধ্যায়

পরবর্তী ইলিয়াস শাহী বা মাহমুদ শাহী আমল

(১৪৩৫/৩৬-১৪৮৭ সাল)

১৪৭৩ হইতে ১৪৮০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত ৩ বৎসর ধরিয়া মালাধর বসু 'শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়' রচনা করিলেন। এই দীর্ঘ কাব্য রচনায় মুগ্ধ হইয়া গৌড়েশ্বর তাঁহাকে 'গুণরাজ খান' উপাধিতে বিভূষিত করিলেন। বাংল-ভাষা ও সাহিত্যকে নূতন করিয়া মর্যাদা দান করিবার কীর্তি ইলিয়াস শাহী বংশের শামসুদ্দীন য়ুসুফ শাহেরই প্রাপ্য (১৪৭৪-১৪৮১)। এই য়ুসুফ শাহের অনুগ্রহে সিক্ত হইয়া মুসলমান কবি জৈনুদ্দীন 'রসুল-বিজয়' কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। ... ইহাতে হজরত মুহম্মদ মুস্তফা (সা)-এর দিগ্বিজয় কাহিনী বর্ণিত আছে... তাঁহার যুদ্ধযাত্রার বর্ণনা ঃ

তার পাছে মাগে সাজ নবী রাজেশ্বর।
মুকুতামণ্ডিত তাজ অতি মনোহর॥
লাল যে কাবাই শোভে জিনি দিবাকর।
প্রভুর পরম সখা পরম সুন্দর॥
নবীর কিঙ্কর ছিল নামে যে বিল্লাল।
বিবিধ বিধানে অশ্ব সাজায় তৎ কাল॥
সুচারু ধবল অশ্ব সুবর্ণ-মণ্ডিত।
হীরার লাগাম জিন মুকুতা শোভিত॥
চারিদিকে চামর দোলায় সবখন।
গরুড়ের গতি সম ভাতি বিচক্ষণ॥
দেখিতে সুন্দর অশ্ব অতি মনোহর।
রহিত সুধীর গতি বঞ্চিত দোসর॥
সেই অশ্ব পরে নবী আরোহণ যবে।
আদ্য ছত্র ধরি ছায়া করিলেন্ত তবে॥
সুসজ্জ হইয়া নবী যুদ্ধ যাত্রা কৈলা।
মঙ্গল-বিধানে সৈন্য বলিতে বলিলা॥

'মঙ্গল-বিধান' অর্থাৎ নারা-ই-তকবীর বলিয়া নবী যুদ্ধ যাত্রা করিলেন।'[১]

---

১. ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য, ১৯৫৭, পৃ. ৩৫ এবং ৬৩-৬৪।

৭

৩৮. সুলতান নাসির-উদ-দীন মাহ্মুদ শাহ্ (১৪৩৫-৩৬–১৪৫৯-৬০ সাল)

সুলতান শামস-উদ-দীন আহমদ শাহ্র মৃত্যুর মাধ্যমে গণেশ-বংশের পতন সম্পন্ন হয় এবং আবার বাংলার মসনদে আরোহণ করেন ইলিয়াস শাহী খান্দানেরই এক সন্তান, যাঁর পরিচয় 'তাবকাত-ই আকবরী'-তে দেওয়া হয়েছে ইলিয়াস শাহ্র 'আহ্ফাদ' বলে, বঙ্গানুবাদে যার অর্থ হয় 'বন্ধু-বান্ধব' সঙ্গী পরিবার, পৌত্র প্রপৌত্র, জামাতা, আত্মীয় ইত্যাদি তারিখ-ই-ফিরিশতায় শব্দটি 'আওলাদ' বা বংশধর, পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র ইত্যাদি; রিয়াজে শব্দটি 'আজ নবায়ের' বা পৌত্রদের মধ্যে একজন। সুতরাং রিয়াজ ছাড়া অন্য কোন গ্রন্থে বলা হয় নাই যে, নাসির-উদ-দীন মাহমুদ শাহ শামস-উদ-দীন ইলিয়াস শাহের পৌত্র ছিলেন। ফিরিশতা পরিষ্কারভাবে বলিয়াছেন যে, তিনি ইলিয়াস শাহের বংশধর ছিলেন এবং নিজাম-উদ-দীনের সাক্ষ্যও মোটামুটি একই। এই হিসাবে মাহমুদ শাহ্ ইলিয়াস শাহের উত্তর-পুরুষ ছিলেন, হয়ত প্রপৌত্র হইতে পারেন। তিনি ইলিয়াস শাহের বংশধর হওয়া বা প্রপৌত্র হওয়া অসম্ভবও নয়, অস্বাভাবিকও নয়। পরবর্তী লেখক গোলাম হোসেন এবং বুকাননের সাক্ষ্যের উপর ভিত্তি করিয়া পূর্ববর্তী লেখক ফিরিশতা এবং নিজাম-উদ-দীনের সাক্ষ্যকে সন্দেহ করা যুক্তিসঙ্গত নয়। মাহমুদ শাহের প্রতিষ্ঠিত বংশকে পরবর্তী ইলিয়াস শাহী বংশ বলাও অসঙ্গত নয়, অবশ্য তাঁহার নিজের নাম অনুসারে এই বংশকে মাহমুদ শাহী বংশ বলা যাইতে পারে।"[২] আগে ঐতিহাসিকরা সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে, নাসির-উদ-দীন মাহমুদ শাহ্ ৮৩৭ হি. (১৪৩৩-৩৪ খ্রিস্টাব্দে) বাংলার মসনদে আরোহণ করেন। কিন্তু পরে ডক্টর করিম ইব্ন হজরের সাক্ষ্য বিবেচনায় এনে বলেন, আমরা মনে করি যে, ৮৩৯ হিজরায় (১৪৩৫-৩৬ খৃস্টাব্দে) নাসির-উদ-দীন মাহমুদ শাহ্ সিংহাসনে আরোহণ করেন।"[৩]

বাংলার রাজশক্তির অধিকার নিয়ে দুই যুগ ধরে যা ঘটেছিল তাকে পুরোপুরি নাটকীয় বলা চলে। বাংলায় প্রায় দু'শ বছরের মুসলিম রাষ্ট্রশক্তির অবসানের লক্ষ্যে ইলিয়াস শাহী বংশের তৃতীয় সুলতান গিয়াস-উদ-দীন আজম শাহ্র অন্যতম প্রধান অমাত্য রাজা গণেশ যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন, তার প্রথম শিকার হন সুলতান গিয়াস-উদ-দীন আজম শাহ্ নিজেই। যখনই তিনি রাজ্যের হিন্দু প্রাধান্যের ব্যাপারে সচেতন হলেন,

---

২. ডক্টর আবদুল করিম, বাংলার ইতিহাস, সুলতানী আমল, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭, পৃ. ৩১১-৩১২।
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৩।

তখনই রাজা গণেশের চক্রান্তে তিনি নিহত হন। মসনদে বসেন তাঁর পুত্র সাইফ-উদ-দীন হামজা শাহ্। কিন্তু দুবছর যেতে না যেতেই রাজা গণেশেরই চক্রান্তে তিনি নিহত হন স্বীয় ক্রীতদাস শিহাব-উদ-দীনের হাতে। এবার মসনদে আরোহণ করেন রাজা গণেশের শিখণ্ডী-ঘাতক শিহাব-উদ-দীন, অভিহিত হন সুলতান শিহাব-উদ-দীন বায়েজীদ শাহ্ বলে। তিন বছরের মত রাজত্ব করার পর এই সুলতানও নিহত হন। এমন কি নিহত হন বায়েজীদ-পুত্র আলা-উদ-দীন ফিরোজ শাহ্ও। এতগুলি হত্যার পরে রাজা গণেশ অবশেষে আরোহণ করেন বাংলার মসনদে। আপাতদৃষ্টিতে রাজা গণেশের সামনে বাংলায় নিজ বংশের রাজত্ব তথা হিন্দু রাজত্বের দিনগুলো হয়ে উঠেছিলো মেঘমুক্ত। এর মধ্যে অপ্রত্যাশিতভাবে রাজা গণেশের সাফল্যের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ালেন বৃদ্ধ সূফী-সাধক শেখ নূর কুতব-ই-আলম। তাঁর অনুরোধে বাংলা অভিযানে এগিয়ে এলেন জৌনপুরের সুলতান ইবরাহীম শর্কী। ফলে পিছনে হটলেন রাজা গণেশ এবং ধর্মান্তরণের মাধ্যমে বাংলার মসনদে বসলেন গণেশ-পুত্র যদু সেন। ইবরাহীম শর্কী ফিরে গেলেন। রাষ্ট্রীয় রঙ্গমঞ্চে আবার এসে দাঁড়ালেন রাজা গণেশ। ধর্মান্তরিত পুত্র শুদ্ধির মাধ্যমে আবার হিন্দু হলেন, বন্দী হলেন এবং সিংহাসনে বসলেন পিতা গণেশ। কিন্তু বছর ফুরিয়ে যেতেই বন্দীশালা থেকে মুক্ত যদু সেন হত্যা করালেন রাজা গণেশকে; সিংহাসনে বসলেন কনিষ্ঠ গণেশ–পুত্র মহেন্দ্রদেব। মাত্র এক মাস কি দুই মাস। মহেন্দ্রদেবকে সরিয়ে যদু সেন আবার ইসলামে দীক্ষিত হয়ে মসনদে আরোহণ করলেন, অভিহিত হলেন জালাল-উদ-দীন মুহম্মদ শাহ্ বলে। ২৪ বছর রাজত্বের পর তাঁর মৃত্যু হলো। এবার সুলতান হলেন তদীয় বালক পুত্র শামস-উদ-দীন আহ্মদ শাহ্। বছর তিনেক রাজত্বের পর তিনিও নিহত হলেন ক্রীতদাসের হাতে। এইসব ঘটনার ব্যাপ্তিকাল দুই যুগের কিছু বেশি। এই ব্যাপ্তিকালের দুই প্রান্তে দু'টি পক্ষ। প্রথম প্রান্তে রাজা গণেশের পক্ষ, দ্বিতীয় প্রান্তে প্রত্যাশিতভাবেই ইলিয়াস শাহী বংশীয় পক্ষ। গণেশ-পৌত্র সুলতান আহ্মদ শাহ্কে হত্যা করেছিল তদীয় ক্রীতদাসদ্বয় সাদী খান ও নাসির খান। সাদী খান মসনদ দখল করতে চাইলে নাসির খান তাকে হত্যা করে এবং কয়েকদিনের মধ্যে দরবারের অমাত্যরা নাসির খানকে সরিয়ে (নিশ্চয়ই হত্যার মাধ্যমে) বাংলার মসনদে বসান মাহ্মুদ শাহ্কে। ঐতিহাসিকরা মনে করেন আহ্মদ শাহ্র হত্যার পেছনে ছিলেন ইলিয়াস শাহী খান্দানের সমর্থক আমীরগণ।

ঐতিহাসিক ফিরিশতার ভাষ্য অনুসারে, সুলতান সাইফ-উদ-দীন হামজা শাহ্র হত্যার মাধ্যমে ইলিয়াস শহী খান্দানের রাজ্য হারানোর সময় প্রকৃত প্রস্তাবে ইলিয়াস শাহী খান্দানের নিধনের সময়, ইলিয়াস শাহী খান্দানের জীবিতরা তাঁদের সমর্থকবৃন্দসহ রাজধানী থেকে পালিয়েছিলেন। ..... Ousted by Raja Ganesh from North Bengal, the Muhamadans, after the demise of Bayazid Shah fell back

on South and East Bengal ...etc."[৪] ধারণা করা যায়, প্রাণভয়ে পলাতক এসব মুসলমানের মধ্যে ইলিয়াস শাহী খান্দানের সন্তানও ছিলেন। ফিরিশতার মতে, ইলিয়াস শাহী খান্দানের জনৈক নাসির শাহ্ রাজধানী থেকে পালিয়ে অজ্ঞাত স্থানে চলে যান এবং কৃষিকার্যে লিপ্ত হন। ধারণা করা যায়, কৃষকের ছদ্মবেশে এই শাহ্জাদা নিজ পরিবার-পরিজনসহ হয়তো দক্ষিণ বঙ্গের কোথাও দিনাতিপাত করছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে এ-ও ধারণা করা যায় যে, ইলিয়াস শাহী খান্দানের সমর্থক কোন কোন আমীর শুধু জানতেন তাঁর খবর। উপযুক্ত সময়ে অর্থাৎ গণেশ বংশের নিধন প্রাপ্তির পর এই 'নাসির শাহ্'কেই ইলিয়াস শাহী বংশের সমর্থক আমীরগণ রাজধানীতে নিয়ে এসে মসনদে বসান। অভিহিত হন সুলতান নাসির-উদ-দীন মাহমুদ শাহ্ বলে। এখানে মনে পড়ার কথা পবিত্র কুরআনের সেই আয়াত ঃ কুলিল্লাহুম্মা মারিলকাল্ মুল্কি তু'তিল্ মুল্কা মান তাশাউ ওয়া তান্যিউল মুল্কা মিম্মা তাশাউ, ওয়া তুইয্যু মান্তাশাউ ওয়া তুযিল্লু মান্তাশাউ বিয়াদিকাল খাইর। ইন্নাকা 'আলা কুল্লি শাই-ইন ক্বাদির। বল (হে মুহম্মদ)! আল্লাহ্ তুমি সমস্ত রাজ্যের অধিপতি, তুমি যাকে ইচ্ছা প্রদান কর বাদশাহী এবং তুমি যার নিকট থেকে ইচ্ছা কর কেড়ে নাও বাদশাহী এবং যাকে ইচ্ছা সম্মান দান কর এবং যাকে ইচ্ছা অপদস্থ কর; তোমার হাতেই সকল কল্যাণ এবং নিশ্চয়ই তুমি সকল বিষয়ের উপর সর্বশক্তিমান।

"রাজা গণেশ, জালালু-উদ-দীন মুহম্মদ শাহ ও শামসু-উদ-দীন আহ্মদ শাহের রাজত্বকালে ইলিয়াস শাহী বংশের লোকেরা ও তাঁদের সমর্থকেরা ছত্রভঙ্গ হয়ে এদিক সেদিক ছড়িয়ে পড়েছিলেন, নাসিরুদ্দীন রাজা হলে তাঁরা আবার একত্র সমবেত হলেন। ফিরিশতা আরও লিখেছেন যে, নাসিরুদ্দীনের রাজত্বকালে জৌনপুর, দিল্লী ও বাংলার সুলতানদের মধ্যে রেষারেষি দূর হয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। রিয়াজ -এ নাসিরুদ্দীন সম্বন্ধে এই কয়েকটি কথা লিপিবদ্ধ হয়েছে, 'নাসির শাহ্ সমস্ত কাজ ন্যায়পরায়ণতা এবং উদারতার সঙ্গে করতেন। যার ফলে বৃদ্ধ-যুবা নির্বিশেষে সমস্ত লোকে তৃপ্ত হল এবং আহ্মদ শাহের অত্যাচারজনিত ক্ষত শুকিয়ে গেল। এই মহান রাজা গৌড়ের দুর্গ ও প্রাসাদগুলি নির্মাণ করান। এই কথাগুলি যে মোটামুটিভাবে সত্য, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ সুশাসক না হলে নাসিরুদ্দীনের পক্ষে সুদীর্ঘ ২৪/২৫ বছর অপ্রতিহতভাবে রাজত্ব করা সম্ভব হত বলে মনে হয় না।"[৫]

---

৪. Dr Nalini Kanta Bhattashali, Coins and Chronology of The Early Independent Sultans of Bengal, First Reprint, 1976, p. 109.

৫. শ্রী সুখময় মুখোপাধ্যায় বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৮০, ষষ্ঠ অধ্যায়, পৃ. ৪।

গৌড়ের বিখ্যাত 'সেনানী দরওয়াজা' বা 'কোৎওয়ালী দরওয়াজা'র নির্মাতা ছিলেন সুলতান নাসির-উদ-দীন মাহ্‌মুদ শাহ্। মাহ্‌মুদ শাহ্‌র রাজত্বকালে বাংলার মুসলিম রাজ্যটি পশ্চিম বিহারের ভাগলপুর, দক্ষিণে হুগলী জেলা এবং পূর্বে ময়মনসিংহ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাঁর রাজত্বকালেই বাগেরহাটের সেই স্বনামধন্য সাধক-সেনাপতি প্রশাসক-খান জাহান আলী দক্ষিণ বঙ্গ জয় করেন এবং খেলাফত মডেলের শাসন ব্যবস্থা কায়েম করেন। খান জাহানের সমাধি, মসজিদ ও দীঘি এখনও বর্তমান। তাঁর নির্মিত ষাট গম্বুজ মসজিদ বাংলার স্থাপত্য শিল্পের একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। খুলনা জেলার বাগেরহাটে (বর্তমানে জেলা) খান জাহান আলীর সমাধি অবস্থিত। সমাধি গাত্রে উৎকীর্ণ শিলালিপিতে বলা হয়েছে ঃ "আল্লাহর এক নগণ্য বান্দা, বিশ্ব প্রভুর অনুগ্রহ-প্রত্যাশী রাসূলে করিম (সা)-এর বংশধরদের অনুরক্ত, সৎপথগামী আলেমগণের বন্ধু, বিধর্মী মুশরিকদের দুশমন, ইসলাম ও মুসলমানদের সাহায্যকারী উলুগ খান-ই-জাহান (তাঁর প্রতি আল্লাহ্‌র করুণা ও ক্ষমা বর্ষিত হোক) হিজরী ৮৬৩ সালের ২৬ শে জিলহজ বুধবার রাত্রে এ নশ্বর দুনিয়া থেকে জান্নাতগামী হন এবং উক্ত মাসের ২৭ তারিখ বৃহস্পতিবার তিনি সমাহিত হন।" তাঁর ধর্মপ্রাণতা, সততা, জনসেবা ও চরিত্র মাধুর্য এ অঞ্চলের জনগণের উপর এত বেশি প্রভাব বিস্তার করে যে, তারা তাঁকে আল্লাহ্‌র একজন যথার্থ অনুগত বান্দা এবং সূফী-দরবেশরূপে শ্রদ্ধা করতে থাকে। হতে পারে না যে ইলিয়াস শাহী খান্দানের বিপদের দিনে 'লোকচক্ষুর অন্তরালে' কৃষকের ছদ্মবেশে জীবনধারণকারী 'নাসির শাহ্' প্রধানত এই খান জাহান আলীর সাহায্যে দক্ষিণ বঙ্গের কোথাও বসবাস করছিলেন? এবং রাজধানী থেকে পালিয়ে যাওয়া ইলিয়াস শাহী খান্দানের সমর্থকদের মধ্যে খান-জাহান আলীও ছিলেন অন্যতম ? আরও গবেষণার ফলে এ ব্যাপারে হয়তো আরও কিছু জানা যেতে পারে।

পররাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি ঘটনা থেকে সুলতান নাসির-উদ-দীন মাহ্‌মুদ শাহ্‌র আত্মসম্মান বোধের পরিচয় পাওয়া যায়। খৃস্টীয় পনের শতকের প্রথম দিকেই বাংলার সুলতান গিয়াস-উদ-দীন আজম শাহ্ চীনের সঙ্গে বাংলার যে কূটনৈতিক সংযোগ স্থাপন করেছিলেন এবং তাঁর পরবর্তী সুলতানরাও যে সংযোগ যথারীতি রক্ষা করে আসছিলেন, সুলতান নাসির-উদ-দীন মাহ্‌মুদ শাহ্‌র সময়ে তা ছিন্ন হয়ে যায়। এজন্য অবশ্য চীনা কর্তৃপক্ষই দায়ী। প্রাচীন কাল থেকেই চীনে এই ধারণা প্রচলিত ছিল যে, চীন সম্রাটই হচ্ছেন সমগ্র পৃথিবীর একচ্ছত্র অধিপতি একং পৃথিবীর অন্য সব রাজনরা চীন সম্রাটের সামন্ত মাত্র। বাংলা সুলতানের দূত ও উপহার পাঠানোকে চীন বাংলার আনুগত্যের নিদর্শনস্বরূপ 'ভেট পাঠানো' বলে গ্রহণ করত। বাংলা সুলতানের কাছে পাঠানো চীন সম্রাটের চিঠিপত্রকে চীনা গ্রন্থগুলিতে 'সার্বভৌম অধিরাজের আদেশলিপি' বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং গিয়াস-উদ-দীন আজম শাহ্‌র মৃত্যুর পর

সাইফ-উদ-দীন হামজা শাহ্‌র মসনদে আরোহণের উল্লেখ করবার সময়ে বলা হয়েছে যে, চীন সম্রাট সাইফ-উদ-দীনকে "বাংলার রাজারূপে নিযুক্ত" করেছেন।

চীনা বিবরণ থেকেই জানা যায় যে, সুলতান নাসির-উদ-দীন মাহ্‌মুদ শাহ্ ১৪৩৮ ও ১৪৩৯ সালে চীন সম্রাটের কাছে উপহারসহ রাজদূত পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সমসাময়িক চীন সম্রাট চেন্ থুং এ বিষয়ে তাঁর পূর্ববর্তী সম্রাটদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেননি। সুলতান মাহ্‌মুদ শাহ্ পরপর দুবার উপহার পাঠালেও চীন সম্রাট চেন্ থুং বাংলার সুলতানকে কোন উপহার পাঠাননি। বলা বাহুল্য, এ অবস্থায় বাংলা থেকে একতরফা উপহার প্রেরণ মোটেই সম্মানজনক ছিল না। সুলতান নাসির-উদ-দীন মাহ্‌মুদ শাহ্ তাই আর রাজদূত কিংবা উপহার পাঠানো বন্ধ করে দেন, ছিন্ন হয়ে যায় বাংলা ও চীনের সখ্যতা-সংযোগ।

৩৯. সুলতান রুকন-উদ-দীন বারবক শাহ্ (১৪৫৯/৬০–১৪৭৪ সাল)

মৃত্যুর পূর্বেই সুলতান নাসির-উদ-দীন মাহ্‌মুদ শাহ্ উপযুক্ত বয়স্ক পুত্র বারবক শাহ্‌কে রাজ্য শাসন ব্যাপারে উচ্চ-ক্ষমতা দিয়েছিলেন এবং পুত্রকে নিজ নামে মুদ্রা উৎকীর্ণ করার অনুমতি দিয়েছিলেন। সুলতান মাহ্‌মুদ শাহ্‌র মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র সুলতান রুকন-উদ-দীন বারবক শাহ্ মসনদে আরোহণ করেন। "রুকনুদ্দীন বারবক শাহ ...... বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুলতান তো বটেই। সর্বদেশের ও সর্বকালের নরপতিদের মধ্যে তাঁর একটি বিশিষ্ট স্থান আছে বললেও অত্যুক্তি হবে না। অথচ এঁর সম্বন্ধে এতদিন আমাদের বিশেষ কিছুই জানা ছিল না। পরবর্তী কালে লেখা ফার্সী বিবরণগুলিতে বারবক শাহ্ সম্বন্ধে যে বিবরণী আছে; তা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর এবং আদৌ নির্ভরযোগ্য নয়। একটি সমসাময়িক ফার্সী গ্রন্থ (ইব্রাহিম কায়ুম ফারুকী রচিত 'শরফনামা') ও কয়েকটি শিলালিপি থেকে তাঁর সম্বন্ধে সামান্য কিছু সংবাদ পাওয়া যায়। এ ছাড়া সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় লেখা কয়েকটি গ্রন্থ বারবক শাহ্ সম্বন্ধে কিছু তথ্য লিপিবদ্ধ আছে। এই বইগুলির মধ্যে কয়েকটি তাঁর সমসাময়িক। এদের সাক্ষ্যই সবচেয়ে মূল্যবান। কারণ বারবক শাহ্ যে কত বড় ছিলেন, তার স্পষ্ট আভাস কেবলমাত্র এদের মধ্য থেকেই পাওয়া যায়।"[৬]

বাংলার সুলতানদের মধ্যে কয়েকজনের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, তারা দীর্ঘজীবী ছিলেন এবং তাঁদের রাজত্বের শেষ দিকে তাঁদের পুত্ররাও বেশ বয়স্ক ছিলেন। তাই শেষ বয়সে পিতার রাজত্বের সময়েও পুত্রও রাজকার্য সম্পন্ন করেছেন, মুদ্রা প্রচলিত করেছেন ও শিলালিপি খোদাই করেছেন। এর আগে আমরা সুলতান শামস-উদ-দীন ফিরোজ শাহ্ দেহলবীর আমলে তাঁর রাজত্বকালের মধ্যেই তদীয় পুত্রদের মুদ্রা প্রচলনের দৃষ্টান্ত

---

৬. প্রাগুক্ত, ষষ্ঠ অধ্যায়, পৃ. ১২-১৩।

পেয়েছি। "বারবক শাহ একুশ বছর বা তারও বেশি সময় রাজত্ব করেন। ৮৬৩ হি. থেকে ৮৭৮ হি. পর্যন্ত তাঁর মুদ্রা পাওয়া যায়। এর কারণ ঐতিহাসিকেরা ঐ সময়ই তাঁর রাজত্বকাল বলে নির্দিষ্ট করেছেন। কিন্তু আসলে বারবক শাহ ৮৬৩ হিজরীর কিছু আগে থাকতেই রাজত্ব করছিলেন এবং ৮৭৮ হিজরীর কয়েক বছর পরেও রাজত্ব করেছিলেন বলে আমরা প্রমাণ পেয়েছি। বারবক শাহ্ অন্তত ৮৬০-৮৬৩ হিজরী অবধি তাঁর পিতার সঙ্গে এবং অন্তত ৮৭৯-৮৮০ হিজরী অবধি তাঁর পুত্রের সঙ্গে যুক্তভাবে রাজত্ব করেছিলেন। সম্ভবত নাসিরু-উদ-দীন মাহ্মুদ শাহের বংশে এই নতুন প্রথা চালু হয়েছিল যে, রাজার পুত্র যুবরাজ পদে অভিষিক্ত হবার সময় থেকে পিতার সঙ্গে যৌথভাবে রাজত্ব করবেন। এবং ঐ সময় থেকেই পিতার মত তাঁরও নামে মুদ্রা, শিলালিপি প্রভৃতি উৎকীর্ণ হবে। হোসেন শাহী বংশেরও এই নিয়ম প্রচলিত ছিল, হোসেন শাহের জীবিতকালেই তাঁর পুত্র নসরৎ শাহের নামাঙ্কিত মুদ্রা প্রকাশিত হয়েছিল। রাজার মৃত্যুর পর যাতে তাঁর পুত্রদের মধ্যে সিংহাসন নিয়ে সংঘর্ষ না ঘটে সেজন্যই সম্ভবত এই ব্যবস্থা হয়েছিল।"[৭]

সুলতান রুকন-উদ-দীন বারবক শাহ্র নামের সঙ্গে বাংলার এক অতি বিখ্যাত মুজাহিদের শাহাদাত বরণের কথা জড়িত রয়েছে। সেই মুজাহিদ হযরত শাহ্ ইসমাইল গাজী। বাংলার দুই জায়গায় রংপুর জেলার কাঁটাদুয়ারে এবং হুগলী জেলার গড় মান্দারনে শাহ্ ইসমাইল গাজীর মাজার রয়েছে। সুলতান রুকন-উদ-দীন বারবক শাহ্র অন্যতম প্রধান সেনাপতি ছিলেন এই শাহ্ ইসমাইল গাজী। কাঁটাদুয়ারে অবস্থিত তাঁর মাজারের খাদিমের নিকট 'রিসালাতুশ শুহাদা' নামক একটি ফার্সী গ্রন্থ পাওয়া গেছে। তাতে শাহ্ ইসমাইল গাজী ও সুলতান রুকন-উদ-দীন বারবক শাহ্ সম্বন্ধে যা লেখা আছে, তার সংক্ষিপ্তসার নিচে দেওয়া হলো।

শাহ্ ইসমাইল গাজী কোরেশ বংশীয় আরব, মক্কাতে তাঁর জন্ম। যৌবন থেকেই তিনি ছিলেন ধর্মপ্রাণ। নানা বিদ্যায় সুশিক্ষিত হয়ে একদল সঙ্গীসহ তিনি আরব থেকে রওনা হয়ে পারস্যের ভিতর দিয়ে ভারতবর্ষে আসেন এবং সুলতান বারবক শাহের রাজধানী লাখনৌতিতে এসে উপনীত হন। রাজ্যে ছিল ছুটিয়া-পটিয়া নামে এক খরস্রোতা নদী, বর্ষাকালে যার প্রবল বন্যায় মানুষের জীবন ও সম্পত্তি নষ্ট হতো। সুলতান অনেক চেষ্টা করেও এই নদীকে বশে আনতে পারেন নি। যতবার বাঁধ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে, ততবারই তা পানিতে ভেসে গেছে। এমনি অবস্থায় শাহ্ ইসমাইল গাজী সুলতানকে জানালেন যে, তিনদিন সময় পেলে তিনি এর প্রতিকার নির্দেশ করতে পারবেন। সুলতান রাজী হলেন। তিনদিন ধরে সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গে আলোচনা শেষে শাহ্

---

৭. প্রাগুক্ত, ষষ্ঠ অধ্যায়, পৃ. ১৪।

সাহেব ছুটিয়া-পটিয়ার উপর এক সেতু বা বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা তৈরি করলেন। তদনুযায়ী সেতু তৈরি করা সম্ভব হলো। সুলতান খুশী হয়ে শাহ্ সাহেবকে সম্মানিত করলেন এবং তাঁর উপর সৈন্য পরিচালনার কঠিন দায়িত্ব অর্পণ করলেন।

'রিসালাতুশ শুহাদা'র বর্ণনা মতে শাহ্ ইসমাইল গাজী উড়িষ্যার রাজা গজপতিকে পরাজিত করে গড় মান্দারন দুর্গ দখল করেন। অতঃপর তিনি কামরূপের রাজা কামেশ্বরকেও পরাজিত করেন। এসব বিজয়ের দরুন তাঁর প্রতি সুলতানের সন্তুষ্টি এবং নিঃস্বার্থ জনসেবার জন্য এই ইসলাম প্রচারক সাধক পুরুষটির প্রতি সুপণ্ডিত সুলতানের অনুরক্তি কোন কোন দরবারী ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে ঈর্ষান্বিত করে তোলে। সুলতানের এক হিন্দু সেনাপতি ঘোড়াঘাটের সীমান্ত দুর্গের অধ্যক্ষ ভান্দসী রায় এই ইসলাম প্রচারকের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে এক চক্রান্ত করেন। সুলতানকে তিনি বোঝাতে সক্ষম হন যে, শাহ্ ইসমাইল গাজী কামরূপের পরাজিত রাজার যোগসাজশে একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালাচ্ছেন। তদনুযায়ী সুলতান গাজী সাহেবের শিরশ্ছেদ করার জন্য একদল সৈন্য পাঠান। সুলতানের হুকুম পালিত হয়। শাহাদাত বরণ করেন বীর মুজাহিদ শাহ্ ইসমাইল গাজী। কথিত আছে, শহীদ গাজী সাহেবের কর্তিত মস্তকটি কাঁটাদুয়ারে এবং মস্তকবিহীন ধড়টি গড় মান্দারনে সমাহিত করা হয়। সুলতান পরে ভান্দসী রায়ের চক্রান্তের কথা জানতে পেরে খুবই দুঃখিত ও অনুতপ্ত হন।

হযরত শাহ্ ইসমাইল গাজী শাহদাতের পর যে মর্যাদা ও সম্মান অর্জন করেছেন তা সত্যিই অসামান্য। আর এই মর্যাদা ও সম্মান তিনি অর্জন করেন হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে। "কাঁটাদুয়ার ও মান্দারনে ইসমাইলের (হযরত শাহ ইসমাইল গাজীর) সমাধি শুধু মুসলমানের নয়, হিন্দুরও তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছিল। এই দুই সমাধি আজ পর্যন্ত বর্তমান আছে। মধ্যযুগের বহু মঙ্গলকাব্যের দিক্‌বন্দনা পালায় কবিরা বিভিন্ন দেবদেবীর বন্দনা করার সময়ে পীর ইসমাইলেরও বন্দনা করেছেন। ইসমাইল গাজীর কাহিনী নিয়ে কোন কোন কবি কাব্য রচনা করছেন, তাঁদের মধ্যে একজন গোরক্ষবিজয় রচয়িতা শেখ ফয়জুল্লাহ্।"[৮]

সুলতান বারবক শাহ্ মিথিলা বা ত্রিহুত অধিকার করেছিলেন বলে জানা যায়। তাছাড়া ত্রিপুরার রাজমালা গ্রন্থ অনুসারে তিনি ত্রিপুরার তরুণ রাজা রত্নফাকে নিজ রাজ্যের অধিকার লাভে সাহায্য করেছিলেন। রত্নফা ত্রিপুরার রাজা হলেন; গৌড়েশ্বরকে তিনি বড় বড় হাতী ধরে উপহার দিলেন এবং গৌড়েশ্বর তাঁর নাম দিলেন 'রত্নমাণিক্য'। তখন থেকে ত্রিপুরার রাজাদের নামের সঙ্গে 'মাণিক্য' শব্দ যোগ করার প্রথা প্রবর্তিত হল।"[৯]

---

৮. প্রাগুক্ত ষষ্ঠ অধ্যায়, পৃ. ১৯।
৯. প্রাগুক্ত, ষষ্ঠ অধ্যায়, পৃ. ২১।

কেবল মাত্র যুদ্ধবিগ্রহে সাফল্য লাভ ও রাজ্য জয়েই সুলতান বারবক শাহ্‌র কীর্তি সীমাবদ্ধ নয়। "বারবক শাহ নিজে ছিলেন মহাপণ্ডিত। তাঁর বিভিন্ন শিলালিপিতে তাঁর নাম এবং বিভিন্ন রাজকীয় উপাধির সঙ্গে আরও দুটি উপাধি যুক্ত দেখা যায়, –অল-ফাজিল এবং অল-কামিল। এ সম্বন্ধে অধ্যাপক আহমদ হাসান দানী বলেন, "The titles al-Fadil and al-Kamil suggest that he attained the highest academic qualifications".

কিন্তু বারবক শাহ্ শুধুমাত্র নিজে পাণ্ডিত্য অর্জন করে সন্তুষ্ট ছিলেন না, তিনি অন্যান্য পণ্ডিতদের পৃষ্ঠপোষণ করতেন। শুধু পণ্ডিত নয়, কবিরাও তাঁর পৃষ্ঠপোষণ লাভ করতেন। আর কেবলমাত্র মুসলমান কবি-পণ্ডিত নয় হিন্দু কবি-পাণ্ডিতদের উপরও তিনি মুক্তহস্তে দাক্ষিণ্য বর্ষণ করতেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষিত কবি-পণ্ডিতদের মধ্যে এমন কয়েকজন রয়েছেন, শত শত বৎসরের ব্যবধানেও যাঁদের খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা অম্লান রয়েছে।" [১০] এই কবি-পণ্ডিতদের মধ্যে ছিলেন 'বিশারদ' বৃহস্পতি মিশ্র রায়মুকুট, মালাধর বসু, কৃত্তিবাস, রাজকবি আমীর জৈনুদ্দীন হারাওয়ী, আমীর শাহাবুদ্দীন হাকীম কিরমানী, কবি মনসুর শিরাজী, কবি মালিক ইউসুফ বিন হামিদ প্রমুখ। শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতির পরিমণ্ডলে যেমন প্রশাসন পরিমণ্ডলেও হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকল প্রতিভার সমাবেশ ঘটেছিল।

সুলতান বারবক শাহ্‌র উৎকীর্ণ মুদ্রা ও শিলালিপি এত বিভিন্ন স্থানে পাওয়া গেছে, যার থেকে বোঝা যায়, তাঁর রাজ্যের আয়তন কত বিশাল ছিল। উত্তরবঙ্গ, পূর্ববঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ এবং বিহারের কতকাংশ ছিল তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। 'রিসালাতুশ শুহাদা'র সাক্ষ্য অনুসারে বারবক শাহ্‌র রাজ্যের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত ছিল ঘোড়াঘাট।

"বারবক শাহ্ যাঁর রাজ্যের আয়তন ছিল সুবিশাল, যিনি নানা রাজ্য জয় করেছিলেন, যিনি নিজে বিদ্বান ছিলেন, বিদ্বান ও সাহিত্যিকদের যিনি পৃষ্ঠপোষণ করতেন, যাঁর মনোভাব ছিল উদার ও অসাম্প্রদায়িক এবং যিনি ছিলেন একজন সত্যকার সৌন্দর্যরসিক তাঁর সম্বন্ধে যে আমরা বিশেষ কিছু জানি না, এ অত্যন্ত দুঃখ ও লজ্জার বিষয়। বারবক শাহের মত একাধারে এতগুলি বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ বাংলার আর কোন রাজার মধ্যেই দেখা যায়নি। পেন্‌সিল্‌ভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত বারবক শাহের পূর্বোক্ত শিলালিপিতে আরবী কবিতায় তাঁর যে প্রশস্তি রয়েছে (Ars Islamica, 1940, PP. 142-143 দ্রষ্টব্য) তার মধ্যে বিশেষ অতিরঞ্জন নেই। প্রশস্তিটি আমরা নিচে বাংলায় অনুবাদ করে দিলাম।

শাহ্ সুলতান রুক্‌ন্ উদ-দুনিয়া ওয়াদ্-দীন

আমাদের সুলতান বারবক শাহ্, জ্ঞানী এবং মহীয়ান,

---

১০. প্রাগুক্ত, ষষ্ঠ অধ্যায়, পৃ. ২৫।

তাঁর পুত্র, –যাঁর খ্যাতি দেশে দেশে বিস্তৃত হয়েছে–
সুলতান মাহমুদ, ন্যায়পরায়ণ এবং ভদ্র।
দুই ইরাকে কি এমন মহান হৃদয় সুলতান আছেন ?
বারবক শাহের মত ? সিরিয়া এবং অল-ইয়েমেনেও কি আছেন ?
না। বিধাতার সমগ্র রাজ্যে আর কেউই নেই,
যিনি মহত্ত্বে তাঁর সমান। তাঁর সময়ে তিনি অদ্বিতীয় এবং অতুলনীয়।[১১]

সুলতান বারবক শাহ্ প্রায় আট হাজার আবিসিনীয়কে তাঁর সেনাদলে এবং প্রশাসনে নিযুক্ত করেছিলেন। কালক্রমে তাঁদের অনেকেই রাজ্যের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হন। পরে প্রমাণিত হয় যে, এমনটি করা ছিল সুলতান বারবক শাহ্র আত্মঘাতী এক পদক্ষেপ।

৪০. সুলতান শামস-উদ-দীন ইউসুফ শাহ্ (১৪৭৪-১৪৮১ সাল)

সুলতান রুকন-উদ-দীন বারবক শাহ্র পুত্র সুলতান শাম্স-উদ-দীন ইউসুফ শাহ কৃতিত্বের সঙ্গে সাত বছরের মত বাংলা শাসন করেন। বুকাননের কথায় এই 'সুশিক্ষিত রাজপুত্র' ছিলেন ন্যায়বিচারক, ধর্মনিষ্ঠ ও সুশাসক। কিন্তু কোন গ্রন্থেই তাঁর সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। কেবলমাত্র তারিখ-ই-ফিরিশ্তায় কয়েকটি কথা পাওয়া যায়। ফিরিশ্তা লিখেছেন, তিনি ছিলেন বিদ্বান, ধার্মিক এবং কৌশলী নরপতি। তিনি ভাল কাজ করতে আদেশ দিতেন এবং মন্দ কাজ নিষেধ করতেন। তাঁর আমলে কেউ প্রকাশ্যে মদ্যপান করতে বা তাঁর আদেশ অমান্য করতে সাহস পেত না। মাঝে মাঝে তিনি প্রধান প্রধান আলিমদের তাঁর সভায় ডেকে বলতেন, আপনারা ধর্ম সংক্রান্ত বিষয়ের নিষ্পত্তি করতে গিয়ে কারও পক্ষ অবলম্বন করবেন না ... ইত্যাদি। তিনি নিজে বহু শাস্ত্রের সুপণ্ডিত ছিলেন, তাই যে সমস্ত মামলায় কাজীরা ব্যর্থ হতেন, তাদের অধিকাংশেরই তিনি নিজে নিষ্পত্তি করতেন।"[১২]

সম্প্রতি কোন কোন ঐতিহাসিক তাঁকে পাণ্ডুয়ায় অবস্থিত একটি মন্দির ভেঙ্গে মসজিদ নির্মাণের অপরাধে সাম্প্রদায়িক বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ডক্টর আবদুল করিম এই মতের বিরোধিতা করে বলেন, "মুসলমানেরা এই দেশে আসার পরে ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরের পাথর ইত্যাদির সাহায্যে মসজিদ তৈয়ার করেন এই কথা সত্য, বাংলাদেশেও এইরূপ উদাহরণ যথেষ্ট পাওয়া যায়, কিন্তু অটুট ও ব্যবহার্য মন্দির ভাঙ্গার নজীর বিরল। ইউসুফ শাহ কর্তৃক নির্মিত মসজিদে মন্দিরের ভাঙ্গা টুকরা পাইলেই তাঁহাকে পরধর্মী বিদ্বেষী বলার কোন হেতু নাই। ইউসুফ জ্ঞানী এবং নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন সত্য কিন্তু নিষ্ঠাবান মুসলমান হইলেই পরধর্ম বিদ্বেষী হইবেন এমন কোন কথা

---

১১. প্রাগুক্ত, ষষ্ঠ অধ্যায়, পৃ. ৪৪।
১২. প্রাগুক্ত, ষষ্ঠ অধ্যায়, পৃ. ৪৫।

নয়। নিছক ভিন্ন ধর্ম অবলম্বন করার কারণে ইউসুফ শাহ কাহারও উপর অত্যাচার করেন– এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।"[১৩] তাঁর রাজত্বকালে যে সব মসজিদ নির্মিত হয়, তার মধ্যে মালদহের সাকোমোহন মসজিদ, গৌড়ের 'কদমরসুল' মসজিদ, দরাসবাড়ী জামে মসজিদ ও তাঁতীপাড়া মসজিদ উল্লেখযোগ্য। ছোট পাণ্ডুয়া থেকে আবিষ্কৃত তাঁর শিলালিপিটি থেকে ধারণা করা চলে, তাঁর আমলে পশ্চিমবঙ্গে মুসলিম অধিকার আরও প্রসারিত হয়েছিল। অন্যান্য শিলালিপি থেকেও বোঝা যায়, উত্তরবঙ্গ পূর্ববঙ্গের এক বৃহৎ অঞ্চল তাঁর রাজ্যভুক্ত ছিল।

৪১. সুলতান জালাল-উদ-দীন ফতেহ্ শাহ্ (১৪৮১-১৪৮৭ সাল)

সুলতান ইউসুফ শাহর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সিকান্দার শাহ্ মসনদে আরোহণ করলেও প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ক্ষমতাচ্যুত হন এবং ফতেহ্ নামক মাহ্মুদ শাহ্ খান্দানেরই এক শাহ্যাদা জালাল-উদ-দীন আবুল মুজাফ্ফর ফতেহ্ শাহ্ উপাধি গ্রহণ করে বাংলার মসনদে আসীন হন। ইতিহাসে তিনিই জালাল-উদ-দীন ফতেহ শাহ্ বলে পরিচিত। ফতেহ্ শাহ্ ছিলেন সুলতান নাসির-উদ-দীন মাহ্মুদ শাহ্র কনিষ্ঠ পুত্র, সুলতান রুকন-উদ-দীন বারবক শাহ্র ছোট ভাই এবং সুলতান ইউসুফ শাহ্র চাচা।

প্রচলিত রীতি অনুসারে সুলতান মাহ্মুদ শাহ্র মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র বারবক শাহ্ বাংলার মসনদ লাভ করেন এবং বারবক শাহ্র মৃত্যুর পর সেই মসনদের অধিকারী হন বারবকরী শাহ্র পুত্র ইউসুফ শাহ্। ফলে সুলতান মাহমুদ শাহ্র কনিষ্ঠ পুত্র ফতেহ্ শাহ্ মসনদের অধিকার থেকে স্বাভাবিকভাবেই বারবার বাদ পড়তে থাকেন। ওদিকে দুর্ভাগ্যজনক হলেও বাংলার রাজধানীতে দলাদলির অস্তিত্ব ছিলই এবং সেই সুবাদে, এটা সহজেই ধরে নেওয়া যায়, ফতেহ্ শাহ্ একটি দলের পক্ষ থেকে ছিলেন মসনদের দাবিদার। এখানে এটাও স্মরণ রাখতে হবে যে, সুলতান বারবক শাহ্ প্রায় আট হাজার আবিসিনীয়কে (হাবশী) নিজ সেনাদলে ও প্রশাসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এই হাবশীরা স্বভাবতই অনুগত ছিল সুলতান বারবক শাহ্ ও তাঁর পুত্র পৌত্রদের প্রতি। আর ধরে নেওয়া যায়, এই প্রভাবশালী হাবশীদের সমর্থনেই সুলতান মাহমুদ শাহ্র পর তাঁর পুত্র ইউসুফ শাহ্ মসনদে আরোহণ করে রাজ্য শাসন করতে পেরেছিলেন। কিন্তু ইউসুফ শাহ্র মৃত্যুর পর মসনদ যখন তাঁর তরুণ পুত্র সিকান্দার শাহ্র অধিকারে চলে গেল, তখনই ফতেহ্ শাহ্র দল মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। তাই তারা শেষ সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইল না। পরিণামে, তরুণ সিকান্দার শাহ্কে গদীতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে বসবার আগেই সরিয়ে দেওয়া হলো। সুলতান হলেন ফতেহ্ শাহ্। উপরোক্তভাবেই ত্বরিতে তরুণ সিকান্দার শাহ্র গদিচ্যুতি এবং ফতেহ্ শাহ্র মসনদ প্রাপ্তির সঙ্গত ব্যাখ্যা দিয়েছেন ঐতিহাসিক ডক্টর আবদুল করিম।

---

১৩. ডক্টর আবদুল করিম, বাংলার ইতিহাস, সুলতানী আমল, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭, পৃ. ৩২৭-৩২৮।

বিভিন্ন ঐতিহাসিকের ভাষ্য অনুযায়ী, সুলতান ফতেহ্ শাহ্ ছিলেন বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান এক সুশাসক। রাজ্য শাসনে তিনি উদার নীতি অনুসরণ করতেন। রাজনীতি, সমরনীতি ছাড়াও তিনি ছিলেন ধর্ম ও ভেষজ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। তবুও মাত্র সাত বছরের মত রাজ্য শাসনের পর সুলতান জালাল-উদ-দীন ফতেহ্ শাহ্ তাঁর প্রাসাদ রক্ষীদের হাতে নিহত হন। সম্ভবত বারবক শাহ্‌র আশ্রয়পুষ্ট হাবশীদের চক্রান্তেই নিহত হন সুলতান ফতেহ্ শাহ্।

রাজনৈতিক দলাদলির ফলে শুধু যে সুলতান ফতেহ্ শাহ্ নিহত হন এবং তার মাধ্যমে সম্পন্ন হয় পরবর্তী ইলিয়াস শাহী খান্দানের পতন তাই নয়, পরবর্তী সাত বছর ধরে বাংলায় চলে এক অরাজক শাসন। সে শাসন হাবশীদের শাসন। ১৪৮৭ সাল থেকে ১৪৯৩ সাল পর্যন্ত ৪ জন হাবশী সুলতান বাংলা শাসন করেন।

এই পরবর্তী ইলিয়াস শাহী বা মাহ্মুদ শাহী বংশের সুলতানদের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে শ্রী মুখোপাধ্যায় বলেন, "বাংলাদেশের ইতিহাসে মাহ্মুদ শাহী বংশের নাম উজ্জ্বল অক্ষরেই লেখা থাকবে। এই বংশের রাজারা ইলিয়াস শাহী বংশোদ্ভব কিনা জানি না, তবে পূর্ববর্তী ইলিয়াস শাহী সুলতানদের সঙ্গে এঁদের সব বিষয়েই স্বাতন্ত্র্য দেখা যায়। আগেকার ইলিয়াস শাহী সুলতানরা বাংলাদেশকে মনেপ্রাণে স্বদেশ বলে গ্রহণ করেছিলেন কিনা সন্দেহ। কিন্তু এই বংশের রাজারা বাঙালী বলেই গণ্য হবেন। কারণ যে সময় রাজা গণেশ ও তাঁর বংশধররা ইলিয়াস শাহী বংশকে ক্ষমতাচ্যুত করে বাংলাদেশ শাসন করছিলেন, সে সময় এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা নাসিরুদ্দীন মাহ্মুদ শাহ বাংলার জনসাধারণের মধ্যেই আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং একটি বিবরণ মতে বাংলার নিভৃত পল্লীতে কৃষিকার্য করে জীবিকা নির্বাহ করছিলেন। সিংহাসন অধিকার করে এই বংশের রাজারা শাসনকার্যে সহযোগিতা করার জন্য এই দেশের লোকদের আহ্বান করলেন– সম্প্রদায় নির্বিশেষে। এই বংশেরই একজন রাজা বিদ্যা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষণের আদর্শ স্থাপন করলেন, বিধর্মী পণ্ডিতেরাও তাঁর আনুকূল্য থেকে বঞ্চিত হলো না। এই বংশের চারজন রাজাই (সিকান্দার শাহকে হিসাবের মধ্যে ধরছি না) – নাসিরুদ্দীন মাহ্মুদ শাহ্, রুকনুদ্দীন বারবক শাহ্, শামসুদ্দীন য়ুসুফ শাহ ও জলালুদ্দীন ফতেহ শাহ্ অত্যন্ত সুযোগ্য রাজা ছিলেন। শেষ দু'জন রাজা সময় সময় হিন্দুদের উপর অত্যাচার করেছিলেন (এ ব্যাপারে সকল ঐতিহাসিক এক মত নন –লেখক) আমার বিশ্বাস, যদি কোন দিন এই রাজবংশের বিস্তৃত ইতিহাস পাওয়া যায়, তাহলে অনেক গৌরবময় ও মনোহর ঘটনা বিস্মৃতির অন্তরাল থেকে আত্মপ্রকাশ করবে।"[১৪]

---

১৪. শ্রী সুখময় মুখোপাধ্যায়, বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৮০, ষষ্ঠ অধ্যায়, পৃ. ৭৬-৭৭।

ইলিয়াস শাহী (পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী) বংশীয় সুলতানদের সম্বন্ধে ডক্টর আবদুল করিম বলেন, "ইলিয়াস শাহী সুলতানেরা রাজা গণেশের কারসাজির ফলে সিংহাসনচ্যুত গণেশের বংশের পতনের পরে ইলিয়াস শাহের একজন বংশধর আবার সিংহাসন লাভ করেন। ইহাতেই বাংলা দেশ ইলিয়াস শাহী সুলতানদের জনপ্রিয়তার প্রমাণ পাওয়া যায়। পরবর্তী ইলিয়াস শাহী সুলতানেরাও অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দেন এবং পূর্ববর্তীদের মত উদারতার, দক্ষ শাসনের, সাহিত্য ও সংস্কৃতি প্রীতির এবং স্থাপত্য শিল্পের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন। বাংলার সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসে ইলিয়াস শাহী সুলতানদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।"[১৫]

অষ্টম অধ্যায়

আবিসিনীয় শাসন আমল
(১৪৮৭-১৪৯৩ সাল)

স্বাধীনতা শুধু রাজনৈতিক দাসত্ব হইতে মানুষকে মুক্তিদান করে না, ইহা মানুষের মনকেও চিন্তার দাসত্ব হইতে মুক্তি দিয়া থাকে। বাংলার সোয়া দুই শত বৎসরের স্বাধীনতাও তাহা প্রমাণ করিয়া দিয়াছিল। এই সময়ে মসজিদ, মাদ্রাসা, শিল্প ও সাহিত্যে দেশ ধীরে ধীরে ভরিয়া উঠিতে থাকে। স্থাপত্য শিল্প হইতে আরম্ভ করিয়া চারু ও কারু শিল্প পর্যন্ত ইসলাম বাংলাদেশের সহিত হাত মিলাইতে আরম্ভ করে। তাই দেখিতে পাই, স্থাপত্য শিল্পে ইসলামী রীতির সহিত বাংলা রীতির বাংলা-ঘর যেমন স্থান লাভ করিয়াছে, মসজিদের কারুকার্যে লতাপাতা ও জ্যামিতিক রীতির সহিত পারস্যের গোলাপের পাশে বাংলার পদ্মও ফুটিয়া উঠিয়াছে। আবার সে পদ্মের পূর্ণ আরবী হরফে 'আল্লাহ' শব্দের পরাগ বুকে লইয়া এখনও তৌহিদের বাণী ঘোষণা করিতেছে। গৌড়ের 'ছোট সোনা মসজিদ' এখনও ইহার প্রধানতম উদাহরণ। ... স্বাধীনতার যুগে বাংলার রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ইসলামের সহিত বাংলার যে মিলন ঘটিল, সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে। বাঙালী মুসলমানের সাহিত্যেও এই মিলন ফুটিয়া উঠিয়াছে। ... বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে গৌড়ীয় সুলতানদের এই দানকে পরোক্ষ দান বলা চলে না। বাংলা-সাহিত্যে মুসলমানদের প্রত্যক্ষ দানে গৌড়ীয় সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতাও অন্যতম। এই সময়ে বাংলা-সাহিত্য তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ না করলে, বনফুলের ন্যায় লোকচক্ষুর অন্তরালে ঝরিয়া পড়িত। ... স্বাধীনতার যুগের বাংলার ধর্মীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রেও মানুষের মন খুলিয়া গেল। দেশে ইসলাম স্থায়ী হইয়া গেল; ইহার বাণী দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সহস্র কণ্ঠে উচ্চারিত ও লক্ষ জীবনে রূপায়িত হইয়া উঠিল। মানুষের চোখের সামনেই ইসলামের আভ্যন্তরীণ বিভব ও বাহ্যিক মহিমা ধীরে ধীরে পর্ণে পর্ণে বিকশিত হইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া দেশের অমুসলমানদের মনে নানা সংশয়, নানা প্রশ্ন জাগিয়া উঠিল। ... হিন্দু মনে প্রশ্ন জাগিতে লাগিল, তবে কি বেদ, বেদান্ত, পুরাণ ও আচার-বিচার প্রভৃতি সমস্তই ভুল ? আর

ইসলাম, ভ্রাতৃত্ব, মানবতা প্রভৃতিই সত্য ? ধর্ম মানুষের জন্য, না মানুষ ধর্মের জন্য ? এই যুগের খ্যাতনামা হিন্দু-কবি চণ্ডীদাস ঘোষণা করিলেন ঃ

শুন হে মানুষ ভাই! সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার্ উপরে নাই।

ইহাতে গোঁড়া হিন্দুদিগের রক্ষণশীলতার আসন টলটলায়মান হইল; রক্ষণশীল দলে রব উঠিল, 'রক্ষা কর, রক্ষা কর।'....

(ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, মুসলিম বাংলা সাহিত্য, ১৯৫৭, পৃ. ৪৬-৪৯)

৮

আবিসিনীয় শাসনামলকে ঐতিহাসিকেরা 'হাবশী শাসনামল'ই বলে থাকেন। আমাদের ধারণায় 'হাবশী' শব্দটায় ক্রীতদাসের ধারণাটা বেশি ব্যক্ত হয়। অথচ এই 'ক্রীতদাস' কথাটি ওই সময়ে ঠিক 'অর্থে কেনা চাকর' অর্থে সব সময় ব্যবহৃত হতো না। যুদ্ধবন্দী অথবা ভাগ্যাহত অনেককেই সুলতানেরা আশ্রয় দিতেন, সুযোগ-সুবিধা দিতেন এবং প্রশাসনের বিভিন্ন দায়িত্ব প্রদান করতেন। আমীরের উচ্চপদও তাঁরা লাভ করতেন। এই কথাটি স্মরণে রেখেই 'হাবশী শাসনামল'কে আমরা 'আবিসিনীয় শাসনামল' বলেছি।

শ্রী মুখোপাধ্যায়ের কথায়, "বাংলার হাব্শী সুলতানদের রাজত্ব সম্বন্ধে প্রায় সকলেরই মনে অত্যন্ত বিরূপ ধারণা আছে। এ সম্বন্ধে স্পষ্ট তথ্য হয়তো অনেকেরই জানা নেই, কিন্তু হাব্শী আমল যে অরাজকতা ও নৃশংসতায় পরিপূর্ণ এবং হাব্শী রাজারা যে নিতান্ত অযোগ্য, স্বেচ্ছাচারী ও নিষ্ঠুর ছিলেন, সে সম্বন্ধে ... কারও মধ্যে দ্বিমত দেখা যায় না।

অনেক আধুনিক ঐতিহাসিক সমস্ত তথ্য এবং প্রমাণ খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ না করে নিতান্ত কতকগুলি গালগল্পের উপর নির্ভর করে হাবশীদের রাজত্ব সংক্রান্ত অধ্যায়টি লিপিবদ্ধ করেছেন এবং তার উপর নিজেদের উত্তপ্ত ধিক্কারবাণী বর্ষণ করে সাধারণ পাঠকদের বিভ্রান্ত করেছেন।

প্রথমে কুশাসনের প্রশ্নটি বিচার করা যাক। আধুনিক ঐতিহাসিকেরা 'হাব্শী রাজা' হিসাবে চারজন রাজার নাম উল্লেখ করেন। এরা সকলে মিলে প্রায় ছ'বছর রাজত্ব করেছিলেন। এর মধ্যে তিন বছর রাজত্ব করেন সৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহ– যিনি বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ সুলতানদের অন্যতম। ঐতিহাসিকেরা যার মহত্ত্ব, যোগ্যতা, বদান্যতা প্রভৃতি গুণের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। এক বছর রাজত্ব করেন কুতুব উদ্দীন মাহ্মুদ শাহ। এর রাজত্বকালেও কোন কুশাসন হয়েছিল বলে কোথাও লেখা নেই। কুশাসনের যা কিছু অভিযোগ তা অপর দু'জন রাজার সম্বন্ধেই সীমাবদ্ধ। এরা হলেন চারজনের মধ্যে প্রথম রাজা 'সুলতান শাহজাদা' এবং শেষ রাজা শামসুদ্দীন মুজাফফর শাহ্। কিন্তু এদের সম্বন্ধে পরবর্তী কালের বইগুলিতে যা লেখা আছে, তা যে সবটা সত্য নয়, তা পরে দেখাচ্ছি। আর একটা কথা মনে রাখতে হবে, এই দু'জন 'কুশাসক' সুলতানের মিলিত রাজত্বকাল দু'বছর নয়"।[১]

১. শ্রী সুখময় মুখোপাধ্যায়, বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৮০ সপ্তম অধ্যায়, পৃ. ৭৮।

'ক্রীতদাস' কথাটার উপর অনেক ঐতিহাসিকের বেশি গুরুত্ব দেওয়া প্রসঙ্গে শ্রী মুখোপাধ্যায় বলেন, "অতীতে যে ক্রীতদাস ছিল, সেও যে একদিন সুলতান হয়ে যোগ্যতার সঙ্গে রাজ্য শাসন করতে পারে, তা কুতুব উদ্দীন আইবক, ইলতুৎমিশ এবং বলবনের দৃষ্টান্ত থেকেই তো দেখতে পাওয়া যায়। ... এই নতুন ক্ষমতাধারীরা হাব্‌শী বলেই যে অযোগ্য হবেন, তা মনে করার কী কারণ আছে।"[২]

৪২. সুলতান শাহ্‌জাদা বারবক শাহ্‌ (মাস ছ'য়েকের মত)

সুলতান ফতেহ্‌ শাহ্‌কে হত্যা করে খোজা বারবক সুলতান শাহ্‌জাদা উপাধি গ্রহণ করে বাংলার মসনদে আসীন হন। রাজ্যের প্রধান আমীর ও রাজপুরুষেরা ফতেহ্‌ শাহ্‌ হত্যাকারী এই খোজা সুলতানকে মোটেই পছন্দ করতেন না। পছন্দ না করার আরও একটি কারণ হলো, সুলতান শাহ্‌জাদা ছিলেন অত্যাচারী ও নীচ প্রকৃতির মানুষ। ফলে দরবারে প্রধান ব্যক্তিরা সুলতান শাহজাদাকে বিতাড়িত করতে মনস্থ করলেন। এই প্রধান ব্যক্তিদের অন্যতম ছিলেন আবিসিনীয় আমীর মালিক আন্দিল। ফতেহ্‌ শাহ্‌র নিহত হওয়ার সময় মালিক আন্দিল সীমান্ত রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। খবর শুনে তিনি সুলতান শাহজাদাকে শাস্তি দেবার জন্য রাজধানীতে আসার উপায় চিন্তা করতে লাগলেন। এমন সময় সুলতান শাহজাদাই তাঁকে রাজধানীতে ডেকে পাঠালেন। মালিক আন্দিল রাজধানীতে পৌঁছে বুঝতে পারলেন যে, দরবারের অনেকেই চান সুলতান শাহজাদার অপসারণ। তারপর অল্পদিনের মধ্যেই মালিক আন্দিলের জন্য সুযোগ এসে গেল। তিনি সুলতান শাহজাদাকে হত্যা করে বাংলার মসনদে আরোহণ করলেন।

৪৩. সুলতান সাইফ-উদ-দীন ফিরোজ শাহ্‌ (১৪৮৭-১৪৯০ সাল)

ঐতিহাসিকদের মতে মালিক আন্দিল সাইফ-উদ-দীন ফিরোজ উপাধি গ্রহণ করে বাংলার মসনদে আরোহণ করেন। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, সুলতান ফতেহ্‌ শাহ্‌র রাজত্বকালেই মালিক আন্দিল সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে 'বিরল' অঞ্চলে স্বাধীনতার পতাকা উড়িয়েছিলেন। সেখানে তখন তিনি নিজ নামে শিলালিপি-মুদ্রা উৎকীর্ণ করেছিলেন। "সৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহের রাজত্বকালকে দুটি সুনির্দিষ্ট অধ্যায়ে বিভক্ত করা যেতে পারে। প্রথম অধ্যায়টি ৮৮৭ থেকে ৮৯৩ হিজরা অবধি বিস্তৃত; তাঁর এই অধ্যায়ের ৮৮৭ হিজরার শিলালিপি এবং ৮৯২ হিজরার মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। এই অধ্যায়ে ফিরোজ শাহ উত্তরবঙ্গের এক ছোট অঞ্চলে (বিরল অঞ্চলে –লেখক) স্বাধীনভাবে রাজত্ব করছিলেন; বাংলার অবশিষ্ট অংশে রাজত্ব করছিলেন জলালুদ্দীন ফতেহ্‌ শাহ। দ্বিতীয় অধ্যায়টির পরিব্যাপ্তিকাল ৮৯৩-৮৯৬ হিজরা। তাঁর এই অধ্যায়ের

---

২. প্রাগুক্ত, সপ্তম অধ্যায়, পৃ. ৭৯।

৮৯৩ হিজরার মুদ্রা এবং ৮৯৪, ৮৯৫ ও ৮৯৬ হিজরার শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। এই অধ্যায়ে তিনি সারা বাংলার একচ্ছত্র অধিপতি ছিলেন। ..... সৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহ একজন সত্যকার কুশলী ব্যক্তি ছিলেন। যেভাবে তিনি সুলতান শাহজাদাকে বধ করেছিলেন, তার থেকে তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় মেলে। জলালুদ্দীন ফতেহ্ শাহের বিরুদ্ধে তিনি যে বিদ্রোহ করেছিলেন, তার দরুন কেউ কেউ তাঁকে বিশ্বাসহন্তা বলতে পারেন। কিন্তু আত্মরক্ষার অনুরোধেই ফিরোজ শাহ্ এই বিদ্রোহ করেছিলেন। সুতরাং এতে তাঁর কোন অপরাধ হয়নি।"[৩]

সুলতান সাইফ-উদ-দীন ফিরোজ শাহ্ (ভূতপূর্ব মালিক আন্দিল) ছিলেন ন্যায়পরায়ণ ও উদার। জনসাধারণের শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে তিনি নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। একাধারে তাঁর বীরত্ব ও মহত্ত্বের জন্য সৈন্যরা ও জনসাধারণ তাঁকে যেমন ভক্তি করত, তেমনি ভয়ও করত। 'রিয়াজ' বর্ণিত বিবরণী অনুযায়ী উদারতা ও মহত্ত্বের দিক দিয়ে তাঁর তুলনা হয় না। তাঁর আগের রাজারা অনেক কষ্ট করে যেসব ধনদৌলত সঞ্চয় করেছিলেন, সেগুলি তিনি অল্প সময়ের মধ্যেই গরীবদের দান করে দিলেন। কথিত আছে, একবার তিনি এক দিনেই গরীবদের একলাখ টাকা দান করেছিলেন। তাঁর সচিবেরা এই মুক্তহস্ত দান পছন্দ করে নি। নিজেদের মধ্যে তারা বলাবলি করতে লাগলো, 'এই হাব্শী বিনা কষ্টে ও পরিশ্রমে যে টাকার মালিক হয়েছে তার মূল্য বুঝতে পারছেন না। যাতে পারেন, সে রকম কোন উপায় আমাদের বের করতে হবে। তাহলে ইনি আর এরকম যথেচ্ছভাবে মুক্তহস্তে দান করতে পারবেন না। এই ঠিক করে তারা এক লখ টাকা ঘরের মেঝেতে রেখে দিল, যাতে রাজা নিজের চোখে তা দেখে তার মূল্য বুঝে তার উপর গুরুত্ব আরোপ করতে পারেন। ..... রাজা যখন এই টাকা দেখলেন, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন 'টাকাটা এখানে পড়ে আছে কেন ?' সচিবেরা বলল, এত টাকাই আপনি গরীবদের দিতে বলেছেন। রাজা বললেন, 'এত কম টাকায় কী করে কুলোবে ? এর সঙ্গে আরও একলাখ টাকা যোগ কর'। সচিবেরা এতে অপ্রস্তুত হয়ে সব টাকা ভিখারীদের বণ্টন করে দিলেন। গল্পটি যদি অক্ষরে অক্ষরে সত্য না-ও হয়, তাহলেও ফিরোজ শাহ যে মহৎ দানবীর ছিলেন, তা এর থেকে বোঝা যায়। কারণ সম্পূর্ণ বিনা কারণে কারও নামে এরকম গল্প রটে না।"[৪] সুলতান সাইফ-উদ-দীন ফিরোজ শাহ্ গৌড়ে একটি মসজিদ, একটি মিনার ও কটি জলাধার নির্মাণ করিয়েছিলেন। কিন্তু এই মহৎ সুলতানও আততায়ীর হাতে বরণ করেছিলেন নির্মম মৃত্যু।

৩. প্রাগুক্ত, সপ্তম অধ্যায়, পৃ. ৮৯।

৪. প্রাগুক্ত, সপ্তম অধ্যায়, পৃ. ৮৯-৯০।

৪৪. সুলতান নাসির-উদ-দীন মাহ্মুদ (দ্বিতীয়) শাহ্ (১৪৯০-১৪৯১ সাল)

তাবকাত-ই-আকবরী, তারিখ-ই-ফিরিশ্তা এবং রিয়াজ-উস্-সালাতীন অনুসারে সুলতান সাইফ-উদ-দীন ফিরোজ শাহর মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র মাহ্মুদ শাহ্ বাংলার মসনদে আরোহণ করেন। তাঁর উপাধি হয় সুলতান দ্বিতীয় নাসির-উদ-দীন মাহ্মুদ শাহ। ফিরিশ্তা ও 'রিয়াজ'-এর মতে সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদ শাহ্র রাজত্বকালে হাব্শ্ খান নামে একজন হাব্শী রাজকোষ ও শাসন ব্যবস্থার সর্বময় কর্তা হয়ে ওঠে। সুলতান হয়ে পড়েন হাব্শ্ খানের হাতের পুতুল। কিছুদিন পর এই হাব্শ খানকে হত্যা করে সিদি বদর নামে অন্য এক আবিসিনীয় উচ্চাকাঙ্ক্ষী নিজেই শাসন ব্যবস্থার কর্তা হয়ে বসে। অতঃপর সুলতানকে হত্যা করে সিদি বদর দখল করে নেয় বাংলার মসনদ। তার উপাধি হয় সুলতান শামস-উদ-দীন মুজাফ্ফর শাহ্।

৪৫. সুলতান শামস-উদ-দীন মুজাফ্ফর শাহ্ (১৪৯১-১৪৯৩ সাল)

সুলতান মাহ্মুদ শাহ্র হত্যাকারী সিদি বদর (সুলতান শামস-উদ-দীন মুজাফ্ফর শাহ্) ছিলেন নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক এবং নিজের খেয়ালখুশী চরিতার্থ করার ব্যাপারে অত্যন্ত বেপরোয়া। "রাজা হয়ে তিনি বহু শিক্ষিত, ধার্মিক ও সম্ভ্রান্ত লোককে হত্যা করেন এবং হিন্দু রাজাদের যমালয়ে প্রেরণ করেন। অবশেষে তাঁর অত্যাচার যখন চরমে পৌঁছালো তখন সকলেই তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়াল। তাঁর মন্ত্রী সৈয়দ হোসেন বিরুদ্ধবাদীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন এবং মুজাফ্ফর শাহকে বধ করে নিজে রাজা হলেন।"[৫]

তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে আবিসিনীয় শাসনের অবসান হয়। এবার রাজনৈতিক মঞ্চের প্রধান চরিত্র হয়ে আবির্ভূত হন সৈয়দ হোসেন বা সৈয়দ আলা-উদ-দীন হোসেন। তিনিই ইতিহাসের সেই বিখ্যাত পুরুষ আলা-উদ-দীন হোসেন শাহ্, বাংলায় হোসেন শাহী রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা।

নবম অধ্যায়

হোসেন শাহী আমল
(১৪৯৩-১৫৩৮ সাল)

সর্বলোক নরপতি,   ভুবন-বিখ্যাত অতি,
আছিল হোসেন শাহা বর।
তান রত্ন-সিংহাসন,   অতিশয় বিলক্ষণ,
গৌড়েত শোভিত মনোহর॥
প্রধান উজীর তান,   নাম যে হামিদ খান,
তাহান গুণের অন্ত নাই।
অন্নছত্র স্থানে স্থানে,   মসজিদ সুনির্মাণে,
পুষ্করিণী দিল ঠাঁই ঠাঁই।

(লায়লী মজনু- দৌলত উজীর বাহরম খান)

কহত কেশব খান কেমত তোমার।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য বলি নাম বোল যার॥
কেমত তাঁহার কথা কেমত মনুষ্য।
কেমত গোসাঞি তিহোঁ কহিবা অবশ্য॥
চতুর্দ্দিকে আইছে লোক তাঁহারে দেখিতে।
কি নিমিত্তে আইসে কহিবা ভালমতে॥

(বৃন্দাবনদাস রচিত 'চৈতন্য ভাগবত)

৪৬. সুলতান আলা-উদ-দীন হোসেন শাহ্ (১৪৯৩-১৫১৯ সাল)

"প্রাক-মোগল যুগে হোসেন শাহী আমল বাংলাদেশের স্বর্ণযুগ। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা সুলতান আলা-উদ-দীন হোসেন শাহ একজন অনন্যসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন লোক ছিলেন। তাঁহার সময়ে বাংলাদেশের সীমানা চতুর্দিকে বিস্তৃত হয়; তাঁহার সময়ের অনেক ঐতিহাসিক কীর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে ও তাঁহার উৎকীর্ণ অনেক শিলালিপি এবং মুদ্রা পাওয়া যায়। ... তিনি এবং তাঁহার অমাত্যেরা বাংলা ভাষার পৃষ্ঠপোষণ করেন।"[১]

হোসেন শাহ্ ছিলেন বাংলায় বহিরাগত এক ভাগ্যান্বেষী। সম্ভবত, সুলতান রুকন-উদ-দীন বারবক শাহ্র সময়ে তিনি পিতা ও ভাইকে সঙ্গে নিয়ে বাংলায় এসে সুলতানের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে বারবক শাহ্র ভাই ফতেহ্ শাহ্ মসনদ লাভের উদ্দেশ্যে যখন স্বীয় সমর্থনে গোপন দল গঠন করেন, তখন সম্ভবত হোসেন শাহ্ও তার পরিবারের লোকজন ফতেহ্ শাহ্র পক্ষ অবলম্বন করেন। হয়তো তখন থেকেই তাঁরা পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন বাংলার রাজনীতির গতি-প্রকৃতি। তারপর দলাদলির পরিণতিতে সংঘটিত হয় একের পর এক হত্যাকাণ্ড, রাজ্য শাসনের নামে হাবশীদের উচ্ছৃঙ্খলতা। সবই পর্যবেক্ষণ করছিলেন হোসেন শাহ্ আর পরিস্থিতি মুকাবিলার জন্য তৈরি করছিলেন নিজেকে। চতুর্থ হাবশী সুলতান মুজাফ্ফর শাহ্র উজীরও হয়েছিলেন তিনি। তাতে তিনি রাজশক্তির নিয়ন্ত্রণ লাভেও সমর্থ হয়েছিলেন। তার পর উপযুক্ত সময় যখন উপস্থিত হলো, তখন হত্যা করালেন নিষ্ঠুর প্রকৃতির হাবশী সুলতান মুজাফ্ফর শাহ্কে। নিজেই আরোহণ করলেন বাংলার মসনদে। গ্রহণ করলেন সুলতান আলা-উদ-দুনিয়া ওয়াদ-দীন আবুল মুজাফ্ফর হোসেন শাহ্ উপাধি, সংক্ষেপে সুলতান আলা-উদ-দীন হোসেন শাহ্। সেটা সম্ভবত ১৪৯৩ সালের শেষ দিকে।

হোসেন শাহ্র রাজত্বকালে দিল্লীর সুলতান সিকান্দার লোদী বাংলা আক্রমণে এগিয়ে আসেন। কিন্তু প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়ে দিল্লীর সুলতান দিল্লীতে ফিরে যান। সুলতান হোসেন শাহ্ কামরূপ কামতা জয় করেছিলেন। কিন্তু আসামের কিছু অংশ জয় করলেও পরে তা হাতছাড়া হয়ে যায়। তার পর তিনি জয় করেন জাজনগর ও উড়িষ্যা। ত্রিপুরা রাজ্যেরও কিছু অংশ তিনি জয় করেছিলেন। এক কথায় সমগ্র বাংলাই এসেছিল তাঁর অধীনে। পশ্চিম সীমান্তে প্রায় সম্পূর্ণ উত্তর-বিহার ও উড়িষ্যা সীমান্তে অবস্থিত জনপদ তাঁর রাজ্যভুক্ত ছিল। উত্তর-পূর্ব সীমানায় তাঁর রাজ্য বিস্তৃত হয় কামরূপ কামতা রাজ্যের

---

১. ডক্টর আবদুল করিম, বাংলার ইতিহাস, সুলতানী আমল, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭, পৃ. ৩৫৮।

শেষ সীমা পর্যন্ত। পূর্ব দিকে ত্রিপুরা রাজ্যের কিছু অংশ এবং দক্ষিণ-পূর্বে কর্ণফুলী নদী পর্যন্ত। আর দক্ষিণ দিকে বাংলা রাজ্যের সীমানা তো আগে থেকেই বিস্তৃত ছিল খুলনা বাগেরহাট-বাকেরগঞ্জ জেলাসহ সবটুকু এলাকা পর্যন্ত।

নিষ্ঠাবান মুসলমান এই সুলতান নির্মাণ করিয়েছেন অনেক মসজিদ, মাদ্রাসা, মুক্ত হস্তে দান করেছেন সূফী-সাধকদের খানকায়। শেখ নূর কুতব-ই-আলমের প্রতি তাঁর ছিল অগাধ শ্রদ্ধা। কথিত আছে, প্রতি বছর একবার পায়ে হেঁটে তিনি রাজধানী থেকে পাণ্ডুয়ায় যেতেন সেই সূফী-সাধকের প্রতি সম্মান দেখাতে। নূর কুতব-ই-আলমের দরগাস্থিত খানকার ব্যয়ভার বহনের জন্য তিনি ২২টি গ্রাম দান করেন। মুহম্মদ বিন ইয়জদান বখ্‌শ্ নামক এক আলেমকে দিয়ে তিনি বুখারী শরীফ নকল করিয়েছিলেন। নিষ্ঠাবান মুসলমান হলেও তিনি অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতিও ছিলেন উদার। অনেক হিন্দু গুণী ব্যক্তিকে তিনি উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত করেন। রূপ ও সনাতন নামক দুই ভাই ছিলেন তাঁর মন্ত্রী। রূপের উপাধি ছিল দবীর খাস (প্রধান সচিব) এবং সনাতনের উপাধি সাকের মালিক। উচ্চ পদে নিযুক্ত ছিলেন রঘুনন্দন, বল্লভ, কেশব বসু, সুবুদ্ধি রায় প্রমুখ।

হোসেন শাহ্‌র রাজত্বকালেই শ্রী চৈতন্যদেবের অভ্যুদয় ঘটে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক এই চৈতন্যদেবকে সুলতান শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। তাঁর সময়ে অনেক কবি-সাহিত্যিক তাঁরই পৃষ্ঠপোষণায় সাহিত্য-চর্চায় লিপ্ত হন। রাজ্যের প্রত্যেক অঞ্চলে তাঁর অমাত্যেরাও বিদ্যা ও সাহিত্যির পৃষ্ঠপোষণ করেন।

"আমাদের মনে হয়, তিনি যে শুধু সর্বোৎকৃষ্ট সুলতান ছিলেন তাই নয়, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠও ছিলেন। এক বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া তিনি দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনেন, অনেক যুদ্ধ-বিগ্রহের মাধ্যমে তিনি চতুর্দিকে রাজ্যসীমা বৃদ্ধি করেন .... এইরূপ সর্বগুণসম্পন্ন সুলতান বাংলাদেশে আর রাজত্ব করেন কিনা সন্দেহ। প্রায় ২৬ বৎসর রাজত্ব করার পর এই মহান নরপতি ৯২৫ হিজরায় বা ১৫১৯ খ্রীস্টাব্দে পরলোক গমন করেন।"[২]

৪৭. সুলতান নাসির-উদ-দীন নসরত শাহ্ (১৫১৯-১৫৩১ সাল)

সুলতান হোসেন শাহ্‌র ১৮ জন পুত্রের মধ্যে নসরত শাহ্‌ই ছিলেন জ্যেষ্ঠ। পিতার মৃত্যুর পর নসরত শাহ্ মসনদে সমাসীন হয়ে ভাইদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করেন ও তাদের বৃত্তি দ্বিগুণ করে দেন। সুলতান নসরত শাহ্‌র সময়েই এই উপমহাদেশের রাজনৈতিক আকাশে মুগল-সূর্য উদিত হয় যার ফলে রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে সংঘটিত হয় এক যুগান্তকারী পরিবর্তন। ১৫২৬ সালে পানিপতের যুদ্ধে ইবরাহীম লোদীকে পরাস্ত করে বাবর এই উপমহাদেশের মুগল শক্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। আফগানরা তখন দিল্লী-আগ্রা

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৬।

ছেড়ে পালিয়ে যেতে আরম্ভ করে। অনেকে লোহানী ও ফর্মূলীদের আশ্রয়ে চলে আসে, অনেকে আবার বাংলায় এসে নসরত শাহ্‌র আশ্রয় নেয়। এসবের পরিণতিতে এবং খরিদ নামক এক গুরুত্বপূর্ণ স্থানের অবাধ ব্যবহার নিয়ে মুঘল সম্রাট বাবরের সঙ্গে সুলতান নসরত শাহ্‌র মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। নসরত শাহ্ অত্যন্ত বিজ্ঞ রাজনীতিজ্ঞের মত সেই সংঘর্ষ এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। তবুও যুদ্ধ বেধে যায় এবং নসরত শাহ্‌র সৈন্যরা হেরে যায়। কিন্তু যেহেতু পাঠানদের শক্তিহীন করাই ছিল বাবরের লক্ষ্য, নসরত শাহ্ নয়, তাই শেষ পর্যন্ত বাবর নসরত শাহ্‌র সঙ্গে শান্তি স্থাপন করেন।

সম্রাট বাবরের মৃত্যুর পরে নসরত শাহ্ সংবাদ পান যে, বাদশা হুমায়ূন বাংলা আক্রমণের পরিকল্পনা করছেন। তখন নসরত শাহ্ গুজরাটের সুলতান বাহাদুর শাহ্‌র নিকট দূত পাঠিয়ে তাঁর কাছ থেকে বাদশা হুমায়ূনের বিরোধিতা কামনা করেন। সুলতান বাহাদুর শাহ্‌ও এতে উৎসাহ দেখান। কিন্তু কোন চুক্তি সম্পাদনের আগেই নসরত শাহ্ ইন্তিকাল করেন।

সুলতান নাসির-উদ-দীন নসরত শাহ্ ছিলেন অত্যন্ত যোগ্য শাসক। পিতার রাজ্যসীমা তিনি শুধু অক্ষুণ্ণই রাখেন নি, কোন কোন দিকে তা বর্ধিত করেন। সুলতান হোসেন শাহ্‌র সময়ে রাজ্যের পশ্চিম সীমা বিহারের কিছু অংশে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু নসরত শাহ্ তা সম্প্রসারিত করে বর্তমান উত্তর প্রদেশের বালিয়া জেলাস্থ্ খরিদ এলাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি করেন। তদুপরি তিনি ছিলেন উচ্চস্তরের এক কূটনীতিজ্ঞ।

একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান হিসাবে তিনি নির্মাণ করেন অনেক মসজিদ, যার কারুকার্য এদেশের স্থাপত্য শিল্পে রেখেছে উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। সুলতান নসরত শাহ্ গৌড়ের কদম রসুল ভবনে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পবিত্র 'পদচিহ্ন' উৎকীর্ণ একখানি পাথর স্থাপন করেন। ফলে এই ভবনটি পরিচিত হয় 'কদম রসুল' ভবন নামে এবং তা মুসলমান সমাজে বিশষভাবে আদৃত হয়। নসরত শাহ্ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য বিখ্যাত হয়ে আছেন। শ্রীকর নদীর মহাভারতে সুলতান হোসেন শাহ্‌র নামের সঙ্গে নসরত শাহ্‌র নামও উল্লেখ করা হয়েছে। কবি শেখর বা কবিরঞ্জন বা বিদ্যাপতি নামক একজন পদকর্তার ভণিতায়ও নসরত শাহ্‌র নাম পাওয়া যায়। প্রায় ১৩ বছর কৃতিত্বের সঙ্গে রাজত্ব করার পর সম্ভবত তিনি কোন আততায়ী কর্তৃক নিহত হন ১৫৩১/৩২ সালে।

৪৮. সুলতান আলা-উদ-দীন ফিরোজ শাহ্ (১৫৩২-১৫৩৩ সাল)

সুলতান নসরত শাহ্‌র মৃত্যুর পর বাংলার মসনদে সমাসীন হন সুলতান আলা-উদ-দীন ফিরোজ শাহ্। কিন্তু অল্পদিন পরেই তাঁর চাচা মাহমুদ শাহ্‌র চক্রান্তে নিহত হন। কিন্তু এই স্বল্পকালের মধ্যেই তিনি খান্দানের সাহিত্য ও সংস্কৃতি প্রীতির

পরিচয় দিতে আরম্ভ করেছিলেন। তাঁর আদেশে দ্বিজ শ্রীধর বিদ্যাসুন্দর কাব্য বা কালিকা মঙ্গল রচনা করেন।

৪৯. সুলতান গিয়াস-উদ-দীন মাহমুদ শাহ্ (১৫৩৩-১৫৩৮ সাল)

স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্রকে হত্যা করে মসনদে আরোহণ করতে গিয়ে উচ্চাভিলাষী মাহমুদ শাহ্ গোড়াতেই অমাত্যদের মধ্যে নিজের শত্রু সৃষ্টি করেন। এবং রাজ্যে অন্তর্বিরোধের বীজ বপন করেন। রিয়াজ-উস-সালাতীনে বলা হয়েছে যে, মাহমুদ শাহ্র এই ঘৃণিত কাজের জন্য তাঁরই নিকট-আত্মীয় ও হাজীপুরের শাসক মাখদুম আলম নতুন সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। মখদুম আলম বিহারের শাসনকর্তা জালাল খানের অভিভাবক শের খানের সঙ্গে মিত্রতা করার ফলে মাহমুদ শাহ্র বিরুদ্ধে শের খানও এগিয়ে আসেন। এই বিবাদের শেষ পরিণতি স্বরূপ শের খানের হাতে মাহমুদ শাহ্ পরাজিত হন এবং এই সঙ্গে বিলুপ্ত হয় হোসেন শাহী খান্দানের রাজ্য শাসন। ১৫৩৮ সালে পাঠান বীর শের খান বাংলা জয় করেন। দু'শ বছরের স্বাধীনতা হারিয়ে বাংলা আবার অধীনতা বরণ করে।

স্বাধীন সুলতানী বাঙ্গালার সাংস্কৃতিক পটভূমি

স্বাধীন সুলতানী আমলে এদেশে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ যে ওই কালের কীর্তিনিচয়ের অন্যতম, তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। ওই সময়ে এদেশের মানুষ বিভিন্ন কারণে বাংলা, সংস্কৃত, আরবী, ফারসী– এই চারটি ভাষা ব্যবহার করত। জনসাধারণ তখনকার চলিত বাংলা ব্যবহার করত বটে, কিন্তু সংস্কৃত ভাষা বঙ্গে মুসলমান আগমনের পূর্ব থেকে রাজভাষা ও হিন্দুদের ধর্মীয় ভাষা হওয়ার কারণে জনসাধারণের মধ্যে এর একটা বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের কথায়, "মুসলিম আমলে সংস্কৃত রাজভাষার মর্যাদা হারাইল বটে, তবু হিন্দু সংস্কৃতি ও জীবনধারার সহিত পরিচিত হইবার জন্য অনেক মুসলমানও সংস্কৃত শিখিতেন। বাস্তবিকই সংস্কৃত ভাষার প্রতি মুসলমানদের কোন বিদ্বেষ ছিল না। ইহা কোন অস্বাভাবিক ব্যাপারও নহে; জাতি যখন বড় হয়, তখন সে অপরের সমস্ত জ্ঞান, তাহা পৃথিবীর যে ভাষাতেই থাকুক, আহরণ করিয়া জাতীয় সঞ্চয় বৃদ্ধি করিয়া থাকে। উঠন্ত জাতি হিসাবে বাঙালী মুসলমানেরাও এই নীতির অনুসরণ করিয়াছিলেন, যদিও সহনশীল মুসলিম আদর্শ ও সংস্কৃতি হইতেই তাহারা অধিক পরিমাণে প্রেরণা লাভ করিতেন।

স্বাধীনতার যুগে, এমন কি তুর্কী আমলেও বাংলার মুসলমান যে আরবী ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলন করিতেন, তাহার প্রমাণ ব্যাপক। বাংলার তুর্কী আমল হইতে স্বাধীনতার শেষ যুগ পর্যন্ত বাংলাদেশে যত মুসলিম শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহার ভাষা আগাগোড়াই আরবী। মুসলমানদের ধর্মীয় ভাষা আরবী বলিয়া, জাতীয় সংস্কৃতির

মূল বাহক ও ধারক হিসাবে এই ভাষার সহিত সোজাসুজি পরিচয় স্থাপন করা মুসলমানেরা নিশ্চয় শ্রেষ্ঠ ভাষাগত কর্তব্য বলিয়া মনে করিতেন। কেননা, তাঁহারা জানিতেন– বিদ্যার্জন করা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর জন্য ফরয বা অবশ্য কর্তব্য। বাঙালী মুসলমানের দেশীয় সাহিত্য রচনায় এই আরবী চর্চার প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। বাংলা ভাষায় যে সমস্ত আরবী শব্দ প্রবেশ করিয়াছে, তাহা শুধু আদালতে ব্যবহৃত ফারসী ভাষার মধ্যস্থতায় ঘটে নাই, ইহা বাংলায় ব্যাপকভাবে আরবী ভাষা চর্চারও ফল।... বাঙালী মুসলমানেরা এই স্বাধীনতার যুগে বাংলা ভাষায় ধর্মীয় সাহিত্যও সৃষ্টি করিয়াছেন। এই সাহিত্য আরবী ভাষার সহিত সোজাসুজি সংযোগ স্থাপনেই সম্ভবপর হইয়াছিল।

ফারসী চিরদিনই মুসলমান আমলে সরকারী ভাষা ছিল। ফারসী স্বাধীন বঙ্গে ব্যাপকভাবে হিন্দু মুসলমানদের দ্বারা অনুশীলিত হইত। সরকারী ভাষার মর্যাদা লাভ করিয়াছিল বলিয়া অনেকেই বাধ্য হইয়া এই ভাষা শিখিত; আবার মুসলমানদের সাংস্কৃতিক ভাষা হিসাবেও অনেকেই ইহার অনুশীলন করিত। এই সময়ে ফারসী ভাষা ও সাহিত্য এবং মুসলমানদের পোশাক-পরিচ্ছদ কিভাবে বাংলার হিন্দুদের মধ্যে বহুল প্রচলিত হয়, তাহার কিছু কিছু উদাহরণ জয়ানন্দের (ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ) 'চৈতন্য মঙ্গলে' দেখিতে পাওয়া যায়। জগাই-মাধাই নামক যে দুইজন বৈষ্ণবদ্রোহী হিন্দুকে চৈতন্যদেব বৈষ্ণবমতে দীক্ষিত করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে জয়ানন্দ বলেন ঃ

'মসনবি (মনসবি) আবৃত্তি করে থাকে নলবনে।
মহাপাপী জগাই মাধই দুই জনে।'

কলিকালের অর্থাৎ চৈতন্যদেবের সম-সময়ের হিন্দু সমাজের বিদ্যা, আচার-ব্যবহার প্রভৃতির বর্ণনা প্রসঙ্গেও জয়ানন্দ লিখিয়াছেন ঃ

'ব্রাহ্মণে রাখিবে দাড়ি পারস্য পড়িবে।
মোজা পাত্র নড়ি হাথে কামান ধরিবে॥
মন্‌সবি আবৃত্তি করিবে দ্বিজবর।
ডাকা-চুরি ঘাটি সাধিবেক নিরন্তর॥'

ব্রাহ্মণগণ মুসলমানের ন্যায় দাড়ি রাখিতে শুরু করিয়াছেন, সংস্কৃত ছাড়িয়া ফারসী ভাষা পড়িতেছেন, তাঁহারা মোজা পরিধান করিয়া এক হাতে যষ্ঠি ও অন্য হাতে কামান বা ধনুক ধারণ করিতেছেন, এবং মুখে মুখে পারস্যের সুফী কবি মৌলানা জালালুদ্দীন রুমীর (১২০৭-১২৭৩) 'মসনবী' গ্রন্থ আবৃত্তি করিতেছেন,– ইহাই তো তখনকার দিনের হিন্দু সমাজের অবস্থা।' (মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য, ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, ১৯৫৭, পৃঃ ৪৩-৪৪)।

এমনি পরিবেশে ফারসী সাহিত্যের নানা প্রভাব যে হিন্দু-মুসলমানের বাংলা সাহিত্যে পড়বে, তাতে আশ্চর্যান্বিত হওয়ার কিছু নেই। এই প্রভাব প্রধানতঃ শব্দ, বিষয়, ভাব ও অনুবাদ- এই চার প্রকারেই বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছে। এতদ্‌সঙ্গে সে সময়ে এদেশে ইসলাম বিস্তৃতির কথাও ভাবতে হয়। স্বাধীনতা অর্জনের আগে থেকেই দেশে ইসলাম বিস্তৃত হতে থাকলেও তার পরিধি ছিল বেশ কিছুটা সঙ্কীর্ণ। দেশের রাষ্ট্রীয় সীমা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম বিস্তৃতির সীমাও বর্ধিত হতে থাকে। "একদিকে মুসলিম সেনাপতি ও সৈন্যেরা রাজ্যের পর রাজ্য জয় করিয়াছেন, অন্যদিকে ঔলিয়া, দরবেশ ও আলিমগণ দলে দলে ইসলাম প্রচার করিয়াছেন। এই সময়ে দেশে যে সমস্ত দরবেশ ও আলিম প্রচার কার্য চালাইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে গৌড়ের আখী সিরাজুদ্দীন (মৃত- ১৩৫৭), পাণ্ডুয়ার শেখ আলাউল হক (মৃত- ১৩৯৮), নূর কুৎব-ই-আলম (মৃত- ১৪১৬), হুগলীর ফুরফুরার শাহ্ আনওয়ার কুলী হলবী (মৃত- ১৩৭৫), রংপুরের শাহ্ ইসমাঈল গাজী (হত্যা- ১৪৭৪), খুলনার খানজাহান (মৃত-১৪৫৮), সোনার গাঁয়ের হাজী বাবা সালিহ্ (মৃত- ১৫০৬), শ্রীহট্টের শাহ্‌জালাল (মৃত-১৩৯৬) চট্টগ্রামের শাহ্ মুহসীন ঔলিয়া (মৃত- ১৩৯৭) এবং পীর বদর (ফখ্‌রুদ্দীন মুবারক শাহের রাজত্বকালে), ত্রিপুরার রাস্তী শাহ্ (১৩৫১ হইতে ১৩৮৮ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে), গৌড়ে মৌলানা বরখুরদার (মৃত ১৪৮৬ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে), দেবকোটের মৌলানা আতা (১৩৫৫), রাজশাহীর মৌলানা শাহ্ দৌলা (জীবিত- ১৫১৯), মুরশিদাবাদে শাহ্ চাঁদ, প্রকাশ দাদা পীর (১৪৯৩- ১৫১৯), সপ্তগ্রামের সৈয়দ আমূলী (মৃত-১৫৩১) প্রভৃতিই প্রধান।" (প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৪-৪৫)।

এমনি করেই সারা দেশ সুফী দরবেশ ও আলিমদের প্রচার তৎপরতায় ভরে উঠেছিল। দেশের সর্বত্র এখনও মুসলিম শাসকদের শত শত আরবী শিলালিপি ছড়িয়ে রয়েছে। এসব শিলালিপি থেকে মুসলিম শাসকদের যে মানস-চিত্র ফুটে ওঠে, তা কোন বিজয়ীর নিরেট ভয়াবহ চিত্র নয়, তা ইসলামের প্রেমের চিত্র, ভ্রাতৃত্বের ছবি, প্রীতির বিশ্ব-বিজয়িনী রূপ। ইসলাম যেন স্বীয় প্রাণের বিরাটত্ব, জ্ঞানের ঐশ্বর্য, সভ্যতার সম্পদ, সংস্কৃতির বিভব বাংলায় দুই হাতে বিলিয়ে দিয়েছে, আর বাংলার এতদিনকার ধর্মীয় সামাজিক অভিশাপে জর্জর নরনারী তা কুড়িয়ে নিয়ে নিজেদেরকে কৃতার্থ মনে করছে!

ইসলামের এই মহাপ্রাণতাই স্বাধীন সুলতানী আমলে বাংলার হিন্দুকে স্বেচ্ছায় ইসলাম কবুল করতে উৎসাহিত করে। ফলে, বাংলায় অনেক বৃদ্ধি পায় মুসলমানের সংখ্যা। এ সময়েই বাংলার মুসলমানেরা 'দেশী ভাষায়' সাহিত্য সৃষ্টি করে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের এবং ইসলামী সংস্কৃতির সমৃদ্ধি সম্পাদনে আত্মনিয়োগ করতে থাকেন।

স্বাধীনতা শুধুমাত্র রাজনৈতিক দাসত্ব থেকে মানুষকে মুক্তি দেয় না, তা মানুষের মনকেও চিন্তার দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে থাকে। প্রায় সোয়া দুই শ' বছরের বাংলা

(তখন বলা হত মুলক-ই-বাঙ্গালাহ্) তার প্রমাণ দিয়েছিল। স্বাধীন অর্থাৎ মুক্ত দেশের মুক্ত মন ও মানস সম্পন্ন মানুষের দেশে এ সময়ে প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে অনেকানেক মসজিদ-মাদ্রাসা ও শিল্প-সাহিত্য প্রসারী স্থাপনাসমূহ, স্থাপত্য শিল্প থেকে আরম্ভ করে চারু ও কারু শিল্প পর্যন্ত বিভিন্ন প্রবর্তনা। তাই দেখা যায়– স্থাপত্য শিল্পে ইসলামী রীতির সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে বাংলা রীতির 'বাংলা-ঘর', দেখা যায়– মসজিদের কারুকার্যে লতাপাতা ও জ্যামিতিক রীতির সঙ্গে বাংলার পুষ্প-স্বপ্নও, পারস্যের গোলাপের পাশে বাংলার পদ্মও। দেখা যায়– সেই পদ্মের পর্ণ আরবী হরফে 'আল্লাহ্' শব্দের পরাগ বুকে নিয়ে তৌহিদের বাণী ঘোষণা করছে। গৌড়ের 'ছোট সোনা মসজিদ' তারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। প্রকৃতপক্ষে, বাংলার মুসলমানদের হাতে পদ্ম যেমন আল্লাহ্ময় হয়েছে, বাংলা সাহিত্যও তেমনি 'বাংলা থাকিয়াও আল্লাহ্ময় হইয়াছে'। বাংলা সাহিত্যে মুসলমান অবদানের এই-ই হচ্ছে প্রধানতম বৈশিষ্ট্য।

স্বাধীনতার কালে বাংলার ধর্মীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রেও মানুষের মন খুলে গেল। ইসলাম দেশের মাটি ও মনের সঙ্গে মিলেমিশে স্থায়ী হয়ে গেল। তার বাণী দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত হাজারো কণ্ঠে উচ্চারিত ও জীবনে রূপায়িত হয়ে উঠল। ডক্টর হকের কথায়, "মানুষের চোখের সামনেই ইসলামের আভ্যন্তরীণ বিভব ও বাহ্যিক মহিমা ধীরে ধীরে পর্ণে পর্ণে বিকশিত হইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া দেশের অমুসলমানদের মনে নানা সংশয়, নানা প্রশ্ন জাগিয়া উঠিল। জাতিভেদ জর্জরিত হিন্দু সমাজের সংস্কারের প্রাচীর তাহাদের সাংস্কৃতিক, বিশেষ করিয়া ধর্মীয় অনুদারতার জন্যই একে একে ধ্বসিয়া পড়িতে লাগিল। এক কথায়, বাংলার হিন্দুর সামাজিক জীবনে প্রথমে মৃদু এবং পরে প্রবল হইতে প্রবলতর চাঞ্চল্য প্রকাশ পাইল। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের অধিকাংশ কুলজী গ্রন্থে যিনি রাজা 'দত্তখান' বা 'দত্তখাস' নামে পরিচিত, তিনিই এই যুগের বাঙালী হিন্দুদের সামাজিক চাঞ্চল্যের প্রাচীনতম উদাহরণ। ১৪৫৫ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে সুলতান নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহের রাজত্বকালে (১৪৪২–১৪৫৯) রাজা 'দত্তখান' এক ধর্মীয় সামাজিক প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ছিলেন। এই প্রতিষ্ঠানটির নাম 'জাতিমালা কাচারী'। এই প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে তিনি রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের ৫৭তম (সপ্তপঞ্চাশত্তম) সমীকরণের ব্যবস্থা করিয়া হিন্দুর সামাজিক চাঞ্চল্য অপনোদনের চেষ্টা করেন। ইহাতেও হিন্দুর সামাজিক চাঞ্চল্য দূরীভূত হয় নাই। ইহার কয়েক বৎসর পরেই 'পটি' ও 'কাপ' বন্ধন করিয়া উদয়নাচার্য ভাদুড়ী উত্তর-বঙ্গের হিন্দুদের মধ্যে 'পরিবর্ত মর্যাদা' স্থাপন করেন। ইহাতেও যখন কুলাইল না, ১৪৮০ খ্রীস্টাব্দে দেবীবর ঘটক রাঢ়ীয় কুলীন সমাজকে ছত্রিশ 'মেলে' আবদ্ধ করেন। ১৪৮৫ খ্রীস্টাব্দে ধ্রুবানন্দ মিশ্রের 'মহাবংশাবলী' রচিত হইল। ইহাতেও সে একই সামাজিক চাঞ্চল্য সুস্পষ্ট।

অতঃপর, এই চাঞ্চল্য সমাজ ছাড়াইয়া ধর্মের ক্ষেত্রেও ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। হিন্দুর মনে প্রশ্ন জাগিতে লাগিল, তবে কি বেদ, বেদান্ত, দেবতা, পুরাণ ও আচার-বিচার প্রভৃতি সমস্তই ভুল? আর ইসলাম, ভ্রাতৃত্ব, মানবতা প্রভৃতিই সত্য? ধর্ম মানুষের জন্য, না মানুষ ধর্মের জন্য?" (প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৮-৪৯)।

এরই প্রেক্ষাপটে তখনকার কবি চন্ডীদাসের কণ্ঠে ঘোষিত হল ঃ

"শুন হে মানুষ ভাই!

সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।"

হোসেন শাহী বংশের রাজত্বকালে বাংলার সংস্কৃত চর্চার প্রধানতম কেন্দ্র নবদ্বীপের খণ্ডিত সমাজ থেকে স্মার্ত পণ্ডিত রঘুনন্দন এবং নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি রক্ষণশীল হিন্দুদের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন। সংহিতার ব্যবস্থায় ও ন্যায়ের ধুম্রজালে হিন্দু সমাজকে আচ্ছন্ন করে দেয়ার চেষ্টা চলল। কিন্তু তা-ও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল। ১৫৪০-এর কাছাকাছি সময়ে 'নুলো পঞ্চানন' তার 'গোষ্ঠী-কথা' নামক গ্রন্থে 'মেল-বন্ধন' করলেন। তিনি রঘুনন্দনের স্মৃতির ব্যবস্থা, রঘুনাথের নৈয়ায়িক বিচার, কিছুরই প্রশংসা না করে লিখলেন ঃ

"এই কালে রাঢ়ে-বঙ্গে পড়ে গেল ধূম।

বড় বড় ঘর যত হইল নির্ধূম॥"

কিন্তু কোন কিছুতেই কিছু হল না। ফলতঃ, ইসলামের সামগ্রিক প্রভাবে হিন্দু সমাজে এক প্রবল বিক্ষোভ উগ্রভাবে আত্মপ্রকাশ করতে লাগল। 'প্রেম-বিলাসে'র কথায় এই বিক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে এভাবে ঃ

"কলিকালে লোক সব বড় দুরাচার।

প্রধান কারণ তার যবন অধিকার॥"

হিন্দু সমাজের এমনিতর বিক্ষুব্ধ সময়েই চৈতন্যদেবের (১৪৮৫–১৫৩৩) আবির্ভাব। ১৫০৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে তিনি নদীয়ায় 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব-মত' প্রচার করতে থাকেন। তাঁর এই মত ঘটক ও কারিকাকারদের ও রক্ষণশীল পণ্ডিতদের হিন্দু ধর্মীয় গোঁড়ামির প্রতিক্রিয়া মাত্র। "এই মতবাদ ইসলামকে মানিয়া লইয়া প্রগতিশীল হইয়া উঠায়, দেশে স্থায়ী ও বিস্তৃত হইতে সমর্থ হয়। 'নামে রুচি, জীবে দয়া'– ইহাই গৌড়ীয় বৈষ্ণব-মতের মূলমন্ত্র। তাঁহাদের 'নামে রুচি' কীর্তনের অর্থাৎ নাম-সংকীর্তনের রূপ গ্রহণ করিয়াছিল এবং 'জীবে দয়া' সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববাদে রূপান্তরিত হইয়া হিন্দুদের জাতিভেদ প্রথা লোপ করিয়া দিবার চেষ্টা করে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের এই 'নামে রুচি ও জীবে দয়া' মুসলিম সুফী সাধকদের 'জিকর' ও 'খিদমৎ' নীতির নামান্তর। ইহাতে

ইসলামের সাম্য, উদারতা ও ভ্রাতৃত্বের ছাপও সুস্পষ্ট। সূফীদের 'সমা' ও বৈষ্ণবদের 'কীর্তনে' কোন তফাৎ নাই। এই কীর্তনের শেষে বৈষ্ণবদের যে 'দশা' হয়, তাহাতে যে শারীরিক ও মানসিক অবস্থা ফুটিয়া উঠে, সূফীদের 'হালের' অবস্থাও তাহাই। 'কীর্তন' ও 'সমা' এবং 'দশা' ও 'হাল' শব্দার্থ, ভাব, সম্পাদন-ব্যবস্থা ও মানসিক অনুভূতির দিক হইতে একই বস্তুর অভিব্যক্তি। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের 'প্রেম', সুফীদের 'ইশ্‌ক'; 'রাধা-কৃষ্ণ' সুফীদের 'সাকী' ও 'বুৎ' কিংবা 'শম্‌আ' ও 'পরওয়ানা'; 'ঐশ্বর্য', সুফীদের 'কিরামৎ' ছাড়া আর কিছুই নহে।" (প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫০-৫১)।

শুধুমাত্র ধর্মীয় ও সামাজিক ইতিহাসেই নয়, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসেও চৈতন্যদেবের আবির্ভাব এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। সংস্কৃত ভাষাতে সুপণ্ডিত হয়েও তিনি তাঁর গৌড়ীয় বৈষ্ণব-মত প্রচার করলেন এদেশীয় জনসাধারণের মুখের ভাষা বাংলায়। বেদ-পুরাণ ত্যাগ করে তিনি মতবাদ প্রচারে সাহায্য নিলেন বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলীর। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের 'রাধা' ও 'কৃষ্ণ' হিন্দু ধর্মীয় 'রাধা' ও 'কৃষ্ণ' নয়। পরন্তু, বৈষ্ণবদের 'রাধা' জীবাত্মার ও 'কৃষ্ণ' পরমাত্মার প্রতীক। কৃষ্ণের বাঁশরী জীবাত্মার প্রতি পরমাত্মার 'ডাক'। মধ্যখানে এই দু'য়ের মিলনের অন্তরায় স্বরূপ ঐহিক জীবনের সংসার-ধর্ম 'যমুনা' রূপে বিরাট অন্তরায় সৃষ্টি করেছে। তাই কবি বলেন ঃ

"এপার হৈতে বাজাও বাঁশী ওপার হৈতে শুনি।
অভাগিয়া নারী আমি সাঁতার নাহি জানি ॥"

এখানে উল্লেখ্য যে, কৃষ্ণের বংশী-ধ্বনিকে অবলম্বন করে বাঁশরী-লীলা দেখাবার জন্য যে বিরাট পদাবলী সাহিত্য রচিত হয়েছে, তার মমার্থ এবং মৌলানা জালালুদ্দীন রূমীর 'মসনবি শরীফ'-এর সুবিখ্যাত 'বাঁশরী-বেদন' কবিতার মর্মার্থ অবিকল এক। দেশভেদে রূপভেদ ঘটেছে মাত্র।

এক্ষণে স্বাধীন সুলতানী বাঙ্গালার সাংস্কৃতিক পটভূমির ইতি টানতে চাই ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক সাহেবেরই কথামালা দিয়ে ঃ "মুসলমানেরা স্বাধীনতার যুগে বাংলা ভাষায় স্বীয় সংস্কৃতি ও ধর্মের অনুসরণে খাঁটি মুসলিম সাহিত্য রচনা করিলেও, গৌড়ীয় বৈষ্ণব কর্তৃক প্রবর্তিত নব্য বাংলা সাহিত্যেও তাঁহাদের প্রত্যক্ষ দান আছে, সম্পূর্ণ মুসলিম থাকিয়াই তাঁহারা বৈষ্ণব ঢঙে সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাহার সর্বপ্রধান নজীর সপ্তদশ শতাব্দীর আলাওল, যে আলাওল 'তোহ্‌ফা'-এর ন্যায় খাঁটি ধর্মীয় গ্রন্থ রচনা করেন, তিনি আবার বৈষ্ণবী ঢঙে 'পদ'ও রচনা করিয়াছিলেন। কি করিয়া এমন হইয়াছিল, তাহাই ভাবিবার কথা। গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা যে নব্য সাহিত্য সৃষ্টি করিলেন, তাহার আবরণ হিন্দুয়ানী-ঘেঁষা হইলেও অন্তর ছিল সুফী সাহিত্যের ভাবে পরিপূর্ণ।... মুসলমানেরা সুফী সাহিত্য পড়িত্‌। হিন্দুরাও তাহাই করিয়াছে। হিন্দুরা যেমন সুফী সাহিত্যের অনুরূপ পদাবলী রচনা করিয়া মুসলমান হয় নাই, মুসলমানেরাও পদাবলী

রচনা করিয়া বৈষ্ণব বনে নাই। সুতরাং, ইঁহাদিগকে 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি' বলা যায় না। তাঁহারা মুসলমান কবিই ছিলেন, বৈষ্ণব ঢঙে সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

এইরূপ সাংস্কৃতিক পটভূমিতেই স্বাধীনতার যুগে বাংলার মুসলমান বাংলা সাহিত্য-সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন।" (প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৩-৫৪)।

স্বাধীন সুলতানী আমলে বাংলা সাহিত্যের বিকাশ-ধারা

বাংলায় ১২০৩ থেকে ১৭৬৫ সাল পর্যন্ত সাড়ে পাঁচশ' বছরেরও অধিককাল যে মুসলিম শাসনামল, তার মধ্যে তুর্কী আমল বলে চিহ্নিত শাসনকালে (১২০৩-১৩৩৮) দিল্লীর সুলতানী সাম্রাজ্যের প্রতি বাংলার শাসনকর্তাদের পূর্ণ আনুগত্যকাল মাত্র ৪৪ বছরের, ১২২৭ থেকে ১২৭২ সাল পর্যন্ত। তার আগে ও পরে বাদবাকী সময়টায় কখনও বাংলা স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে শাসিত হয়েছে, কখনও দিল্লীর অধীনস্থ হিসাবে শাসিত হয়েছে। স্বাধীনতা-অধীনতার এই টানাপোড়েনে অবস্থা চরম পরিণতির পর্যায়ে পৌঁছেছে ১২৭২ থেকে ১৩৩৮ সালের মধ্যবর্তীকালে; তাই এ কালটাকে স্বাধীনতা প্রয়াসকাল হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। অতঃপর ১৩৩৮ সালে বাংলার তিনটি অঞ্চলে সোনারগাঁও, সাতগাঁও ও লাখনৌতিকে তিনটি রাজধানী করে আলাদাভাবে যে স্বাধীনতা ঘোষিত হল এবং ১৩৫২ সালে তিনটি অঞ্চলের সমন্বয়ে সুলতান শামস-উদ-দীন ইলিয়াস শাহ্ যে একীভূত স্বাধীন বাংলার প্রতিষ্ঠা করলেন তার স্বাধীনতা অটুট থেকেছে ১৫৩৮ সাল পর্যন্ত। ১৩৩৮ থেকে ১৫৭৫ সাল পর্যন্ত বাংলায় দিল্লীভিত্তিক আফগান শাসন এবং তার পরেই ১৫৭৫ থেকে ১৭৬৫ সাল পর্যন্ত দিল্লীকেন্দ্রিক মুঘল শাসন। বাংলা তখন মুঘল সাম্রাজ্যের একটি সমৃদ্ধিশালী সুবাহ্ মাত্র।

দু' শ' বছরের নিরঙ্কুশ স্বাধীনতাকালে বাংলা শাসন করেছেন বিভিন্ন বংশীয় সুলতানগণ যার মধ্যে বিশেষভাবে স্মরণীয় হচ্ছে ইলিয়াস শাহী বংশ ও হোসেন শাহী বংশ। ইলিয়াস শাহী বংশের শাসনকাল দু'ভাগে বিভক্তঃ প্রথম ভাগ ১৩৫২ থেকে ১৪১২ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত এবং দ্বিতীয় ভাগ ১৪৩৫/৩৬ থেকে ১৪৮৭ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত। মধ্যকার ২৪ বছর রাজা গণেশ কর্তৃক ইলিয়াস শাহী বাংলাকে ধ্বংস করে ব্রাহ্মণ্য কর্তৃত্ব পুনরুদ্ধার প্রয়াসের ৭ বছরের বিশৃংখলা এবং সে প্রয়াস ব্যর্থ হওয়ার পর গণেশ-পুত্র যদুর ইসলামে দীক্ষিত হয়ে জালাল-উদ-দীন মুহাম্মদ শাহ্ উপাধি নিয়ে সুলতান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মাধ্যমে বিশৃংখলার অবসান। সুলতান জালাল-উদ-দীন মুহম্মদ শাহ্র রাজত্বকাল ১৪১৮ থেকে ১৪৩৩ সাল। তাঁর মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র সুলতান শামস-উদ-দীন আহমদ শাহ ১৪৩৫/৩৬ সালে নিহত হলে বাংলার মসনদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয় সেই ইলিয়াস শাহী বংশ ইতিহাসে যা 'পরবর্তী ইলিয়াস শাহী বংশ' বলে অভিহিত।

ইলিয়াস শাহী বংশের প্রথম ভাগের সুলতানগণ হচ্ছেন ঃ শামস-উদ-দীন ইলিয়াস শাহ্ (১৩৫২-১৩৫৭), সিকান্দার শাহ (১৩৫৭-১৩৯৩), গিয়াস-উদ-দীন আজম শাহ্ (১৩৯৩-১৪১০/১১) ও সাইফ-উদ-দীন হামজা শাহ (১৪১০/১১-১৪১১/১২)।

মধ্যবর্তী গণেশ বংশীয় সুলতানগণ হচ্ছেন ঃ জালাল-উদ-দীন মুহম্মদ শাহ্ (যদু) (১৪১৮-১৪৩৩) ও শামস-উদ-দীন আহমদ শাহ্ (১৪৩৩-১৪৩৫/৩৬)।

'পরবর্তী ইলিয়াস শাহী' বংশীয় সুলতানগণ হচ্ছেন ঃ নাসির-উদ-দীন মাহমুদ শাহ্ (১৪৩৫/৩৬-১৪৫৯/৬০), রুকন-উদ-দীন বারবক শাহ্ (১৪৫৯/৬০-১৪৭৪), শামস-উদ-দীন ইউসুফ শাহ্ (১৪৭৪-১৪৮১) ও জালাল-উদ-দীন ফতেহ শাহ্ (১৪৮১-১৪৮৭)।

হোসেন শাহী বংশীয় সুলতানগণ হচ্ছেন ঃ আলা-উদ-দীন হোসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯), নাসির-উদ-দীন নুসরত শাহ্ (১৫১৯-১৫৩১), আলা-উদ-দীন ফিরোজ শাহ্ (১৫৩১-১৫৩৩) ও গিয়াস-উদ-দীন মাহমুদ শাহ্ (১৫৩৩-১৫৩৮)। উপরোক্ত সুলতানগণের অনেকেই বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য এবং নিজেদের বিদ্যা ও কাব্যানুরাগের জন্য ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের কথায়, "ইলিয়াস শাহ একজন দূরদর্শী সুলতান ছিলেন; বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতা বাংলাদেশে মুসলিম সাংস্কৃতিক জাগরণের এক নবযুগ সূচনা করিল। (তখন থেকে) গৌড়ীয় শাহী দরবার বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সাংস্কৃতিক স্নায়ু-কেন্দ্ররূপে গড়িয়া উঠিতে থাকে।

বাংলা সাহিত্যে ও চারুকলার পরিপোষক আবহাওয়া সৃষ্টিতে একটির পর একটি করিয়া মুসলিম সুলতানদের নিরবচ্ছিন্ন রাজত্ব প্রবল অনুপ্রেরণা যোগাইতে থাকে।" (দ্রষ্টব্য–ডঃ মুহাম্মদ এনামুল হক ঃ মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য, ১৯৫৭ সাল পৃঃ ৩১)।

বস্তুত, ইলিয়াস শাহী সুলতানেরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা ও বিকাশের জন্য যে ঐতিহ্য সৃষ্টি করলেন, তার পরিণামে ক্রমসমৃদ্ধ হয়ে উঠতে লাগল বাংলার নিজস্ব সাহিত্য ও সংস্কৃতি। এই ঐতিহ্য নবতর প্রাণ-প্রাচুর্যে আরও উজ্জীবিত হয়ে ওঠে সুলতান জালাল-উদ-দীন মুহম্মদ শাহ্র কালে, পরবর্তী ইলিয়াস শাহ্ বংশীয়দের রাজত্ব কালে ও হোসেন শাহী আমলে। 'পরবর্তী ইলিয়াস শাহী' সুলতানদের অবদান প্রসঙ্গে ডক্টর মুহাম্মদ এনামুল হকের বক্তব্য হচ্ছে ঃ "এই সময়ে গৌড়ের শাহী দরবারে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের নীরব অভিযানের আর এক ধাপ সুদৃঢ় করিয়া রচিত হইল। ইতঃপূর্বে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য গৌড় দরবারে প্রকাশ্য স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। এইবার এই স্বীকৃতির ভিত্তি আরও ব্যাপক ও সুদৃঢ় হইল।" (দৃষ্টব্য–প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৪-৩৫)।

হোসেন শাহী সুলতানদের অবদান প্রসঙ্গে ডক্টর হক বলেন ঃ "১৪৯৩ খ্রীস্টাব্দে গৌড়ে আলাউদ্দীন হোসেন শাহ বাদশাহ হইলেন। বাংলা ইতিহাসে হুসেনী বংশের ৪৫

রচনা করিয়া বৈষ্ণব বনে নাই। সুতরাং, ইঁহাদিগকে 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি' বলা যায় না। তাঁহারা মুসলমান কবিই ছিলেন, বৈষ্ণব ঢঙে সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

এইরূপ সাংস্কৃতিক পটভূমিতেই স্বাধীনতার যুগে বাংলার মুসলমান বাংলা সাহিত্য-সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন।" (প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৩-৫৪)।

স্বাধীন সুলতানী আমলে বাংলা সাহিত্যের বিকাশ-ধারা

বাংলায় ১২০৩ থেকে ১৭৬৫ সাল পর্যন্ত সাড়ে পাঁচশ' বছরেরও অধিককাল যে মুসলিম শাসনামল, তার মধ্যে তুর্কী আমল বলে চিহ্নিত শাসনকালে (১২০৩-১৩৩৮) দিল্লীর সুলতানী সাম্রাজ্যের প্রতি বাংলার শাসনকর্তাদের পূর্ণ আনুগত্যকাল মাত্র ৪৪ বছরের, ১২২৭ থেকে ১২৭২ সাল পর্যন্ত। তার আগে ও পরে বাদবাকী সময়টায় কখনও বাংলা স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে শাসিত হয়েছে, কখনও দিল্লীর অধীনস্থ হিসাবে শাসিত হয়েছে। স্বাধীনতা-অধীনতার এই টানাপোড়েনে অবস্থা চরম পরিণতির পর্যায়ে পৌঁছেছে ১২৭২ থেকে ১৩৩৮ সালের মধ্যবর্তীকালে; তাই এ কালটাকে স্বাধীনতা প্রয়াসকাল হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। অতঃপর ১৩৩৮ সালে বাংলার তিনটি অঞ্চলে সোনারগাঁও, সাতগাঁও ও লাখনৌতিকে তিনটি রাজধানী করে আলাদাভাবে যে স্বাধীনতা ঘোষিত হল এবং ১৩৫২ সালে তিনটি অঞ্চলের সমন্বয়ে সুলতান শামস-উদ-দীন ইলিয়াস শাহ্ যে একীভূত স্বাধীন বাংলার প্রতিষ্ঠা করলেন তার স্বাধীনতা অটুট থেকেছে ১৫৩৮ সাল পর্যন্ত। ১৩৩৮ থেকে ১৫৭৫ সাল পর্যন্ত বাংলায় দিল্লীভিত্তিক আফগান শাসন এবং তার পরেই ১৫৭৫ থেকে ১৭৬৫ সাল পর্যন্ত দিল্লীকেন্দ্রিক মুঘল শাসন। বাংলা তখন মুঘল সাম্রাজ্যের একটি সমৃদ্ধিশালী সুবাহ্ মাত্র।

দু' শ' বছরের নিরঙ্কুশ স্বাধীনতাকালে বাংলা শাসন করেছেন বিভিন্ন বংশীয় সুলতানগণ যার মধ্যে বিশেষভাবে স্মরণীয় হচ্ছে ইলিয়াস শাহী বংশ ও হোসেন শাহী বংশ। ইলিয়াস শাহী বংশের শাসনকাল দু'ভাগে বিভক্তঃ প্রথম ভাগ ১৩৫২ থেকে ১৪১২ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত এবং দ্বিতীয় ভাগ ১৪৩৫/৩৬ থেকে ১৪৮৭ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত। মধ্যকার ২৪ বছর রাজা গণেশ কর্তৃক ইলিয়াস শাহী বাংলাকে ধ্বংস করে ব্রাহ্মণ্য কর্তৃত্ব পুনরুদ্ধার প্রয়াসের ৭ বছরের বিশৃংখলা এবং সে প্রয়াস ব্যর্থ হওয়ার পর গণেশ-পুত্র যদুর ইসলামে দীক্ষিত হয়ে জালাল-উদ-দীন মুহাম্মদ শাহ্ উপাধি নিয়ে সুলতান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মাধ্যমে বিশৃংখলার অবসান। সুলতান জালাল-উদ-দীন মুহম্মদ শাহ্র রাজত্বকাল ১৪১৮ থেকে ১৪৩৩ সাল। তাঁর মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র সুলতান শামস-উদ-দীন আহমদ শাহ ১৪৩৫/৩৬ সালে নিহত হলে বাংলার মসনদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয় সেই ইলিয়াস শাহী বংশ ইতিহাসে যা 'পরবর্তী ইলিয়াস শাহী বংশ' বলে অভিহিত।

ইলিয়াস শাহী বংশের প্রথম ভাগের সুলতানগণ হচ্ছেন ঃ শামস-উদ-দীন ইলিয়াস শাহ্ (১৩৫২-১৩৫৭), সিকান্দার শাহ (১৩৫৭-১৩৯৩), গিয়াস-উদ-দীন আজম শাহ্ (১৩৯৩-১৪১০/১১) ও সাইফ-উদ-দীন হামজা শাহ (১৪১০/১১-১৪১১/১২)।

মধ্যবর্তী গণেশ বংশীয় সুলতানগণ হচ্ছেন ঃ জালাল-উদ-দীন মুহম্মদ শাহ্ (যদু) (১৪১৮-১৪৩৩) ও শামস-উদ-দীন আহমদ শাহ্ (১৪৩৩-১৪৩৫/৩৬)।

'পরবর্তী ইলিয়াস শাহী' বংশীয় সুলতানগণ হচ্ছেন ঃ নাসির-উদ-দীন মাহমুদ শাহ্ (১৪৩৫/৩৬-১৪৫৯/৬০), রুকন-উদ-দীন বারবক শাহ্ (১৪৫৯/৬০-১৪৭৪), শামস-উদ-দীন ইউসুফ শাহ্ (১৪৭৪-১৪৮১) ও জালাল-উদ-দীন ফতেহ শাহ্ (১৪৮১-১৪৮৭)।

হোসেন শাহী বংশীয় সুলতানগণ হচ্ছেন ঃ আলা-উদ-দীন হোসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯), নাসির-উদ-দীন নুসরত শাহ্ (১৫১৯-১৫৩১), আলা-উদ-দীন ফিরোজ শাহ্ (১৫৩১-১৫৩৩) ও গিয়াস-উদ-দীন মাহমুদ শাহ্ (১৫৩৩-১৫৩৮)। উপরোক্ত সুলতানগণের অনেকেই বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য এবং নিজেদের বিদ্যা ও কাব্যানুরাগের জন্য ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের কথায়, "ইলিয়াস শাহ একজন দূরদর্শী সুলতান ছিলেন; বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতা বাংলাদেশে মুসলিম সাংস্কৃতিক জাগরণের এক নবযুগ সূচনা করিল। (তখন থেকে) গৌড়ীয় শাহী দরবার বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সাংস্কৃতিক স্নায়ু-কেন্দ্ররূপে গড়িয়া উঠিতে থাকে।

বাংলা সাহিত্যে ও চারুকলার পরিপোষক আবহাওয়া সৃষ্টিতে একটির পর একটি করিয়া মুসলিম সুলতানদের নিরবচ্ছিন্ন রাজত্ব প্রবল অনুপ্রেরণা যোগাইতে থাকে।" (দ্রষ্টব্য– ডঃ মুহাম্মদ এনামুল হক ঃ মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য, ১৯৫৭ সাল পৃঃ ৩১)।

বস্তুত, ইলিয়াস শাহী সুলতানেরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা ও বিকাশের জন্য যে ঐতিহ্য সৃষ্টি করলেন, তার পরিণামে ক্রমসমৃদ্ধ হয়ে উঠতে লাগল বাংলার নিজস্ব সাহিত্য ও সংস্কৃতি। এই ঐতিহ্য নবতর প্রাণ-প্রাচুর্যে আরও উজ্জীবিত হয়ে ওঠে সুলতান জালাল-উদ-দীন মুহম্মদ শাহ্র কালে, পরবর্তী ইলিয়াস শাহ্ বংশীয়দের রাজত্ব কালে ও হোসেন শাহী আমলে। 'পরবর্তী ইলিয়াস শাহী' সুলতানদের অবদান প্রসঙ্গে ডক্টর মুহাম্মদ এনামুল হকের বক্তব্য হচ্ছে ঃ "এই সময়ে গৌড়ের শাহী দরবারে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের নীরব অভিযানের আর এক ধাপ সুদৃঢ় করিয়া রচিত হইল। ইতঃপূর্বে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য গৌড় দরবারে প্রকাশ্য স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। এইবার এই স্বীকৃতির ভিত্তি আরও ব্যাপক ও সুদৃঢ় হইল।" (দৃষ্টব্য–প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৪-৩৫)।

হোসেন শাহী সুলতানদের অবদান প্রসঙ্গে ডক্টর হক বলেন ঃ "১৪৯৩ খ্রীস্টাব্দে গৌড়ে আলাউদ্দীন হুসেন শাহ্ বাদশাহ্ হইলেন। বাংলা ইতিহাসে হুসেনী বংশের ৪৫

বর্ষব্যাপী রাজত্বকাল (১৪৯৩-১৫৩৮) রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক তৎপরতার জন্য, অধিকন্তু সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য চিরবিখ্যাত। এই বংশ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি ও বিস্তৃতির জন্য যাহা করিয়াছে, তাহার তুলনা ইতিহাসে বিরল। বাংলায় 'ব্রজবুলি ভাষায়' পদ রচনা করিবার রেওয়াজও হুসেন শাহের সময় প্রবর্তিত হইল। প্রাচীন হিন্দু গ্রন্থের, বিশেষ করিয়া ধর্ম সাহিত্যের বাংলা ভাষায় অনুবাদ হুসেন শাহের আর এক বড় কীর্তি। বাংলার সর্বপ্রথম 'বিদ্যাসুন্দর কাহিনী'ও হুসেন শাহের আমলে রচিত হয়। এইভাবে হুসেন শাহের রাজত্বকালে বাংলার লৌকিক কাহিনী 'মনসামঙ্গল' বাংলা সাহিত্যের এক প্রধান শাখা 'ব্রজবুলি পদ' হিন্দু ধর্মীয় সাহিত্যের অনুবাদ 'বাংলা মহাভারত' এবং ভারত বিখ্যাত পৌরাণিক গল্প 'বিদ্যাসুন্দর' প্রভৃতি বাংলা সাহিত্যে স্থান পাইল। এতদ্ব্যতীত তাঁহার রাজত্বকালের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইতেছে চৈতন্যদেবের (১৪৮৬-১৫৩৩) আবির্ভাব ও তৎকর্তৃক 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতের' প্রতিষ্ঠা। চৈতন্যদেব তাঁহার মাতৃভাষা বাংলায় 'গৌড়ীর বৈষ্ণব মত' প্রচার করায় বাংলা সাহিত্যের এক নতুন দিক খুলিয়া গেল। বাংলায় বৈষ্ণব সাহিত্যের ভিত্তি প্রোথিত হইল।" (দ্রষ্টব্য- প্রাগুক্ত পৃ. ৩৫-৩৭)।

এবার স্বাধীন সুলতানী আমলের একটা কবি ও কাব্য পরিচিতি এখানে তুলে ধরতে চাই। এ প্রসঙ্গে কবিদের আবির্ভাবকাল ও কাব্য রচনাকাল নির্ণয়ে ঐতহাসিকদের মধ্যে মতান্তর দেখা যায় বলে আমরা সঠিক কাল নির্ণয়ের মধ্যে না গিয়ে "এ পর্যন্ত গ্রহণীয় সম্ভাব্যকাল" উল্লেখ করেই তালিকাটি তৈরি করেছি। প্রথমেই বলে নেয়া উচিত যে এ তলিকা সম্পূর্ণাঙ্গ নয়, সম্পূর্ণাঙ্গ হতেও পারে না; কারণ, ঐতিহাসিক ও পণ্ডিতবর্গের অনুসন্ধান ও গবেষণার ফলে এ পর্যন্ত যা পাওয়া গেছে, তারই একটা খতিয়ান দেওয়াই আমাদের পক্ষে সম্ভব। অনুসন্ধান ও গবেষণার কাজ বরাবরই চলবে, নতুন তথ্যও তাই প্রকাশিত হতে পারে নতুন করে। মুসলিম কবিদের তালিকাটি বিশেষ করেই অসম্পূর্ণ। এ প্রসঙ্গে ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক বলেন ঃ "বাংলার মুসলমানদের অত্যন্ত দুর্ভাগ্য যে, রাজ্যহারা হইয়া উনবিংশ শতাব্দীতে তাঁহারা প্রতিবেশী হিন্দুর সহিত ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করিলেন না। ফলে, পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোকে প্রদীপ্ত হইয়া, এ দেশের হিন্দুদের মধ্যে যে জাতীয়তাবোধ ও তাহার ফলস্বরূপ জাতীয় বিলুপ্ত–ঐতিহ্য সন্ধান ও উদ্ধারের স্পৃহা জাগিল, তাহাতে রাশি রাশি বাংলা পুঁথি ও পাণ্ডুলিপি সংগৃহীত হইয়া গেল। তাহার সহিত দুই চারিটি মুসলিম পুঁথিও যে উদ্ধার হইল না, তাহা নহে, সংগ্রহের প্রেরণায় মুসলমানের বাড়ি হইতে মুসলিম পুঁথি সংগৃহীত হইল না। ইহার জন্যই বাংলার মুসলমানদের এক বিরাট জাতীয় সম্পদ ধ্বংস হইয়া যাইতে লাগিল। এই সময়ে মরহুম আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ সাহেবের আবির্ভাব (১৮৬৯-১৯৫৩) না ঘটিলে প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমরা নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইতাম। তাঁহার ব্যক্তিগত চেষ্টায় শুধু চট্টগ্রাম অঞ্চল

হইতে বাংলার মুসলমানদের যে সমস্ত পুথি সংগৃহীত হইয়াছিল, বর্তমান আলোচনায় তাহাই আমাদের প্রধান সম্বল। এতদ্‌সত্ত্বেও প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যে মুসলমানদের দান সম্বন্ধে ধারণা করিয়া লইতে বিশেষ কোন বেগ পাইতে হয় না।" (দ্রষ্টব্য– প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৫)।

তালিকা–এক

কবিদের নাম	বাংলায় কাব্য-কৃতি	সম্ভাব্য কাল ও মন্তব্য
কৃত্তিবাস	রামায়ণ	'পরবর্তী ইলিয়াস শাহী' বংশীয় দ্বিতীয় সুলতান রুকন-উদ-দীন বারবক শাহ্ (১৪৫৯/৬০-১৪৭৪); এর আগেকার মতামত খণ্ডন করেছেন অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায়
মালাধর বসু (গুণরাজ খান)	শ্রীকৃষ্ণ বিজয়	–ঐ–
বিজয়গুপ্ত	মনসা মঙ্গল	অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায়ের মতে সুলতান জালাল-উদ-দীন ফতেহ্ শাহ্ (১৪৮১-৮৭)
বিপ্রদাস পিপিলাই	মনসা বিজয়	সুলতান আলা-উদ-দীন হোসেন শাহ্ (১৪৯৩-১৫১৯)
যশোরাজ খান	শ্রীকৃষ্ণ বিজয়	–ঐ–
কবীন্দ্র পরমেশ্বর	মহাভারত (অংশ)	–ঐ–
শ্রীকর নন্দী	মহাভারত (অংশ)	–ঐ–
শ্রীধর	বিদ্যাসুন্দর	সুলতান আলা-উদ-দীন ফিরোজ শাহ্ (১৫৩২-১৫৩৩)
বৃন্দাবন দাস	চৈতন্য ভাগবত	সুলতান গিয়াস-উদ-দীন মাহমুদ শাহ্ (১৫৩৩-১৫৩৮)
জয়ানন্দ	চৈতন্য মঙ্গল	আফগান শাসনামল (১৫৩৯-৭৫)
মুক্তারাম সেন	সারদা মঙ্গল	–ঐ–
রামচন্দ্র খান	মহাভারত (অশ্বমেধ পর্ব)	–ঐ–
রঘুনাথ পণ্ডিত	কৃষ্ণপ্রেম তরঙ্গিনী	–ঐ–
মাধবাচার্য	শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল, গঙ্গামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল	–ঐ–

দ্বিজ বংশীদাস	মনসা মঙ্গল	–ঐ–
চন্দ্রাবতী	মনসা মঙ্গল	–ঐ– (সম্ভবত)
কৃষ্ণদাস কবিরাজ	চৈতন্য মঙ্গল	–ঐ– (সম্ভবত)

এ ছাড়াও রয়েছেন 'গৌরীমঙ্গল' রচয়িতা শঙ্করকিরণ মিশ্র, 'চৈতন্য চরাণামৃত' রচয়িতা কবি কর্ণপুর, 'বিদ্যাসুন্দর' রচয়িতা কবি কঙ্ক, 'রামায়ণ' রচয়িতা দ্বিজ অনন্ত, কয়েকটি গ্রন্থের প্রণেতা ও 'গুণরাজ' উপাধিপ্রাপ্ত কবি ষষ্ঠীধর, চৈতন্য মঙ্গল'-এর কবি লোচন দাস, 'চন্ডী মঙ্গল' রচয়িতা মুকুন্দরাম চক্রবর্তী এবং আরও আরও কবি।

এর থেকে ধারণা করা যায় যে, হিন্দু কবিগণ ওই যুগে ধর্মীয় ও দেব-দেবী সম্বলিত কাহিনী নিয়েই কাব্য রচনা করেছেন। কবি শ্রীধর ও কবি কঙ্ক রচিত 'বিদ্যাসুন্দর'ই এর একমাত্র ব্যতিক্রম। শ্রী চৈতন্য ঐতিহাসিক ব্যক্তি হলেও বৈষ্ণব-মতের প্রতিষ্ঠাতা বলে তাঁর ভক্তদের কাছে তিনিও দেবতাই বটেন। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক বলেন, "তখনও বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষ সাহিত্য রচিত হয় নাই। সাহিত্য যে ধর্মপ্রধান না হইয়া রসপ্রধান হইতে পারে এই কথা তখনও বাংলার হিন্দু সাহিত্যিকগণ কল্পনাই করিতে পারেন নাই।" (দ্রষ্টব্য-প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৭)।

তালিকা– দুই

কবিদের নাম	বাংলায় কাব্য-কৃতি	সম্ভাব্য কাল ও মন্তব্য
মুজাম্মিল	সায়াৎনামা, খঞ্জন সুলতান চরিত্র, নীতিশাস্ত্র-বার্তা	রুকন-উদ-দীন বারবক শাহ্ (১৪৫৯/৬০-১৪৭৪)
চাঁদ কাজী	পদাবলী	সুলতান আলা-উদ-দীন হোসেন শাহ্ (১৪৯৩-১৫১৯)
শেখ কবীর	পদাবলী	সুলতান আলা-উদ-দীন ফিরোজ শাহ্ (১৫৩২-৩৩)
আফজাল আলী	নসীহৎনামা	–ঐ–
শাহ্ মুহাম্মদ সগীর	য়ুসুফ–জলিখা	সুলতান গিয়াস-উদ-দীন মাহমুদ শাহ্ (১৪৩৩-৩৮)
জৈনুদ্দীন	রসুল বিজয়	আফগান শাসনামল (১৫৩৯-১৫৭৫)
সাবিরিদ খান	বিদ্যাসুন্দর, রসুল বিজয়, হানিফা ও কয়রাপরী	অনির্ণীত
দোনা গাজী	সয়ফুল মুলক বদিউজ্জামাল	অনির্ণীত
শেখ ফয়জুল্লাহ্	গোরক্ষ বিজয়, গাজী বিজয়, সত্যপীর,	আফগান শাসনামল (১৫৩৯-৭৫)।
	জয়নবের চৌতিশা	–ঐ–

সারা বাংলায় অনুসন্ধান চালালে আরও যে অনেক কবি ও তাঁদের কাব্য-কৃতির সন্ধান পাওয়া যেত তা প্রায় নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। তবু যতটুকু জানা গেছে তা থেকেই উপরোক্ত তালিকা তৈরি করা হয়েছে। আর তা থেকে দেখা যাচ্ছে, মুসলিম কবিরা ওই সুলতানী আমলে বিষয়-বৈচিত্র এনে বাংলা সাহিত্যের দিগন্তকে সম্প্রসারিত করেছেন। কাব্যসমূহের শ্রেণী বিভাগ করলে দেখা যায়, তাঁরা প্রেমমূলক মুসলিম কাহিনী কাব্য ও ভারতীয় কাহিনী কাব্য, মুসলিম ধর্মীয় কাব্য, হিন্দু ধর্মীয় কাব্য, বীরগাথা ও রম্যকাব্য প্রভৃতি নানা বিষয়ের উপর কাব্য রচনা করেছেন। বলতে হয়, মুসলিম কবিরাই প্রথমে ধর্মপ্রধান সাহিত্যগন্ডির বাইরে এসে রসপ্রধান কাব্য চর্চায় ব্রতী হয়েছেন। রচিত হয়েছে 'ইউসুফ-জোলায়খা' 'সয়ফুল মুলক-বদিউজ্জামাল' ও 'হানিফা ও কয়রাপরী' কাব্য।

মুসলিম কবিদের রচিত ধর্মীয় কাব্যগুলোর মধ্যে দু'টি শ্রেণী দেখা যায় ঃ (১) ইসলামী শরা-শরীয়ত সম্বলিত কাব্য এবং (২) হিন্দু কবিদের রচিত দেব-দেবীর মাহাত্ম্য জ্ঞাপক 'বিজয়-কাব্যে'র অনুরূপ মুসলিম মহাপুরুষদের মাহাত্ম্য-জ্ঞাপক 'বিজয়-কাব্য'। এসব 'বিজয়-কাব্য'কে ঐতিহাসিক কাহিনী কাব্যও বলা যায়। 'গাজী বিজয়' সুপ্রসিদ্ধ সূফী ইসমাইলকে নিয়ে রচিত, 'গোরক্ষ বিজয়' রচিত নাথ–গুরু গোরক্ষনাথকে নিয়ে; আর 'রসুল বিজয়' ঐতিহাসিক—এ তো বলার অপেক্ষা রাখে না। অবিশ্যি ইতিহাস এসব কাব্যে বহুল উপকথা কল্পকথা মিশ্রিত। বাংলা সাহিত্যে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে সত্যপীর কাহিনী কাব্য। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কবিরাই সত্যপীরকে নিয়ে কাব্য রচনা করেছেন। তেমনি 'পদাবলী' রচনাতেও শামিল হয়েছেন মুসলিম কবিরা। সত্যপীর ও পদাবলী বাংলা সাহিত্যের এ দু'টি ধারা হচ্ছে হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতির সমন্বয়-সঞ্জাত সৃষ্টি।

স্বাধীন সুলতানী আমলে মুসলিম কবিরা তাঁদের কাব্যচর্চায় যে বৈচিত্র্য এনেছেন তার আরও প্রমাণ পাওয়া যায়, 'জয়নবের চৌতিশা' জাতীয় মানবিক শোকগাঁথামূলক রচনায় এবং 'সায়াৎনামা' ও 'নীতিশাস্ত্র-বার্তা' জাতীয় নীতিকথামূলক কাব্য প্রয়াসে। এখানে প্রশ্ন জাগতে পারে মুসলিম কবিরা কি তাঁদের কাব্যচর্চায় হিন্দু কবিদের অনুকরণ করেছেন? উত্তরে বলা যাবে ঃ না, অনুকরণ নয়; মুসলিম কবিরা তাঁদের ধর্মীয় রচনায় হিন্দু কবিদের অনুসরণ করেছেন। তদুপরি মুক্ত চিন্তা নিয়ে তাঁরা সাহিত্যের বিভিন্ন দিকের পথ-নির্দেশ করেছেন; বিভিন্ন দিগন্তে পাড়ি জমিয়েছে তাঁদের কবিকল্পনা। হিন্দু কবিদের অন্বেষণ যেখানে ধর্মীয় কারণে সংস্কৃত সাহিত্যের উৎসেই প্রধানত সীমিত ছিল, বাংলার মুসলিম কবিদের অন্বেষা তখন ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কারণে ভারতীয় সাহিত্য ছাড়াও আরবী-ফারসী সাহিত্যের বিশালতায় আহরিত মুসলিম মনীষার সমৃদ্ধ সঞ্চয়কে

আত্মস্থ করতে নিয়োজিত। তবুও প্রশ্ন থেকে যায় ধর্মীয় সাহিত্য সৃষ্টিতে মুসলিম কবিরা হিন্দু কবিদের অনুসরণই বা করেছেন কেন?

বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম অবদান ছিল ধর্ম-শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণদের নিরঙ্কুশ একাধিপত্যের অবসান ও অব্রাহ্মণ হিন্দু মেধার মুক্তিদান। এই মুক্তি কার্যকরী হয়েছিল একটা নীতি ভিত্তিক দীর্ঘকালীন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। ব্রাহ্মণ্যবাদী রাজশক্তি যখন অনুপস্থিত, অব্রাহ্মণদের শাস্ত্রীয় গুপ্তধনে হাত দেওয়ার জন্য 'ধর্মচ্যুতি' বা রৌরব নরকের ভয়ও আর তখন নেই। এবং যোগ্যতার মাপকাঠিতে রাষ্ট্রীয় কাজে অংশগ্রহণেও নেই কোন বাধা। এখানে এটাও উল্লেখ্য যে ব্রাহ্মণ্যবাদী জগদ্দল বাধার নিগড় থেকে মুক্তি পেল বলেই আর সকল হিন্দু পিতৃ-পিতামহের প্রচলিত ধর্ম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়নি। বরং সুদীর্ঘকালের এক পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় তারা সামাজিক সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অবস্থার বাস্তবতা অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিল। তাদের কাছে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছিল যে বিদ্যমান শাসনামলে গোটা হিন্দু সমাজই তখন এক রকম অবক্ষয়ের মুখোমুখি। এও তাদের অনুধাবন করার কথা যে, গত আড়াই শ' বছরের মধ্যে বাংলায় মুসলিম শক্তি শুধুমাত্র দৃঢ় ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত হয়নি, সেই শক্তির প্রাধান্যকে ধারণ করার মতো উপযুক্ত শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক পরিবেশসহ একটা সংহত মুসলিম সমাজও ততদিনে গড়ে উঠেছে। বাস্তবতার এমনি অনুধাবনই হিন্দু চিন্তায় বাংলা ভাষায় কাব্যচর্চাকে প্রয়োজনীয় করে তোলে দু'টি সম্ভাব্য কারণে ঃ (১) সংস্কৃত সাহিত্যের গুপ্তধন আহরণ করে বাংলা ভাষার মাধ্যমে নিজেদের জ্ঞান-ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধতর করে তোলা এবং (২) ইসলামী সমাজ বিধানের সাম্য ও উদারতার আকর্ষণ থেকে হিন্দু জনসাধারণকে রক্ষা করা। এই উভয়বিধ অথবা যে কোন কারণের জন্যই হোক, হিন্দুদের ধর্মীয় কথা বাংলা ভাষায় কাব্য সুষমা দিয়ে প্রচার ও প্রকাশের কাজ আরম্ভ হয়ে গেল।

হিন্দু কবিদের এই কাব্যচর্চা আরম্ভের কালে বাংলায় মুসলিম সমাজের গঠন প্রকৃতি সম্পর্কে অবহিত হওয়ারও প্রয়োজন আছে। বাংলায় মুসলিম শাসনের প্রায় আড়াই শ' বছর তখন অতিক্রান্ত। এর মধ্যে বাংলায় বহিরাগত মুসলিমদের সন্তান-সন্ততিরা ততদিনে বাঙ্গালীই হয়ে গেছে; বাংলা ভাষা পরিণত হয়েছে তাদের মাতৃভাষায়। তাদের নিয়ে এবং এদেশীয় বাংলা ভাষাভাষী ধর্মান্তরিত ও তাদের সন্তান-সন্ততিদের নিয়ে গঠিত তখন বাংলার মুসলিম সমাজ। এ সমাজের পড়শী বাংলা ভাষাভাষী হিন্দু সমাজ। দেশের এমনি সামাজিক বাস্তবতায় হিন্দু কবিদের বাংলা ভাষায় রচিত কাব্য-কথা হিন্দু জনসাধারণের মনে তো বটেই, মুসলিম জনসাধারণের মনেও যথেষ্ট সাড়া জাগানোর কথা। আর ধর্মান্তরিত মুসলিম পরিবারে সেই সাড়া যে প্রবলতর হতে পারে, তার সম্ভাবনাও যথেষ্ট ছিল বলে ধরে নেয়া যায়। তদুপরি, হিন্দু কবিদের রচিত কাব্য-কথার

সুষমায় যে মুসলিম মানসে ধর্মীয় বিভ্রান্তি আনতে পারে, তার সম্ভাবনাও যথেষ্ট ছিল। এসব পরিস্থিতির প্রেক্ষিতেই মুসলিম কবিরা হিন্দু কবিদের অনুসরণে নিজেদের ধর্মীয় কাব্যচর্চায় হাত দিলেন। এবং হাত দিয়ে অল্প দিনের মধ্যেই অনুসরণকারীর স্থলে হয়ে দাঁড়ালেন অনুসরণযোগ্য, অনুসরণীয়। শুধু ধর্মীয় কাব্য-কথা নয়, প্রেমমূলক কাহিনী-কাব্য এবং আরো নানা ধারায় কাব্য–কথার সমন্বয়ে গড়ে তুলতে লাগলেন মনোহারী এক সাহিত্য-সম্ভার। এ যেন হিন্দু কবিদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে একই মাধ্যম ব্যবহার করে কাব্য সুষমার বিচিত্র পথে তাঁদের অভিযাত্রা! এবং বিষয় বৈচিত্র্যের সমৃদ্ধিতে তাঁরা ছাড়িয়েও গেলেন হিন্দু কবিদের কাব্য-কৃতিকে। বাস্তবতার নিরিখে সমাজের প্রয়োজনকে এমনি করেই মেটাতে হয়।

স্বাধীনতাকালে বাংলা সাহিত্যের বিষয়ভিত্তিক রকমারি

স্বাধীনতাকালে মুসলমান কবিদের রচনাবলীকে ছয়ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

(১) কাহিনী কাব্য ঃ এই কাহিনী-কাব্যগুলোকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায় যার পরিচয় এখানে তুলে ধরা হয়।

(ক) মুসলম কাহিনী কাব্য ঃ

(অ) ইউসুফ জলিখা – শাহ্ মোহাম্মদ সগীর

(আ) হানিফা ও কয়রাপরী – সাবিরিদ খান

(ই) সয়ফুল মুলক – দোনাগাজী

(ঈ) লাইলী-মজনু – বাহরাম খান

(খ) ভারতীয় কাহিনীকাব্য ঃ

(অ) মনোহর-মধুমালতী – মুহাম্মদ কবীর

(আ) বিদ্যাসুন্দর – সাবিরিদ খান

(২) ধর্মীয় কাব্য ঃ এই কাব্যগুলো তিন ভাগে বিভক্ত।

(ক) শরাশরিয়ৎ সম্বলিত কাব্য ঃ

নসিহৎনামা – আফজল আলী

(খ) মুসলিম ঐতিহাসিক কাব্য ঃ

(অ) রসুল বিজয় – জৈনুদ্দীন

(আ) রসুল বিজয় – সাবিরিদ খান

(ই) গাজী বিজয় – শেখ ফয়জুল্লাহ্

(গ) হিন্দু ঐতিহাসিক কাব্য ঃ

(অ) গোরক্ষ বিজয় – শেখ ফয়জুল্লাহ্

(৩) সংস্কৃতি সমন্বয় সঞ্জাত কাব্য ঃ

(অ) সত্য পীর – শেখ ফয়জুল্লাহ্

(আ) পদাবলী – চাঁদ কাজী, শেখ কবীর, আফজল আলী

(৪) শোকগাথা ঃ

জয়নবের চৌতিশা – শেখ ফয়জুল্লাহ্

(৫) জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় কাব্য ঃ

(ক) সায়াৎনামা – মোজাম্মিল

(খ) নীতিশাস্ত্র-বার্তা – মোজাম্মিল

(৬) সঙ্গীত শাস্ত্রীয় কাব্য ঃ

রাগমালা – শেখ ফয়জুল্লাহ্

উপর্যুক্ত তালিকা থেকে একথা স্পষ্ট হবে যে, স্বাধীন সুলতানী আমলে মুসলিম বাংলা সাহিত্যে 'কাহিনী কাব্য' ও 'ধর্মীয় সাহিত্য'ই প্রাধান্য লাভ করেছে। তারই সঙ্গে আরম্ভ হয়েছে হিন্দু মুসলিম সংস্কৃতি সমন্বয়মূলক সাহিত্যও। পরবর্তীকালে মুহররমের করুণ কাহিনী অবলম্বন করে বাংলার মুসলমানদের মধ্যে যে বিরাট সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছিল, যে জারীগান জন্মলাভ করেছিল, 'জয়নবের চৌতিশা' ছিল সেসবের নিশ্চিত ভিত্তি। কাব্য রচনা থেকে মুসলমান কবিরা জ্যোতিষ ও সঙ্গীত শাস্ত্রকেও বাদ দেন নাই।

যতটা জানা যায়, শাহ্ মোহাম্মদ সগীরের 'ইউসুফ-জলিখা'ই প্রাচীনতম। তখনও বাংলায় ধর্মনিরপেক্ষ সাহিত্য রচিত হয় নাই। সাহিত্য যে ধর্মপ্রধান না হয়ে রসপ্রধান হতে পারে– একথা তখনও বাংলার হিন্দু সাহিত্যিকগণ কল্পনা করতে পারেন নাই। এ কল্পনা ঠাঁই পেয়েছিল এক মুসলমান কবির মনে!

"কিতাব কোরআন মধ্যে দেখিলুঁ বিশেষ।
ইছুফ জলিখা কথা অমৃত বিশেষ ॥
কহিব কিতাব চাহি সুধারস পুরি।
শুনহ ভক্তজন শ্রুতিঘট ভরি ॥
দোষ খেম গুণ ধর রসিক সুজন।
মোহাম্মদ সগীর ভণে প্রেমক বচন ॥"

শিল্প-সুষমা মণ্ডিত মুসলিম কাহিনীর প্রচার ও প্রসারে যে সাংস্কৃতিক পরিবেশ সৃষ্ট হয়েছিল, তা ভারতীয় কাহিনীগুলোকেও বাংলা সাহিত্যের আসরে পাঙতেয় করে তুলল। লক্ষণীয় যে, বাংলা ভাষায় ভারতীয় কাহিনীর এই যে সাহিত্যিক মর্যাদা দান– তা ঘটল একজন মুসলমান কবির হাতেই। মুহম্মদ কবীরের 'মনোহর-মধুমালতী' এবং সাবিরিদ খানের 'বিদ্যাসুন্দর' এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

একথা খুবই সত্য যে, মধ্যযুগীয় (তুর্কী আমল ও স্বাধীন সুলতানী আমলের) বাংলা সাহিত্য একান্তই ধর্মকেন্দ্রিক। মুসলিম আমলের আগে হিন্দু ও বৌদ্ধদের এবং মুসলিম আমলে হিন্দু শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণবের ধর্মীয় কোন্দলকে কেন্দ্র করেই বাংলা সাহিত্য গড়ে উঠতে থাকে। মুসলমান আগমনের পর পীর-ফকীর ও আলিম-উলামাদের ইসলাম প্রচারে নতুন করে যে চিন্তার মুক্তি বিঘোষিত হল, তাতে মুসলমানদের চেয়ে হিন্দুদের ধর্মীয় চেতনাই অধিক প্রকট হয়ে ওঠে। সুতরাং বাংলা সাহিত্যে এই ধর্মীয় কোন্দলের প্রভাব একান্তই স্বাভাবিক। এই প্রভাবের ফলে মুসলমানদের মধ্যে দুই শ্রেণীর বাংলা সাহিত্য দেখা দেয় যার একটি হল– (১) খাঁটি ইসলামী শরা-শরিয়ত সম্বলিত কাব্য, (২) অন্যটি হল হিন্দুর দেবদেবীর মাহাত্ম্যজ্ঞাপক 'বিজয় কাব্যে'র অনুরূপ মুসলিম মহাপুরুষদের মাহাত্ম্য বর্ণনাত্মক 'বিজয়কাব্য'। এসবে ইসলামের চাইতে ইসলামী উপকথাই বেশি। তবুও, এসবের নায়ক-নায়িকার অধিকাংশই একান্ত ঐতিহাসিক ব্যক্তি। অনৈতিহাসিক উপাখ্যান-প্রধান হিন্দু 'বিজয় কাব্যের' স্থলে এই যুগের মুসলমানেরা ঐতিহাসিক উপাখ্যান-প্রধান 'বিজয় কাব্য' রচনা করে বাংলা সাহিত্যে ইতিহাস রচনার এক নতুন ধারার প্রবর্তন করেছিলেন।

বাংলা সাহিত্যের এক বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে সত্যপীর কাহিনী কাব্য। এই কাব্য-রচয়িতাদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কবিই রয়েছেন। তন্মধ্যে প্রাচীনতম হচ্ছেন শেখ ফয়জুল্লাহ্। প্রকৃতপক্ষে, সত্যপীর কাহিনী খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতি-সঞ্জাত সৃষ্টি। 'পদাবলী' সাহিত্যও বাংলায় হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতি-সঞ্জত সৃষ্টি। এতে সুফীদের 'গজলিয়াৎ' সাহিত্যের চিন্তাধারা, প্রকৃতি, গঠনগত প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট।

কোন বিষাদাত্মক ঘটনাকে উপলক্ষ করে কাব্য রচনা ষোড়শ শতক পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে প্রবর্তিত হয় নাই। অথচ 'করুণতম চিন্তাধারার অভিব্যক্তিতেই সর্বাপেক্ষা হৃদয়স্পর্শী গানের সৃষ্টি' (Our sweetest songs are those that tell of saddest thought) বলে ইংরেজ কবি ঘোষণা করেছেন। এ জাতীয় সৃষ্টিতে বাংলা সাহিত্য যখন একেবারেই দীন, তখন মুসলমান কবি শেখ ফয়জুল্লাহ্ 'জয়নবের চৌতিশা' রচনা করে বাংলা সাহিত্যের একটি নতুন দিকের দ্বার উদ্‌ঘাটন করেন।

জ্যোতিষ শাস্ত্র সম্বন্ধীয় কাব্য রচনার প্রাথমিক কৃতিত্বও বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের প্রাপ্য। কবি মোজাম্মিলের 'সায়াৎনামা' ও 'নীতিশাস্ত্র-বার্তা' এ শ্রেণীরই গ্রন্থ। সঙ্গীত শাস্ত্রে মুসলমানদের খ্যাতি চির-প্রসিদ্ধ। ভারতীয় সঙ্গীতেও মুসলমানদের অবদান চিরস্মরণীয়। বাংলা ভাষায় সঙ্গীত শাস্ত্রীয় কোন কাব্য ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত লিখিত হয় নাই। শেখ ফয়জুল্লাহ্‌র 'রাগনামা' বাংলা ভাষায় সঙ্গীত শাস্ত্রীয় কাব্যের প্রাচীনতম নিদর্শন।

স্বাধীন সুলতানী বাঙ্গালার আর্থ-সামাজিক কথকতা

বাংলাদেশের স্বনামখ্যাত ঐতিহাসিক ডক্টর আবদুল করিম (প্রাক্তন ভাইস-চ্যান্সেলর, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়) তাঁর রচিত ইতিহাস গ্রন্থের ভূমিকায় বলেন ঃ "প্রায় দশ বছর আগে বিশ্বভারতীয় অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় 'বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর' শিরোনামে বাংলার স্বাধীন সুলতানদের আমলের একটি মূল্যবান ইতিহাস রচনা করেন। আমার বর্তমান গ্রন্থ 'বাংলার ইতিহাস, [সুলতানী আমল]' এই আমলের ইতিহাসে আর একটি সংযোজন।" (বাংলার ইতিহাস–সুলতানী আমল, বাংলা একাডেমী; ঢাকা, ১৯৭৭, পৃ. চার)।

ভারতীয় প্রখ্যাত ঐতিহাসিক অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় তাঁর উপর্যুক্ত গ্রন্থের অবতরণিকায় বলেন ঃ "বাংলাদেশে মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ পর্যায়ক্রমে একবার দিল্লীর অধীন হয়েছে, আবার স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু ১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দে ফকরুদ্দীন মুবারক শাহের স্বাধীনতা ঘোষণা থেকে শুরু করে ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দে গিয়াসুদ্দীন মাহ্‌মুদ শাহের উচ্ছেদ পর্যন্ত পুরোপুরি দু'শো বছর বাংলাদেশ যে রকম অবিচ্ছিন্নভাবে স্বাধীনতা ভোগ করেছিল, তত দীর্ঘদিন ধরে আর কোন সময় তার স্বাধীনতা স্থায়ী হয়নি। এই দু'শো বছর বাংলাদেশের ইতিহাসের একটি গৌরবময় অধ্যায়। এই সময়ে বাংলার সুলতানরা নিজেদের যোগ্যতা, শক্তি ও ঐশ্বর্যের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ নৃপতিদের অন্যতম হয়ে উঠেছিলেন। শুধু তাই নয়, তাঁরা দেশের আভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থার পরিচালনায় এবং রাজার নানা রকম কর্তব্য পালনেও অপরিসীম দক্ষতা দেখিয়ে গিয়েছেন। তার ফলে তাঁরা বাংলার জনসাধারণের আস্থা ও ভালোবাসা অর্জন করেছিলেন।" (বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছরঃ স্বাধীন সুলতানদের আমল, ভারতী বুক স্টল, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৮০, পৃ. ১)।

আমি ঐতিহাসিক নই, সামাজিক পরিসংখ্যানবিদ। পরিসংখ্যান বিজ্ঞানের রীতি অনুযায়ী সংগৃহীত তথ্যাবলী থেকে সত্যানুসন্ধান যেমন পরিসংখ্যান বিজ্ঞানীদের করণীয় কর্তব্য তেমনি, প্রখ্যাত ঐতিহাসিকদের ইতিহাস-বিজ্ঞানের রীতি অনুযায়ী পরিবেশিত তথ্যাবলী থেকে দেশের অতীত দিনের সত্যানুসন্ধানের প্রয়াসও সামাজিক বা ঐতিহাসিক পরিসংখ্যানবিদের করণীয় কাজের অন্তর্ভুক্ত বলেই মনে করি। সেই সুবাদে আমি এই সংযুক্তি অধ্যায় বা পরিশিষ্টে 'স্বাধীন সুলতানী বাংলার আর্থ-সামাজিক কথকতা' রচনার প্রয়াস পেয়েছি। উদ্দেশ্য, ওই সময়ের নানা কথাকে সহজবোধ্য করে তুলে ধরা যাতে বিভিন্ন দিকে 'স্বাধীন বাঙ্গলা'র সেই দু'শো বছরের ঐশ্বর্যময় দিনগুলোকে পাঠক-পাঠিকারা স্মরণের মণিকোঠায় স্থান দিতে পারেন। ভাবভঙ্গি সহকারে বর্ণিত না হলেও এটাও এক রকমের পুরান পাঠ বা প্রচীন ইতিবৃত্তের স্মরণিকা বৈকি। তাই কথকতা।

এই কথকতা আরম্ভ করার আগে 'বাঙ্গালা' নামকরণ সম্পর্কে কিছু কথা। প্রাচীনতম কাল থেকে খৃস্টীয় সপ্তম শতক পর্যন্ত উক্ত নামের এই বিশাল জনপদটির বিভিন্ন অঞ্চল বিভিন্ন সময়ে বঙ্গ, হরিকেল, চন্দ্রদ্বীপ, সমতট, বঙ্গাল, পুণ্ড্র, বরেন্দ্রী, রাঢ়া, তাম্রলিপ্তি, গৌড় প্রভৃতি নামে অভিহিত হলেও "সপ্তম শতকের গোড়ায় শশাঙ্ক যখন গৌড়ের রাজা হলেন, তখন বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ মুর্শিদাবাদ থেকে শুরু করে উৎকল পর্যন্ত) সর্বপ্রথম এক রাষ্ট্রীয় ঐক্য লাভ করে। শশাঙ্কের পর থেকে বাংলাদেশের তিনটি জনপদই যেন গোটা বাংলাদেশের জায়গা জুড়ে বসল– পুণ্ড্র বা পুণ্ড্রবর্ধন, গৌড় ও বঙ্গ। বিভিন্ন নামের অন্যান্য জনপদ, বিভাগ, উপবিভাগ থাকলেও এই তিনটি জনপদের কাছে তারা ম্লান বলে বোধ হয়। এই তিনটি জনপদের মধ্যে অন্যান্যদের সত্তা বিলীন হয়ে যাচ্ছিল। শশাঙ্ক এবং পাল রাজারা সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের মালিক হয়েও রাঢ়াধিপতি বা রাঢ়েশ্বর না বলে নিজেদের পরিচয় দিলেন গৌড়াধিপতি বা গৌড়েশ্বর বলে। শশাঙ্কের আমল থেকেই একটিমাত্র নাম নিয়ে প্রাচীন বাংলার বিভিন্ন জনপদকে এক সূত্রে গাঁথবার যে সজ্ঞান সূচনা দেখা গিয়েছিল, পাল ও সেন রাজাদের আমলে তা পূর্ণ পরিণতি লাভ করল। অবশ্য বঙ্গ তখনও স্বতন্ত্র জনপদ হিসেবে নিজের প্রতিষ্ঠা বজায় রেখেছে। এক গৌড় নাম, লক্ষ্য ও আদর্শ হওয়া সত্ত্বেও বঙ্গ নাম তখনও তার প্রতিদ্বন্দ্বী।....

গৌড় নামে বাংলার সমস্ত জনপদকে ঐক্যবদ্ধ করার যে চেষ্টা শশাঙ্ক, পাল ও সেন রাজারা করেছিলেন, তাতে কাজ হল না। যে বঙ্গ ছিল আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক থেকে ঘৃণিত ও অবজ্ঞাত, যা ছিল পাল ও সেনদের আমলে কম গৌরবের ও আদরের—সেই বঙ্গ নামেই শেষ পর্যন্ত তথাকথিত পাঠান আমলে বাংলার সমস্ত জনপদ ঐক্যবদ্ধ হল।" (বাঙালীর ইতিহাস— সংক্ষেপে ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়-এর 'বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)', সুভাষ মুখোপাধ্যায়, নিউ এজ সংস্করণ, ১৯৬০, পৃঃ ২১-২২)।

এই ঐক্যবদ্ধ জনপদটির নাম হল 'বাঙ্গালা'। ১৩৩৮ সাল থেকে এই বিশাল জনপদটি সোনারগাঁও, লাখনৌতি ও সাতগাঁও নামের তিনটি অঞ্চলে বিভক্ত হয়ে যার-যার মত স্বাধীনতা ভোগ করে আসছিল। এই তিনটি স্বাধীন অঞ্চলকে একীভূত করে ১৩৫২ সালে সুলতান ইলিয়াস শাহ্ প্রতিষ্ঠিত করেন স্বাধীন বাঙ্গালা সালতানাত। আর ঐতিহাসিক আফিফ সুলতান ইলিয়াস শাহ্‌কে অভিহিত করেন 'শাহ্-ই-বাঙ্গালা', 'শাহ্-ই-বাঙ্গালীয়ান' ও 'সুলতান-ই-বাঙ্গালা' বলে। এই বাঙ্গালা পরে 'বাংলা' হয়েছে। এবং "এই বাংলা হইতেই ইউরোপীয়গণের 'বেঙ্গলা' (Bengala) ও 'বেঙ্গল' নামের উৎপত্তি। মুঘল সাম্রাজ্যের যুগে 'বাঙ্গালা' চট্টগ্রাম হইতে গহি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।" (বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, প্রাচীন যুগ, শ্রীরমেশ চন্দ্র মজুমদার, ষষ্ঠ সংস্কারণ, ১৯৭৪, পৃ. ২)।

বাঙ্গালার বাইরেও সুলতান ইলিয়াস শাহ্ জয় করেন তিরহুত উড়িষ্যা বারানসীর বিরাট ভূখণ্ড এবং নেপাল। রাজ্যে তিনি এমন "এক উদার শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন যাহার ফলে বাঙ্গালী হিন্দুরাও তাঁহার সঙ্গে সহযোগিতা করেন এবং এমন কি তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিয়া দিল্লীর সুলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। তাঁহার উত্তরাধিকারীরাও তাঁহার নীতি অনুসরণ করিয়া হিন্দুদের প্রতি সম্প্রীতির ভাব পোষণ করেন এবং হিন্দুদের উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত করেন।" (বাংলার ইতিহাস—সুলতানী আমল, ডক্টর আবদুল করিম, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭, পৃ. ১৯৯)।

এখানে উল্লেখ্য যে, তুর্কী খিলজীদের নদীয়া তথা লাখনৌত বিজয়ের সময় থেকেই বিজিত জনপদের অগণিত সাধারণ হিন্দুর সম্প্রীতিমূলক সমর্থন লাভ করেন বিজয়ীরা। এর প্রধানতম কারণ নিহিত ছিল মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে তখনকার রাজশক্তির জনগণবিরোধী শাসন ব্যবস্থা। অধ্যাপক শ্রীঅতীন্দ্র মজুমদার তাঁর 'চর্যাপদ' গ্রন্থে বলেন ঃ "গোটা সমাজ তখন তিনটি বৃহৎ প্রাচীরের দ্বারা বিভক্ত– সবার উপরে ব্রাহ্মণ, মাঝে অগণিত ক্ষুদ্র পর্যায়ের সাধারণ লোক আর সবার পিছে সবার নীচে সমস্ত রকম সামাজিক অধিকার ও মানবিক মর্যাদা থেকে বঞ্চিত অস্পৃশ্য দীন ও নিরন্তর দুঃখের দাহনে দগ্ধ অন্তজ ও ম্লেচ্ছ সম্প্রদায়। প্রত্যেকটি বর্ণের মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য দুরাতিক্রম্য বাধার প্রাচীর।... এর পরিণতি তাই শেষ পর্যন্ত দাঁড়ালো ব্রাহ্মণ এবং অব্রাহ্মণের মধ্যে একটা গুপ্ত বিরোধ এবং অবিশ্বাস। এই বিরোধ, অবিশ্বাস, ঘৃণা এবং অপমানের ধূমকলঙ্কে মলিন পরিবেশ সেদিন বাংলার সমাজ-জীবনকে ঘোলাটে করে তুলেছিল।... একদিকে সামাজিক গোঁড়ামি, ঐশ্বর্যবিলাস এবং কাম-বাসনার সোৎসাহ আতিশয্য। জীবনের সমস্ত দিকে কদর্যতার সমাবেশ; আর অন্যদিকে নিদারুণ দারিদ্র, ক্ষুধা, অভাব, পীড়ন, শোষণ, বর্জন, যন্ত্রণা ও মৃত্যু। ..." (চর্যাপদ, ১৯৭২, পৃ. ৩১-৩৯)।

আর শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দর কথায়, "গোপালের বংশধরগণকে গৌড়জন যেরূপ ভক্তি-নেত্রে দেখিতেন, বিদেশাগত পাল রাজকুল উন্মূলনকারী বিজয় সেনের এবং বল্লাল সেনের উত্তরাধিকারী লক্ষ্মণ সেন সেরূপ ভক্তি লাভ করিতে পারিয়াছিলেন না।... মহম্মদ-ই-বখ্তিয়ারের অভ্যুদয় গৌড়ের সর্বনাশের মূল বা সর্বনাশের ফল বলিয়া কথিত হইতে পারে না;... লক্ষ্মণ সেন গৌড় রাষ্ট্রের বহিঃশত্রু দমনে সমর্থ হইয়া থাকিলেও, প্রজাপুঞ্জের সহযোগিতার অভাবে, আভ্যন্তরীণ ঐক্যসাধনে এবং বিভিন্ন অংশের রক্ষার সুব্যবস্থা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন না। সেই জন্যই মহম্মদ-ই-বখ্তিয়ার অবাধে মগধ এবং বরেন্দ্র অধিকার করিতে পারিয়াছিলেন।" (গৌড়রাজমালা, রমাপ্রসাদ চন্দ, ১৯৭৫, পৃ. ৮১-৮২)।

"এর পর বখৎ-ইয়ারের নবদ্বীপ জয় এবং এক'শো বছরের মধ্যে সারা বাংলাদেশ জুড়ে মুসলমান রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা মোটেই আকস্মিক ঘটনা নয়– সেন আমলে রাষ্ট্রীয়,

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধোগতিরই পরিণাম।" (ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়-এর 'বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব') এর সংক্ষেপিত সংস্করণ, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, ১৯৬০, পৃ. ৯৮)।

অতঃপর এদেশে আরম্ভ হল মুসলিম শাসন। ১২০৩ সাল থেকে আরম্ভ করে ১৭৫৭ সালে পলাশী বিপর্যয়েরও কিছুকাল পর পর্যন্ত প্রায় ছয়'শো বছরের শাসনামল ছিল মুসলিম শাসনামল। এই শাসনামলেও যেসব গোত্র-গোষ্ঠী বা বংশ বাঙ্গালা শাসন করেছে, তাদের উত্থান-পতনের মূল কারণ নিজেদের চরিত্রেই নিহিত ছিল। চরিত্র-গুণেই মানুষ নিজ কীর্তি-শীর্ষে উত্থিত হয়, আবার চরিত্রদোষেই মানুষ তলিয়ে যায় পতনের অতলে। সেন রাজাদের বা পূর্ববর্তী রাজাদের উত্থান-পতনের ইতিহাসে এ সত্য যেমন উদ্‌ঘাটিত, তেমনি উদ্‌ঘাটিত এ সত্য সুলতান-পাঠান-মুঘলদের উত্থান-পতনেও।

প্রকৃত কথায় ফিরে এসে প্রথমেই যে কথাটি বলতে হয়, তা হচ্ছে বাংলার মুসলিম শাসকদের পক্ষ থেকে এ দেশটিকে স্বাধীন করার প্রয়াসের কথা। অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায়ের কথায়, বাংলাদেশে মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ পর্যায়ক্রমে একবার দিল্লীর অধীন হয়েছে, আবার স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু ১৩৩৮ সাল থেকে ১৫৩৮ সাল এই দু'শো বছর বাংলাদেশ স্বাধীনতা ভোগ করেছে অবিচ্ছিন্নভাবে। এই দু'শো বছর বাংলাদেশের ইতিহাসের একটি গৌরবময় অধ্যায়। আর এই গৌরবময় অধ্যায়ের অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবস্থার কথকতাই এ সংযুক্তি অধ্যায়ের মূল কথা। আর সে কথাটা হল এইঃ সেন-রাজাদের হাত থেকে দেশের শাসন-দণ্ড কেড়ে নিয়ে এই দেশে যে মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠিত হল, তাতে তার গৌরবময় অধ্যায় বলে চিহ্নিতকালে দেশের বা দেশবাসীর অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিস্থিতিতে কোন শুভ পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল কি? তার উত্তর হবে— হয়েছিল।

প্রাক-মুসলিম যুগের 'বাংলায়' ব্যবসা-বাণিজ্যের অবনতি প্রসঙ্গে ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়-এর মন্তব্য হচ্ছে ঃ "অষ্টম শতকের গোড়া থেকেই পূর্ব-ভূমধ্যসাগর থেকে আরম্ভ করে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত বৈদেশিক সামুদ্রিক ব্যবসা-বাণিজ্য আরব ও পারসিক বণিকদের হাতে চলে যেতে আরম্ভ করে। পশ্চিম ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের অন্যতম আশ্রয় সিন্ধুদেশ আরব বণিকের দখলে চলে গেল। রোম সাম্রাজ্যের ধ্বংসের ফলে ভূমধ্যসাগরীয় ভূখণ্ডে ভারতীয় শিল্প ও গন্ধদ্রব্যের চাহিদাও গেল কমে। পূর্ব-ভারতে তাম্রলিপ্তি বন্দরও একাধিক কারণে বন্ধ হয়ে গেল।

এরপর পাঁচশত বছর ধরে সামুদ্রিক বাণিজ্যে বাংলা দেশের তেমন কোন স্থান নেই। কাজেই বাইরে থেকে সোনা-রূপার আমদানিও কম। স্বর্ণমুদ্রার অবনতির ভেতর দিয়ে এই দৈন্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

ব্যবসা-বাণিজ্যের অবনতির ফলে শিল্পচেষ্টারও কিছুটা অবনতি ঘটল। পাল রাজাদের আমলে স্থলপথে কাশ্মীর, তিব্বত, নেপাল, সিকিম, ভুটানের সঙ্গে বাণিজ্য সম্বন্ধ গড়ে তোলার চেষ্টা হল ; এমন কি ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, চম্পা, কম্বোজ, যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ, সুবর্ণদ্বীপের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করার চেষ্টা হল। কিন্তু যথেষ্ট সার্থক হতে পারেনি। ফলে, কৃষির ওপর নির্ভরতা বাড়তে বাড়তে পাল আমলের শেষের দিকে এবং সেন আমলে বাংলাদেশ পুরোপুরি কৃষিনির্ভর ও ভূমিনির্ভর অচল-অনড় গ্রাম্য সমাজে পরিণত হল।

এই ঐকান্তিক ভূমি ও কৃষিনির্ভরতার ফলে গ্রাম্য জীবন সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে বাঁধা পড়ল। রোজকার জীবনে যা নেহাৎ দরকার, তা গ্রামের মধ্যেই পাওয়া যায়; তার জন্যে বাইরে যাবার দরকার হয় না। ফলে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত হল না; নিচু স্তরেই থেকে গেল। শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের মারফত বাইরের মানুষের সংস্পর্শে এসে সংগ্রামময় বহুমুখী অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে দুর্বার গতিতে সমৃদ্ধির পথে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবার সুযোগ ছিল; কিন্তু অষ্টম শতকের পর বাংলাদেশের সে সুযোগ আর থাকল না।" (বাঙালীর ইতিহাস ইত্যাদি ... সুভাষ মুখোপাধ্যায়, নিউএজ সংস্করণ, ১৯৬০, পৃ. ৪৬-৪৭)।

ব্যবসা-বাণিজ্যের এই অবনতির ফলে দেশে আর্থিক লেনদেনের ব্যাপারে ক্রমে স্বর্ণমুদ্রা ও পরে রৌপ্য, এমন কি যে কোন ধাতব মুদ্রাও উধাও হতে লাগল। পাল আমলে গেল স্বর্ণমুদ্রা, সেন আমলে রৌপ্য, তাম্র সকল মুদ্রাই উধাও হল। সোনা-রূপা তখন রাজপুরুষদের প্রাসাদই উজ্জ্বল করে থাকল। জনসাধারণের জন্য চালু হল কড়ি। এমন কি, রাজপুরুষেরাও দান-ধর্ম পালন করার মানসে কড়ি দান করতে আরম্ভ করলেন। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, রাজা লক্ষ্মণ সেন এক লক্ষ কড়ির কম কাউকে দান করতেন না। ব্যবসা-বাণিজ্যের অবনতি, বাইরে থেকে সোনা-রূপার আমদানিও তাই বন্ধ। এমনি অবস্থায় দেশে যে আর্থিক সচ্ছলতার মাধ্যমে শান্তি-সুখ খুব একটা বিরাজমান ছিল, এমন কথা নিশ্চয়ই বলা যাবে না।

সুলতানী তথা মুসলিম আমলে বাঙ্গালায় যে মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পেয়েছিল, ঐতিহাসিকেরা এতে কোন দ্বিমত পোষণ করেন না। ঐতিহাসিক ডক্টর এম.এ. রহিম বলেন ঃ "চারটি জিনিসের মাধ্যমে একটা দেশের সমৃদ্ধি প্রকাশ পায়। প্রথম— কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যের প্রাচুর্য; দ্বিতীয়— প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সহজলভ্যতা; তৃতীয়— ব্যাপক বৈদেশিক বাণিজ্য; এবং চতুর্থ— দেশে স্বর্ণ ও মূল্যবান পদার্থের প্রাচুর্য। সমসাময়িক ফরাসী ঐতিহাসিক ও বিদেশী পরিব্রাজকদের বর্ণনায় প্রকাশ পায় যে, মুসলিম শাসনাধীনে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে সমৃদ্ধির এই চারটি প্রয়োজনীয় উপাদানের অধিকারী

ছিল।" (বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ডক্টর এম.এ.রহিম –অনুবাদ ঃ মুহম্মদ আসাদুজ্জামান, বাংলা একাডেমী, ১৯৮২, পৃ. ৪৩৮)।

মুসলিম আমলে বাঙ্গালার ব্যবসা-বাণিজ্য যে আবার প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল, তাতেও ঐতিহাসিকদের কোন দ্বিমত নেই। আর প্রাণবন্ত হয়ে উঠবার কথাও তো! বঙ্গোপসাগরের উপকূল বন্দরে আরব-পারসিক বণিকেরা আগে থেকেই ছিলেন সক্রিয়। অষ্টম শতক থেকেই আরব-পারসিক বণিকেরা পূর্ব-ভূমধ্যসাগর, প্রশান্ত মহাসাগর, ভারত মহাসাগর এবং সেই সূত্রে বঙ্গোপসাগরে আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্রিয়াকাণ্ড থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন বাংলা তথা ভারতের বণিকেরা। তারপর মুসলিম যোদ্ধারা বাংলার অংশবিশেষ জয় করলেন যখন, তখন তো আগে থেকেই বাণিজ্যরত মুসলিম বণিকেরা বর্ধিত উৎসাহে তাদের কর্মপরিধি বাড়িয়েই দেবেন। অতঃপর বাঙ্গালায় মুসলিম অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হল যখন, তখন অনেক মুসলিম বণিকই এই দেশের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে ব্যবসা-বাণিজ্যেই মনোনিবেশ করেন।

পর্যটক-পরিব্রাজকদের মধ্যে ওয়াং তা-ইউয়ান (১৩৪৯-৫০ সাল) থেকে আরম্ভ করে ফেইশিন (১৪৩৬ সাল) পর্যন্ত চীনা পর্যটক-পরিব্রাজকগণ, ১৫০৩ থেকে ১৫০৮ সালের মধ্যে আগত ইতালীয় ভারথেমা এবং পতুগীজ বণিক বারবোসা (১৫১৪ সাল) সবাই বাংলার সামুদ্রিক বাণিজ্যের প্রশংসা করেছেন। বাংলার কথা বলতে গিয়ে বারবোসা বলেন ঃ "এই রাজ্যের ভিতরের দিকে এবং সমুদ্রতটে অনেক শহর আছে।... সামুদ্রিক বন্দরগুলোতে মুর ও পৌত্তলিকেরা বাস করে। তারা বহু জিনিসপত্রের ব্যবসায় করে এবং বহু স্থানে জাহাজ নিয়ে যায়; এই সমুদ্র একটি উপসাগর, এটি উত্তর দিকে (স্থলভাগের মধ্যে) প্রবেশ করেছে। এর অভ্যন্তরে প্রত্যন্তদেশে একটি বিরাট শহর আছে। সেখানে মুররা বাস করে। তার নাম 'বেংগালা'। সেটি একটি ভাল বন্দর। এর অধিবাসীরা শ্বেতকায়, তাদের দেহ সুগঠিত। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত বহু বিদেশী এই শহরে বাস করে, আরব ও ইরানী দুই জাতের লোকেরা, হাবশীরা এবং ভারতীয়েরা এখানে সম্মিলিত হয়েছে,– কারণ দেশটি অত্যন্ত উর্বর, এর জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ। এরা সকলেই বড় ব্যবসায়ী, এদের নিজেদের বড় জাহাজগুলোর নির্মাণ কৌশল মক্কার জাহাজের মত, অন্য জাহাজগুলো চীন দেশের পদ্ধতিতে তৈরি, তাদের এরা বলে 'জাঙ্গো' (jungo=junk); এগুলি খুবই বৃহৎ এবং যথেষ্ট পরিমাণে মাল বহন করে। এইসব জাহাজ নিয়ে এরা চোল-মান্দার, মালাবার, কাম্বে, পেগু, টার্নাসারি (টেনাসেরিম), সমাত্রা (সুমাত্রা), সিংহল এবং মালাক্কায় যায়। এরা নানা জায়গায় বহু রকম জিনিসের ব্যবসায় করে।" (বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর, সুখময় মুখোপাধ্যায়, ১৯৮০; পৃ. ৩৪৪-৩৪৫ থেকে উদ্ধৃত)।

সামুদ্রিক বাণিজ্যের কতটুকু প্রসার ঘটলে এদেশেই জাহাজ নির্মাণের প্রয়োজন দেখা দেয়, তা সহজেই অনুমেয়। অথচ গুপ্ত যুগের শাসন অবসানের পরপরই (অর্থাৎ পঞ্চম শতাব্দীর পর–লেখক) ভারতবর্ষের এবং সেই সুবাদে এদেশেরও, সামুদ্রিক বাণিজ্য নিঃশেষিত হওয়ার পথে পা বাড়ায়। "পাল-যুগ বৈশ্য প্রাধানোর হলেও ব্রাহ্মণ্য প্রভাবের যুগ। বেদ-ব্রাহ্মণ রাজার যুগ। সওদাগরের ছেলেরা তাদের মানদণ্ড আর বাণিজ্য তরীর কথা ভুলে টোলে বসে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে সংস্কৃত পড়তো। পড়তো কাব্য, নাটক আর অলঙ্কার। ধ্যানগম্ভীর পবিত্র বেদমন্ত্রে মুখরিত সেই পরিবেশে আমদানি-রপ্তানি, কেনাকাটার মত স্থুল বিষয় কল্পনা করাও ছিল পাপ।

বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি যার ওপরে একান্ত নির্ভরশীল সেই সমুদ্র যাত্রা নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। কারণ দূর বিদেশে গিয়ে এমন আচার-ব্যবহার ব্যবসায়ী সম্প্রদায় নিয়ে আসতো যা এদেশের শান্তশিষ্ট ধর্মভীরু হিন্দুসমাজ একেবারেই সহ্য করতে পারতো না। নৌবিদ্যায় সমুদ্রযাত্রায় বাঙ্গালীর যুগসঞ্চিত গৌরবময় ইতিহাসের ওপরে নেমে এসেছিল বিস্মৃতির যবনিকা।" (বাণিজ্যে বাঙালী– একাল ও সেকাল, সুভাষ সমাজদার, শঙ্খ প্রকাশন, ১৩৮২, পৃ. ৬৩-৬৪)।

শ্রী সমাজদার আরও বলেন যে, 'সেন রাজাদের সময়ে বাংলায় বাণিজ্য প্রসারের কোন ইঙ্গিতই নেই। কেননা, সেন রাজারা জন-জীবনের সঙ্গে ছিলেন সম্পর্কহীন। তাঁরা বণিকদের ব্যবসায়িক প্রচেষ্টায় কোনরকম পৃষ্ঠপোষকতা করতেন না। শুধু নিজেদের বিলাসব্যসন, যুদ্ধ, সাম্রাজ্য বিস্তার, জাতিভেদ প্রথা, কৌলীন্য প্রথার প্রবর্তন ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন।"

প্রকৃত প্রস্তাবে, মুসলিম আমল ছিল ব্যাপকতম বাণিজ্যিক কার্যকলাপের আমল। মুসলিম আমলের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত চট্টগ্রাম বন্দর ছিল সবচেয়ে প্রসিদ্ধ বন্দর, পর্তুগীজদের ভাষায় 'পোর্টো গ্রাণ্ডি' (বড় বন্দর)। তার পরেই ছিল সাতগাঁও বন্দরের স্থান। বৈদেশিক বাণিজ্যের এই দ্বিতীয় বন্দরটিকে পর্তুগীজেরা বলত 'পোর্টো পিকেনো' বা ছোট বন্দর।

কৃষি ও কুটিরশিল্প প্রাক-মুসলিম যুগেও ছিল, ছিল এসবের প্রাচুর্যও। কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার না থাকলে এসব খাতে দ্রব্যোৎপাদন সীমিত হয়ে আসতে বাধ্য। মুসলিম আমলে ব্যবসা-বাণিজ্যের বিপুল প্রসারের ফলে কৃষিজাত ও শিল্পজাত দ্রব্যাদির অধিক উৎপাদনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। সে আমলে "সুতীবস্ত্র, চাউল, চিনি, রেশমী বস্ত্রাদি, আদা, মরিচ, লাক্ষা, হরিতকী ইত্যাদি রপ্তানির প্রধান দ্রব্য ছিল। এসবের মধ্যে সুতীবস্ত্র অধিক পরিমাণে রপ্তানি করা হত। চাউল বাংলার রপ্তানি বাণিজ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিল। .... সেকালে বাংলার উৎপন্ন চিনি বহুদেশে রপ্তানি হত এবং ইহার বিনিময়ে এদেশ প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণ ও মূল্যবান পদার্থ অর্জন করত।

বাংলাদেশ সে সময় উত্তম মানের লাক্ষা উৎপন্ন করত এবং বৈদেশিক বাজারে ইহার একচেটিয়া রপ্তানি বাণিজ্য ছিল।.... বাংলার সঙ্গে চীনের স্বর্ণ, সাটিন, রেশম, নীল ও সাদা মাটির বাসন, তাম্র, লৌহ, কস্তুরী, সিন্দুর, পারদ ও মাদুর ইত্যাদির ব্যবসা ছিল। বাংলাদেশ সাধারণত সুতীবস্ত্র, রেশমী কাপড় ও অন্যান্য পণ্যদ্রব্যের বিনিময়ে স্বর্ণ ও মূল্যবান ধাতব পদার্থ গ্রহণ করত।" (বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ডক্টর এম.এ. রহিম- অনুবাদঃ মুহম্মদ আসাদুজ্জামান, বাংলা একাডেমী, ১৯৮২, পৃ. ৪৫০-৪৫১)।

এই বিপুল পরিমাণ ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে মুসলিম আমলে বিদেশ থেকে অর্জিত স্বর্ণ ও রৌপ্যের আভায় 'মুলক-ই-বাঙ্গালা' ঝলমল করে উঠল। মানুষের ঘরে ঘরে, বাজারে বাজারে আবার দেখা দিল স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা। "মুসলিম আমলে এত প্রচুর সংখ্যক স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা প্রচলিত ছিল যে, প্রজারা এসব মুদ্রায় খাজনা দিত।" (প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৮)।

মুসলিম আমলে–স্বাধীন সালতানাত ও মুঘল আমলে মুদ্রা খোদিত হত এমন ২৬টি টাকশালের নাম পাওয়া যায়। সেগুলো হচ্ছেঃ লাখনৌতি (গৌড়ে), ফিরোজাবাদ (পাণ্ডুয়ায়), সাতগাঁও, সোনারগাঁও, মুয়াজ্জমাবাদ (সম্ভবত ময়মনসিংহে), শহর-ই-নও (গঙ্গার ধারে কোথাও), গিয়াসপুর (গৌড়ের কাছে), ফতেহাবাদ (ফরিদপুরে), হোসেনাবাদ (২৪-পরগণায়), খলিফতাবাদ (বাগেরহাটে), মুজাফ্‌ফরাবাদ (পাণ্ডুয়ার কাছে), চাটগাঁও (চট্টগ্রামে), মুহাম্মদাবাদ, মাহ্‌মুদাবাদ, জান্নাতাবাদ, নসরতাবাদ, বারবকাবাদ (মুহাম্মদাবাদ থেকে বারবকাবাদ হয়তো একই টাকশালের ভিন্ন ভিন্ন নাম), কামরু (সিলেটে), আরাকান, রোহতাসপুর, শরিফাবাদ, পাটনা, রাজমহল, তাণ্ডা বা তাঁড়া, ঢাকা এবং মুর্শিদাবাদ। একই সুলতান যে সবগুলো টাকশাল থেকেই মুদ্রা খোদাই করিয়েছেন তা নয়, তবে একাধিক স্থান থেকে অনেক সুলতানই তা করিয়েছেন। এতসব টাকশালের অস্তিত্ব সেই বাঙ্গালার আর্থিক সচ্ছলতারই পরিচায়ক।

মুসলিম আমলে বাঙ্গালার আর্থিক সমৃদ্ধি ও সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রায় তার সহজলভ্যতার চিত্র তুলে ধরতে যেয়ে এম. এ. রহিম বিভিন্ন ঐতিহাসিক তথ্য ঘেটে যা পেয়েছেন, তা থেকে আমাদের বক্তব্যের জন্য প্রয়োজনীয় অংশ হচ্ছে–"মাটির উর্বরতা, শিল্পের উন্নতি এবং লোকদের পরিশ্রম ও কারিগরী নৈপুণ্য বাংলার কৃষিজ ও শিল্পজাত দ্রব্যের প্রাচুর্যের মূল কারণ। অত্যধিক প্রাচুর্য থাকায় জীবনযাপনের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র অসাধারণভাবে সস্তা ছিল এবং অন্যান্য দেশের স্বর্ণ ও মূল্যবান পদার্থ এই দেশকে সম্পদশালী করে তুলেছিল। হিন্দু আমলে ১২৮০ কড়ি ছিল এক টাকার সমান। কিন্তু মুসলিম আমলে ৮০০০ কড়িতে এক টাকা হত। ব্যাপক রপ্তানি বাণিজ্যের মাধ্যমে স্বর্ণ ও রৌপ্যের ব্যাপক সমাগমের ফলে কড়ির মূল্যমান হ্রাস পায়।... কৃষক শ্রেণীর

নারী-পুরুষ উভয়েই ক্ষেতে কাজ করত এবং অবসরকালে সুতা কাটা, বস্ত্র বোনা কিংবা অন্য কোন কাজে নিয়োজিত থাকত। অতএব, যারা ছিল বাংলার লোকসংখ্যার অধিকাংশ, সেই কৃষকদের জীবন ছিল মোটামুটি সচ্ছল। ভূমিহীন লোকের সংখ্যা ছিল খুবই কম। এই সমস্ত ভূমিহীন লোকেরা ছোটখাট কারিগরী বা হস্তশিল্পের কাজ গ্রহণ করত অথবা কৃষিকার্যে শ্রমিক হিসেবে কাজ করত। কৃষি-শ্রমিকদেরকে তাদের কাজের জন্য পারিশ্রমিক দেয়া হত। সাধারণত টাকার বদলে জমির উৎপন্ন দ্রব্য দিয়ে তাদের পারিশ্রমিক দেয়া হত। শস্য কাটার জন্যে তাদেরকে সংগৃহীত শস্যের এক-চতুর্থাংশ অথবা এক-তৃতীয়াংশ শস্য দেয়া হত। 'দিনী' নামে অভিহিত এই পদ্ধতি এখনও বাংলার অনেক অঞ্চলে প্রচলিত আছে। উৎপন্ন ফসলে শ্রমিকদের অংশ তার ও তার পরিবারের ভরণপোষণের জন্য যথেষ্ট ছিল। ... এতে দেখা যায় যে, প্রাচুর্য ও সস্তার জন্যে এমন কি সাধারণ লোকের জীবনযাত্রাও সহজ ছিল।" (প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৬-৪৬৩)।

সুলতানী আমলে, বিশেষ করে স্বাধীন বাঙ্গালার সুলতানী আমলে, বাঙ্গালার সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবস্থা সম্পর্কে আমাদের বাদবাকি বক্তব্য পেশ করার আগে মুসলিম আমলে বাংলার গোত্র-গোষ্ঠী বা বংশভিত্তিক শাসনামলের একটা ক্রম-বিভক্তি এখানে পুনরুল্লেখ করছি। তা হচ্ছে ঃ

বাংলায় লাখনৌতি রাজ্যের প্রতিষ্ঠাকাল ১২০৩-১২২৭ সাল।

বাংলায় লাখনৌতি রাজ্যের বিস্তৃতিকাল, ১২২৭-১৩৩৭ সাল;

(ক) দিল্লীর পূর্ণ আনুগত্যকাল, ১২২৭-১২৭২ সাল;

(খ) স্বাধীনতা প্রয়াসকাল, ১২৭৩-১৩৩৮ সাল।

স্বাধীন বাঙ্গালা

(ক) বাঙ্গালায় ভিন্ন ভিন্ন স্বাধীন জনপদ, ১৩৩৮-১৩৫২ সাল;

(খ) একীভূত স্বাধীন বাঙ্গালা সালতানাত, ১৩৫২-১৫৩৮ সাল;

১৫৩৮ সালে হোসেনশাহী বংশের শেষ সুলতান গিয়াস উদ-দীন মাহ্মুদ শাহ্র শাসনাবসানে স্বাধীনতার অবসান।

অতঃপর,

দিল্লী কেন্দ্রিক আফগান শাসনামল, ১৫৩৯-১৫৭৫ সাল;

ও

মুঘল সাম্রাজ্যের অধীনে সুবে বাঙ্গালা, ১৫৭৬-১৭১৭ সাল

এখানে যে কথাটি বলে নেয়া প্রয়োজন মনে করছি, তা হচ্ছে এইঃ মুসলিম সাম্রাজ্য প্রধানের উপাধি ছিল তখন 'খলিফা', আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের বেলায় 'বাগদাদের খলিফা'। তাঁর প্রতি আনুগত্যশীল বিভিন্ন রাজ্যের প্রধানগণের উপাধি ছিল 'সুলতান'—অনেকটাই

গভর্নরের মত। অধিকন্তু, মুঘলরাই ভারত বিজয়ের পর উপরিউক্ত ওই রীতির অবসান ঘটায়। দিল্লী-কেন্দ্রিক সর্বোচ্চ মুঘল শাসকের উপাধি হল খলিফার বদলে বাদশাহ্, শাহান শাহ্।

যাক সে কথা। মুসলিম বাঙ্গালার রাজ্য-প্রধান ছিলেন সুলতান বা শাসনকর্তা। রাজ্য-প্রধানের নানা কাজে সহায়তা করার জন্য ছিলেন আমীর ও মালিকেরা; আরও ছিলেন নানা উচ্চ পদের অধিকারী রাজকীয় কর্মকর্তাবৃন্দ। আমীর মালিকেরা মন্ত্রীর দায়িত্বের সঙ্গে সৈন্য পরিচালনার দায়িত্ব পালন করতেন। প্রশাসনের সুবিধার জন্য রাজ্য বা রাষ্ট্রকে কয়েকটি বিভাগ, বিভাগকে উপবিভাগ, এবং উপবিভাগকেও ক্ষুদ্রতর প্রশাসনিক ইউনিটে বিভক্ত করা হত। সর্বত্রই প্রশাসন পরিচালিত হত রাষ্ট্রপ্রধানের নির্দেশিত নীতি অনুযায়ী। দেশের সাধারণ নিয়ম-নীতি বা আইন মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে প্রযোজ্য ছিল। তবে মুসলমান সমাজের প্রতি রাষ্ট্রপ্রধান এবং সেই সূত্রে বিভাগ-উপবিভাগ প্রভৃতির প্রধানদের কিছু বিশেষ দায়িত্ব ছিল। 'তারিখ-ই-মুবারক শাহী'তে বর্ণিত আছে মুসলিম শাসকদের সেইসব বিশেষ কর্তব্য ঃ (১) শুক্রবারে ও ঈদের নামাযে খুত্‌বা পাঠ করা, (২) ধর্মীয় বিধি-নিষেধসমূহের সীমা নির্ধারণ করা, (৩) দান-খয়রাত করার উদ্দেশ্যে কর আদায় করা, (৪) ধর্ম রক্ষার্থে যুদ্ধ করা, (৫) ঝগড়া-বিবাদের বিচার-আচার করা এবং (৬) রাজ্য রক্ষার্থে উপযুক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা।

উপর্যুক্ত কর্তব্যাদি খিলাফতের নিয়ম-নীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এবং কর্তব্যগুলো থেকেই বোঝা যায় যে, রাষ্ট্রপ্রধানকে ও তাঁর সহায়তাকারীদেরকে ইসলামী শিক্ষায় সুশিক্ষিত হতেই হত। প্রকৃত প্রস্তাবে বাঙ্গালার অধিকাংশ শাসনকর্তা সুলতানই ছিলেন ইসলামী শিক্ষায় সুশিক্ষিত।

"বাঙ্গালার মুসলমান শাসনকর্তা মুসলমান সমাজের প্রতি তাঁর দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং তিনি তা পালন করতেন। সমগ্র পৃথিবীর মুসলমান সমাজের প্রধানরূপে আব্বাসীয় খলিফার আইনগত সার্বভৌমত্ব তিনি স্বীকার করতেন, মুসলমানদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। মুসলমান সমাজের উন্নতির উদ্দেশ্যে তিনি উলামা, পীরদরবেশ, ধর্মপ্রচারক ও শিক্ষকদেরকে নানাভাবে সাহায্য করতেন। তিনি নিয়মিতভাবে মুসলমানদের ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহে যোগদান করতেন এবং এরূপে তিনি মুসলমান সমাজের নেতৃত্ব করতেন।

এ সম্পর্কে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, হিন্দু সম্প্রদায়ের স্বার্থ কোন প্রকারে ক্ষুণ্ন হয় এমন কোন কাজে মুসলমান শাসক কখনও মুসলমান সমাজকে তাঁর অভিভাবকত্ব ও পৃষ্ঠপোষকতা দান করেননি। হিন্দুদেরকে তাদের ধর্মীয় ও সামাজিক কার্যাবলীতে সম্পূর্ণ

স্বাধীনতা দেয়া হয়েছিল। তাঁরা হিন্দু প্রজাদের প্রতিভা এবং তাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নতিরও পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন।" (বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস ইত্যাদি ... ১৯৮২, পৃঃ ২৮০)।

বাঙ্গালার শাসনকর্তাদের রাজোচিত আড়ম্বর ও জাঁকিজমকপূর্ণ জীবন যাপন এ ব্যাপারে দিল্লী সুলতানদের জীবন যাপনের কথাই স্মরণ করিয়ে দিত। দিল্লী সুলতানদের সঙ্গে একটা প্রচ্ছন্ন প্রতিযোগী মনোভাব থেকেই হয়তো জীবনধারার এমনি রীতি গড়ে উঠে থাকবে। ১৪৩৬ সালে রচিত ফেই শিন-এর বিবরণী থেকে বাংলার সুলতান দরবারের বিশদ পরিচয় পাওয়া যায়। এক কথায় বলা যায়, প্রাচ্যের রাজারাজড়াদের জাঁকজমক ও জীবন-কথা সব দেশে প্রায় একই। বাংলায়ও তার ব্যতিক্রম ছিল না।

সুলতান ও রাজপরিবারের লোকদের পরেই গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি বলে পরিগণিত হতেন আমীর-মালিকেরা। তাঁরাই ছিলেন দেশের প্রথম সারির অভিজাত শ্রেণী। তবে বাঙ্গালায় এই অভিজাত শ্রেণীটির ছিল একটি তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। এখানে আভিজাত্যটা বংশগত ছিল না, ছিল প্রতিভাগত। সাধারণ অবস্থা থেকে অভিজাত শ্রেণীতে উন্নীত হয়েছেন, বাঙ্গালায়ই এর দৃষ্টান্ত অনেক বেশি। এখানকার আভিজাত্য গড়ে উঠত প্রধানত সামরিক ও প্রশাসনিক কৃতিত্বকে ভিত্তি করেই। আর কৃতিত্ব-ভিত্তিক এই আভিজাত্য অর্জনের পথ খোলা ছিল মুসলিম-অমুসলিম সকলের জন্যই।

আলোচ্য সময়ে বাঙ্গালার শাসকদের কাছে এবং সমাজে শিক্ষিত ও ধর্মনিষ্ঠ মুসলমান শেখ-সৈয়দ-উলামা পীরদবেশগণ ছিলেন শ্রদ্ধেয়, নেতৃস্থানীয় ও প্রভাবশালী। দেশে ইসলামী শিক্ষার প্রসার ও ইসলামী আদর্শের প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব ছিল তাঁদেরই ওপর। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তাঁরা রাষ্ট্র থেকে নিষ্কর জমি ও বৃত্তি ভোগ করতেন। নিষ্কর জমির একটা তালিকা দেয়া হল এখানে।

নিষ্কর জমির প্রকার	যাঁরা পেতেন	জমির উৎপাদন যেজন্য ব্যাহত
জায়গীর	মুসলমান এবং হিন্দু	কোন রাজকর্মচারী তাঁর কাজের জন্য জীবদ্দশা পর্যন্ত ভোগদখল করতেন।
আল-তমঘা	মুসলমান এবং হিন্দু	বরাবরের জন্য প্রদত্ত
মদদ-ই-মা'শ	মুসলমান	আধ্যাত্মিক সাধনায় সিদ্ধদেরকেই দেয়া হত
আইমা	মুসলমান	ধর্মীয় নেতা, পীরদরবেশ-সৈয়দদেরকে দেয়া হত
মাসকান	মুসলমান	বসবাস স্থাপনের জন্য
নযুরাত	মুসলমান	ধর্মীয় নেতা, পীরদরবেশদের দেয়া হত
খানকাহ্	মুসলমান	খানকাহ্ নির্মাণের জন্য
ফকিরান	মুসলমান	দারিদ্র ভিক্ষাজীবীদেরকে

নযরি দরগাহ্	মুসলমান	কোন দরগা'র রক্ষণাবেক্ষণের জন্য
নযরি ইমামাইন বা		
তাযিয়াদারি	মুসলমান	মোহররম পালনের জন্য
যমিন-ই-মসজিদ	মুসলমান	মসজিদের ব্যয় নির্বাহের জন্য
নযরি হযরত	মুসলমান	কোন ধর্মীয় উৎসব পালনের জন্য
খরচি মুসাফিরান	মুসলমান	পথচারী মুসাফিরদের সেবার জন্য
মা'ফি	মুসলমান	কোন সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের জন্য
পীরান	মুসলমান	পীর-দরবেশদের ভরণ-পোষণের জন্য
খয়রাতি	মুসলমান	দুর্দশাগ্রস্ত মুসলমানদের জন্য
খারিজ জমা	হিন্দু এবং মুসলমান	দুঃস্থ অবস্থা অবসানের লক্ষ্যে
মিনহাই	হিন্দু এবং মুসলমান	দুঃস্থ অবস্থা অবসানের লক্ষ্যে
ব্রহ্মোত্তর	হিন্দু	উপযুক্ত ব্রাহ্মণদের জন্য
দেবোত্তর	হিন্দু	হিন্দুদের দেবস্থানের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য
মেথরান	হিন্দু	নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুর কাজ্যের জন্য
সেবোত্তর	হিন্দু	হিন্দুদের দেব-স্থানের সেবা কার্যের জন্য
সুরজ পর্বত	হিন্দু	হিন্দুদের দেবস্থানের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য
মালেক ও মালেয়াকান	হিন্দু এবং মুসলমান	কাজের জন্য
ইনাম	মুসলমান এবং হিন্দু	কোন কাজের পুরস্কার স্বরূপ
যুনকার	মুসলমান এবং হিন্দু	কোন কাজের পুরস্কার স্বরূপ

পরবর্তী পর্যায়ে আসে জমিদার, ভূ-সম্পত্তির মালিক, কৃষক ও খাজনা-আদায়কারীদের কথা। 'মুকাদ্দাস' নামে অভিহিত ব্যক্তি গ্রামবাসীদের কাছ থেকে সরকারি খাজনা আদায় করতেন। তিনি হতেন গ্রামের প্রধান মান্যবান ব্যক্তি। হিন্দু ও মুসলমান কৃষকরা জমি ভোগ দখলের জন্য সরকারে একটা বার্ষিক কর দিতেন। বাঙ্গালায় এই কর আদায় ছাড়া হিন্দুদের কাছ থেকে কোন 'জিজিয়া' নেয়া হত না। "বুদ্ধিবৃত্তিমূলক পেশার কাজে নিযুক্ত লোকদের সমন্বয়ে ঐ যুগের মধ্যবিত্ত শ্রেণী গঠিত ছিল। মোটামুটি নিম্নপদস্থ কর্মচারী, কেরানী, চিকিৎসক, শিক্ষক, ধর্মপ্রচারক, কবি, সঙ্গীত শিল্পী, কারিগর, স্থপতি এবং উৎপাদনকারী ব্যক্তিরাও মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত ছিলেন।" (প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৯৮)।

কৃষক, ছোট ছোট কারিগর ও উৎপাদক এবং শ্রমিকদের নিয়ে গঠিত ছিল সাধারণ শ্রেণী। "হিন্দুরা বেশিরভাগ ছিল কৃষিজীবী। মুসলমান শাসনামলে মুসলমানদের চাকরি-বাকরির অসংখ্য পথ খোলা ছিল। মুসলমান শাসনকর্তারা নিয়মিত ও অনিয়মিত বিরাট সৈন্যদল রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা অনুচর বাহিনী রাখতেন এবং তাদের ব্যয়ভার বহন করতেন। জেলাসমূহের অধীনে অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যদল রাখার ব্যবস্থা ছিল এবং তাদের এলাকায় শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পালনের জন্য বহু পেয়াদাও ছিল। এমন কি, মুসলমান বণিক ও জমিদারদেরও পাইক ও পেয়াদার বাহিনী থাকত।" (প্রাগুক্ত পৃঃ ৩০০-৩০১)।

এসব চাকরি-বাকরিতে সাধারণত মসুলমানরাই নিয়োজিত হত। তাছাড়াও সমাজে ছোটখাট কাজ অনুযায়ী লোকদের নানা নামে ডাকা হত। যেমন, যেসব মুসলমান গবাদি পশু নিয়ে কারবার করত, তাদেরকে বলা হত 'মুকেরী', পিঠা তৈরি ও বিক্রি করত যারা তাদেরকে 'পিঠারী', মাছের ব্যবসায়ীকে 'কাবারী', মুসলমান তাঁতীদের 'সানকার', তীর-ধনুক প্রস্তুতকারীদেরকে 'তীরকার', খতনাকারীদের 'হাজ্জাম', কাগজের কারিগরগণকে 'কাগচা' ইত্যাদি।

"মুসলমান আমলে বাঙ্গালায় সঙ্গীত ও নৃত্যকলা খুবই প্রচালিত ছিল। প্রতিটি সামাজিক উৎসবে এসব ছিল অপরিহার্য অঙ্গ। চৈনিক সূত্র থেকে জানা যায় যে, যখন কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি কোন ভোজে মেহমান নিমন্ত্রণ করতেন, তখন মেহমানদের চিত্তবিনোদনের জন্য অভিনেত্রী ও নর্তকীদের ব্যবস্থা থাকত। অভিনেত্রীরা পুষ্পখচিত নকশা করা হালকা লাল রঙের কাপড় পরিধান করত। তারা তাদের শরীরের নিম্নভাগ রঙ্গীন রেশমী বস্ত্র দিয়ে আবৃত করত। চীনা দূত বাঙ্গালার সঙ্গীত ও নৃত্যকলার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন।" (প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৯৪)।

ইসলাম একটি সহজ-সরল এবং বাহুল্য অনুষ্ঠান-বর্জিত ধর্ম হলেও মুসলমানগণ তাদের ঈদ-পরব এবং অন্যান্য লৌকিক অনুষ্ঠান সাড়ম্বরেই পালন করতেন। "সুলতানগণ রমজান মাসে দৈনন্দিন ধর্মীয় আলোচনার ব্যবস্থা করেন এবং এ উদ্দেশ্যে ধর্মপ্রচারক নিযুক্ত করেন। তাঁরা 'ঈদুল ফিতর' ও 'ঈদুল আজহা'র নামায পড়ার জন্য ইমামও নিযুক্ত করেন। শহরের বাইরে বিরাট উন্মুক্ত জায়গায় অথবা গ্রামে ঈদের নামায অনুষ্ঠিত হত।" (তাবকাত-ই-নাসিরী (Elbot), পৃঃ ৬১৯-৬২০)।

দুই ঈদের উৎসব ছাড়াও ছিল মোহররমের অনুষ্ঠান, 'শব-ই-বরাত,' 'শব-ই-কদর' প্রভৃতি। এই সব ধর্মসংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান ছাড়াও সামাজিক অনুষ্ঠান যেমন, বিয়েশাদী, জন্ম-মৃত্যুর সঙ্গে জড়িত অনুষ্ঠান, 'বিসমিল্লাহ্ খানি' (লেখাপড়ায় হাতে খড়ি অনুষ্ঠান), খাতনা প্রভৃতি। তাছাড়া ছিল নানা ধরনের খেলাধুলা।

হিন্দু সমাজে যেসব অনুষ্ঠান আগে থেকেই প্রচলিত ছিল, তা মুসলিম আমলেও বাধাপ্রাপ্ত হয় নি। সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহের সময়ে শ্রীচৈতন্য কীর্তনের প্রচলন করেন। সারারাত ধরে নাম কীর্তনের শব্দে বিরক্ত হয়ে শ্রীচৈতন্য বিরোধী ব্রাহ্মণেরা, এমনকি মুসলমান নাগরিকেরাও মুসলিম কর্তৃপক্ষের কাছে তা বন্ধ করার আদেশ দেয়ার জন্য প্রার্থনা জানিয়েছেন। কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে এতে কোন রকম হস্তক্ষেপই করা হয় নি।

এক কথায় বলা যায়, সাংস্কৃতিক লৌকিক ক্রিয়াকাণ্ড বাঙ্গালায় লাভ করেছিল একটা আবহমানতা। প্রাচীনকাল থেকে আরম্ভ করে আজও তা চলে আসছে, সময়ে সময়ে তাতে এসেছে পরিবর্তন-পরিবর্ধন– এই মাত্র।

বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত' থেকে সুলতান আলা-উদ-দীন হোসেন শাহ্র রাজত্বকালে বাংলা দেশ সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। 'চৈতন্যভাগবত' রচিত হয়েছিল ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দে অথবা তার সামান্য পরে অর্থাৎ স্বাধীন সুলতান আমল শেষ হওয়ার সময়। এই গ্রন্থে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে হোসেন শাহ্ ও তাঁর বংশধরদের রাজত্বকালের বাঙ্গালার একটি উজ্জল ও প্রামাণিক আলেখ্য রচনা করা যেতে পারে।

"সে যুগে নবদ্বীপ ছিল বিশাল ও সমৃদ্ধ এক নগর। রাঢ়, পূর্ববঙ্গ, চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট,, উড়িষ্যা প্রভৃতি নানা স্থানের লোকেরা এখানে এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন। নবদ্বীপের সম্পদ ছিল অপরিমেয়। এখানে এক এক গঙ্গাঘাটে 'লক্ষ লোক' স্নান করত। নবদ্বীপে বাস করতেন অসংখ্য পণ্ডিত ও অধ্যাপক। নানা দেশ থেকে ছাত্রেরা নবদ্বীপে এসে বিদ্যাশিক্ষা করত। কিন্তু এইসব অধ্যাপক ও ছাত্রেরা কৃষ্ণভক্ত ছিলেন না, এমন কি যাঁরা গীতা বা ভাগবত পড়াতেন, তাঁরাও না। দু'একজন কেবল স্নানের সময় 'গোবিন্দ' বা 'পুণ্ডরীকাক্ষ' নাম উচ্চারণ করতেন।

তন্তুবায়, গোয়ালা, গন্ধবণিক, মালাকার, তাম্বুলী, শঙ্খবণিক, খোলাবেচা (থোড়, কলা, মূলা, খোলা প্রভৃতির বিক্রেতা) প্রভৃতি নানা জাতির ও পেশার লোক নবদ্বীপে বাস করত। অনেক তপস্বী, সন্ন্যাসী, জ্ঞানী, যোগীও এখানে বাস করতেন। এঁরা কৌমার্যব্রতধারী ছিলেন, অনেকে কোন দান পরিগ্রহ করতেন না।

নবদ্বীপে বহু অধ্যাপক ছিলেন। এঁরা ভট্টাচার্য, চক্রবর্তী, মিশ্র, আচার্য প্রভৃতি উপাধি দ্বারা পরিচিত হতেন; নানা শাস্ত্রে এঁরা পণ্ডিত ছিলেন। প্রত্যেকেরই অনেক ছাত্র থাকত, এইসব ছাত্রেরা গঙ্গায় স্নানের সময় নিজের গুরুর উৎকর্ষ ও অপরের গুরুর অপকর্ষ প্রচার করে ঝগড়া-মারামারি করত। ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ন্যায়, স্মৃতি প্রভৃতি নানা শাস্ত্র এখানে পড়ানো হত। কোন কোন পণ্ডিতের টোল তাঁর বাড়িতেই ছিল; কেউ কেউ আবার অপরের বাড়িতে (সাধারণত কোন ধনী ব্যক্তির দালানে বা চণ্ডীমণ্ডপে) টোল বসাতেন। টোল বসত সকালে ও বিকালে। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের মধ্যে অনেকেরই জীবনযাত্রা ছিল নিষ্কিঞ্চন, অনেকে আবার অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণ জীবন-যাপন করতেন; এঁরা আড়ম্বরপূর্ণ 'সাহেবান' দোলাতেও চড়তেন। নবদ্বীপের বাইরে বাংলার অন্যান্য

জায়গাতেও বিদ্যা-কেন্দ্র ছিল। সে যুগে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা ভক্ত ও শিষ্যদের কাছে সোনা, রূপা, জলপাত্র, আসন, সুরঙ্গ-কম্বল প্রভৃতি জিনিস উপহার পেতেন। শিশু জন্মের পর যথাসময়ে বালক-উত্থান, নামকরণ প্রভৃতি পর্ব অনুষ্ঠিত হত; তারপর কয়েক (পাঁচ?) বছর বয়স হলে কর্ণবেধ ও চূড়াকরণ সহকারে হাতে-খড়ি অনুষ্ঠিত হত। ব্রাহ্মণ-সন্তানদের উপনয়নের বয়স হলে উপনয়ন অনুষ্ঠিত হত; এই উপলক্ষে বন্ধুবান্ধবরা নিমন্ত্রিত হত, নারীরা কৃষ্ণের জয়ধ্বনি দিত, নটেরা মৃদঙ্গ, সানাই ও বাঁশী বাজাত, ব্রাহ্মণরা বেদ পাঠ করত ও ভাটেরা রায়বার পড়ত। ব্রাহ্মণদের পক্ষে সন্ধ্যা করা ও সন্ধ্যার শেষে কপালে তিলক কাটা অবশ্য কর্তব্য বলে গণ্য হত।

তখনও 'দুর্গোৎসব' ছিল বাংলার প্রধান পার্বণ। সমস্ত ঘরে মৃদঙ্গ, মন্দিরা ও শঙ্খ থাকত। দুর্গোৎসরের সময় এই সব বাদ্য বাজানো হত। বৈষ্ণদের অন্যতম উৎসব ছিল ব্যাসপূজা ও মাধবেন্দ্রপুরীর আরাধনা দিবস পালন। কোথাও কোন মহাপুরুষের আগমন হলে সেখানে হাট বসে যেত।

চৈতন্যদেবের প্রথমবার বিবাহ হয়েছিল বল্লভাচার্যের কন্যা লক্ষীদেবীর সঙ্গে। পাত্রপক্ষ ও পাত্রীপক্ষ উভয়েই দরিদ্র বলে এ বিবাহে ঘটা বিশেষ হয়নি। সে যুগেও পাত্রকে যৌতুক ও পণ দেবার প্রথা ছিল, কিন্তু বল্লভাচার্য দরিদ্র বলে মাত্র পঞ্চ হরিতকী দিয়ে কন্যা সম্প্রদান করেছিলেন।

চৈতন্যদেবের দ্বিতীয়বার বিবাহ হয় রাজপণ্ডিত সনাতন মিশ্রের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সঙ্গে। সনাতন মিশ্র ধনী লোক ছিলেন। চৈতন্য দেবের তরফে বিবাহের সমস্ত ব্যয় বহন করেছিলেন তাঁর দুই ধনী শিষ্য মুকুন্দ সঞ্জয় ও বুদ্ধিমন্ত খান। কাজেই খুব আড়ম্বর ও সমারোহের সঙ্গে এই বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই বিবাহের যে বর্ণনা বৃন্দাবন দাস দিয়েছেন, তার থেকে সে যুগে ধনী হিন্দুদের বিবাহের বাস্তব চিত্র পাই।-----সে যুগে পৌরাণিক কাহিনী অভিনয় করা হত। চৈতন্যদেব তাঁর সন্ন্যাসের কিছুদিন আগে একবার তাঁর ভক্তদের সঙ্গে মিলে রুক্সিণী-হরণ পালা অভিনয় করেছিলেন। এতে চৈতন্যদেব রুক্সিণী, হরিদাস কোতোয়াল, শ্রীবাস পণ্ডিত নারদ, শ্রীরাম পণ্ডিত স্নাতক, শ্রীমান পণ্ডিত 'দিয়াড়িয়া হাড়ি' ও নিত্যানন্দ বড়াই সেজেছিলেন। এটি অনেকটা নৃত্যনাট্যের মত; এতে সংলাপ অল্প ছিল, তবে নৃত্য-গীতই বেশি। একদল লোক গান করছিল আর অভিনেতারা নাচছিল। নিত্যানন্দ তাঁর বাল্যকালে তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে নানা পৌরাণিক পালা অভিনয় করতেন। 'ডঙ্ক' নামে পরিচিত একদল লোক সে যুগে বড়লোকদের বাড়িতে কালীয়দমন পালা গান করতো। কীর্তন চৈতন্যদেবের আগেও অল্প-স্বল্প ছিল। বিশেষ বিশেষ পুণ্যথিতিতে ও গ্রহণের সময় কীর্তন হত, কিন্তু ব্যাপকভাবে কীর্তন প্রচলন চৈতন্যদেবই করেন।

সে যুগে খাদ্যের মধ্যে প্রধান ছিলো ঃ নারকেল, সন্দেশ, মেওয়াক্ষীর, কর্কটিকা ফল, আখ, দই, দুধ, ঘি, সর, ননী, মুগ, কলা, চিঁড়া, চালভাজা, লাফরা, পিঠাপানা,

ছানাবড়া, তেঁতুল পাতার অম্বল, নানা ধরনের শাক– যথা অচ্যুত, পটোল, বাস্তুক, কাল, শালিঞ্চা, হিলঞ্চা প্রভৃতি। বৈষ্ণবদের অন্নের উপরে তুলসী-মঞ্জরী দেওয়া হত। গরীবেরা খোলায় ভাত খেত ও পিতলের বাটি ব্যবহার করত। যারা খোলা বিক্রি করতো, তারা থোড়, কলা এবং মূলাও বেচতো। সে যুগে পান খাওয়ার বেশ চলন ছিল। সে যুগে লোকে আমলকী দিয়ে কেশ সংস্কার করত। কেবল নারীরা নয়, পুরুষেরাও নানা রকম অলংকার পরতেন, যেমন– অঙ্গদবলয়, আংটি, নূপুর, কুন্তল; এইসব গয়না সোনায় তৈরি হত, তার সঙ্গে সময় সময় রূপাও থাকত এবং মরকত, প্রবাল, মুক্তা, বিড়ালাক্ষ প্রভৃতি রত্নও গয়নায় ব্যবহৃত হত।

নারীরা অন্তঃপুরচারিনী ছিলেন, তবে চৈতন্যদেব ও শ্রীবাসের স্ত্রীরা তাঁদের কোন কোন বন্ধু বা ভক্তের সামনে বার হতেন। দিনের বেলায় সাধারণত স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে দেখা হত না। এই জন্য চৈতন্যদেব পূর্ববঙ্গ থেকে বাড়িতে ফিরে লক্ষ্মীকে না দেখেও বুঝতে পারেন নি যে তিনি মারা গিয়েছেন। সহমরণ প্রথা অবশ্যই ছিল, কিন্তু তা বাধ্যতামূলক ছিল না, জগন্নাথ মিশ্রের মৃত্যুর পরে তাঁর স্ত্রী শচী দেবী সহমৃতা হন নি।

খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে সে যুগের হিন্দুদের মধ্যে প্রবল বাছবিচার ছিল। ব্রাহ্মণেরা অন্য জাতির লোকদের হাতে তো খেতেনই না, অনাত্মীয় ও অপরিচিত ব্রাহ্মণদের রান্নাও খেতেন না। কারও বাড়িতে অতিথি এলে তাঁকে কাঁচা ভোজ্যসামগ্রী দেওয়া হত, অতিথি সেগুলি রান্না করতেন।

সে যুগের লোকদের জীবনযাত্রা ছিলো সচ্ছল। সকলেই ভাবত, যে দোলা-ঘোড়া চড়ে, দশ-বিশ জন লোক যার আগে-পিছে নড়ে– সে-ই সুকৃতী। ছেলে-মেয়েদের বিবাহ এবং অন্যান্য উৎসবে লোকে বহু অর্থ ব্যয় করতো। তবে দেশে মাঝে মাঝে দুর্ভিক্ষও হত। ধানের দর পাছে বাড়ে, এই ভয়ে লোকে আতঙ্কিত হয়ে থাকত। দেশে অনেকেই জুয়া খেলত। চোর ও ডাকাতের সংখ্যা বড় অল্প ছিল না। ছোট ছেলের গায়ে অলঙ্কার থাকলে চোরে তাকে অনেক সময় নিয়ে যেত। ডাকাতদের মধ্যে নানা জাতির লোক থাকত, অনেক সময় ব্রাহ্মণের ছেলেরাও ডাকাতদের সর্দার হত।

সে যুগে লোকদের বাড়িতে শৌচাগারের পাট ছিল না, প্রয়োজন মত বাড়ির বাইরে গিয়ে তারা মলমূত্র ত্যাগ করত।

সে যুগে আয়ুর্বেদ ও টোটকা মতে লোকের চিকিৎসা হত। কারও বায়ুরোগ হলে মাথায় বিষ্ণু তৈল, নারায়ণ তৈল ও আরও সব সুগন্ধি পাক-তৈল দেওয়া হত, শুধু তাই নয়, তাকে তৈল দ্রোণে (তেল-ভর্তি বিরাট পাত্রে) রাখা হত। অনেক সময় বায়ুরোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে বেঁধেও রাখা হত, তাকে খেতে দেওয়া হত ডাবের জল; বায়ুর প্রকোপ বেশি হলে শিবাঘৃত প্রয়োগ করা হত। কফ-রোগের ওষুধ ছিল পিপ্পলিখণ্ড।

দশম অধ্যায়

আফগান শাসন আমল
(১৫৩৯-১৫৭৫ সালে)

গোর্খ বিজয় আদ্যে মুনিসিদ্ধা কত।
কহিলাম সভ কথা শুনিলাম যত॥
খোঁটাদুরের পীর ইছমাইল গাজী।
গাজীর বিজয় সেহ মোক হইল রাজী॥
এবে কহি সত্যপীর অপূর্ব্ব কথন।
ধন বাড়ে শুনিলে পাতক খণ্ডন।
মুনি রস বেদ শশী শাকে রহে সন।
শেখ ফয়জুল্লা ভণে ভাবি দেখ মন।

(শেখ ফয়জুল্লাহ্ রচিত 'সত্যপীর' থেকে)

'মুসলিম বাংলা সাহিত্য' গ্রন্থের ৮৯ পৃষ্ঠায় ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক বলেন ঃ "ইহা (উপরে উদ্ধৃতাংশ –লেখক) হইতে দেখা যায়, শেখ ফয়জুল্লাহ ১৪৬৭ কিংবা ১৪৯৭ শকাব্দে 'সত্যপীর' রচনা করেন। সুতরাং ১৫৪৫ বা ১৫৭৫ খ্রীস্টাব্দে সত্যপীরের রচনা।"

১০

এই দ্বন্দ্বকালের প্রারম্ভে রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে প্রধান চরিত্র তিনটি ঃ বিশাল বাংলার সুলতান মাহ্‌মুদ শাহ্‌, পাঠান বীর শের খান ও দিল্লীর বাদশা হুমায়ুন। এদের মধ্যে একটি বিশাল রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন মাহমুদ শাহ্‌, খুব বড় না হলেও একটি সাম্রাজ্য ছিল বাদশা হুমায়ুনের, আর রাজ্যহীন ছিলেন পাঠান বীর শের খান। শের খান ছিলেন বিহারের সুলতান-পুত্র জালাল খানের শিক্ষক-অভিভাবক। তিনটি চরিত্রের মধ্যে সবচাইতে বুদ্ধিমান ও ধুরন্ধর ছিলেন শের খান, সবচাইতে শরীফ স্বভাবের অধিকারী ছিলেন হুমায়ুন, আর সব চাইতে নির্বোধ ছিলেন মাহমুদ শাহ্‌।

শের খান বাংলা আক্রমণ করতে আসছেন শুনে পর্তুগীজদের সাহায্যে বলীয়ান হয়ে মাহমুদ শাহ্‌ তেলিয়াগড়ে শের খানকে মুকাবিলা করলেন। শের খান বুঝলেন, পর্তুগীজদের পরাস্ত করা সম্ভব নয়। আবার তেলিয়াগড়ে যুদ্ধে বেশি দিন জড়িয়ে থাকলে বাদশা হুমায়ুনের দিক থেকে বিপদ বাড়বে। কারণ এর মধ্যেই হুমায়ুন পরাস্ত করেছেন গুজরাট সুলতানকে এবং যেকোন সময় তিনি ছুটে আসবেন শের খানের অধিকৃত এলাকা ছিনিয়ে নিতে। হুমায়ুনের মুঘল বাহিনীকে মুকাবিলা করা তাঁর পক্ষে সহজ হবে না। তাই শের খান নিজ পুত্রকে তেলিয়াগড়ের যুদ্ধে লিপ্ত রেখে নিজে তাঁর বাহিনীসহ গোপনে ছুটে এসে উপস্থিত হলেন বাংলার রাজধানী গৌড়ে। খবর পেয়ে মাহমুদ শাহ্‌ তো হতবাক। তখনই দেন তিনি চরম নির্বুদ্ধিতার পরিচয়। পর্তুগীজদের নিষেধ সত্ত্বেও মাহমুদ শাহ্‌ বীরের মত শের খানকে আক্রমণ না করে ১৩ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা উপহার দিয়ে শের খানকে বিহারে ফিরে যেতে রাজী করান। শের খান বিহারে ফিরে গিয়ে মাহমুদ শাহ্‌র প্রদত্ত অর্থে সেনাবাহিনীকে আরও শক্তিশালী করে মাহ্‌মুদ শাহ্‌র বিরুদ্ধে চূড়ান্ত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন।

আক্রান্ত হলো বাংলার রাজধানী। পালালেন মাহমুদ শাহ্‌। ওদিকে চুনার দুর্গ জয় করে বাদশা হুমায়ুন বাংলার পথে অগ্রসরমান। শের খান বাদশার কাছে দূত পাঠালেন সন্ধির আশায়। বাদশার কাছে দূত পাঠালেন মাহ্‌মুদ শাহ্‌ও। তিনি শের খানকে দমন করার জন্য বাদশা হুমায়ুনকে অনুরোধ জানান। বাদশার দুর্ধর্ষ মুঘল বাহিনী ছুটে চলল গৌড়ের পথে। সঙ্গে মাহমুদ শাহ্‌। কিন্তু খলগাঁও নামক স্থানে এলে মাহমুদ শাহ্‌ তাঁর দুই ছেলের মর্মান্তিক মৃত্যু সংবাদ পেয়ে শোকে দুঃখে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

ইতিমধ্যে শের খান গৌড়ে রক্ষিত বিপুল ধন-সম্পদ হস্তগত করে তা রোহ্‌তাস্‌ দুর্গে স্থানান্তরিত করেন এবং গৌড় ত্যাগ করে চলে যান। ১৫৩৮ সালের জুলাই মাসের মাঝামাঝি সময়ে বাদশা হুমায়ুন গৌড়ে প্রবেশ করেন। সেখানে আরাম-আয়েশের মধ্য

দিয়ে কাটিয়ে দেন দীর্ঘ নয় মাস। এর মধ্যে শের খান নিজেকে আরও শক্তিশালী করে নিয়ে বেনারস দখল করে নেন। দখল করে নেন জৌনপুর ও চুনার দুর্গ। এই খবরে অপেক্ষাকৃত সরলমনা বাদশা হুমায়ুন প্রমাদ গণলেন। এবার যে শেরখানের দিল্লী-আগ্রা আক্রমণের পালা। তিনি ত্বরিতে গৌড় ত্যাগ করে রাজধানীর পথে অগ্রসর হলেন। কিন্তু শের খান তাঁকে প্রতিরোধ করে দাঁড়ান চৌসারে। গৌড় ত্যাগ করার মুহূর্তে মুগল বাদশা বাংলার শাসনকর্তা নিয়োগ করে যান জাহাঁঙ্গীর কুলী বেগকে।

৫০. জাহাঁগীর কুলী বেগ (১৫৩৯–১৫৪০ সাল)

বাংলার শাসনকর্তা জাহাঁগীর কুলী বেগের অধীনে তখন পাঁচ হাজার সৈন্য এবং কিছু সংখ্যক অমাত্য। চৌসারে শের খান বাদশা হুমায়ুনকে পরাজিত করে কনৌজ পর্যন্ত পুরো এলাকায় নিজ আধিপত্য বিস্তারে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন এবং হাজী খান বাতনী ও জালাল বিন জলুকে গৌড় আক্রমণ করতে পাঠালেন। যুদ্ধে স্বল্প সংখ্যক সৈন্য নিয়ে জাহাঁগীর কুলী বেগ পাঠান বাহিনীর মুকাবিলা করে পরাস্ত ও নিহত হলেন। এর আগে শেরখান শেরগড় দুর্গে মসনদে আরোহণ করে নিজ নামে মুদ্রা জারি করেছেন এবং উপাধি গ্রহণ করেছেন আল-সুলতান আল-আদেল ফরীদ আল-দুনিয়া ওয়াল-দীন আবুল মুজাফ্ফর শের শাহ্ আল-সুলতান। তারপর ১৫৪০ সালে কনৌজের যুদ্ধে হুমায়ুনকে পরাজিত করে শের শাহ্ দিল্লীর মসনদে আরোহণ করেন। বাংলা পরিণত হয় দিল্লী সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশে। সেই প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন খিজির খানকে।

৫১. খিজির খান (১৫৪০–১৫৪১ সাল)

বাংলার খিজির খানের শাসনকর্তৃত্ব বজায় থাকে মাত্র এক বছরের মত। এর মধ্যেই তিনি বিদ্রোহাত্মক কার্যকলাপ আরম্ভ করেন। তিনি মরহুম মাহমুদ শাহ্র কন্যাকে বিয়ে করে সুলতান শের শাহ্র বিরাগভাজন হন এবং কঠোর শাস্তি পেয়ে বাংলার শাসন কর্তৃত্ব থেকে অপসারিত হন।

শের শাহ্ তখন বাংলাকে কয়েকটি ছোট ছোট শাসনতান্ত্রিক এলাকায় বিভক্ত করেন। এই এলাকাসমূহের শাসনকর্তারা ছিলেন পরস্পরের মধ্যে স্বাধীন এবং সকলেই দিল্লীর অনুগত। দিল্লীর সুলতান নিজেই তাঁদেরকে নিযুক্ত করতেন এবং তাঁরা সুলতানের নিকট তাঁদের কাজের জন্য দায়ী থাকতেন। এই ব্যবস্থায় বাংলার বিদ্রোহ সমস্যা দূরীভূত হয়। সুলতান শের শাহ্র সময়ে ১৫৪২/৪৩ সালে বাংলায় বারবক শাহ্ নামধারী একজন সুলতান রাজত্ব করেন। শের শাহ্র রাজত্বের মধ্যভাগে ইনি বিদ্রোহ করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। মনে হয় তাঁর স্বল্পকালীন রাজত্ব ছিল ময়মনসিংহ ও সিলেট অঞ্চলে। সে যাক, শের শাহ্ কর্তৃক বাংলাকে কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত করার ফলে বাংলার জন্য কোন একক শাসনকর্তার নাম পাওয়া যায় না। এমনি অবস্থা চলে ১৫৪৫ সাল পর্যন্ত। ঐ

সালে সুলতান শের শাহ্‌র মৃত্যুর পর শের শাহ্‌র পুত্র জালাল খান সুলতান ইসলাম শাহ্ সূর উপাধি গ্রহণ করে দিল্লীর মসনদে আরোহণ করেন। বাংলা শাসনের ব্যাপারে পিতার ব্যবস্থা তিনি বাতিল করে বাংলাকে একক শাসন কর্তৃত্বে আনয়ন করেন। শামস-উদ-দীন মুহম্মদ সূর নামক এক আত্মীয়কে তিনি বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করে।

৫২. শামস-উদ-দীন মুহম্মদ সূর (১৫৪৫–১৫৫৫ সাল)

শামস-উদ-দীন মুহম্মদ সূর ১৫৫৩ সাল পর্যন্ত দিল্লীর অনুগত শাসনকর্তা হিসাবেই বাংলা শাসন করেন। কিন্তু ১৫৫৩ সালে সুলতান ইসলাম শাহ্ সূরের মৃত্যুর পর সূর বংশের পতন আরম্ভ হয়। তাঁর মৃত্যুর পর দিল্লীর মসনদে আরোহণ করেন তাঁর পুত্র ফিরোজ শাহ্ সূর। কিন্তু কিছুদিন রাজত্বের পর তাঁকে হত্যা করে মুবারিজ খান নিজেই মুহম্মদ শাহ্ আদিল উপাধি গ্রহণ করে মসনদে আরোহণ করেন। তখন থেকেই দিল্লী প্রশাসনে আরম্ভ হয় চরম অরাজকতা। বাংলার শাসনকর্তা শামস-উদ-দীন মুহম্মদ সূর এই অরাজকতার খবর পেয়েই স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং তাঁর উপাধি হয় সুলতান শামস-উদ-দীন মুহম্মদ শাহ্ গাজী। সূর বংশেরই লোক হওয়ায় দিল্লীতে নিজ বংশের পতনে তিনি ব্যথিত হন। স্বাধীনতা ঘোষণা করে তিনি দিল্লীর পথে অভিযান পরিচালনা করেন এবং ক্রমে চুনার, জৌনপুর ও কাল্‌পী অধিকার করে নেন। মুহম্মদ শাহ্ আদিল তাঁকে প্রতিরোধ করতে এগিয়ে এসে ১৫৫৫ সালে উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধে। যুদ্ধে নিহত হন সুলতান শামস-উদ-দীন মুহম্মদ শাহ্ গাজী। মুহম্মদ শাহ্ আদিল তখন শাহবায খান নামক এক সেনাপতিকে বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই সুলতান শামস-উদ-দীন মুহম্মদ শাহ্ গাজীর পুত্র খিজির খান গিয়াস-উদ-দীন বাহাদুর শাহ্ উপাধি গ্রহণ করে শাহবায খানকে পরাজিত করে বাংলা অধিকার করেন।

৫৩. সুলতান (প্রথম) গিয়াস-উদ-দীন বাহাদুর শাহ্ (১৫৫৬–১৫৬০ সাল)

সুলতান হওয়ার পর বাহাদুর শাহ্ পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হলেন এবং ১৫৫৭ সালে এক বিশাল বাহিনীসহ দিল্লীর পথে রওনা করলেন। এর মধ্যে মুহম্মদ আদিল শাহ্‌র বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়েছেন তাঁর সেনাপতি তাজ খান কররানী। এই কররানীও যোগ দিলেন বাহাদুর শাহ্‌র সঙ্গে। সুরজগড়ের অনতিদূরে ফতেহ্‌পুরে দুই পক্ষ মুকাবিলা করে দুই পক্ষকে। সেই যুদ্ধে আদিল শাহ্ পরাজিত ও নিহত হন। আর বাহাদুর শাহ্ তাজ খান কররানীকে বিহারের শাসনভার দিয়ে গৌড়ে ফিরে আসেন।

ওদিকে দিল্লীতেও আসে পরিবর্তন। পলায়িত বাদশা হুমায়ুন দিল্লীর মসনদ পুনরাধিকার করেন এবং কিছুদিন পর হুমায়ুনের মৃত্যু হলে দিল্লীর মসনদে অধিষ্ঠিত হন তরুণ বাদশা আকবর। জৌনপুর পর্যন্ত এলাকা মুগলদের অধিকারে চলে যায়।

এবারে বাংলায় প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন সুলতান বাহাদুর শাহ্, বিহারে শাসনকর্তা তাজ খান কররানী এবং দিল্লীর মসনদে সম্রাট আকবর। বাংলার সুলতান বাহাদুর শাহ্ মুগলদের বিতাড়িত করার অভিপ্রায়ে ৩০ হাজার সৈন্যের এক বাহিনী নিয়ে দিল্লীর পথে অগ্রসর হন। মুগল সেনাপতি খান জামান বাহাদুর শাহ্র গতিরোধ করেন। এই যুদ্ধে প্রথমে বাংলার বাহিনী সাফল্য লাভ করলেও শেষ পর্যন্ত জয় হয় মুগলদেরই। পরাজিত বাহাদুর শাহ্ ফিরে আসেন বাংলায়। ১৫৬০ সালে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

৫৪. সুলতান গিয়াস-উদ-দীন জালাল শাহ্ (১৫৬০-১৫৬৩ সাল)

সুলতান গিয়াস-উদ-দীন জালাল শাহ্ ছিলেন সুলতান গিয়াস-উদ-দীন বাহাদুর শাহ্র ভাই। তিনি মুগল শক্তি সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। তাই মুগলদের সঙ্গে বিবাদে না গিয়ে বাংলা শাসন করেন প্রায় তিন বছর। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁরই এক পুত্র বাংলার মসনদে আরোহণ করেন। কিন্তু কোন সূত্রেই তাঁর নাম পাওয়া যায় না এবং মাত্র কয়েকমাস রাজত্ব করার পরই এক জবরদখলকারী তাঁকে সরিয়ে বাংলার মসনদে আরোহণ করেন। তিনিও গিয়াস-উদ-দীন উপাধি গ্রহণ করেন।

৫৫. সুলতান গিয়াস-উদ-দীন (১৫৬৩-১৫৬৪ সাল)

এই জবরদখলকারী সুলতান মাত্র এক বছর এগার দিন রাজত্ব করেন। এর পরই তাঁকে হত্যা করে বিহারের শাসনকর্তা তাজ খান কররানী বাংলার মসনদ অধিকার করেন। বাংলায় আরম্ভ হয় কররানী বংশের শাসন।

৫৬. সুলতান তাজ খান কররানী (১৫৬৪-১৫৬৫ সাল)

সুলতান তাজ খান কররানী বছর খানেকের মত বাংলা শাসন করেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। বাংলার মসনদে বসেন তাঁরই ভাই সুলায়মান খান কররানী।

৫৭. সুলায়মান খান কররানী (১৫৬৫-১৫৭২ সাল)

বাংলার শাসন কর্তৃত্ব গ্রহণের আগেই সুলায়মান কররানী ছিলেন বিহারের শাসনকর্তা। এবার বিহার ও বাংলা মিলিয়ে বিশাল ভূখণ্ডের শাসনকর্তৃত্বের অধিকারী হলেন তিনি। এদিকে সম্রাট আকবরের রাজত্বে মুগল সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটতে থাকে এবং তারই সঙ্গে সঙ্কুচিত হতে থাকে এই উপমহাদেশের পাঠান কর্তৃত্ব। এমনি অবস্থায় সুলায়মান কররানী হয়ে ওঠেন পাঠান শক্তির ধারক ও বাহক। ইসলাম খান সূরের পরে সূরদের মধ্যে অন্তর্বিরোধ দেখা দেওয়ায় এবং মুগলদের হাতে পরাজয়ের পর উত্তর ভারতের সকল আফগান ছুটে আসতে থাকে তাদের শেষ ভরসাস্থল বাংলা-বিহারের পানে। সুলায়মান খান কররানী তাদেরকে চাকুরীসহ সকল সুবিধার বন্দোবস্ত করে দেন। তাতে করে সুলায়মান খানেরও শক্তি বৃদ্ধি হয়। ঐতিহাসিক স্টুয়ার্টের মতে, সুলায়মান

খান কররানীর অধীনে গড়ে ওঠে ৩৬০০ হাতী, ৪০ হাজার অশ্বারোহী, ১৪ হাজার পদাতিক ও ২০ হাজার কামানের এক বিশাল বাহিনী।

কিন্তু সুলায়মান খান কররানী ছিলেন ধীরস্থির প্রকৃতির মানুষ এবং পররাষ্ট্র বিষয়ে এক বিচক্ষণ শাসক। তিনি উপলব্ধি করতে পারেন যে, হঠকারিতা দেখিয়ে পাঠানরা ক্রমবর্ধমান মুগল শক্তির বিরুদ্ধে টিকে থাকতে পারবে না। তাই তিনি মুগলদের সঙ্গে যথাসম্ভব সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলেন। বিভিন্ন সময়ে দিল্লীতে পাঠাতে থাকেন নানাবিধ উপহার সামগ্রী। সুলতান উপাধিও তিনি গ্রহণ করেন নাই। জৌনপুরের মুগল শাসনকর্তা খান-ই-জামানের সঙ্গেও তিনি গড়ে তোলেন বন্ধুত্বের সম্পর্ক। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল বাংলা-বিহারকে মুগলদের সম্প্রসারণ অভিযান থেকে বাঁচিয়ে রাখা। এ কাজে তিনি সফলও হয়েছিলেন। তাঁর জীবদ্দশায় মুগল সম্রাট আকবর বাংলা-বিহার বিজয়ের কোন চেষ্টাই করেন নাই।

এর মধ্যে উড়িষ্যার সঙ্গে সুলায়মান খান কররানী সংঘর্ষে জড়িত হয়ে পড়েছিলেন। উড়িষ্যার রাজা মুকুন্দ হরিচরণ জনৈক পলাতক ইবরাহীম খান সূরকে স্বরাজ্যে আশ্রয় দিয়ে সুলায়মান খান কররানীর সঙ্গে শত্রুতার সূচনা করেন। ঠিক তখনই জৌনপুরের শাসনকর্তা খান জামানও আকবরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। সম্রাট আকবর জানতেন যে, খানই-জামানের সঙ্গে রয়েছে সুলায়মান খান কররানীর বন্ধুত্ব। তাই তিনি শত্রুর বন্ধুর শত্রু উড়িষ্যা রাজকে সুলায়মানের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেন। ১৫৬৭ সালে সম্রাট আকবর যখন চিতোর আক্রমণে ব্যস্ত, তখন সুলায়মান খান উড়িষ্যা আক্রমণের আদেশ দেন। বাংলার এক বিশাল সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন সুলায়মান খানের পুত্র বায়েজীদ এবং কালাপাহাড় নামক এক ধর্মান্তরিত মুসলমান বীর। উড়িষ্যা-রাজ বীর বিক্রমে যুদ্ধ করেও পরাজিত হন এবং পুরীসহ সমগ্র উড়িষ্যা জয় করে নেয় বাংলা বাহিনী। উড়িষ্যা বিজয়ের পর সুলায়মান খান কররানী লোদী খান ও কতলু খানকে যথাক্রমে উড়িষ্যা ও পুরীর শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন।

এরপর সুলায়মান খান জড়িয়ে পড়েন কোচবিহার রাজ্যের সঙ্গে এক অবাঞ্ছিত সংঘর্ষে। কোচবিহারের রাজা বিশ্বসিংহ কামতা রাজ্য জয় করার পর রাজ্য বিস্তারের নেশায় মেতে ওঠেন। বিশ্বসিংহের পুত্রেরা রাজ্যের আরও বিস্তৃতি ঘটান। ১৫৬৮ সালে কোচবিহার বাহিনী সুলায়মান খানের রাজ্য-সীমান্তে এসে হানা দেয়। ফলে বাংলা বাহিনী কোচবিহার আক্রমণ করে। এই বাহিনী ব্রহ্মপুত্র বরাবর অগ্রসর হয়ে তেজপুর পর্যন্ত অধিকার করে। কিন্তু বিজয়ী হয়েও সুলায়মান খান কররানী কোচবিহার থেকে ফিরিয়ে আনেন তাঁর বাহিনীকে। বন্ধুত্ব স্থাপন করেন কোচবিহার রাজের সঙ্গে। এটা সুলায়মান খানের দূরদর্শিতার আর একটি প্রমাণ। তিনি বুঝতে পারেন শক্তিশালী মুগলদের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ অনিবার্য। তাই শত্রুর সংখ্যা তিনি কিছুতেই বাড়াতে পারেন না। সুলায়মান

খান কররানীর এসব কৃতিত্বের পেছনে ছিল তাঁর বিচক্ষণ উজীর লোদী খানের উল্লেখযোগ্য অবদান। সাত বছর কৃতিত্বের সঙ্গে বাংলা-বিহার শাসন করে ১৫৭২ সালের ১১ অক্টোবর তারিখে ইন্তিকাল করেন এই কৃতী শাসক সুলায়মান খান কররানী। মসনদে আরোহণ করেন তাঁরই জ্যেষ্ঠ পুত্র বায়েজীদ খান কররানী। কিন্তু নিজের হঠকারিতার ফলে অল্পদিনের মধ্যেই তাঁকে হত্যা করে বসে সুলায়মান কররানীর জামাতা হাঁসুর নেতৃত্বে একদল লোহানী আফগান। কিন্তু উজীর লোদী খান হাঁসুর বিরুদ্ধাচরণ করেন এবং হাঁসুকে হত্যা করিয়ে সুলায়মান কররানীর কনিষ্ঠ পুত্র দাউদ খান কররানীকে মসনদে বসান।

৫৮. দাউদ খান কররানী (১৫৭২–১৫৭৬ সাল)

সুলায়মান খান কররানীর মৃত্যুর পর বাংলা-বিহারের তদানীন্তন রাজধানী তাণ্ডায় যে আত্মঘাতী দলাদলি আরম্ভ হয়, তার পরিণামে দাউদ খান কররানীর রাজত্বকালে দেখা দেয় এক সর্বনাশা বিশৃঙ্খলা ও মতবিরোধ। আর তারই সুযোগ গ্রহণ করেন মুগল সম্রাট আকবর।

বায়েজীদ খান কররানীকে হত্যা করে সাময়িকভাবে মসনদ দখল করেন যে হাঁসু, তার পক্ষাবলম্বী আফগানদের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন লোহানীদের সর্দার কতলু খান লোহানী। উজীর লোদী খান হাঁসুকে হত্যা করিয়ে দাউদ খান কররানীকে মসনদে বসালে পর কতলু খান লোহানী তাঁর অনুচরবৃন্দসহ দাউদ খানের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। কিন্তু ওদিকে গুজর খান কররানী নামক পাঠান-প্রধান বায়েজীদ খানের এক ছেলেকে বিহারের মসনদে বসিয়ে দেন। আফগানদের মধ্যে যখন এমনি পরিস্থিতি বিরাজমান, সম্রাট আকবর তখন সেনাপতি মুনিম খান খান-ই খানানকে বাংলা-বিহার রাজ্য আক্রমণ করতে পাঠান।

এর আগে দাউদ খান কররানী মসনদে আরোহণ করে সম্রাট আকবরের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন নি। অধিকন্তু তিনি নিজ নামে খুতবা পাঠ ও মুদ্রা জারির ব্যবস্থা করেন। বেশ অত্যাচারী-অনাচারীও হয়ে ওঠেন তিনি। ফলে রাজ্যের আমীরগণ হয়ে ওঠেন অতিষ্ঠ। এমনি অবস্থায় সম্রাট আকবর বাংলা-বিহার আক্রমণের জন্য মুনিম খানকে পাঠান। মুনিম খান চুনার থেকে পাটনার দিকে অগ্রসর হন এবং বাংলা আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। এমনি অবস্থায় উজীর লোদী খান মুনিম খানের অভিযানের গুরুত্ব অনুধাবন করে গুজর খান কররানীর সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করেন এবং প্রচুর উপঢৌকনের বিনিময়ে মুনিম খানকে ফিরিয়ে দিতে সমর্থ হন। এভাবে লোদী খান প্রথম বিপদ কাটিয়ে ওঠেন।

ইতিমধ্যে মুগল এলাকা গোরক্ষপুরে বিদ্রোহ দেখা দেয় এবং মুনিম খান সেই বিদ্রোহ দমনে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন। আর এটাকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে দাউদ খান কররানী কালাপাহাড়ের সহায়তায় জৌনপুর আক্রমণ করে বসেন।

মুনিম খান লোদী খানের সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হন। এ সময়ে কতলু খান লোহানী দাউদ কররানীকে বোঝালেন যে, লোদী খান তাঁর ভাবী জামাতা তাজ খান কররানীর ছেলে ইউসুফকে মসনদে বসাবার জন্য আগ্রহী। তাতে করে ক্রুদ্ধ দাউদ খান ইউসুফকে হত্যা করান। এতে হতাশ হয়ে লোদী খান দাউদ খানের বিরুদ্ধেই সৈন্য পরিচালনা করলেন। কালাপাহাড় লোদী খানের সঙ্গে যোগ দিতে অস্বীকার করায় লোদী খান মুনিম খানের সাহায্য কামনা করে রোহ্‌তাস দুর্গে আশ্রয় নেন।

সম্রাট আকবর বাংলা জয়ের মানসে এবার রাজা তোডরমলকে মুনিম খানের সঙ্গে যোগ দিতে পাঠান। নবোদ্যমে মুনিম খান দাউদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। এবার উপায়ান্তর না দেখে দাউদ খান আফগান স্বার্থ রক্ষায় লোদী খানকে এগিয়ে আসতে অনুরোধ পাঠান। লোদী খানের কাছে নিজ স্বার্থের চেয়ে জাতীয় স্বার্থের আবেদন ছিল অধিকতর কার্যকর। ফলে, দাউদ খানের কথা বিশ্বাস করে তিনি তাঁর অনুরোধে সাড়া দেন। শোন নদীর তীরে তিনি বাধা দেন মুগল বাহিনীকে। মুগল অগ্রগতি বন্ধ হয়ে গেল। মুনিম খানের সঙ্গে সন্ধি হলো লোদী খানের। সুপ্রসন্ন হয়ে উঠল দাউদ খানের ভাগ্য। কিন্তু ষড়যন্ত্রকারীদের চক্রান্তে আবার ভুল করলেন দাউদ খান। কতলু খান লোহানী, গুজর খান প্রমুখ আফগান-প্রধান লোদী খানের বিরুদ্ধে দাউদ খান কররানীর কান বিষিয়ে তোললেন। দাউদ খান কররানী এবার লোদী খানকে প্রথমে বন্দী করে পরে হত্যা করেন।

লোদী খানের মৃত্যুর পর আফগানদের মধ্যে দেখা দেয় চরম বিশৃঙ্খলা। দাউদ খানের অমাত্যদের মধ্যে এমন কেউ ছিলেন না, যিনি এই বিশৃঙ্খলা দূর করতে পারেন। এই সুযোগে মুনিম খান আবার ছুটে এলেন বাংলার পথে। শোন নদী অতিক্রম করে পাটনার পথে অগ্রসর হলেন মুনিম খান; আর অনেক সৈন্য-সামন্ত থাকা সত্ত্বেও দাউদ খান কররানী আশ্রয় নিলেন পাটনা দুর্গে। ১৫৭৩ সালের শেষ দিকে পাটনা দুর্গ অবরোধ করলেন মুনিম খান। অবরোধ চলল বহুদিন। ১৫৭৪ সালে সম্রাট আকবর নিজে এলেন পাটনা অবরোধ তদারক করতে। পরিস্থিতি অনুধাবন করে সম্রাট আকবর পাটনা দুর্গের রসদ-সূত্র হাজীপুর জয় করার হুকুম দিলেন। প্রথম আক্রমণেই হাজীপুর চলে আসে মুগল অধিকারে। চরম হতাশা ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে দাউদ খান ও আফগান-প্রধানেরা পালালেন পাটনা দুর্গ থেকে। বিহার থেকে বিতাড়িত হলেন দাউদ খান কররানী।

এবার আরম্ভ হয় দাউদ খান কররানীর পতনের শেষ পর্যায়। এই পর্যায়ে আছে দাউদ খানের সেনানায়ক ও অমাত্যদের বিচ্ছিন্নভাবে বিশাল বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা রাজ্যের নানা স্থানে অবস্থান গ্রহণ, মুগলদের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজয় বরণ ও পলায়ন। দাউদ খান কররানীর অবস্থাও ছিল তা-ই। এই সময়ের মধ্যে দু'টি সময় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার জন্য স্মরণীয় হয়ে

আছে। ১৫৭৫ সালের ৩রা মার্চ উড়িষ্যায় আফগানদের সঙ্গে মুগলদের যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে তুকারায়ের যুদ্ধ বা মুগলমারীর যুদ্ধ নামে খ্যাত। তুকারায় ও মুগলমারী মেদিনীপুর জেলায় দু'টি গ্রাম; দু'টি গ্রামের মধ্যে ব্যবধান আট মাইল। এই আট মাইল বিস্তৃত স্থানেই সংঘটিত হয় এই যুদ্ধ। বাংলার ইতিহাসে এই যুদ্ধ গুরুত্বপূর্ণ এজন্য যে, এ যুদ্ধেই আফগানরা দেশের নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি হারিয়ে ফেলে এবং বাংলায় আফগান স্বাধীনতার অবসান ঘটে।

আর ১৫৭৬ সালের ১২ জুলাই সংঘটিত হয় রাজমহলের যুদ্ধ। এই যুদ্ধে মুগল সেনাপতি ছিলেন খানই-জাহান। আর আফগানদের নেতৃত্বে ছিলেন দাউদ খান কররানী। এ যুদ্ধেও বিজয়ী হয় মুগলবাহিনী। পালাতে গিয়ে দাউদ খানের ঘোড়ার পা কাদায় আটকে যায়। বন্দী হন দাউদ খান কররানী। মুগল আমীরদের দাবি অনুসারে হত্যা করা হয় দাউদ খান কররানীকে।এই সঙ্গে লুপ্ত হয় বাংলায় আফগানদের স্বাধীন সালতানাত।

একাদশতম অধ্যায়

মুঘল সাম্রাজ্যের অধীনে সুবে বাঙ্গালা
(১৫৭৬-১৭১৭ সাল)

লস্কর পরাগল খান-আজ্ঞা শিরে ধরি।
কবীন্দ্র ভারতকথা কহিল বিচারি॥
হিন্দু মুসলমান তাএ ঘরে ঘরে পড়ে।
খোদা রছুলের কথা কেহ ন সোঙরে॥
গ্রহ শত রস যোগে অব্দ গোঙ্গাইল।
দেশী ভাষে এহি কথা কেহ ন কহিল॥
(সৈয়দ সুলতান (১৫৫০-১৬৪৮ খৃঃ) রচিত 'শব-ই-মিরাজ'
গ্রন্থের প্রারম্ভিক অনুচ্ছেদের অংশ)

মালিনী, বোলসি অনুচিত বাণী।
ধরম ন চাওসি ত্যজি সতীত্ব মতি
লোর প্রেম করাওসি হানি॥
....
দুরন্ত দুর্মতি দূতীপনা দূর কর
চিন্তহ মোহোর কল্যাণং।
কাজী দৌলত ভণে দাতা মনোভব মনে
শ্রীযুত আশারফ খানং॥
(দৌলত কাজী রচিত 'সতী ময়না ও লোর-চন্দ্রানী' থেকে উদ্ধৃত)

সুচারু রোসাঙ্গ স্থান, নানা জাতি শোভমান,
শ্রীচন্দ্র সুধর্ম্ম নরপতি।
অস্ত্রে শস্ত্রে সুপণ্ডিত, ব্রতকর্ম্মে সুরচিত,
খলনাশ দুঃখিতের গতি।
(মহাকবি আলাওল (আনুমানিক ১৬০৭-১৬৮০ খৃঃ)
রচিত 'সেকান্দারনামা' থেকে উদ্ধৃত)

যে সবে বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী।
সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি
দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে ন জুয়ায়।
নিজ দেশ ত্যাগী কেন বিদেশে ন যায়॥
মাতা পিতামহ ক্রমে বঙ্গেত বসতি।
দেশী ভাষা উপদেশ মনে হিত অতি॥
(কবি আবদুল হাকীম (আনুমানিক ১৬২০-১৬৯০ খৃঃ)
রচিত 'নূরনামা'র অংশ)

১১

বিজয়-উদ্বুদ্ধ চাকতাই-তুর্কীরা যখন দিল্লী-সালতানাতের কেন্দ্রভূমিতে আঘাত হানল, তখন তাদের শৌর্য-প্রভায় উদ্ভাসিত নতুন দিনে সচকিত হয়েই উঠল না শুধু এই উপমহাদেশের জীবনধারা, চঞ্চলও হয়ে উঠল নতুনত্বের আগমনে। এক দ্রুত পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় তা সম্পূর্ণভাবে বদলে দিল বাংলার মুসলিম জনসাধারণের 'জাতীয়' চরিত্র আর ধ্বংস করে দিল উড়িষ্যার রাজনৈতিক জীবন। এই পরিবর্তনের প্রচণ্ড সংঘর্ষণের ফলে আফগান শাসকরা ছিটকে পড়লেন লোদী সাম্রাজ্যের পূর্ব প্রান্তে। বাদশা বাবরের চার বছরের ব্যস্ত শাসনকালে এবং বাদশা হুমায়ুনের প্রথম পর্যায়ের দশ বছরের গোলযোগপূর্ণ রাজত্বকালেও আফগান শাসকরা তাঁদের পিছিয়ে পড়ার প্রক্রিয়ায় বাংলায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হন নি; কারণ, শের শাহ্‌র অভ্যুদয়ের আগে পর্যন্ত আফগান শাসকদের জন্য বিহার ছিল পূর্বাঞ্চলের শেষ প্রতিরোধ লাইন।

"It was Sher Shah who first read the future aright, and in his far-sighted political wisdom decided to make Bengal, with its proverbial wealth as a support and its equally proverbial bad climate as a barrier, the citadel of the last Afghan power, with the province of Bihar forming a shield on its western border. The forts of Rohtas and Chunar and his own revived city of Patna, — on the strategic point where the Ganges the Gandak and the Son meet together, entirely dominating the great river highway, — formed a screen of the strongest defensive power. If to these Jaunpur could be added, Bengal's western line of defence would run almost up to the Himalayas."[১]

শের শাহ্ বাংলার রাজধানীর নিয়ন্ত্রণ লাভ করেন ১৫৩৮ সালে আর বাংলার শেষ আফগান শাসক রাজ্যের অধিকার মুগলদের হাতে তুলে দেন ১৫৭৬ সালে; এবং শেষ স্বাধীন আফগান প্রধান খাজা উসমান সিলেটে প্রতিরোধ সংগ্রামে নিহত হন ১৬১২ সালে। ১৫৩৮ সাল থেকে এই সময়টুকুর মধ্যে বাংলা ছেয়ে যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্ত অধিপতিদের দ্বারা। উত্তর ভারত থেকে ছিটকে পড়া আফগান প্রধান এবং মুগলদের হাতে রাজ্যহারা বাংলার আফগান রাজরাজড়াদের বংশধরেরাই সৃষ্টি করেন এসব সামন্ত জনপদ। তারপর এসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আফগান শক্তিও উৎখাত হয়ে যায় বাংলা থেকে।

১. Sir Jadunath Sarkar, History of Bengal, Vol II, The University of Dacca, 1972, P. 187.

"Mughal conquest opened for Bengal a new era of peace and progress. It re-established that contact with upper India,— and through upper India by the land-route with the countries of Central Asia and Western Asia,— which Bengal had lost first when Buddhism became dead in the land of its birth and next when its Muslim viceroys threw off the overlordship of Delhi."[২]

ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকারের মতে, মুগল বিজয়ের আগে পর্যন্ত বেশ কয়েক শ' বছর বহির্বিশ্ব থেকে বাংলা ছিল অনেকটা বিচ্ছিন্ন এবং স্যার সরকারেরই মতে, এই বিচ্ছিন্নতার অবসান সূচিত হয় মুগল বিজয়ের পর, যখন মুগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় বাংলা।

"The imperial peace which had by this time settled on Bengal led to an immense increase of this province's maritime trade, but almost entirely through European agency. Thus Bengal gained a second line of free communication with the vast outer world, while officials, scholars, preachers, traders, artisans and soldiers continued to flock by the land-route from the heart of the Mughal empire into what had now become a regular well-administered province of that empire..... The renaissance which we owe to English rule early in the 19th century had a precursory,—a faint glimmer of dawn, no doubt,—two hundred and fifty years earlier. These were the fruits, the truly glorious fruits, of Mughal peace."[৩]

এখানে প্রশ্ন জাগতে পারে, মুগল বিজয়ের আগে পর্যন্ত সত্যিই বাংলা স্বাধীনতা লাভের কারণে বহির্বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল ? স্বাধীন বাংলার পররাষ্ট্র সম্পর্ক বিষয়ে স্যার যদুনাথ সরকারের পরবর্তী ঐতিহাসিক শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্য হচ্ছে, স্বাধীন বাংলার ইলিয়াস শাহী বংশের তৃতীয় সুলতান গিয়াস-উদ-দীন আজম শাহ্ ভারতবর্ষেরই জৌনপুর রাজ্যের সুলতানের কাছে উপঢৌকন স্বরূপ হাতী পাঠিয়েছিলেন। "এই হাতী প্রেরণ বশ্যতা স্বীকারের নিদর্শন নয়, সমকক্ষ রাজা হিসাবে উপহার দান। ..... দ্বিতীয় যে বিদেশী রাজার কাছে গিয়াস-উদ-দীন দূত ও উপহার পাঠিয়েছিলেন, তিনি সুদূর চীনদেশের সম্রাট 'মিং' বংশীয় য়ুং-লো। চীন দেশের বিভিন্ন ইতিহাস গ্রন্থ থেকে গিয়াস-উদ-দীনের এই দূত প্রেরণের কথা জানা যায়।"[৪] সুলতান গিয়াস-উদ-দীন আজম শাহ্‌র এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেছিলেন রাজা গণেশ, সুলতান জালাল-উদ-দীন মুহম্মদ

২. ibid, P. 188.

৩. ibid, PP. 188—189.

৪. শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায়, বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৮০ পৃ. ৭৫।

শাহ্ প্রমুখ শাসক। অধিকন্তু, সুলতান জালাল-উদ-দীন মুহম্মদ শাহ্ মিসরের সুলতান ও বাগদাদের খলীফার কাছেও দূত পাঠিয়ে তাঁদের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন।

বহির্বিশ্বের সঙ্গে বাংলার বাণিজ্য সম্পর্কে সুলতানী আমলের কতিপয় বিদেশী পর্যটকের বিবরণী থেকে কিছু উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে। ১৩৪৯-৫০ সালে রচিত চীনা গ্রন্থ 'তাও-য়ি-চি-লিয়েহ্'-তে লেখক ওয়াং তা-ইউয়াল বাংলাদেশের বর্ণনায় বলেন, "এদেশের উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আমাদের চীনদেশের মত তুলার বস্ত্র– যেমন পি-পু, কাও-নি-পু এবং তু-লো-কিন; আর (উল্লেখযোগ্য দ্রব্য) মাছরাঙার পালক। বাণিজ্যের জন্য এইসব জিনিস ব্যবহৃত হয়– দক্ষিণের ও উত্তরের রেশম, রঙীন তফেতা, জায়ফল– নীল ও সাদা, সাদা চীনামাটির জিনিসপত্র, সাদা সুতা (বা ফিতা) এবং এই ধরনের আরও সব জিনিস।"[৫] পঞ্চদশ শতকের প্রথম দিকে মা হোয়ান বা কুও হুং-লি লিখেন, "বাংলার ধনীরা জাহাজ তৈরী করে, যা দিয়ে এরা বিদেশী জাতিগুলির সঙ্গে বাণিজ্য চালায়।"[৬] ঐ সময়কারই রচিত গ্রন্থ 'শিং-ছা-শ্যাং-লান'-এ ফেই শিন লিখেছেন, "এদেশের স্বাভাবিক উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে সূক্ষ্ম বস্ত্র (মসলিন), সাহ-হ-ল্ (শাল), কম্বল, তু-লো-কিন, নানা রকম কাপড়, স্ফটিক, গোমেদ, প্রবাল, মুক্তা, দামী পাথর, চিনি, ঘি, ময়ূরের পালক প্রভৃতির নাম করা যায়। এদেশ থেকে সোনা, রূপা, সাটিন, রেশম, নীল ও সাদা রঙ্গের পোর্সিলেন, পিতল, লোহা, চন্দন, সিঁদুর, পারদ এবং মাদুর রপ্তানী হয়।"[৭]

প্রাচীন বাংলায়ও ব্যবসা-বাণিজ্যের বিশেষ প্রসার ছিল বলে জানা যায়। বিদেশেও রপ্তানী হতো বাংলার উৎপন্ন দ্রব্য। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে উল্লিখিত হয়েছে যে, বাঙ্গালী বণিকেরা দক্ষিণ ভারতের সমুদ্রোপকূল ধরে গুজরাট পর্যন্ত তাদের পণ্য সম্ভার নিয়ে যেতেন। নিয়ে যেতেন পান-সুপারি-নারকেল। বিনিময়ে নিয়ে আসতেন মাণিক্য-মরকত শঙ্খ। আরও আরও পণ্য সামগ্রীর উল্লেখ রয়েছে এই সময়কার বাংলা সাহিত্যে। গুজরাট থেকে গৌড়ে এবং বারানসী থেকে পুণ্ড্রবর্ধনে চলত স্থলপথের বাণিজ্য। একদিকে উত্তর রাঢ় ও পুণ্ড্রবর্ধন, অন্যদিকে সমতট-তাম্রলিপ্তির সঙ্গে কামরূপের যোগাযোগের জন্য যে রাস্তা ছিল, তা দিয়েই হতো বণিকদের আনাগোনা। বাংলার সামুদ্রিক বাণিজ্যের প্রধান বন্দর ছিল গঙ্গাবন্দর ও তাম্রলিপ্তি।

কিন্তু সেই প্রাচীন কাল এবং সুলতানী আমলের মধ্যকার সময়টাতে বাংলার এই বাণিজ্যে ভাটা পড়েছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। "অষ্টম শতকের গোড়া থেকেই

৫. প্রাগুক্ত, একাদশ অধ্যায়, পৃ. ৩১৯।
৬. প্রাগুক্ত, একাদশ অধ্যায়, পৃ. ৩২৩।
৭. প্রাগুক্ত, একাদশ অধ্যায়, পৃ. ৩৩১।

পূর্ব-ভূমধ্যসাগর থেকে আরম্ভ করে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত বৈদেশিক সামুদ্রিক ব্যবসা-বাণিজ্য আরব ও পারসিক বণিকদের হাতে চলে যেতে আরম্ভ করে। পশ্চিম ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের অন্যতম আশ্রয় সিন্ধুদেশ আরব বণিকের দখলে চলে গেল। রোম সাম্রাজ্যের ধ্বংসের ফলে ভূমধ্যসাগরীয় ভূখণ্ডে ভারতীয় শিল্প ও গন্ধদ্রব্যের চাহিদাও গেল কমে। পূর্ব ভারতে তাম্রলিপ্তি বন্দরও একাধিক কারণে বন্ধ হয়ে গেল। এরপর পাঁচ–ছশো বছর ধরে সামুদ্রিক বাণিজ্যে বাংলাদেশের তেমন কোন স্থান নেই।"[৮]

সামুদ্রিক বাণিজ্যে নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতার এই পরিবর্তন ছাড়াও আভ্যন্তরীণ কারণও বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্যের পতনে যথেষ্ট ক্রিয়াশীল ছিল। সপ্তম শতকের মাঝামাঝি থেকে অষ্টম শতকের মাঝামাঝি– এই শতবর্ষ ছিল বাংলার জন্য মাৎস্যন্যায় বা অরাজকতার কাল। স্বাভাবিকভাবেই তখন "মাৎস্যন্যায়ের এই একশো বছরে শান্তি-শৃঙ্খলার অভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা বেজায় কাহিল হয়ে পড়ল। বাংলাদেশের মুদ্রাজগৎ থেকে সুবর্ণমুদ্রা একেবারেই উধাও হয়ে গেল। সামুদ্রিক বন্দর তাম্রলিপ্তির সৌভাগ্যসূর্য চিরতরে অস্তমিত হলো। স্ব স্ব প্রধান সামন্তরাই ছিলেন এ যুগের নায়ক। ধর্ম ও সংস্কৃতির দিক থেকে এই একশো বছরের দুর্দিন-দুর্যোগের সুযোগে বাংলাদেশে বড় রকমের রূপান্তর ঘটছিল বলে মনে হয়।"[৯] মাৎস্যন্যায়ের দুর্যোগ কাটিয়ে বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হলো পাল শাসন। এই পাল আমলের স্থিতিশীল রাষ্ট্রীয় অবস্থায় দু'টি বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তার একটি হচ্ছে বাংলায় সামন্ততন্ত্রের সূত্রপাত এবং অন্যটি হচ্ছে– বৌদ্ধধর্মাবলম্বী পাল আমলেও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রসার ও ব্রাহ্মণ্যবাদীদের আধিপত্য বিস্তার। সামন্ততন্ত্রের পাশাপাশি তখন আমলাতন্ত্রেরও প্রতিষ্ঠা লগ্ন এসে যায়। "শিল্পী-বণিক-ব্যবসায়ী সমাজের প্রভাব-প্রতিপত্তি এই যুগের রাষ্ট্রে ও সমাজে তেমন ছিল না। কর্মচারীদের তালিকায় দেখা যায় ভূমি ও কৃষি সংক্রান্ত রাজপদই বেশি। বর্ণ-ব্রাহ্মণ্য সমাজে বণিক-ব্যবসায়ী শিল্পীদের স্থান তেমন উঁচুতে ছিল না। সমাজে এই যুগে ভূমি ও কৃষি নির্ভরতা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে দেখা যায়। ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায়, রাজপদোপজীবী, মহত্তর, কুটুম্বের দল—সবাই ভূমিনির্ভর। যে সমাজে জমিই জীবিকার প্রধান উপায় এবং জমির ওপর যেখানে ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকৃত, সেখানে সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা গড়ে ওঠাই স্বাভাবিক।"[১০]

---

৮. ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়-এর 'বাঙালীর ইতিহাস (আদি পর্ব)'-এর সংক্ষিপ্ত সংস্করণ সুভাষ মুখোপাধ্যায় রচিত বাঙালীর ইতিহাস, ১৯৬০, পৃ. ৪৬–৪৭।

৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩।

১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩।

অতঃপর পাল-আমলের অবসানে বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হলো সেন শাসন। এই শাসনামলে "সমাজ ক্রমশ ভূমি-নির্ভর ও কৃষি-নির্ভর হয়ে পড়েছে। রাষ্ট্রের সামাজিক দৃষ্টি যত সংকীর্ণ হয়েছে, আমলাতন্ত্রের তত বিস্তার হয়েছে। রাজার সর্বময় কর্তৃত্ব বেড়েছে। রাষ্ট্রযন্ত্রে ব্রাহ্মণ-পুরোহিতেরা আসন জাঁকিয়ে বসেছে। শিল্পী, বণিক, ব্যবসায়ীরা সেন আমলে সমাজের নীচের স্তরে নেমে গেছে। .... বাংলার রাষ্ট্র ও সমাজ এই যুগে ভেদবুদ্ধিতে আচ্ছন্ন, স্তরে উপস্তরে দুর্লংঘ্য প্রাচীরে বিভক্ত। রাজসভার চরিত্রবল ও আত্মশক্তির অভাব। ধর্ম ও সমাজ বিলাস-ব্যসনে মশগুল। শিল্প ও সাহিত্য বাস্তবতা হারিয়ে ফাঁকা উচ্ছ্বাস, অত্যুক্তি ও দেহসর্বস্বতায় ভরে উঠেছে। জনসাধারণের দেহমন বৌদ্ধ বজ্রযান-সহজযান প্রভৃতির এবং তান্ত্রিক সিদ্ধাচার্য-ডাকিনী-যোগিনীদের অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ড ও তুক্-তাকে পঙ্গু। উচ্চতর বর্ণসমাজ ব্রাহ্মণ্য পুরোহিততন্ত্র ও ব্রাহ্মণ্য রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্বে আড়ষ্ট।

এরপর বখ্‌ৎ-ইয়ারের নবদ্বীপ জয় এবং একশো বছরের মধ্যে সারা বাংলাদেশ জুড়ে মুসলমান রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা মোটেই আকস্মিক ঘটনা নয়। সেন আমলে রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধোগতিরই অনিবার্য পরিণাম।"[১১]

মুসলিম আমলে বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্য যে আবার প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল, ইতিহাস তার সাক্ষী। আর এ তো স্বাভাবিক যে বাংলায় মুসলিম রাষ্ট্রশক্তি প্রতিষ্ঠিত হবার পর আগে থেকেই বাণিজ্যরত মুসলিম বণিকেরা বর্ধিত উৎসাহ-উদ্দীপনায় তাদের কর্ম-পরিধি বাড়িয়ে দেবেন।

"With the coming of the Muslims Bengal was indeed drawn into the main stream of an extensive international trade then almost exclusively in the hands of the Arabs, Persians and Turks. They were also in control of not only the land routes but also the sea-routes till the end of the sixteenth century. There is evidence showing that a number of those traders came to Bengal even during the time of Ikhtyar al-Din Bakhtiyar Khalji, almost immediately after his conquest of Nadia. When the Muslim rule was consolidated in Bengal a great many Muslim merchants settled in Bengal and engaged themselves in trade and commerce."[১২]

মুগল বিজয়ের আগে বাংলার সুলতানী আমলের ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা বিদেশী পর্যটকবৃন্দ যা উল্লেখ করেছেন, তার উদ্ধৃতি এই অধ্যায়ের প্রথম দিকেই দেওয়া

১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮।

১২. Dr. Muhammad Mohar Ali, History of the Muslims of Bengal, Vol. IB, Imam Muhammad Ibn Sa'ud Islamic University, Riyadh, 1985, p. 936.

হয়েছে। সব মিলিয়ে দেখলে এ সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে হয় যে, মুগল বিজয়ের আগে অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়কালে বাংলাদেশ বহির্বিশ্ব থেকে বেশ কিছুটা বিচ্ছিন্ন থাকলেও মুগল-পূর্ব মুসলিম শাসনামলে এই বিচ্ছিন্নতা মোটেই অস্তিত্ববান ছিল না। সুলতানী আমলের স্বাধীন 'বাঙ্গালা' ব্যবসা-বাণিজ্যে এবং পররাষ্ট্রের সঙ্গে সংযোগ রক্ষায় মুক্ত ও সবলমনা যে কোন স্বাধীন দেশের মতই পদক্ষেপ নিয়েছিল। হ্যাঁ, একথাও সত্য যে, আলোচ্য সময়ের শেষ দিকটায় সামুদ্রিক আধিপত্য ইউরোপীয় বণিকদের হাতে চলে যেতে থাকে।

"But with the spening of the 16th century this sea-borne traffic was endangered and all but stopped. Goa became the seat of a European Power planted on the Indian Soil (1510) and the Portuguese fleet soon imposed its dominance on the Indian Ocean, subjecting Arab and African, Indian and Malay ships to harassment and tribute — —. This all but scared away the entire Asiatic trade with Bengal by the sea-route."[১৩]

এ তো ওই আমলে স্বাধীন বাংলার অক্ষমতার পরিচায়ক, বহির্বিশ্বের সঙ্গে তার বিচ্ছিতার নয়। অবশ্য মুগল সাম্রাজ্য স্থাপিত হওয়ার পর ইউরোপীয় বণিকদের এই দৌরাত্ম্য থেমে যায়, কিন্তু ইউরোপীয় বণিকদের অস্তিত্ব ও তার ফলাফল মুগল সাম্রাজ্যের পতনের কালে তা সর্বগ্রাসী সর্বনাশ রূপে দেখা দেয়নি কি?

"Thus Bengal gained a second line of free communication with the vast outer world, while officials, scholars, preachers, traders, artisans and soldiers continued to flock by the land-route from the heart of the Mughal empire into what had now become a regular well-administered province of what empire. The return current, generated by the same Imperial peace and regular administration, was represented by the Vaishnav pilgrims and teachers who went from Bengal to Vrindavan, and beyond Vrindavan even to Jaipur and Kurukshetra; and also by the much thinner stream of Bengal candidates' for the public service or ambitious cadets of landed families or discontented litigants defeated in the provincial law courts who sought to improve their fortunes by a visit to the royal court at Agra and Delhi."[১৪]

---

১৩. Sir Jadunath Sarkar, History of Bengal, Vol. II, The University of Dacca 1967, p. 188.

১৪. Ibid, P. 189.

কিন্তু সুলতানী আমলেও তো এমনি 'যাতায়াত' শুধুমাত্র বৃন্দাবন-জয়পুর-কুরুক্ষেত্রে কেন, ভারতবর্ষের সীমানা ছাড়িয়ে মধ্য এশিয়া, মালয়াদি দ্বীপদেশসমূহেও ঘটেছিল! এই 'যাতায়াত' মুগল আমলেও অব্যাহত ছিল। তাবকাত-ই-নাসিরী, ফিরিশ্‌তা প্রভৃতি থেকে উদ্ধৃতি তুলে ধরে খোন্দকার ফযলে রাব্বি বলেন ঃ

"It will be manifest from the citations made successively in the preceding pages, from various historical works, that owing to the disruption of the Kingdoms of Arabia, Iran, Turkistan and Khorasan, the high and low people of those realms came mostly to India .... Most of such refugees flocked to Delhi. It has also been shown that during the reigns of the Ghori, Khilji, Tughlak, Syyad, Lodi and Mughal emperors, people continued to come into Bengal from Delhi and other parts of India ... the former rulers of Bengal, during their successive reigns, directed their best endeavours to induce men belonging to their own race and creed to come from all parts of the world and settle in their dominions. This state of things prevailed throughout the very long period that the kingdom of Gaur subsisted ; but on the dissolution and disruption of this kingdom at the establishment of the Mughal dominion, Gaur became involved in the general ruin."[১৫]

সুলতানী আমলে বাংলার সঙ্গে অন্যান্য দেশের যোগাযোগ ও বিভিন্ন প্রতিভার গমনাগমনের দৃষ্টান্ত ইতিহাসের অনেক পাতায় ছড়িয়ে আছে। সুতরাং মুগল-পূর্বকালে বহির্বিশ্বের সঙ্গে বাংলার বিচ্ছিন্নতার কথা প্রসঙ্গে স্যার সরকারের সঙ্গে অনেকেই দ্বিমত পোষণ করতে পারেন। তবে বাংলাসহ গোটা ভারতের এক দেশ হিসাবে তার গুরুত্ব আর একটি স্বাধীন জনপদ হিসাবে বাংলার গুরুত্বে তারতম্য নিশ্চয়ই হবে। এই তারতম্য যেমন বৃহত্তের দিক থেকে, তেমনি শক্তির দিক থেকে। কিন্তু আয়তনে অনেক ক্ষুদ্র হলেও এবং শক্তিতে অনেক দুর্বল হলেও স্বাধীন বাংলা তখন যে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তার মূল্য যে অসীম। তাছাড়া, স্বাধীনতা কোন জনপদকে শুধুমাত্র মর্যাদাই দান করে না, তার অর্থনৈতিক ভিত্তিও সুদৃঢ় করে। বাংলার সম্পদ বাংলায়ই পুরোপুরি ব্যয়িত হয়েছিল তার স্বাধীনতাকালেই, বিশাল দিল্লী-সাম্রাজ্যের অধীনতাকালে নয়। অধীনতাকালে বাংলার সম্পদের সিংহভাগই ব্যয়িত হয়েছে দিল্লী কর্তৃপক্ষের প্রয়োজন মেটাতে।

---

১৫. Khondkar Fuzli Rubbee, The Origin of the Musalmans of Bengal, published in the Journal of the East Pakistan History Association, 1968, p. 24-25.

১৫৭৬ সালে সম্রাট আকবর বাংলাকে নামেমাত্র মুগল সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। কররানী বংশের অবসানে বাংলার স্বাধীনতা রক্ষায় বা তার পুনঃপ্রতিষ্ঠায় কোন সর্বস্বীকৃত রাজবংশ নেতৃত্বে না থাকলেও কার্যত সম্রাট আকবর বাংলার সামান্য অংশের উপরই পূর্ণ কর্তৃত্ব স্থাপন করতে পেরেছিলেন। বাংলার বাদবাকি অংশে তখনও স্বাধীনভাবেই শাসন কার্য পরিচালনা করছিলেন আফগান সর্দারেরা এবং বাংলার পাঠান ও হিন্দু জমিদারেরা। এইসব পাঠান ও হিন্দু জমিদার আপন আপন স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আকবর ও জাহাঁগীরের সেনানায়কদের সঙ্গে দীর্ঘদিন যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। আকবরের রাজত্বের শেষ ২৯ বছর এবং জাহাঁগীরের রাজত্বের প্রথম ৭ বছর– মোট ৩৬ বছরের সুদীর্ঘ কাল ছিল স্বাধীনতাপ্রিয় পাঠান ও হিন্দু প্রধানদের সঙ্গে মুগল সেনানায়কদের খণ্ডযুদ্ধের কাল। এইসব পাঠান ও হিন্দু জমিদারগণই ইতিহাসে 'বার ভুঁইয়া' নামে পরিচিত। সংখ্যায় তাঁরা বার জনই ছিলেন না এবং তাঁদের অধিকাংশ ছিলেন মুসলমান।

৫৯. সুবাদার হোসাইন কুলী (১৫৭৫–১৫৭৮ সাল)

শাসনতান্ত্রিকভাবে মুগল সাম্রাজ্য বিভক্ত ছিল কয়েকটি সুবায়। সেই সুবাদে সুবার শাসনকর্তাগণ অভিহিত হতেন সুবাদার নামে। বাংলায় প্রথম মুগল সুবাদার ছিলেন হোসাইন কুলী। এই দায়িত্বে তিনি নিযুক্ত ছিলেন ১৫৭৮ সাল পর্যন্ত। তাঁর পরবর্তী সুবাদারগণের নাম ও বন্ধনীর মধ্যে তাঁদের কার্যকাল দেওয়া হল নিচে ঃ

৬০. সুবাদার মুজাফ্ফর খান তুরবতী (১৫৭৯–১৫৮০ সাল)

৬১. সুবাদার খান-ই-আযম মির্যা আযীয কোকাহ্ (১৫৮১–১৫৮৩ সাল)

৬২. সুবাদার শাহবায খান (১৫৮৩–১৫৮৫ সাল)

৬৩. সুবাদার সাদেক খান (১৫৮৫–১৫৮৬ সাল)

৬৪. সুবাদার ওয়াযির খান (১৫৮৬–১৫৮৭ সাল)

৬৫. সুবাদার সাঈদ খান (১৫৮৭–১৫৯৪ সাল)

৬৬. সুবাদার রাজা মানসিংহ (১৫৯৪–১৬০৬ সাল)

৬৭. সুবাদার শেখ কুতবুদ্দীন খান কোকাহ্ (১৬০৬–১৬০৭ সাল)

৬৮. সুবাদার জাহাঁগীর কুলী (১৬০৭–১৬০৮ সাল)

৬৯. সুবাদার ইসলাম খান (১৬০৮–১৬১৩ সাল)

এই সুবাদারদের সকলেই বাংলা জয়ে ব্যস্ত ছিলেন। একটি প্রদেশের শাসনকর্তা বলতে যা বোঝায়, তাঁদের প্রায় কেউই তা ছিলেন না বলা যায়। শাসনকর্তার দায়িত্বের মধ্যে প্রদেশবাসীর সর্বরকম উন্নয়ন বিধানের দায়িত্বটি অন্যতম। শান্তির সময় ছাড়া সে দায়িত্ব পালন করার প্রশ্নটা খুবই জটিল। এইসব সুবাদারের প্রধানতম দায়িত্ব ছিল–

স্বাধীনতাপ্রয়াসী, বিজয়ী মুগলদের দৃষ্টিতে 'বিদ্রোহী'দের শান্তিনাশ প্রচেষ্টাকে দমন করা এবং রাজ্যময় মুগল-কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত ও সুসংহত করা। উপরোক্ত ৩৬ বছরে মুগলদের দ্বারা বাংলা বিজয় সম্পূর্ণতার পথে এগিয়ে যাচ্ছিল। সুবাদার ইসলাম খানই বাংলা জয় সম্পূর্ণ করেন এবং তিনিই ভুঁইয়া ও আফগান সর্দারদের স্বাধীনতা-প্রয়াসকে ধূলিসাৎ করে দিয়ে বাংলায় মুগল-শক্তিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। এখানে সেই স্বাধীনতা প্রয়াসের একটা রূপরেখা তুলে ধরা যেতে পারে। বাংলার স্বাধীনতার জন্য যেসকল বীর যোদ্ধা মুগলদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে সর্বপ্রধান ছিলেন ঈসা খান। বাংলার ইতিহাসে খ্যাত বার ভুঁইয়াদের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। মুগল সাম্রাজ্যের তদানীন্তন প্রধান সেনাপতি রাজা মানসিংহ জীবনে দুই ব্যক্তির উচ্চশির নত করতে পারেন নাই। তাঁদের একজন চিতোরের রাণা প্রতাপ সিংহ, অন্যজন বাংলার ঈসা খান। ঈসা খান তাঁর অসাধারণ প্রজ্ঞা, সাহস, রণদক্ষতা ও কৌশলের সাহায্যে বাংলায় এক উল্লেখযোগ্য শক্তিস্তম্ভে পরিণত হন। উত্তরবঙ্গ থেকে আরম্ভ করে ত্রিপুরার সরাইল পর্যন্ত বিস্তৃত তাঁর ভাটি রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল বর্তমান ঢাকা জেলার অর্ধাংশ, প্রায় সমগ্র ময়মনসিংহ জেলা এবং পাবনা-বগুড়া-রংপুর জেলাসমূহের অংশবিশেষ। এই ভাটি রাজ্যের স্বাধীন শাসক ছিলেন ঈসা খান। ঢাকা জেলার পূর্ব-দক্ষিণ অঞ্চল এবং দুলাই নদী ও লক্ষ্যা নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত খিজিরপুর দুর্গ ছিল তাঁর শক্তির প্রধান কেন্দ্র। ঈসা খানের রাজধানী ছিল খিজিরপুরের প্রায় তের মাইল পূর্বে এবং বর্তমান ঢাকার নয় মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত সোনারগাঁও-এ। এই নগর ছিল বিশেষভাবে সুরক্ষিত। বর্তমান নারায়ণগঞ্জের অপর তীরে কদমরসুলে অবস্থিত ছিল ঈসা খানের অন্য একটি দুর্গ। খিজিরপুরের বিপরীত দিকে লক্ষ্যা নদীর তীরে কাতরাবু নামক স্থানে ছিল ঈসা খানের বাসস্থান। তখনকার পদ্মা, ধলেশ্বরী ও ইছামতীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত যাত্রাপুরেও প্রতিষ্ঠিত ছিল তাঁর অন্য একটি দুর্গ।

মুগল সুবাদার খান-ই-জাহান হোসাইন কুলী বেগ ১৫৭৫ সালে দাউদ খান কররানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বাংলা অধিকারের পথ সুগম করতে আসেন। ঈসা খান সে সময়ে মুগল নৌ-সেনাপতি শাহ্ বরদীর রণতরীগুলোকে পূর্ববঙ্গের নদী থেকে তাড়িয়ে দেন। খান-ই-জাহান নিজে ঢাকার উত্তরে অবস্থিত ভাওয়াল পর্যন্ত আসেন। মুগলেরা এগারসিন্ধুরের নিকটে এক যুদ্ধে ঈসা খানকে পরাস্ত করলে ঈসা খান নিরাপদ স্থানে সরে পড়েন। অতঃপর আবার অতর্কিতভাবে আক্রমণ করে মুগল রণতরীগুলোকে বিধ্বস্ত করে দেন।

পরবর্তীতে মুগল সুবাদার শাহ্বায খান মাসুম কাবুলীকে ধরার জন্য ঈসা খানের রাজ্যে প্রবেশ করেন। শাহ্বায খান সোনারগাঁও নগরেও প্রবেশ করেন এবং কাত্রাবু লুণ্ঠন করেন। তারপর দখল করেন এগারসিন্ধুর। এদিকে অন্যত্র মুগল সেনাপতি

তারসুন খান ঈসা খানের বাহিনীর হাতে পরাজিত ও নিহত হন। সাত মাস কাল যাবত শাহ্বায খান ঈসা খানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যান ও মাসুম কাবুলীকে তার হাতে অর্পণ করার দাবি জানান। ঈসা খান নানা অজুহাতে সময় কাটাতে থাকেন। ইতিমধ্যে তিনি ঢাকার মুগল কর্মচারী সাইদ হোসেনকে বন্দী করেন এবং তাঁর মাধ্যমে শাহ্বায খানের সঙ্গে সন্ধির প্রস্তাব দেন। কিন্তু তা সফল হয় নাই। অবশেষে ১৫৮৪ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর ভাওয়ালে এক যুদ্ধে ঈসা খান শাহ্বায খানকে পরাজিত করেন। অনেক মুগল সৈন্য ঈসা খানের হাতে বন্দী হয়। শাহ্বায খান তাঁর সমস্ত বিজিত স্থান পরিত্যাগ করে তাণ্ডায় ফিরে যান।

শাহ্বাযের পরাজয় সংবাদে সম্রাট আকবর ঈসা খানকে পদানত করার জন্য বাংলা ও বিহারের সকল কর্মচারীকে এক সঙ্গে মিলিত হয়ে বাংলায় অভিযান চালানোর জন্য নির্দেশ দেন। এদিকে শাহ্বায খানের পরাজয়ের ফলে যেসব হাতী ও অস্ত্রপাতি ঈসা খানের হস্তগত হয়েছিল, সম্রাট আকবরকে শান্ত করার কৌশল হিসাবে ঈসা খান সেগুলো মুগলদের কাছে ফেরত পাঠান।

১৫৯৪ সালে সম্রাট আকবর রাজা মানসিংহকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করেন। বাংলার ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে, বিশেষ করে নৌপথে আক্রমণের হাত থেকে মুগলদের নিরাপদ রাখার উদ্দেশ্যে রাজা মানসিংহ রাজমহলে বাংলার রাজধানী স্থাপন করেন এবং তার নামকরণ করেন 'আকবরনগর' বলে। তারপর সেই রাজধানী থেকে রাজা মানসিংহ ১৫৯৫ সালের ৭ ডিসেম্বর তারিখে ভাটি রাজ্য দখলের উদ্দেশ্যে অভিযান শুরু করলেন। ভাটি রাজ্যের কিছু অংশ মুগলদের হস্তগত হলো। ১৫৯৬ সালের বর্ষাকালে রাজা মানসিংহ অসুস্থ হয়ে ঘোড়াঘাটে অবস্থান করতে লাগলেন। এদিকে ঈসা খান বহু রণতরীসহ রাজাকে আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে ঘোড়াঘাটের পথে অগ্রসর হলেন। রাজার শিবির আর মাত্র ২৪ মাইল দূরে অবস্থিত। কিন্তু নদীর পানি কমে যাওয়ায় আর এগুতে পারল না ঈসা খানের নৌবাহিনী। তিনি ফিরে এলেন।

এদিকে কিছুদিন পর কোচবিহারের রাজা লক্ষ্মীনারায়ণকে আক্রমণ করেন লক্ষ্মীনারায়ণেরই আত্মীয় রঘুদেব; রঘুদেবকে সাহায্য করেন ঈসা খান। এমনি অবস্থায় রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ রাজা মানসিংহের সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং নিজের ভগ্নীকে রাজা মানসিংহের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেন। রাজা মানসিংহ লক্ষ্মীনারায়ণকে সাহায্য করার জন্য সেনাবাহিনী পাঠিয়ে দেন। রঘুদেব পরাজিত হন। কিন্তু মুগল সৈন্যেরা বাংলায় ফিরে আসামাত্রই আবার ঈসা খান তাঁর বাহিনী নিয়ে রঘুদেবের সাহায্যে এগিয়ে যান। এই সংবাদে রাজা মানসিংহ তাঁর পুত্র দুর্জন সিংহকে ঈসা খানের বাসস্থান কাতরাবু আক্রমণের জন্য পাঠালেন। কিন্তু ১৫৯৭ সালের ৫ সেপ্টেম্বর বিক্রমপুর থেকে বার মাইল দূরে ঈসা খানের নৌবাহিনী মুগলবাহিনীকে ঘিরে ফেলল। মানসিংহ-পুত্র দুর্জন

সিংহ ও অনেক মুগল সৈন্য সেই যুদ্ধে নিহত হলো এবং বন্দী হলো অনেক মুগল সৈন্য। কিন্তু সুচতুর ঈসা খান সেসব বন্দী সৈন্যকে মুক্তি দিলেন এবং লক্ষ্মীনারায়ণের বিরুদ্ধে রঘুদেবকে সাহায্য করা থেকে বিরত থাকলেন। তাছাড়া ঈসা খান সম্রাট আকবরের প্রতি আনুগত্যের ইচ্ছাও প্রকাশ করে ভাটি রাজ্যে নিজের আধিপত্য বজায় রাখলেন।

তারপর দীর্ঘকাল ভাটি রাজ্যের স্বাধীনতার জন্য মুগল বাহিনীর বিরুদ্ধে সগৌরবে যুদ্ধ করে ১৫৯৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ঈসা খান স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র মূসা খান হলেন ভাটি রাজ্যের শাসনকর্তা। তিনিও স্বীয় রাজ্যের স্বাধীনতা রক্ষায় মুগলদের মুকাবিলা করতে থাকেন। ওদিকে সম্রাট আকবরের মৃত্যুর পর জাহাঁগীর দিল্লীর মসনদে আরোহণ করেছেন। জাহাঁগীরের রাজত্বের প্রারম্ভে পূর্ববঙ্গে মূসা খানই ছিলেন সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী শাসক। ১৬০২ সালে অবিশ্যি এক নৌযুদ্ধে রাজা মানসিংহ পরাস্ত করেন মূসা খানের বাহিনীকে। ১৬০৩ সালে পূর্ববঙ্গের অন্যতম ভুঁইয়া কেদার রায়ের মৃত্যুর পর তাঁর অধিকৃত স্থানগুলি এবং শ্রীপুর বিক্রমপুরের দুর্গ মূসা খানের হস্তগত হয়।

১৬০৮ সালে সম্রাট জাহাঁগীর শেখ আলাউদ্দীন ইসলাম খান চিশতীকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করে পাঠান। তখনও পূর্ববঙ্গে যাঁরা মুগল প্রভুত্বের বিরুদ্ধে বাধা হয়ে দাঁড়ান, তাঁদের মধ্যে মূসা খান ছিলেন অন্যতম। কিন্তু ইসলাম খান রাজধানী রাজমহল থেকে বিশাল বাহিনী নিয়ে পূর্ববঙ্গের পথে এগিয়ে আসেন। ইফতিখার নামক তাঁর এক সেনানায়কের হাতে পরাজয় বরণ করেন ভূষণার রাজা ছত্রজিত। অন্য এক রাজা প্রতাপাদিত্য বিনা যুদ্ধেই ইসলাম খানের অধীনতা স্বীকার করেন। এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে ইসলাম খান জয় করেন মূসা খানের যাত্রাপুর দুর্গ। ১৬১০ সালের জুলাই মাসের শেষে ইসলাম খান ঢাকায় পৌঁছেন। মুগল বাহিনী একের পর এক জয় করে নেয় মূসা খানের কাত্রাবু দুর্গ, কদমরসুল এবং অবশেষে ভাটি রাজ্যের রাজধানী সোনারগাঁও। রাজা অনন্ত মাণিক্যকে পরাস্ত করে মুগলেরা জয় করে নেয় নোয়াখালীর ভুলুয়া রাজ্য। রাজা প্রতাপাদিত্যের জামাতা রাজা কন্দর্প নারায়ণকে পরাস্ত করে মুগলেরা হস্তগত করে তাঁর বাকেরগঞ্জের বাকলা রাজ্য। এখানে মূসা খানের পরাজয় প্রসঙ্গে বাংলার 'বার ভূঁইয়া'দের সম্পর্কে আলোকপাত করা যেতে পারে। বাংলার 'বার ভূঁইয়া' নামে কথিত মুগল-বিরোধী এইসব স্থানীয় প্রধানের সম্পর্কে নানারকম কথা-কাহিনী প্রচলিত আছে। বিভিন্ন ঐতিহাসিকের মতামত ও প্রমাণাদি বিশ্লেষণ করে সম্প্রতি ডক্টর মোহর আলী বলেন ঃ

"A little careful analysis of the contemporary sources, both Mughal and European, enables us to identify the following

distinguishing features of the 'Bara Bhuiyans.' (a) All the source agree in stating in one form or another that the 'Bara Bhuiyans' were those who rose in Bengal after the fall of the Afghan ruler Da'ud Khan and spearheaded the Afghan resistance to the advance of the Mughals. (b) Secondly, they were allied with one another forming a sort of anti-Mughal confederacy. (c) Thirdly, they were persistent in their hostility towards the Mughals. (d) They followed the lead of 'Isa Khan and, after him, of his son Musa Khan; and (e) they belonged generally to eastern Bengal which was the main theatre of their resistance .... keeping in view these characteristics it may be stated that the other individuals who are found to have carved out an independent existence in their respective localities by taking advantage of the troublous and unsettled conditions of the time but who do not otherwise satisfy all the above mentioned characteristics, should not be counted among the 'Bara Bhuiyans'. Thus Shams Khan and Salim Khan, two powerful chiefs who established themselves in south-west Bengal and were also anti-Mughal in their policies, but who did not follow the lead of 'Isa Khan or Musa Khan, should not be grouped with the 'Bara Bhuiyans.' Similarly Pratapaditya of Jessore, his son-in-law Ram Chandra of Bakla (Barisal), and the latter's adversary Ananta Manikya of Bhulua (Noakhali), who did never really wage a war of resistance against the Mughals but were rather the earliest to submit and cooperate with them, should not be ranked with the 'Bara Bhuiyans'. Pratapditya, Ram Chandra and Ananta Manikya did not also follow the lead of 'Isa Khan and Musa Khan, nor was there a confederate unity between them, Ram Chandra and Ananta Manikya being on hostile terms with each other. They and the other 'Zamindars' who were not allied with Musa Khan have been mistakenly grouped with the 'Bara Bhuiyans' for the reasons indicated above, and also perhaps because the descendants of some of those 'Zamindars' subsequently identified themselves for various reasons with the historic 'Bara Bhuiyans'." [১৬]

'Bengal Past and Present' নামক গ্রন্থে অনুরূপ মত প্রকাশ করে ডক্টর ভট্টশালী বলেন, "As far as I have been able to understand and sift

---

১৬. Dr. Muhammad Mohar Ali, History of the Muslims of Bengal, Vol. IA, Imam Muhammad Ibn Sa'ud Islamic University, Riyadh, PP. 293—294.

historical evidence, I have obtained no proofs to show that Pratapaditya ever fought with the forces of Akbar. Pratapaditya of Jessore and Ananta Manikya of Bhulua appear to have fought the Mughals for the first and last time in 1612 and 1613 in the reign of Jahangir when they had not other recourse but to fight, and they went down in the contest. Mukundaram of Bhushna never fought with the Mughals and Ram Chandra of Bacla submitted on the first onslaught."[১৭]

স্যার যদুনাথ সরকার তো "বার ভুঁইয়া"দের সম্পর্কে আরও অমর্যাদাকর মন্তব্য প্রকাশ করেছেন ! 'A false Provincial patriotism has led modern Bengali writers to glorify the Bara Bhuiyas of Bengal as the champions of national independence against foreign invaders. They were nothing of the sort. Firstly, they were nearly all of them upstarts, who had in their own persons —or one generation earlier— grabbed at some portion of the dissolving Karrani Kingdom of Bengal and set up as masterless Rajas in their different corners of the country, especially in the inaccessible regions of the sea-coast in Khulna and Baqarganj or beyond the mighty barrier of the Brahmaputra in Dacca and the still remoter jungles of north Mymensingh and Sylhet. These mushroom captains of plundering bands have been likened to the hereditary chieftains of the Sisodia and Rathor clans of Rajputana who fought the Mughals in defence of the homes they had bought with the blood of their ancestors through centuries of struggle.

The height of absurdity is reached when our dramatists call Pratapaditya of Jessore as the counterpart of Maharana Protap Singh of Mewar."[১৮]

এতসব মতামতের পরেও বলতে হবে, সুপ্রাচীন রাজবংশের সন্তান না হয়েও এসব বীর প্রবল পরাক্রান্ত দিল্লী বাহিনীর কাছে সানন্দে আত্মসমর্পণ না করে তাদের মোকাবিলা করেছিলেন। এর থেকে ধারণা করা যায়, দেশপ্রেম তাঁদের নিশ্চয়ই কিছুটা ছিল এবং তারই প্রেরণায় দিল্লীর সাম্রাজ্যবাদের থাবা থেকে তাঁরা চেয়েছিলেন বাংলাকে রক্ষা করতে। তাঁরা পরাজিত হয়েছিলেন সত্য, কিন্তু পরাজিত হয়েছিলেন সাম্রাজ্যবাদী দিল্লী বাহিনীর মোকাবিলা করে।

১৭. Dr. Nalini Kanta Bhattasali, Bengal Past and Present, 1928, P. 33.

১৮. Sir Jadunath Sarkar, History of Bengal. Vol. II, The University of Dacca, Second Impression, 1927, P. 225.

ডক্টর আলী মূসা খান ও তাঁর সহযোগী "ভূঁইয়া"দের নামোল্লেখ করেছেন এভাবে ঃ (১) মসনদ-ই-'আলা মূসা খান এবং তাঁর চার ভাই দাউদ খান, আবদুল্লাহ্ খান, মাহ্মুদ খান ও ইলিয়াস খান (রাজ্যসীমা বিস্তৃত ছিল ঢাকা-ময়মনসিংহ-ত্রিপুরা জেলায়); (২) ঢাকা জেলার ভাওয়াল ও চউরা অঞ্চলের অধিপতি বাহাদুর গাজী ও তাঁর পরিবার; (৩) হাজী ভকুল-এর পুত্র শেখ পীর (রাজ্যাঞ্চলের কথা জানা নেই); (৪) পাবনার চাটমোহর এলাকার অধিপতি মাসুম কাবুলী ও তদীয় পুত্র মির্জা মু'মিন; (৫) কেদার রায় (ঢাকা জেলার বিক্রমপুর ও শ্রীপুরের অধিপতি ; কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর সে অঞ্চল মূসা খানের রাজ্যভুক্ত হয়); (৬) পাবনা জেলার খাল্সী এলাকার প্রধান মধু রায়; (৭) ঢাকা জেলার চাঁদ প্রতাপের জমিদার বিনোদ রায়; (৮) সরাইলের উত্তরে মাতঙ্গের প্রধান 'পাহালওয়ান'; (৯) উড়িষ্যার কতলু খান লোহানীর ভ্রাতুষ্পুত্র খাজা উসমান এবং তাঁর পুত্র ও তিন ভাই (ময়মনসিংহ জেলার বোকাইনগর ও পরবর্তীতে সিলেট জেলায় ছিল তাঁর প্রতিরোধ দুর্গ); (১০) সিলেট জেলার বানিয়াচং-এর অধিপতি আনওয়ার খান ও তাঁর ভাই হোসেন খান; (১১) মধ্য ও উত্তর সিলেটের অধিপতি বায়েজীদ কররানী ও তাঁর ভাই ইয়াকুব কররানী; এবং (১২) ফরিদপুর জেলাস্থ ফতেহাবাদের প্রধান মজলিস কুতুব।

"These were the associates and allies of Musa Khan whom Mirza Nathan and other contemporary sources call the 'Bara Bhuiyans."[১৯]

শেষ যুদ্ধে হেরে মূসা খান ও সহযোগী "ভূঁইয়া'গণ মুগলদের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। কিন্তু আত্মসমর্পণ করেননি খাজা উসমান ও তাঁর পরিবারের বীরবৃন্দ।

এদেশে আফগানদের একমাত্র আশা এবং তাদের শ্রেষ্ঠ বীর খাজা উসমান উড়িষ্যা থেকে বিতাড়িত হয়ে ময়মনসিংহের বোকাইনগর অঞ্চলে স্বাধীনভাবে অবস্থান করছিলেন। ঈসা খানের সঙ্গে মিলিত হয়ে তিনি এর আগে রাজা মানসিংহের বিরুদ্ধে নানা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ইসলাম খান এবার তাঁর বিরুদ্ধে এগিয়ে এলেন। বোকাইনগর থেকে মুগলদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে খাজা উসমান দক্ষিণ সিলেটের মৌলবীবাজার অঞ্চলে চলে গিয়ে আবার নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। সেখানেও আক্রমণ চালান সুবাদার ইসলাম খান। এক মরণপণ যুদ্ধে সেখানে মৃত্যুবরণ করেন খাজা উসমান। সেটা ১৬১২ সালে। এভাবে বাংলায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয় মুগল অধিকার।

৭০. সুবাদার শেখ কাসিম খান চিশতী (১৬১৩–১৬১৭ সাল)

কৃতিত্বপূর্ণভাবে কর্তব্য সম্পন্ন করে ইসলাম খান ভাওয়ালে শিকার করতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ১৬১৩ সালের ২১ আগস্ট মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর

১৯. Dr. Muhammad Mohar Ali, History of the Muslims of Bengal, Vol. IA, Imam Muhammad Ibn Sa'ud Islamic University, Riyadh, 1985, PP. 297—298.

বাংলার সুবাদার হন শেখ কাসিম খান চিশতী। তিনি ছিলেন দুর্বলচেতা এবং কিছুটা কলহপ্রিয়। তাঁর আমলে কামরূপ রাজ্যে বিদ্রোহ ঘটে। আসাম, আরাকান ও কাছাড় রাজ্যের বিদ্রোহ দমনে তিনি ব্যর্থ হন।

৭১. সুবাদার ইবরাহীম খান ফতেহ্ জং (১৬১৭–১৬২৪ সাল)

বাংলার এই সুবাদার ছিলেন নূরজাহানের ভাই। উদ্যোগী ও বিচক্ষণ এই সুবাদার ত্রিপুরা জয় করেন, মগদের দমন করেন ও ফিরিঙ্গী জলদস্যুদেরও বাংলার উপকূল থেকে বিতাড়িত করেন। ইবরাহীম খান এত দৃঢ়তা ও বিচক্ষণতার সঙ্গে বাংলা শাসন করেন যে, বহু কাল যাবত বাংলায় আর কোন গোলযোগ সংঘটিত হয় নাই। তাঁর শাসনকালের শেষভাগে সম্রাট জাহাঁগীরের তৃতীয় পুত্র শাহ্যাদা খুররম বিদ্রোহী হয়ে বাংলা আক্রমণ করেন। ইবরাহীম খান তাঁকে প্রতিরোধ করতে গিয়ে নিহত হন।

৭২. সুবাদার দারাব খান (১৬২৪–১৬২৫ সাল)

সুবাদার ইবরাহীম খানকে যুদ্ধে পরাজিত করে শাহ্যাদা খুররম জাহাঁগীরনগরে আগমন করে প্রচুর ধন-সম্পদ হস্তগত করে দারাব খানকে সুবাদারের দায়িত্ব দিয়ে ঢাকা ত্যাগ করেন।

৭৩. সুবাদার মহব্বত খান (১৬২৫–১৬২৬ সাল)

সেনাপতি মহব্বত খাঁর সাহায্যে সম্রাট জাহাঁগীর খুররম কর্তৃক নিযুক্ত সুবাদার দারাব খানকে পরাজিত করে বাংলায় নিজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর মহব্বত খান হন বাংলার সুবাদার। কিন্তু দিল্লী দরবারের ষড়যন্ত্রের ফলে মহব্বত খান বাংলা ত্যাগ করে গিয়ে নিজেও বিদ্রোহী হন।

৭৪. সুবাদার শেখ মুকাররম খান চিশতী (১৬২৬–১৬২৭ সাল)

সুবাদার হওয়ার আগে মুকাররম খান চিশতী বাংলায় একজন রাজকর্মচারী হিসাবে কাজ করে যান। অতঃপর তিনি উড়িষ্যা ও দিল্লীতে প্রাদেশিক শাসনকর্তা হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। এবার বাংলায় শাসনকর্তা হিসাবে কাজ করতে এসে বছর খানেক পরেই ১৬২৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে পানিতে ডুবে মারা যান।

৭৫. সুবাদার মির্জা হেদায়েতুল্লাহ্ ফিদাই খান (১৬২৭–১৬২৮ সাল)

সম্রাট জাহাঁগীরের নিযুক্ত বাংলার শেষ সুবাদার হচ্ছেন এই ফিদাই খান। তিনি ছিলেন একজন সুদক্ষ শাসনকর্তা। কিন্তু ১৬২৭ সালের ২৮শে অক্টোবর সম্রাট জাহাঁগীরের মৃত্যু হলে নতুন সম্রাট শাহ্জাহান কর্তৃক তিনি অপসারিত হন।

৭৬. সুবাদার কাসিম খান জুইনী (১৬২৮–১৬৩২ সাল)

দিল্লীর নতুন সম্রাট শাহ্‌জাহান মীর মুরাদের পুত্র কাসিম খানকে ফিদাই খানের স্থলে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করেন। তিনি ছিলেন নূরজাহানের ভগ্নীপতি এবং দলাদলিতে শাহ্‌জাহান পক্ষীয়। তিনি কামরূপ পুনর্দখল করেন এবং আরাকানী মগদেরকে বাংলা থেকে বিতাড়িত করেন।

৭৭. সুবাদার মীর মহম্মদ বকর আযম খান (১৬৩২–১৬৩৫ সাল)

মীর আযম খানের অপর নাম ছিল ইরাদাত খান। ১৬৩৫ সালের ১২ মার্চ তাঁকে সুবাদারের পদ থেকে অপসারণ করা হয়।

৭৮. সুবাদার ইসলাম খান মাশহাদী (১৬৩৫–১৬৩৯ সাল)

ইসলাম খান মাশহাদী প্রায় চার বছর বাংলার সুবাদার হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর সুবাদারী কালে আসামের অহোম-রাজ্যের সঙ্গে কামরূপের অধিকার নিয়ে সুবাদার মাশহাদীর সংঘাত বাধে। ইসলাম খান মাশহাদী অহোম-রাজকে পরাজিত করে কামরূপের উপর মুগল কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৬৩৮ সালে আরাকান-রাজ নোয়াখালী ও ঢাকা আক্রমণের জন্য অগ্রসর হলে সুবাদার মাশহাদী আরাকান-রাজকে মোকাবিলা করার জন্য এগিয়ে যান। তাতে ভয় পেয়ে আরাকান-রাজ পলায়ন করেন।

৭৯. সুবাদার শাহ্‌যাদা শুজা (১৬৩৯– ১৬৬০ সাল)

সম্রাট শাহ্‌জাহানের পুত্র শাহ্‌যাদা শুজার ২১ বৎসরকাল বাংলা শাসন বিশেষভাবে স্মরণীয়। এই সময়ে বাংলায় দীর্ঘকাল শান্তি বিরাজ করে এবং অর্থনৈতিকভাবেও বাংলার বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়। ১৬৪২ সালে উড়িষ্যা প্রদেশকেও শুজার অধীনে দেওয়া হয়। সম্রাট শাহ্‌জাহানের রাজত্বের শেষদিকে মসনদের উত্তরাধিকার নিয়ে শাহ্‌যাদাদের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হলে শাহ্‌যাদা আওরঙ্গজেব দিল্লীর মসনদে আরোহণ করেন এবং শাহ্ শুজা মীর জুমলার হাতে পরাজিত হয়ে আরাকানে পলায়ন করেন। সেখানে তিনি আরাকান রাজের বিশ্বাসঘাতকতায় করুণভাবে মৃত্যুবরণ করেন।

৮০. সুবাদার মীর জুমলা (১৬৬০–১৬৬৩ সাল)

বাংলার বিচক্ষণ সুবাদারদের মধ্যে মীর জুমলা অন্যতম। তাঁর প্রকৃত নাম মীর মুহম্মদ সাইয়েদ। জন্মস্থান পারস্য থেকে তিনি ভাগ্যান্বেষণে দক্ষিণ ভারতের গোলকুণ্ডা রাজ্যে আগমন করেন। গোলকুণ্ডার সুলতানের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করে নিজ প্রতিভাবলে প্রধানমন্ত্রীর পদ লাভ করেন। অতঃপর তিনি মুগলদের চাকুরীতে প্রবেশ করেন। সম্রাট শাহ্‌জাহানের নিকট থেকে মুয়ায্‌যিম খান উপাধি পেয়ে তিনি উচ্চপদে নিযুক্ত হন। মসনদের উত্তরাধিকার নিয়ে ভ্রাতৃবিরোধের সময় তিনি আওরঙ্গজেবের প্রধান

সেনাপতি পদে নিযুক্ত হয়ে শাহ্যাদা শুজাকে পরাজিত করেন। এরপর সম্রাট আওরঙ্গজেব তাঁকে বাংলার সুবাদার করে পাঠান। সম্রাট কর্তৃক তিনি 'খান-ই-খানান' ও 'সিপাহ্সালার' উপাধিতে ভূষিত হন।

মীর জুমলা তিন বছর কাল বাংলার সুবাদার ছিলেন। এর আগে শাহ্যাদা শুজা কর্তৃক বাংলার রাজধানী রাজমহলে স্থানান্তরিত হয়েছিল। কিন্তু মীর জুমলা রাজমহলের পরিবর্তে রাজধানী আবার জাহাঁগীরনগরে নিয়ে আসেন। কারণ, এখান থেকেই আরাকানী মগ ও পর্তুগীজ জলদস্যুদের দমন করা সহজ ছিল। ১৬৬১ সালে মীর জুমলা কোচবিহার জয় করে তার রাজধানীর নাম রাখেন 'আলমগীরনগর'। আসাম রাজকেও তিনি যুদ্ধে পরাজিত করে আসামের বেশির ভাগ অংশ মুগল রাজ্যভুক্ত করেন। পরাজিত আসাম রাজ সন্ধি স্থাপন করে ক্ষতিপূরণ হিসাবে দান করেন প্রচুর অর্থ। আসাম থেকে ফেরার পথে মীর জুমলা অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ঢাকার অদূরবর্তী খিজিরপুরের নিকটে প্রাণত্যাগ করেন।

মীর জুমলা ছিলেন একজন সুশাসক। কৃষকদের প্রতি তিনি ছিলেন দয়াপরায়ণ ও সহানুভূতিশীল। ন্যায়পরায়ণ মীর জুমলা ঢাকার কাজী মুল্লা মুস্তফাকে ঘুষ গ্রহণের অভিযোগে বরখাস্ত করেন। কোমল হৃদয়ের অধিকারী মীর জুমলা শত্রুর অমঙ্গলে আনন্দ প্রকাশ করতেন না, শত্রুর প্রতি করতেন না কোন নির্দয় ব্যবহার। তাঁর হাত থেকে শাহ্যাদা শুজা মুক্তি লাভ করতে পেরেছিলেন বলে মীর জুমলা বিশেষ প্রীতি লাভ করেন।

৮১. সুবাদার শায়েস্তা খান (১৬৬৩–১৬৭৮ সাল)

মীর জুমলার মৃত্যুর পর বাদশা আলমগীর তাঁর মামা শায়েস্তা খানকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করেন। তিনি ছিলেন নূরজাহানের ভাই আসফ খানের পুত্র এবং মমতাজ মহলের সহোদর। সুবাদার মীর জুমলার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন কোচবিহার রাজ, বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হয় আরাকানী মগ ও পর্তুগীজ জলদস্যুগণ। কিন্তু শায়েস্তা খান সুবাদার হয়ে বাংলায় আসার সঙ্গে সঙ্গেই বশ্যতা ও ক্ষতিপূরণের ডালি নিয়ে এগিয়ে আসেন কোচবিহার রাজ। মগ ও পর্তুগীজ দস্যুরাও যুদ্ধে পরাজিত হয়। শায়েস্তা খানের পুত্র বুযুর্গ উম্মীদ খান তাঁর বাহিনীসহ ফেনী নদী পার হয়ে আরাকান রাজ্যে প্রবেশ করেন। আর ইবনে হোসাইন নৌযুদ্ধে জলদস্যুদের উৎখাত করে চট্টগ্রাম দুর্গ জয় করেন। চট্টগ্রাম বিজয় এবং মগ ও পর্তুগীজদের দমন হচ্ছে সুবাদার শায়েস্তা খানের অম্লান কীর্তি।

শায়েস্তা খানের শাসনামলে বাংলার লোক সুখ ও শান্তিতে কালাতিপাত করত। ইংরেজ বণিকদের সঙ্গে তাঁর বিবাদ উপস্থিত হলে তিনি তাদের বাণিজ্য বন্ধ করে দেন।

চৌদ্দ বছর সুবাদার থাকার পর ১৬৭৮ সালে তিনি বাংলা ছেড়ে যান। কিন্তু সুবাদার হিসাবেই আবার বাংলায় ফিরে আসেন কিছু দিন পর।

৮২. সুবাদার ফিদাই খান (১৬৭৮ সাল)

সুবাদার শায়েস্তা খান প্রথম বারে চলে যাওয়ার পর ফিদাই খান (আযম খান) ১৬৭৮ সালের প্রথম ভাগে অল্পকালের জন্য বাংলার সুবাদার ছিলেন। তাঁকে পরে সুবাদার পদ থেকে বরখাস্ত করা হয় এবং তিনি ১৬৭৮ সালের ২৪শে মে ঢাকাতেই মৃত্যুমুখে পতিত হন।

৮৩. সুবাদার শাহ্যাদা মুহম্মদ আযম ১৬৭৮–১৬৭৯ সাল)

সম্রাট আলমগীরের পুত্র শাহ্যাদা মুহম্মদ আযম বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হয়ে ঢাকায় আসেন ১৬৭৮ সালের ২৯ জুলাই। পরের বছর তাঁকে দিল্লীতে ডেকে পাঠানো হলে তিনি ১৬৭৯ সালের ১২ অক্টোবর দিল্লীর পথে রওনা হয়ে যান। আমোদ-প্রমোদেই ব্যস্ত থাকতেন বলে সুবাদারীর কাজে তিনি কোন উৎসাহই দেখান নি। তিনি চলে যাবার পর শায়েস্তা খান দ্বিতীয় বারের মত বাংলায় আসেন সুবাদার হয়ে।

৮৪. সুবাদার শায়েস্তা খান (১৬৭৯–১৬৮৮ সাল)

এর আগের বার শায়েস্তা খান প্রায় ১৪ বছর সুবাদার হিসাবে বাংলায় দায়িত্বশীল ছিলেন, আর দ্বিতীয় বার তাঁর সুবাদারীর স্থায়িত্বকাল ছিল প্রায় ৯ বছর। দুই বারে মোট প্রায় ২৩ বছর তিনি খুবই দক্ষতার সঙ্গে বাংলা শাসন করেন। ঢাকার ছোট কাটরা, হোসাইনী দালান, লালবাগ কেল্লার অংশ এবং আরও বহু অট্টালিকা ও মসজিদ নির্মাণ শায়েস্তা খানের কীর্তির স্বাক্ষর। প্রায় ৮৭ বছর বয়সে তিনি দ্বিতীয় বারের মত বাংলা ছেড়ে যান। তাঁর সময়ে এক টাকায় আট মণ চাল বিক্রি হতো। এই ঘটনার স্মৃতি রক্ষার জন্য তিনি নির্মাণ করেন ঢাকার পশ্চিম ফটক। ঢাকা ছেড়ে যাবার সময় তিনি এই ফটকের ভেতর দিয়েই বেরিয়ে যান। তাঁর হুকুমে বন্ধ ফটকের উপরে লিখিত হয় "ভবিষ্যতে যদি কোন শাসনকর্তা বাংলায় বর্তমান সময়ের মত শস্যের মূল্য কমাইতে পারেন, তবেই এই ফটকদ্বার খুলিতে পারিবেন।" বহুদিন পর্যন্ত এই ফটকের দরজা বন্ধ থাকে। অবশেষে মুর্শিদ কুলী খাঁর জামাতা নবাব শুজাউদ্দীনের শাসনকালে এই ফটকদ্বার আবার খোলা হয়।

৮৫. সুবাদার খান-ই-জাহান (১৬৮৮–১৬৮৯ সাল)

শায়েস্তা খানের দ্বিতীয় বার বাংলা ত্যাগের পর ফিদাই খানের ভাই খান-ই-জাহান বাহাদুর বাংলার সুবাদার হয়ে আসেন। কিন্তু এক বছর পরই তাঁকে অপসারণ করা হয়।

৮৬. সুবাদার ইবরাহীম খান (১৬৮৯–১৬৯৭ সাল)

সম্রাট শাহ্ জাহানের রাজত্বকালের বিখ্যাত আলী মর্দানের পুত্র ইবরাহীম খান বৃদ্ধ বয়সে ঢাকায় আসেন বাংলার সুবাদার হয়ে। ১৬৬২ সাল থেকে তিনি পরপর বিভিন্ন প্রদেশে সুবাদারীর দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তিনি পরিচিত ছিলেন অত্যন্ত সদাশয় ও ন্যায় বিচারক হিসাবে। তিনিই ইংরেজ ও ফরাসীদিগকে বাংলায় অবাধ বাণিজ্যের অধিকার দেন। তাঁর সময়েই মেদিনীপুরের জমিদার শোভা সিংহ বিদ্রোহী হন। সুবাদার ইবরাহীম খান তাঁকে দমন করতে ব্যর্থ হলে সম্রাট আলমগীর তাঁর স্থানে বাংলার সুবাদার করে পাঠান স্বীয় পৌত্র শাহ্যাদা আযীমুশ্শানকে।

৮৭. সুবাদার আযীমুশ্শান (১৬৯৭–১৭১২ সাল)

শাহ্যাদার নাম ছিল আযীমুদ্দীন; আযীমুশ্শান তাঁর উপাধি। বাংলায় এসে শোভা সিংহ ও অন্যান্য বিদ্রোহীকে তিনি সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেন। কিন্তু তিনি সুশাসক ছিলেন না। ছিলেন বিলাসী ও অপরিণামদর্শী এক শাহ্যাদা। ১৭০০ সালে তাঁর উপর নজর রাখার জন্য ও সুবাদারীর কাজে সহায়তা করার জন্য আলমগীর মুর্শিদ কুলী খানকে বাংলার দেওয়ান নিযুক্ত করে পাঠান। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই সুবাদার সাহেব দেওয়ানজীর উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠলেন। দুইজনের মধ্যে আরম্ভ হলো মন কষাকষি। সুবাদারের কাছ থেকে নিরাপদে অবস্থান করার জন্য মুর্শিদ কুলি খান তাঁর দফতর মকসুদাবাদে (মুর্শিদাবাদ) স্থানান্তরিত করেন। তারপর সম্রাট আলমগীরের হুকুমে ১৭০৩ সালে সুবাদার আযীমুশ্শান তাঁর পুত্র ফররুখশিয়রকে বাংলায় তাঁর প্রতিনিধি রূপে রেখে পাটনায় গমন করেন। কারণ, তখন তাঁকে একই সাথে বাংলা ও বিহারের সুবাদার নিযুক্ত করা হয়। ১৭০৭ সালে আলমগীরের মৃত্যুর পর শাহ্ আলম বাহাদুর শাহ্ উপাধি নিয়ে দিল্লীর মসনদে উপবিষ্ট হন। তখন তো সুবাদার আযীমুশ্শান পিতার পর মসনদ লাভের স্বপ্ন দেখছেন। তবু ১২১২ সাল পর্যন্ত বাংলায় অনুপস্থিত থেকে আইনত আযীমুশ্শান বাংলার সুবাদার। কিন্তু অল্প বয়সেই ১৭১২ সালের ৮ মার্চ তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

৮৮. সুবাদার খান-ই-আলম (১৭১২–১৭১৩ সালের ৯ জানুয়ারি পর্যন্ত)

শাহ্যাদা ফররুখশিয়র সুবাদার আযীমুশ্শানের প্রতিনিধিরূপে বাংলায় ছিলেন ১৭১০ সাল পর্যন্ত। ১৭১০ সালের পর আযীমুশ্শানের অনুপস্থিতিতে খান-ই-আলম আযীমুশ্শানের প্রতিনিধি হয়ে ঢাকায় ছিলেন। ১৭১২ সালের ৯ জানুয়ারি আযীমুশ্শানের মৃত্যু হলে খান-ই-আলম বাংলার সুবাদার হন। ১৭১৩ সালের ৯ জানুয়ারি ফররুখশিয়র দিল্লীর মসনদে উপবিষ্ট হলে খান-ই-আলমকে সুবাদারি থেকে সরিয়ে নতুন সম্রাটের শিশুপুত্র ফারখুন্দাশিয়রকে কাগজে-কলমে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করা হয় এবং তাঁর

প্রতিনিধিরূপে মুর্শিদ কুলি খান সুবাদারের দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। কয়েক মাস পরে ১৭১৩ সালের ২ মে শিশু-সুবাদার মৃত্যুবরণ করলে দ্বিতীয় মীরজুমলা (ওবায়দুল্লাহ্ মুজাফ্ফর জং খান-ই-খানান মু'তামিদুল্ মুল্ক্) বাংলার অনুপস্থিত সুবাদার নিযুক্ত হন। এবারও দ্বিতীয় মীর জুমলার প্রতিনিধিরূপে বাংলার সুবাদারের দায়িত্ব পালন করতে থাকেন মুর্শিদ কুলি খান।

৮৯. অনুপস্থিত সুবাদার দ্বিতীয় মীর জুমলা (১৭১৩-১৭১৭ সাল)

বলা বাহুল্য, দ্বিতীয় মীর জুমলা শুধুমাত্র নামেই বাংলার সুবাদার ছিলেন চার বছর। অর্থাৎ মুর্শিদ কুলী খানের আইনত পদোন্নতি আরও চার বছরের জন্য পিছিয়ে যায়।

বাংলার মুগল সুবাদারদের মধ্যে ইসলাম খানের পর যাঁরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন তাঁদের মধ্যে মীর জুমলা ও শায়েস্তা খানের নাম স্মরণীয় হয়ে আছে। এই দু'জনের মধ্যে শায়েস্তা খান সম্পর্কে মূল্যায়ন করতে গিয়ে ডক্টর আলী বলেন,

"The viceroyalty of Shaista Khan marked the climax of Mughal Muslim rule in Bengal. The period that followed from 1688 to 1712 AC, covering the viceroyalties of Khan-i-Jahan Bahadur (1688—1689), Ibrahim Khan (1689—1697) and Prince 'Azim al-Din (1697—1712), witnessed the beginning of those factors and processes which ultimately led to the end of Muslim rule in the country."[২০]

এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে, মুগল শাসনামলের প্রায় শুরু থেকেই ইউরোপীয় বণিকেরা এই উপমহাদেশে তাদের বাণিজ্য ব্যবস্থা মজবুত করতে আরম্ভ করে। ক্রমে বাংলার বাণিজ্যেও তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে বসে। দেখা গেছে, সুচতুর এই ইউরোপীয় বণিকেরা সুযোগ্য সুবাদারদের আমলে বেশ সমীহ করে চললেও প্রশাসনের যে কোন রকম দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণে তৎপর থাকে। তাছাড়া সুযোগ্য সুবাদারদের সঙ্গেও তারা বিভিন্ন সময়ে বিরোধিতা ও শত্রুতায় লিপ্ত হয়। এ প্রসঙ্গে ডক্টর আলী বলেন,

"Hostilities with the English were ended in 1690 and they were allowed to settle themselves at the present site of Calcutta. Eight years afterwards they were also allowed to purchase the 'Zamindari' rights of the three villages of Sutanuti, Kalikata (Calcutta)" and Govindapur. It was from this small but solid base that they gradually built up their military and political power and ultimately became the masters of the land. Secondly, it was also during this period that the growing internal

২০. Dr Muahammad Mohar Ali, History of the Muslims of Bengal. Vol. IA. Imam Muhammad Ibn Sa'ud Islamic University, Riyadh, P. 516.

weakness of the Mughal state manifested itself through the revolt of Rahim Khan the chief of the Afghans in Orissa, in alliance with Shova Singh, a Hindu adventurer of Midnapur in south west Bengal (1695-97). The revolt was of course crushed; but it was the first serious challenge to Mughal authority in Bengal from within since the time of emperor Jahangir. More than this, taking advantage of the temporary confusion caused by it in West Bengal the European companies fortified their settlements and strengthened themselves militarily."[২১]

এখানে উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত সময়কালেই ১৭০৭ সালে সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যু হয়। আর মুগল শক্তিতে ধস নামতে আরম্ভ করে তখন থেকেই। সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর হঠাৎ করেই স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, মুগল শক্তি প্রকৃত প্রস্তাবেই জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে।

"The customary struggle for power followed the death of Aurangzeb, but it was a struggle between the second-rate and the third-rate. Out of it was to emerge a series of weak rulers who permitted the empire to fall apart at the seams.

Prince Muazzam finally defeated the other contenders for the throne, and assumed the reign-title of Bahadur Shah. Unfortunately, though 'pious and amiable', he was incapable of decisive rule ... Bahadur Shah was succeeded in 1712, after yet another war of succession, by his son Jahandar, who was deposed by Farrukhsiyar and strangled.

Farrukhsiyar owed his throne to two brothers, Husain Ali and Abdullah, but turned against them. They deposed, blinded and finally murdered him in 1719. The 'king-makers' now placed various puppets on the throne, the last of whom, Muhammad Shah, refused to conform to their pulls on the strings. In attempting to dispose of him they were themselves captured and killed."[২২]

মুগল-সাম্রাজ্যের এমনি প্রেক্ষাপটে বাংলার সুবাদারির দায়িত্বে নিয়োজিত হলেন সম্রাট আওরঙ্গজেবের বিশ্বস্ত ও বিচক্ষণ দেওয়ান মুর্শিদ কুলী খান।

---

২১. ibid, p. 516.

২২. Michael Edwardes, A History of India, 1967, pp. 166–167.

দ্বাদশতম অধ্যায়

মুর্শিদাবাদ নিযামত আমল
(১৭১৭-১৭৬৫ সাল)

সন এগার শও পঁয়ষট্টি বৎসরে।
রচিনু আম্বিয়া-বাণী এত সনান্তরে॥
কেহ কেহ কহে মোরে এসব রচিতে।
শেষকালে এত শ্রম করিনু সে মতে॥
একে শেষ কাল আর বিষম জঞ্জাল।
তথাপি রচিনু যদি কেহ বোলে ভাল॥

(মুগল আমলের শেষ শক্তিশালী কবি হায়াত মামুদ রচিত 'আম্বিয়া-বাণী'র অংশ; রচনাকাল ১১৬৫ বাংলা, ১৭৫৮ সাল ইংরেজী)

কি হলোরে জান।
পলাশী ময়দানে নবাব হারাল পরাণ।
তীর পড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে, গুলি পড়ে রয়ে,
একলা মীরমদন বল কত নেবে সয়ে।
ছোট ছোট তেলেঙ্গাগুলি লাল কুর্ত্তি গায়,
হাঁটু গেড়ে মারছে তীর মীরমদনের গায়।
কি হলোরে জান,
পলাশী ময়দানে নবাব হারাল পরাণ।
নবাব কাঁদে সিপুই কাঁদে আর কাঁদে হাতী,
কল্‌কেতাতে বসে কাঁদে মোহনলালের বেটী।
কি হলোরে জান,
পলাশী ময়দানে উড়ে কোম্পানী নিশান।

('পলাশী যুদ্ধের গ্রাম্য গীত' নামক এই সংগৃহীত কবিতাটির অংশ শ্রীনিখিলনাথ রায়-এর 'মুর্শিদাবাদ কাহিনী' থেকে উদ্ধৃত)

১২

৯০. নবাব সুবাদার মুর্শিদ কুলী খান (১৭১৭-১৭২৭ সাল)

১৭১৭ সালের নভেম্বর মাসে মুর্শিদ কুলী খান বাংলার নিয়মিত সুবাদার নিযুক্ত হন। মুর্শিদাবাদের পূর্ব নাম ছিল মখসুদাবাদ; মুর্শিদ কুলী জাফর খান মুর্শিদাবাদে বাংলার রাজধানী স্থানান্তরিত করার পর তাঁর নামানুসারে মখসুদাবাদের নাম হয় মুর্শিদাবাদ। মুগল প্রশাসনে সম্রাট আকবরের সময় থেকেই সুবার রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব ছিল দেওয়ানের হাতে এবং এ ব্যাপারে দেওয়ান ছিলেন স্বাধীন, এতে সুবাদারের হস্তক্ষেপ করার অধিকার ছিল না। শাহ্যাদা আযীম-উশ-শানের সুবাদারি কালে মুকাররমত খান ছিলেন বাংলা সুবার দেওয়ান। আওরঙ্গজেব তখন মুগল সম্রাট। এই দেওয়ান তাঁর অন্যান্য কর্মচারীর যোগসাজশে সুবার আদায়কৃত রাজস্ব আত্মসাৎ করেন বলে জানা যায়।

"At any rate the emperor, then in the twentieth year of his Deccan Campaigns, was, in need of money and was not obviously satisfied with the remittance from Bengal. Hence in November 1700 Aurangzeb transferred the honest and efficient 'diwan' at Hyderabad, Kartalab Khan, (later Murshid Quli Khan) to Bengal."[১]

বাংলার দায়িত্বভার গ্রহণ করে তিনি রাজস্ব-প্রশাসনের পুনর্বিন্যাস করেন এবং রাজস্ব আদায়ে শৃঙ্খলা স্থাপন করে তার পরিমাণও বাড়াতে সক্ষম হন। তাতে করে সম্রাটের কাছে তাঁর কর্মক্ষমতার সুখ্যাতি বৃদ্ধি পেলেও বাংলার সুবাদার শাহ্যাদার পক্ষ থেকে শত্রুতা ছাড়া আর কিছুই পান নি। এই শত্রুতার সূত্র ধরেই সম্রাট আওরঙ্গজেব সুবাদার-শাহ্যাদাকে ভবিষ্যতের জন্য সাবধান করে দেন। কিন্তু শত্রুতা থেকেই যায়। তারই পরিণামে মুর্শিদ কুলী খান দেওয়ানী প্রশাসনের কেন্দ্র ঢাকা থেকে মখসুদাবাদে স্থানান্তরিত করেন ১৭০২ সালে। ঢাকায় থেকে যায় সুবাদারের প্রশাসন কেন্দ্র। অল্পকাল পরে, এই শত্রুতারই পরিণামে করতলব খানকে (পরে মুর্শিদ কুলী খান) বিহারের নায়েব সুবাদারের বাড়তি দায়িত্বও দেওয়া হয়।

"Even this arrangement did not solve the conflict. Hence, after about six months, on 29 July 1703, the emperor ordered the Prince to take up his residence in Bihar, leaving his son Prince Farrukhsiyar as his deputy at Dhaka. At the same time Kartalab Khan was elevated to the position of 'subahdar' of Orissa, in addition to his post of 'diwan'

---

১. Dr Muhammad Mohar Ali, History of the Muslims of Bengal, Vol. IA, Imam Muhammad Ibn Sa'ud Islamic University, Riyadh, 1985, P. 526.

of Bengal and Orissa, and the young prince Farrukhsiyar was asked to 'obey the diwan as his guardian'."[২]

এই ঘটনার আগে বা পরে ১৭০৩ সালে তিনি দাক্ষিণাত্যে সম্রাটের কাছে উপস্থিত হন। সেখানেই করতলব খানকে সম্রাট 'মুর্শিদ কুলী খান' উপাধিতে ভূষিত করেন এবং মখসুদাবাদের নাম পরিবর্তন করে মুর্শিদাবাদ রাখার প্রস্তাবও অনুমোদন করেন।

"Before Murshid Quli Khan returned to Bengal, Prince 'Azim al-Din moved out of Dhaka the end of 1703 or the beginning of 1704. He fixed his residence at Patna which he was also permited to rename after him as 'Azimabad, just as Murshid Quli Khan was allowed to rename Makhsudabad after himself. With the Prince's departure from Dhaka his viceroyalty in Bengal practically came to an end, for he never afterwards returned to the province where Murshid Quli Khan emerged as the real administration, holding at the same time the office of 'diwan' of Bengal, Bihar and Orissa, 'Subahdar' of Orissa, and 'guardian' of the 'naib-subahdar' Prince Farrukhsiyar at Dacca. Prince Azim al-Din remained at Patna (Azimabad) for about three years more when he was recalled to court on the eve of emperor Aurangzeb's death. After the emperor's death in 1707 his son Bahadur Shah-1, father of Prince 'Azim al-Din, became emperor, conferred on the latter the title of 'Azim al-Shan, and continued his appointment as 'subahdar' of Bengal and Bihar. Prince 'Azim al-Shan '(Azim al-Din) stayed at court, however, nominally ruling Bengal and Bihar through his sons Farrukhsiyar and Karim al-Din as deputy 'subahdars' respectively at Dacca and Patna, and acting rather as adviser of his father till his death in February 1712. Prince 'Azim al-Shan was killed in the following month in the war of succession which followed Bahadur Shah.-1's death."[৩]

কিন্তু এই মৃত্যু দু'টির আগে ১৭১০ সাল অর্থাৎ সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর বছর তিনেক মুর্শিদ কুলী খানের কর্মজীবনে স্বাভাবিকভাবেই বিপর্যয় নেমে এসেছিল। তিনি হারিয়েছিলেন বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার পদগুলো; দেওয়ানরূপে আবার বদলি হয়েছিলেন দাক্ষিণাত্যে। কিন্তু তাঁর অনুপস্থিতিতে এসব সুবায় নেমে এসেছিল বিশৃঙ্খলা।

---

২. Ibid, p, 529.

৩. Ibid, p, 530.

"In the meantime there was a reconciliation between Murshid Quli Khan and Prince 'Azim al-Shan. The former was shrewd enough to recognize the power behind the throne, while the latter, conscious of the honesty and abilities of the 'diwan' wanted to win him over to his side in preparation for his bid for the Delhi throne. Accordingly Murshid Quli Khan was reposted to Bengal where he arrived towards the end of 1710."[8]

এরপর কয়েক বছর দিল্লীর মসনদ নিয়ে চলে মৃত্যুর লীলা-খেলা; এবং এসব ঘটনার পর ১৭১৭ সালে মুর্শিদ কুলী লাভ করেন বাংলার সুবাদারির দায়িত্ব। সুবাদার হিসাবে তিনি ছিলেন ন্যায়পরায়ণ, বিচক্ষণ, প্রজাবৎসল অথচ প্রশাসনে কঠোর। অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন এই সুবাদারের সুদীর্ঘ বিচক্ষণ শাসনামলে বাংলার রাজস্ব বিভাগের বিপুল উন্নতি যেমন সাধিত হয়, তেমনি সারা বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হয় শান্তি-শৃঙ্খলা। ব্যক্তিগত জীবনে মুর্শিদ কুলী খান ছিলেন পরম ধর্মনিষ্ঠ। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে, শায়েস্তা খানের পর ভারতের কোথাও মুর্শিদ কুলীর মত উপযুক্ত কোন সুবাদার আর দেখা যায়নি।

তাঁর সুবাদারির সময়টাই ছিল এমন যে তারই বাস্তবতায় সুবা বাংলা লাভ করে, বলতে গেলে, এক স্বাধীন সত্তা। ঐ সময়টায় যে মুগল শক্তিতে ধস নামতে আরম্ভ করেছে, তা আগেই বলা হয়েছে। দিল্লীর মসনদ নিয়ে তখন 'second-rate' ও 'third-rate'দের মধ্যে আরম্ভ হয়েছিল হানাহানি।

"Territorial changes and the growth of new centres of power during this period are important, not only in relation to the disintegration of the Mughal empire but to the infiltration of the Europeans, and some detail is necessary to an understanding of events."[৫]

এমনি একটা সময়ে মুগল সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলের শক্তিকেন্দ্র বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার ভবিষ্যত নির্মাণের দায়িত্বও এসে বর্তায় মুর্শিদ কুলী খানের উপর। শাসনকার্যে যে ন্যায়পরায়ণতা ও বিচক্ষণতা প্রয়োগ করে দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপন করেছিলেন, তাতে দুর্বল দিল্লী-সাম্রাজ্যের কেন্দ্রের প্রতি ততটুকু আনুগত্য তিনি না দেখালেও পারতেন। কিন্তু তা তিনি করেন নি।

"Another distinguishing feature of his career as an officer was his steadfast loyalty to the Delhi throne. He rendered allegiance and

---

৪. Ibid, p. 530-537.

৫. Michael Edwardes. A History of India, 1967, P. 167.

regularly sent the provincial revenues to every prince who came out successful in the various wars of succession. In turn this earned for him the confirmation in his positòn by each succeeding emperor... Notwithstanding his undoubted loyalty to the Delhi throne Murshid Quli Khan seems to have realized that the central authority was on the wane. Hence he centralized the administration of the provinces under his charge in his own hands and took steps to establish his dynastic rule there. It was partly out of policy and partly due to his upbringing and temperament that he did not openly break away from the centre. His administrative knack and his having adopted the land for himself and his family might explain why he undertook his famous revenue survey and settlement measures rather late in his life when the weakness of the central government and his own advanced age must have become all too clear to him."[৬]

কিন্তু অদৃশ্য ভবিতব্য বাংলার এই আপাত সুদিনেও অন্য এক ইতিহাসের সূচনা করছিল মুর্শিদ কুলী খাঁর সময় থেকেই। মুর্শিদ কুলী খাঁর নিয়মিত সুবাদারির আগে পর্যন্ত মুগল প্রশাসনের সকল উচ্চপদেই নিযুক্তি পেতেন আগ্রা ও পাঞ্জাব থেকে আগত, বিশেষ করে মুসলমানরা। তাঁরা নতুন সুবাদারের সঙ্গে বাংলায় আসতেন এবং সুবাদারের বদলির সঙ্গে সঙ্গে সেসব স্থানে ফেরত যেতেন। কিন্তু দিল্লীর দুর্দিনে অবস্থা বদলে গেল।

"Under Murshid Quli Khan and the succeeding Nawabs, Bengali Hindus, by the force of their talents and mastery of Persians, came to occupy the highest civil posts under the subahdar and many of the military posts also under the faujdars. There had been Bengali Hindu diwans and qanungoes, well-versed in the Persian language and in Muslim Court etiquette, as early as the days of Husain Shah (c.1510). Under Murshid Quli such men grew prosperous enough to found new zamindari houses."[৭]

তদুপরি, বাংলায় বাণিজ্যরত ইউরোপীয় বণিকেরা তো ছিলই। মুর্শিদ কুলী খাঁর মত যোগ্য শাসকের সময়ে এইসব বণিক ও হিন্দু উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গ বাংলার শাসকের জন্য বিপদের কারণ হয়ে দেখা দেয়নি সত্য, কিন্তু মুর্শিদ কুলী খাঁর মৃত্যুর ৩০ বছর পর দেখা

৬. Ibid, pp, 572-573.

৭. Sir Jadunath Sarkar, History of Bengal, Vol. II, The University of Dacca, 1972, P. 410.

গেল ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীই বাংলার এসব উচ্চপদস্থ হিন্দুর যোগসাজশে বাংলার মুগল তথা মুসলিম শক্তির পতন ঘটিয়ে দিল।

"Before long the Hindu official and commercial class emerged as a powerful factor in the body politic. Further, it was also during Murshid Quli Khan's time that the English traders firmly established themselves in Bengal, firstly by fortifying their settlements at Calcutta during the wars of succession and, secondly, by obtaining emperor Farrukhsiyar's 'farman' in 1717. Thus the forces and factors which ultimately supplanted the Muslim political power in Bengal clearly emerged during Murshid Quli Khan's time. In effect his rule constituted only a deceptive facade of peace and stability behind which the process of degeneration and decline continued apace."[৮]

মুগল শক্তির দেহে অধঃপতন ও ক্ষয়ের এই যে প্রক্রিয়া সম্রাট আওরঙজেবের বিচক্ষণ শাসনের আড়ালে আরম্ভ হয়েছিল এবং যার পরিণামে ধসে পড়েছিল দিল্লী সাম্রাজ্য, কিছুটা দেরিতে হলেও তা-ই আরম্ভ হলো মুর্শিদ কুলী খাঁর সুশাসনের আড়ালে। অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন নবাব-সুবাদার মুর্শিদ কুলী খাঁ তা যেন দেখেও দেখতে পেলেন না। ভবিতব্য বুঝি এমনিভাবেই আড়াল থেকে ধ্বংসের শক্তিকে ক্রমে নিয়ে আসে স্পষ্ট দিবালোকে। এই অধ্যায়ের শেষের দিকে দেখা যাবে, কি সর্বগ্রাসী রূপ নিয়েই না সেই ধ্বংস দেখা দিয়েছিল বাংলার ভাগ্যাকাশে।

পরম ধর্মনিষ্ঠ নবাব-সুবাদার মুর্শিদ কুলী খান জীবনের শেষ দিকে মুর্শিদাবাদের অদূরে নির্মাণ করেন একটি মসজিদ। সেই মসজিদই কাটরার মসজিদ নামে বিখ্যাত। পবিত্র মক্কা মুয়াজ্জমার মসজিদের অনুকরণে নির্মিত এই মসজিদটির সঙ্গে ছিল মিনার, চৌবাচ্চা ও ইন্দারা। তাঁর হুকুমে মসজিদের প্রবেশদ্বারের সোপানাবলীর নিচে একটি প্রকোষ্ঠ নির্মিত হয়। মৃত্যুর পর এই প্রকোষ্ঠেই তাঁকে সমাহিত করা হয়। এই-ই ছিল তাঁর শেষ ইচ্ছা। তিনি বলেছিলেন, নামাযীদের পায়ের ধূলো যেন তাঁর কবরের উপর পড়ে। মসজিদটি দৈর্ঘ্যে ৮৬/৮৭ হাত, প্রস্থে ১৬ হাতেরও বেশি। মসজিদ নির্মাণ সমাপ্ত হওয়ার প্রায় এক বছর পর ১৭২৭ সালে তিনি পরলোকগমন করেন।

৯১. নবাব সুবাদার শুজা-উদ-দীন মুহম্মদ খান (১৭২৭-১৭৩৯ সাল)

নবাব মুর্শিদ কুলী খাঁর কোন পুত্র সন্তান না থাকায় তাঁর মৃত্যুর পর কন্যা যীনাতুন্নিসার স্বামী উড়িষ্যার নায়েব-সুবাদার শুজা-উদ-দীন মুহম্মদ খান বাংলা ও উড়িষ্যার

৮. Dr Muhammad Mohar Ali, History of the Muslims of Bengal, Vol. IA, Imam Muhammad Ibn Sa'ud Islamic University, Riyadh, 1985, P. 576.

সুবাদার হন। দিল্লীর সম্রাট মুহম্মদ শাহ্ ১৭৩৩ সালে বিহারকেও বাংলার সঙ্গে একত্র করে দেন। ফলে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা একটি সুবায় পরিণত হয়। আর এই সুবাটির প্রথম সুবাদার থাকেন শুজা-উদ-দীন মুহম্মদ খান। শুজা-উদ-দীন বাংলা-বিহার-উড়িষ্যাকে চারটি ভাগে বিভক্ত করেন। প্রথম বিভাগটি গঠিত হয় পশ্চিমবঙ্গ, মধ্যবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের কিছু অংশ নিয়ে; দ্বিতীয় বিভাগটিতে থাকে পূর্ব ও দক্ষিণ বঙগ, উত্তরবঙ্গের বাকি অংশ, সিলেট ও চট্টগ্রাম অঞ্চল; তৃতীয় বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হয় বিহার এবং চতুর্থ বিভাগ গঠিত হয় উড়িষ্যা নিয়ে। অন্য কথায়, রাজধানী মুর্শিদাবাদকে কেন্দ্র করে প্রথম বিভাগ এবং জাহাঙ্গীরনগর বা ঢাকাকে কেন্দ্র করে দ্বিতীয় বিভাগটি গঠিত হয়। প্রথম বিভাগটির সরাসরি দায়িত্বে ছিলেন সুবাদার স্বয়ং এবং অন্য তিনটি বিভাগ ছিল তিনজন নায়েব-সুবাদারের দায়িত্বে।

ডক্টর কালী কিঙ্কর দত্তের কথায়, "He was kind and bountiful towards those who happened to visit Murshidabad, and extended his charity to his old friends. A God-fearing man, he had a scrupulous regard for justice and dispensed it impartially .... In fact, peace and prosperity then prevailed in Bengal as a result of his wise and beneficial measures."[৯]

শুজা-উদ-দীন মুহম্মদ খানের সুশাসনে দেশে শান্তি বিরাজিত ছিল বলেই শায়েস্তা খানের আমলের পর বাংলায় আবার জিনিসপত্রের দাম কমে যায়। তখন এক টাকায় আট মণ চাল বিক্রি হয় এবং শর্তানুসারে আবার খুলে দেওয়া হয় জাহাঙ্গীরনগরের পশ্চিম ফটকের দ্বার, যে দ্বারপথে ঢাকা ত্যাগ করে বেরিয়ে গিয়েছিলেন আশ্চর্য প্রতিভার অধিকারী নবাব-সুবাদার শায়েস্তা খান।

১৭৩৯ সালের ১৩ মার্চ প্রাণত্যাগ করেন নবাব-সুবাদার শুজা-উদ-দীন মুহম্মদ খান। মুর্শিদাবাদে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে দাহাপাড়া নামক স্থানে শুজা-উদ-দীন নির্মিত উদ্যান ফারাহ্‌বাগে (আনন্দ উদ্যান) তাঁকে সমাহিত করা হয়।

৯২. নবাব সুবাদার সরফরাজ খান (১৭৩৯–১৭৪০ সাল)

শুজা-উদ-দীন খানের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সরফরাজ খান বাংলার মসনদে আরোহণ করেন। শাসনকার্যে তিনি তেমন যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারেন নি। আর এই অযোগ্যতারই সূত্র ধরে বিহারের নায়েব-সুবাদার আলীওয়ার্দী খান তাঁকে যুদ্ধক্ষেত্রে মোকাবিলা করেন। সে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন নবাব-সুবাদার সরফরাজ খান এবং বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার শাসনকর্তা হিসাবে বাংলার মসনদে উপবিষ্ট হন আলীওয়ার্দী খান।

---

৯. Dr Kali Kinkar Datta, History of Bengal, Vol. II, the University of Dacca, 1972, P. 424.

৯৩. নবাব সুবাদার আলীওয়ার্দী খান (১৭৪০–১৭৫৬ সাল)

বাদশা আলমগীরের মৃত্যুর (১৭০৭ সাল) পর বিশাল মুগল সাম্রাজ্য ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলে। ধ্বংসের পথে চলতে চলতে মুগল বাদশাহীর শেষ পরিচয়টা মুছে যায় ১৮৫৮ সালে, সিপাহী যুদ্ধের পরিণতিতে শেষ মুগল বাদশা বাহাদুর শাহ্ জাফরের নির্বাসনের মাধ্যমে। বিশাল এই মুগল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকে ঃ মুগলদের নৈতিক অবনতি, বিভিন্ন সঙ্কটে উপযুক্ত লোকের অভাব, সামরিক শক্তির অবনতি, মসনদের উত্তরাধিকারী নির্ণয়ে নিয়ম-নীতির অভাবজনিত ত্রুটি, সাম্রাজ্যের অধিক বিস্তৃতি, সাম্রাজ্যের আর্থিক অবনতি, সুবাদারদের বিদ্রোহ, অমুসলিম শক্তির উত্থান, বৈদেশিক আক্রমণ এবং মুগলদের নৌ-শক্তির অভাব।

১৭০৭ থেকে ১৮৫৮–এই প্রায় দেড়শ' বছরে ১১ জন 'বাদশা' 'মুগল সাম্রাজ্যের' প্রধান ছিলেন। তাঁরা হচ্ছেন ঃ

১. শাহ্-ই-আলম বাহাদুর শাহ্ (১৭০৭–১৭১২ সাল) ঃ বাদশা আলমগীরের জ্যেষ্ঠ পুত্র।

২. জাহান্দার শাহ্ (১৭১২–১৭১৩ সাল) ঃ বাহাদুর শাহ্র পুত্র; নিহত।

৩. ফররুখসিয়ার (১৭১৩–১৭১৯ সাল) ঃ জাহান্দার শাহ্র ভ্রাতুষ্পুত্র; স্বনামখ্যাত "সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়' কর্তৃক নিহত।

৪. রফিউদ্ দরজাত (কয়েক মাস) ঃ বাহাদুর শাহ্র পৌত্র ; নিহত।

৩. রফিউদ্দৌলাহ্ (কয়েক মাস) ঃ বাহাদুর শাহ্র পৌত্র; নিহত। দ্বিতীয় শাহ্জাহান বলেও তিনি পরিচিত ছিলেন।

৬. মুহম্মদ শাহ্ (১৭১৯–১৭৪৮) ঃ বাহাদুর শাহ্র পৌত্র; স্বাভাবিক মৃত্যু।

৭. আহমদ শাহ্ (১৭৪৮–১৭৫৪) ঃ মুহম্মদ শাহ্র পুত্র ; স্বাভাবিক মৃত্যু।

৮. দ্বিতীয় আলমগীর (১৭৫৪–১৭৫৯) ঃ জাহান্দার শা'র পুত্র।

৯. দ্বিতীয় শাহ্ আলম (১৭৫৯–১৮০৬) ঃ দ্বিতীয় আলমগীরের পুত্র।

১০. দ্বিতীয় আকবর (১৮০৬–১৮৩৭) ঃ দ্বিতীয় শাহ্ আলমের পুত্র; স্বাভাবিক মৃত্যু।

১১. দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্ জাফর (১৮৩৬–১৮৫৮) ঃ দ্বিতীয় আকবরের পুত্র; রেঙ্গুনে নির্বাসিত ও সেখানেই মৃত্যু।

মুগল শক্তির ধ্বংস ও পতনের এই প্রেক্ষাপটে ১৭৪০ সালে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার মসনদে উপবেশন করেন নবাব-সুবাদার আলীওয়ার্দী খান। তিনি নামেমাত্র মুগল সাম্রাজ্যের অধীন ছিলেন।

আলীওয়ার্দী ছিলেন খুবই বিচক্ষণ এক সুবাদার ও রাষ্ট্রনায়ক। ঐতিহাসিক নিখিলনাথ রায়-এর কথায়, "নবাব আলীবর্দী খাঁর ন্যায় রাজনীতিবিদ পুরুষ বাংলার সিংহাসনে অল্পই উপবেশন করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। দুর্দান্ত মহারাষ্ট্রীয়দিগকে দমন করিয়া সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গলা-রাজ্যের প্রজাদিগকে শান্তির হিল্লোলে ভাসাইয়া তিনি রাজনীতির চূড়ান্ত পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।"[১০]

আলীওয়ার্দী খান মারাঠা বর্গীদের দমন করার জন্য এক রণক্ষেত্র থেকে অন্য রণক্ষেত্রে ছুটে বেড়ান। কিন্তু দুর্দান্ত মারাঠা বর্গীকে সম্পূর্ণরূপে দমন করতে পারেন নি। অতঃপর বার্ষিক ১২ লক্ষ টাকা কর দিতে স্বীকৃত হয়ে তিনি বাংলাকে বর্গীদের কবল থেকে রক্ষা করেন।

আলীওয়ার্দী খান ইংরেজ বণিকদেরও সংযত রেখেছিলেন। ১৭৪৮ সালে ইংরেজ কমোডর গ্রিফিন মুগল ও আর্মেনীয় বণিকদের বাণিজ্য জাহাজ লুণ্ঠন করলে আলীওয়ার্দী খান ইংরেজ বণিকদের নিকট ক্ষতিপূরণ দাবি করেন। ১৭৪৯ সালে ইংরেজরা দেড় লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়ে নবাবের রোষাগ্নি নির্বাপিত করে।

আলীওয়ার্দী খানের সময় জানকীরাম সোম, দুর্লভরাম, রামনারায়ণ, উম্মীদ চাঁদ, বীরু দত্ত, কিরাত চাঁদ, রাম রাম সিংহ এবং গোকুল চাঁদ প্রমুখ ব্যক্তি খুব শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। এঁদের এবং পরবর্তীতে জগৎ শেঠ-রাজবল্লভাদির ষড়যন্ত্রের পরিণামে বাংলার ধ্বংস সাধিত হয় এবং বাংলা হারায় তার স্বাধীনতা। ১৭৫৬ সালে এই কর্মবীর ৮২ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন।

৯৪. নবাব সিরাজউদ্দৌলা (১৭৫৬–১৭৫৭ সাল)

১৭৩৩ সালে সিরাজউদ্দৌলা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম মির্জা মুহম্মদ। নবাব আলীওয়ার্দী খানের কোন পুত্র ছিল না, তিন কন্যা। তাঁর বড় ভাই হাজী আহমদের তিন ছেলের সঙ্গে আলীওয়ার্দী খানের তিন কন্যার বিয়ে হয়। কনিষ্ঠা কন্যা আমেনা বেগমের বিয়ে হয় হাজী আহমদের কনিষ্ঠ পুত্র জৈনুদ্দীনের সঙ্গে। তাঁদেরই অন্যতম সন্তান এই মির্জা মুহম্মদ। দৌহিত্র মির্জা মুহম্মদকে পুত্রের মত লালন-পালন করেন আলীওয়ার্দী ও আলীওয়ার্দী বেগম। তাঁদেরই কাছে থেকে তাঁদেরই তত্ত্বাবধানে ও যত্নে লেখাপড়া ও যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে ওঠেন মির্জা মুহম্মদ। বর্গীর হাঙ্গামার সময় এই বীর বালক মির্জা মুহম্মদ অস্ত্র হাতে মাতামহের পাশে থেকে যুদ্ধ করেছেন। ১৭৪৮ সালে মির্জা মুহম্মদের পিতা ও পিতামহ আফগান বিদ্রোহীদের হাতে নিহত হলে মির্জা মুহম্মদ মাতামহ আলীওয়ার্দী খানের সঙ্গে ছুটে যান বিহারে। বিহারে শান্তি স্থাপন করে নবাব রাজধানীতে

১০. শ্রীনিখিলনাথ রায়, মুর্শিদাবাদ কাহিনী, তৃতীয় সংস্করণ, ১৩১৬ সন, পৃ. ১৩০।

ফিরে আসেন। তখনই সেই পনের বছর বয়সে মির্জা মুহম্মদ বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার যুবরাজ বলে স্বীকৃতি লাভ করেন।

১৭৫৬ সালে নবাব আলীওয়ার্দী খাঁর মৃত্যুর পর এই মির্জা মুহম্মদ নবাবের মসনদে আরোহণ করেন। উপাধিসহ তিনি অভিহিত হন নবাব মনসুরুল্ মুল্‌ক্ সিরাজউদ্দৌলাহ শাহ্ কুলী খান মির্জা মুহম্মদ হায়বত জং বাহাদুর বলে এবং মাত্র ১ বছর আড়াই মাস রাজত্ব চালিয়ে ১৭৫৭ সালের ৩রা জুলাই নির্মমভাবে নিহত হন।

নবাব সিরাজের এই সোয়া এক বছরের রাজ্য শাসন ও মৃত্যু যেন এক অতি-নাটকীয় ঘটনাবলীর সমাহার! মাত্র তেইশ বছর বয়স্ক তরুণ নবাব বিশাল বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার শাসন-দায়িত্ব মাথায় নিয়ে মসনদে উপবিষ্ট। পরক্ষণেই জানা গেল, নবাবের খালাতো ভাই শওকত জং পুর্নিয়ায় নিজেকেই নবাব বলে ঘোষণা করেছেন। তরুণ নবাব সিরাজকে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে যেতে হলো পুর্নিয়ার পথে। যুদ্ধে শওকত জং নিহত হলে সে-সমস্যা মিটে গেল বটে, কিন্তু তরুণ নবাবের জানতে বাকি রইল না যে তাঁর বিরুদ্ধে সর্বনাশা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছেন তাঁরই বড় খালা ঘসেটি বেগম, যিনি অঢেল হীরা-জহরত নিয়ে মোতিঝিল প্রাসাদে তাঁরই ধ্বংস সাধনে বদ্ধপরিকর। মোতিঝিল প্রাসাদ দখল করে নবাব সিরাজ ঘসেটি বেগমকে নিয়ে এলেন মুর্শিদাবাদ প্রাসাদে। ঘসেটি বেগম বুঝলেন, তাঁকে বন্দিনীই করা হয়েছে। আর করা হয়েছে শক্তিহীনা। কিন্তু কত দিক সামলাবেন নবাব সিরাজ? ষড়যন্ত্রীদের দিয়ে পূর্ণ হয়ে আছে তাঁর দরবার! কত চাঁদ! জগৎশেঠ মহাতপচাঁদ, তাঁর ভাই মহারাজা স্বরূপচাঁদ , মানিকচাঁদ, পাঞ্জাবী ব্যবসায়ী উমিচাঁদ, দেওয়ান রাজবল্লভ, দেওয়ান রায়দুর্লভ, নন্দকুমার এবং আরও অনেকে। তদুপরি কলকাতায় রয়েছে ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ঘাঁটি। নবাব সিরাজ আক্রমণ করলেন কলকাতাস্থ ইংরেজদের আলিনগরের ঘাঁটি। নবাব হয়ে সেখানকার শাসন দায়িত্বে রেখে এলেন মানিকচাঁদকে। মানিকচাঁদ পরে নিমকহারামি করল। এমনি প্রতি সঙ্কটে নিমকহারামি করে চলল তাঁরই অনুগৃহীত উচ্চপদস্থ দরবারীরা।

ইংরেজদের চরম শাস্তিদানের চিন্তা করছেন নবাব, তখনই জানলেন, আফগানরাজ আহমদ শাহ্ আবদালী দিল্লী অধিকার করেছেন। তাঁর বাংলা আক্রমণের সম্ভাবনাও রয়েছে। এমনি অবস্থায় ইংরেজদের সঙ্গে সন্ধি করে সব বিবাদ মিটিয়ে ফেললেন নবাব। সন্ধির শর্ত থাকল ঃ

(ক) ইংরেজদের ছাড়পত্র বহনকারী সমস্ত বাণিজ্য বিনা শুল্কে এবং বিনা বাধায় বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার মধ্যে চলাচলের সুযোগ আবার লাভ করবে ;

(খ) ইংরেজগণ কলকাতার দুর্গ মেরামত ও সম্প্রসারণের কাজ থেকে বিরত থাকার প্রতিশ্রুতি দান করবে;

(গ) ইংরেজগণ কলকাতায় টাকশাল স্থাপনের অধিকার লাভ করবে; এবং

(ঘ) নবাব তাঁর ১৭৫৬ সালে কলকাতা আক্রমণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ইংরেজ, বিদেশী ও বঙ্গ-ভারতীয় ইংরেজ প্রজাদের যথারীতি ক্ষতিপূরণ দেবেন।

নবাবের দিক থেকে সন্ধির শর্ত পালন আরম্ভ হলো। কিন্তু অন্য পক্ষ কি করছে তার খতিয়ান নেবার আগেই নবাব জানলেন যে, মুর্শিদাবাদের নবাব-বিরোধীরা তাঁদের নবাব পরিবর্তনের ষড়যন্ত্রে ইংরেজদের সমর্থনও পেয়েছে। প্রকৃত প্রস্তাবেও ষড়যন্ত্র সেদিকেই মোড় নিচ্ছিল। নবাব পরিবর্তনের ষড়যন্ত্রটা আসলে ছিল হিন্দুদেরই ষড়যন্ত্র-একথা হিন্দু ঐতিহাসিকরাই স্বীকার করেন। ষড়যন্ত্রকারীদের প্রথম প্রস্তাব ছিল– নবাব সিরাজের পরিবর্তে বাংলার নবাব হবেন জগৎশেঠ-আশ্রিত দুই হাজার সৈন্যের মনসবদার ইয়ার লুত্‌ফ্ খান। কিন্তু প্রস্তাব শুনেই ধূর্ত রবার্ট ক্লাইভ বুঝে ফেললেন যে, হিন্দু-প্রধানেরা হিন্দুশাসিত রাজ্য করতে চায় বাংলাকে। আর সীমান্ত ঘেঁষে নাগপুরের হিন্দু মারাঠা রাজ্য তো রয়েছেই। বাংলাও হিন্দু-শাসিত হলে কালক্রমে পুরো এই বিশাল জনপদটাই..... ইত্যাদি। সঙ্গে সঙ্গে ক্লাইভের পক্ষ থেকে প্রস্তাব এল ঃ না, 'ইয়ার লুত্‌ফ্‌কে মানবে না কেউ, উনি বহুত সাধারণ লোক আছেন। আমাদের প্রস্তাব, রয়েল ফ্যামিলির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত মীর জাফর আলী খান হবে নবাব সিরাজের পরিবর্তে নতুন নবাব। এ প্রস্তাবে রাজী না থাকলে ইংরেজ লোক বাধ্য হয়ে ঐ তরুণ নবাব সিরাজের সঙ্গেই সমঝোতা করে চলবে।' ক্লাইভের প্রস্তাব শুনেই লেজ গুটিয়ে জগৎশেঠ গয়রহেরা মীর জাফর আলী খানকেই নবাব করায় স্বীকৃত হয়ে গেলেন। আর সব শুনে মীর জাফর তো আনন্দে আত্মহারা। কেউ যাকে এতদিন চিনতে পারল না, যুদ্ধবিদ্যায় অজ্ঞ হয়েও রবার্ট ক্লাইভ তাকে মুহূর্তে চিনে ফেললেন! মীর জাফর রাজী।

ব্যস, কোথায় ভেসে গেল কুরআন স্পর্শ করে নবাব সিরাজের প্রতি মীর জাফরের আনুগত্যের কথা! মীর জাফর রাজী হয়ে গেলেন ষড়যন্ত্রকারীদের বানানো নবাব হতে। তারপর এল পলাশী প্রান্তরে সেই নাট্যাভিনয়ের সময়। রাজধানী মুর্শিদাবাদ থেকে ৩০ মাইল দক্ষিণে আর কলকাতা থেকে ৮০ মাইল উত্তরে অবস্থিত পলাশী, যেখানে ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন হয়ে গেল সকলের জানা কাহিনী-সম্বলিত সেই মহানাট্যের অভিনয়। মীর জাফর আলী খানের অভিনয় দেখেই নবাব সিরাজ পলাশী ছেড়ে দ্রুতগতিতে রাজধানীর পথ ধরলেন এবং রাজধানী থেকে গোপনে পাটনার পথে নৌকোয় উঠে বসলেন। পাশে তাঁর বেগম লুৎফুন্নিসা ও চার বছরের কন্যা উম্মে জহুরা। কিন্তু ধরা পড়লেন রাজমহলের নিকট। মীর জাফরের জামাতা মীর কাশেম পলাতক নবাবকে বেঁধে আনলেন মুর্শিদাবাদে। জগৎশেঠ আর ক্লাইভের উপদেশে আর নতুন নবাব-তনয় মীর মীরণের উৎসাহের আতিশয্যে সিরাজ সম্পর্কে যথাকর্তব্য সম্পন্ন করার আদেশ দিলেন নতুন নবাব মীর জাফর আলী খান। ৩ জুলাই আলীওয়ার্দী বেগমের দয়ায়

প্রতিপালিত এবং সদ্য মীরণ-অনুগত মুহম্মদী বেগ নির্মমভাবে হত্যা করল তরুণ নবাব সিরাজউদ্দৌলা মির্জা মুহম্মদকে। ওদিকে নতুন নবাবের উপাধি হলো ঃ

নবাব শুজা-উল-মুল্‌ক্ হাসামুদ্দৌলা মীর মুহম্মদ জাফর আলী খান মহব্বত জঙ্গ বাহাদুর।

৯৫. নবাব মীর জাফর আলী খান (১৭৫৭–১৭৬০ সাল)

মীর জাফর আলী খান সম্ভ্রান্ত বংশসম্ভূত, খান্দানী উপাধি সৈয়দ। দরিদ্র ছিলেন বলে জাফর আলী খান আলীওয়ার্দী খানের সংসারে অনুগৃহীত হন। আর সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান বলে আলীওয়ার্দী খান স্বীয় বৈমাত্রেয় ভগিনী শাহ্ খানমের সঙ্গে তাঁর বিবাহ্ দেন। তাঁদেরই প্রথম সন্তানের নাম মীর মীরণ এবং কন্যা মীর কাশেমের স্ত্রী। পরবর্তীকালে মীর জাফর আলীর কাজকাম দেখে শাহ্ খানম স্বামী-সান্নিধ্য পরিত্যাগ করে জামাতা মীর কাশেমের কাছেই বাস করতেন।

মীর জাফর ছিলেন সুদক্ষ যোদ্ধা। তাঁর এই দক্ষতার জন্য নবাব আলীওয়ার্দী তাঁকে সেনাপতির পদ প্রদান করেন। মারাঠাদের সঙ্গে যুদ্ধে মীর জাফর নিজ বীর্যবত্তার প্রমাণ রেখেছিলেন। কিন্তু পরে আলীওয়ার্দী খানের আত্মীয় আতাউল্লা খাঁর সঙ্গে পরামর্শক্রমে বাংলাকে বিভক্ত করে নিয়ে একাংশের শাসন কর্তৃত্ব লাভের আশায় আলীওয়ার্দীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহাত্মক কাজে লিপ্ত হন। আলীওয়ার্দী খান সেজন্য তাঁকে পদচ্যুত করেন। পরে আলীওয়ার্দী খানের বড় জামাতা নওয়াজিশ মুহম্মদ খাঁর অনুরোধে তাঁকে ক্ষমা করে পুনরায় সেনাপতির পদ দেওয়া হয়।

মীর জাফরের পরবর্তী বেঈমানী নবাব সিরাজের সঙ্গে। আর সেকথা তো সকলেরই জানা। পলাশীর বিয়োগান্ত নাটক প্রসঙ্গে ইংরেজ ঐতিহাসিক ম্যালিসন বলেন, "Nay more, no unbiased Englishman, sitting in judgment on the events which passed in the interval between the 8th February and the 23rd June, can deny that the name of Sirajuddaulah stands higher in the scale of honour than does the name of Clive. He (Sirajuddaulah) was the only one of the principal actors in that tragic drama who did not attempt to deceive."[১১]

মসনদে আরোহণ করেই ইংরেজদের দুর্ব্যবহারে নবাব মীর জাফর আলী খান অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে ওঠেন। তাঁর ইচ্ছা জাগে, ইংরেজদের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন নবাবের মতই বাংলা শাসন করবেন। এমন কি, মীর জাফর-পুত্র মীর মীরণেরও এমনি ইচ্ছা অধিকতর বলবতী ছিল। কিন্তু তখন যে সকল ক্ষমতা কর্নেল ক্লাইভের হাতে! কর্নেল ক্লাইভ বিলাতে লিখলেন ঃ

---

১১. Malleson's, Decisive Battles of India, P.76.

"In laying open the state of this government, I am concerned to mention that the present Nabob is a Prince of little capacity, and not at all blessed with the talent of gaining the love and confidence of his principal officers. His management threw the country into great confusion in the space of few months and might have proved of fatal consequence to himself but for our known attachment to him."[১২]

সকলের কাছে বাংলার এই নবাব অভিহিত হতে থাকলেন 'ক্লাইভের গর্দভ' বলে। অল্পদিনেই এই নবাব সাহেব টের পেলেন যে রাজকোষ অর্থশূন্য। দেশ চালাবেন কি করে ? সুচতুর ক্লাইভ তখন মীর জাফরকে বুঝালেন, 'সেনাবিভাগই সর্বাপেক্ষা ব্যয়বহুল; আমরাই যখন সিংহাসন রক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছি, তখন আর বহুসংখ্যক সিপাহী পুষিবার প্রয়োজন কি ? অর্ধেক সিপাহী বরখাস্ত করা হোক।'

তারপরের কাহিনী নিতান্ত বিরক্তিজনক। ১৭৬০ সালে কোম্পানী কর্তৃপক্ষ নবাব মীর জাফরকে বাংলার মসনদ থেকে সরিয়ে দিল। এবার নবান হলেন মীর কাশেম।

৯৬. নবাব মীর কাশেম আলী খান (১৭৬০–১৭৬৩ সাল)

বজ্রপাতেই হোক, আর ক্লাইভের চক্রান্তেই হোক– মীর জাফরের পুত্র মীর মীরণ আগেই নিহত হয়েছিল। ক্লাইভের চক্রান্তেই যদি মীর মীরণ নিহত হয়ে থাকে, তাহলে সে মৃত্যুর পিছনে মীর কাশেমেরও হাত ছিল বলে কোন কোন ঐতিহাসিকের ধারণা। যাক, পলাশীর ষড়যন্ত্র এতদ্দেশে যে আদর্শ স্থাপন করে গেছে, সে আদর্শ তখন সকল প্রধান ব্যক্তির মনে ঠাঁই করে নিয়েছে। মীর কাশেমের মনেও। ক্লাইভেরা এতদিন ধরে তা পর্যবেক্ষণ করেছেন, চিঠিপত্রের মাধ্যমে ক্রমে ক্রমে তা একটা নির্দিষ্ট রূপ লাভ করেছে এবং পরিণতি স্বরূপ নবাব মীর জাফরের স্থলে পরবর্তী নবাব হলেন মীর কাশেম– নবাব নাসির-উল-মুল্‌ক্ ইমতিয়ায্ উদ্দৌলা মীর মুহম্মদ কাশেম আলী খান নসরত জঙ্গ বাহাদুর।

নবাব মীর কাশেম জানতেন–একটা ঘৃণ্য আদর্শ অনুসরণ করে তিনি নবাব হয়েছেন। তবু তাঁর অদম্য বাসনা ছিল ঃ বাংলার স্বাধীনতাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবেন তিনি; আর তখন মুছে যাবে 'ঘৃণিত আদর্শ' অনুসরণ করে নবাবী লাভের কলঙ্ক। সেই লক্ষ্যে নীরবে তিনি কাজ করে যেতে থাকলেন। কিন্তু ইংরেজ যে তাঁর মনের বাসনা হৃদয়ঙ্গম করতেও সক্ষম! তবুও স্বাধীন বাংলার স্বপ্নে মশগুল থাকলেন নবাব মীর কাশেম। সে স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথেও তিনি অগ্রসর হলেন। আরম্ভ হলো ইংরেজের বিরুদ্ধে তাঁর প্রকাশ্য সংগ্রাম।

১২. Clive's letter to the Court of Directors, 23 December, 1757, Para 21.

ওদিকে দিল্লীভিত্তিক মুগল শক্তির জীর্ণ দেহে মৃত্যুর আলামত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তার অবসান শুধু সময়ের অপেক্ষায় দিন গুণছে। জীর্ণ দেহে তার শকুনির ক্রূরতায় ঝাঁপিয়ে পড়েছে নবোত্থিত উদ্ধত মারাঠা শক্তি। ইংরেজরাও বসে নেই। মুগলদের দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করতে তারা তৎপর। এমনি প্রেক্ষাপটে ইংরেজের বিরুদ্ধে আরম্ভ হলো বাংলার স্বাধীনতাকামী নবাব মীর কাশেমের অনমনীয় প্রতিরোধ সংগ্রাম। অবশেষে ১৭৬৩ সালে ইংরেজ কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ গদিচ্যুত করল নবাব মীর কাশেমকে। আবার নবাবের গদিতে বসানো হলো কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত অকর্মণ্য মীর জাফরকে। শুধু নামেমাত্র নবাব। প্রকৃত ক্ষমতা তখন বিদেশী ইংরেজের হাতে। আর রাজধানী ছেড়ে গদিচ্যুত নবাব মীর কাশেম তাঁর অনুগত বাহিনীসহ ইংরেজ বিতাড়নের লক্ষ্যে এদেশের প্রান্তর থেকে প্রান্তরে প্রতিরোধ-সংগ্রামী।

৯৭. নবাব মীর জাফর আলী খান (১৭৬৩–১৭৬৫ সাল)

The Nawab Meer Mahomed Cossim Allee Cawn having entered upon and committed acts of open hostility against the English nation, and the interest of the English United East India Company, we, on their behalf, are reduced to the necessity of declaring war against him; and having come to a resolution of placing the Nawab Meer Mahomed Jaffer Cawn Bahadur again in the Government, we now proclaim and acknowledge him as subahdar of the province of Bengal, Behar and Orissa. — The Proclamation.

আবার মীর জাফর! ইংরেজ কর্তৃপক্ষ আবার মীর জাফরকে বাংলার শাসনকর্তা হিসাবে অভিবাদন করে, তাঁর দেওয়া কর্তৃত্ব হাতে নিয়ে গদিচ্যুত নবাব মীর কাশেমের বিরুদ্ধে এক রণক্ষেত্র থেকে অন্য রণক্ষেত্রে ধাবমান! কাটোয়া, গিরিয়া, উধুয়ানালা। প্রতিটি রণক্ষেত্রে মীর কাশেম জয় করায়ত্ত করার পূর্ব মুহূর্তে এদেশীয়দের বিশ্বাসঘাতকতায় পরাজিত।

যখন সকল স্থানই ইংরেজ কবলে নিপতিত, তখন অযোধ্যার নবাব শুজাউদ্দৌলার আশ্রয় গ্রহণ করে সেখান থেকে বাংলার স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের প্রবল বাসনা নিয়ে মীর কাশেম বাংলা ত্যাগ করলেন। কিন্তু অচিরেই মীর কাশেম উপলব্ধি করলেন যে, মুগল শক্তি মরণোন্মুখ। অযোধ্যায় তাঁর আশা পূর্ণ হলো না, আশা পূর্ণ হলো না দিল্লীতে গিয়েও। ১৭৬৫ সালে দিল্লীর 'বাদশা' বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী সনদ প্রদান করেন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে, নিজামতের দায়িত্ব থাকে শুধু নবাবের হাতে। অর্থাৎ অর্থ-সম্পদের কর্তৃত্ব থাকল বিদেশী বেনিয়ার উপর, আর রাজ্য শাসনের দায়িত্ব থাকল শক্তিহীন সম্পদহীন নবাব-নাজিমের উপর।

সব আশা, সব ভরসা হারিয়ে ফকিরের বেশে পথে বের হলেন একদা নবাব মীর কাশেম। আর ১৭৭৭ সালে কপর্দকহীন অবস্থায় ভিখারীর বেশে মরে পড়ে থাকলেন দিল্লীর পথের উপর। এর আগে ১৭৬৫ সালের জানুয়ারি মাসে ঘনিষ্ঠতম সহচর ও বন্ধু মহারাজা নন্দকুমারের দ্বারা আনীত দেবী কিরীটেশ্বরীর চরণামৃত পান করে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন দুরারোগ্য কুষ্ঠরোগী নবাব মীর জাফর আলী খান।

এই অধ্যায়ের প্রধান দু'টি চরিত্রের একজন নবাব মুর্শিদ কুলী খান এবং অন্যজন নবাব আলীওয়ার্দী খান। তদুপরি আছেন নবাব সিরাজউদ্দৌলা, নবাব মীর জাফর আলী খান ও নবাব মীর কাশেম। এঁদের সম্পর্কে বিভিন্ন ঐতিহাসিকের মন্তব্যের প্রয়োজন আছে।

বাংলার জীবন-ধারার উপর মুর্শিদ কুলী খান ও আলীওয়ার্দী খানের প্রভাব সম্পর্কে বলতে গিয়ে স্যার যদুনাথ সরকার বলেন, "In the first half of the 18th century when disorder and revolution were desolating other provinces of the dying Mughal empire, it was the singular good fortune of Bengal that it passed into the hands of two rulers of exceptional ability, strength of character and long life. For over half a century Murshid Quli and Alivardi Khan between them maintained peace, increased the wealth and trade of the country, and above all else cast the administration into a new mould, which it retained long after the sceptre had passed into British hands ....

Murshid Quli and Alivardi between them also gave this province a peace unknown in that age elsewhere in India."[১৩]

তবু স্বীকার করতেই হবে, নবাব মুর্শিদ কুলী খান রাজ্য রক্ষার তেমন কোন উদ্যোগই গ্রহণ করেন নি। নিয়মিত সেনাবাহিনী বলতে তাঁর সময় ছিল মাত্র ২০০০ অশ্বারোহী এবং ৪০০০ পদাতিক সৈন্য। তাও-ও এই বাহিনীর প্রশিক্ষণের সুব্যবস্থাও যেমন ছিল না, তেমনি ছিল না উপযুক্ত পরিমাণ যুদ্ধ সরঞ্জাম। "In the hour of foreign attack his successor was to learn that an army cannot be improvised in a day. The artillery (including the musketeers) was starved of the powder and shot required in training and had to rust without practice or improvement in the type of its guns. ... The incredible numbers between the victors and the vanquished at Plassey is a matter of shame to us, no doubt; but still more humiliating is the political blindness and administrative corruption of the preceding

---

১৩. Sir Jadunath Sarkar, History of Bengal, Vol. II, The University of Dacca, 1972, p. 397.

years which made such a defeat of the Nawabi Government possible."[১৪]

পলাশীর ব্যাপারটা যে বাঙালী জাতির জন্য খুবই লজ্জাজনক, এতে দ্বিমতের কোন অবকাশ নেই। তবে লজ্জাটা বীরত্বের অভাবের জন্য যতটা নয়, তার অনেক বেশি চারিত্রিক অধঃপতনের জন্য। পলাশী ষড়যন্ত্রের জন্য। একটা ষড়যন্ত্র ছাড়া ওটা যে কোন 'যুদ্ধ'ই ছিল না, বিভিন্ন ঐতিহাসিকদের বক্তব্য থেকেই তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ঐতিহাসিক নিখিলনাথ রায়-এর কথায়, "নিরপেক্ষ ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করে থাকেন যে, পলাশীতে প্রকৃত যুদ্ধ ঘটে নাই, ইংরেজেরা একরূপ বিনা যুদ্ধেই পলাশীতে জয়লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই জয়লাভ তাঁহাদিগকে জগতের মধ্যে অজেয় করিয়া তুলিয়াছে। এই বিজয়ের কারণ, কেবল বিশ্বাসঘাতকদিগের ষড়যন্ত্র ও সিরাজউদ্দৌলার কাপুরুষতা! যদি নবাবের সেনাপতিগণ স্ব স্ব কর্তব্য পালন করিতেন, অথবা মীরমদনের পতনের পর সিরাজ মোহনলালের সহিত নিজে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেন, তাহা হইলে উত্তাল তরঙ্গসঙ্কুল মহাসমুদ্রসমান নবাব সৈন্যের নিকট মুষ্টিমেয় ইংরেজ তৃণগুচ্ছ যে কোথায় ভাসিয়া যাইত, তাহা বলিতে পারা যায় না।"[১৫] ঐতিহাসিক ম্যালিসন বলেন, "Yes I as a victory, Plassey was, in its consequences perhaps the greatest ever gained. But, as a battle, it is not in my opinion, a matter to be very proud of. In the first place, it was not a fair fight. Who can doubt that if the three principal generals of Sirazu'ddaulah had been faithful to their master Plassey would not have been won ? Up to the time of the death of Mir Mudin Khan the English had made no progress; they had even been forced to retire. They could have made no impression on their enemy had the Nuwab's army, led by men loyal to their master, simply maintained their position. An advance against the French guns meant an exposure of their right flank to some 40,000 men. It was not to be thought of. It was only when treason had done her work, when treason had driven the Nuwab from the field, when treason had removed his army from its commanding position, that Clive was able to advance without the certainty of being annihilated. Plassey then, though a decisive, can never be considered a great battle."[১৬] আরও ইংরেজ ঐতিহাসিক পলাশীর যুদ্ধকে ষড়যন্ত্রভিত্তিক যুদ্ধের

---

১৪. ibid, p. 398.

১৫. শ্রীনিখিলনাথ রায়, মুর্শিদাবাদ-কাহিনী, তৃতীয় সংস্করণ, ১৩১৬ সন, পৃ. ২১৯-২২০।

১৬. Malleson's Decisive Battles of India, Plassey, P. 73.

অভিনয় হিসাবেই বর্ণনা করেছেন (See Transactions in India, pp, 35-37 এবং Bolt's Consideration, p. 40)

"ষড়যন্ত্রটা আসলে হিন্দুদেরই ষড়যন্ত্র। পশ্চিমবঙ্গে তখন বীরভূম ছাড়া আর সব বড় বড় জায়গাতেই হিন্দু জমিদার। সিরাজউদ্দৌলার হাতে তাঁদের নাকালের এক-শেষ। প্রকাশ্যে না হলেও, ভিতরে ভিতরে প্রায় সব জমিদারই এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে প্রধান নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়। ..... বাংলাদেশের মহাজনদের মাথা জগৎশেঠদের বাড়ির কর্তা মহাতাবচাঁদ। জগৎশেঠরা জৈন সম্প্রদায়ের লোক হলেও অনেকদিন ধরে বাংলাদেশে পুরুষানুক্রমে থাকায় তাঁরা হিন্দু সমাজেরই অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। সিরাজউদ্দৌলার হাতে প্রত্যহই মহাতাবচাঁদকে কিছু না কিছু অপমান সহ্য করতে হয়। .... তিনিই ইংরেজদের সঙ্গে গোপনে তাঁর উকিল রঞ্জিৎ রায়ের মারফত কথা চালাতে লাগলেন। ইংরেজদের পক্ষে রইলেন উমিচাঁদ। ... হিন্দু সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে এই দলের পাণ্ডা হলেন রায় দুর্লভরাম। .... হুগলিতে রইলেন নন্দকুমার। উমিচাঁদ ইংরেজদের হয়ে তাঁকে অনেক টাকার লোভ দেখিয়ে রেখেছিলেন নন্দকুমার ইংরেজদের গতিবিধি সম্বন্ধে নবাব সরকারে যতসব উট্‌কো খবর পাঠাবার ভার নিলেন।

হিন্দুদের চক্রান্ত হলেও বড় গোছের মুসলমান ত্মে অন্তত একজন চাই। নইলে সিরাজউদ্দৌলার জায়গায় বাংলার নবাব হবেন কে ? ক্লাইভ তো নিজে হতেই পারেন না। হিন্দু গভর্নরও কেউ পছন্দ করবেন কিনা সন্দেহ। সেই আকবর বাদশার আমলে যা একবার মানসিংহ বাংলার গভর্নর হয়ে এসেছিলেন, তারপর আর কোনো হিন্দু বাংলাদেশের গভর্নর হয়েছিলেন বলে তো দেখতে পাচ্ছিনে। দিল্লির বাদশা কোনো হিন্দুকে বাংলার গভর্নরি পরোয়ানা দেবেন বলে তো কারুর বিশ্বাস হয় না। সুতরাং মুসলমান একজনকে নবাবি মসনদ নেবার জন্যে জোগাড় করতেই হয়।

জগৎশেঠরা তাঁদেরই আশ্রিত ইয়ার লুত্‌ফ খাঁকে সিরাজউদ্দৌলার জায়গায় বাংলার মসনদে বসাতে মনস্থ করেছিলেন। উমিচাঁদেরও এতে সায় ছিল। কিন্তু ক্লাইভ ঠিক করলেন অন্য রকম। তিনি এমন লোককে নবাব করতে চান যিনি ইংরেজদেরই তাঁবে থেকে তাঁদেরই কথা শুনে নবাবি করবেন। অবশ্য মনের কথাটা তিনি মনেই রেখে দিলেন। প্রকাশ্যে বললেন, এমন লোকের নবাব হওয়া উচিত, যাঁকে সকলে মানবে। ইয়ার লুত্‌ফ কাজের লোক হলেও খানদানী আদমি নন। তিনি নবাব হলে নবাবি পদের জন্যে আবার লড়াই বেঁধে যাবে। অবশেষে জগৎশেঠও ক্লাইভের কথাটা যুক্তিসঙ্গত বলে মেনে নিলেন।

ক্লাইভ মনে মনে মীর জাফরকেই ভাবী নবাবি পদের জন্যে মনোনীত করে রেখেছিলেন। তিনি মীর জাফরকে এখনো চোখে দেখেন নি, শুধু ওয়াট্‌সের বর্ণনা

পড়েই মনস্থির করেছিলেন। আশ্চর্য বুদ্ধি। তিনি ইংরেজদের পক্ষে ঠিক উপযুক্ত লোকই বেছে নিতে পেরেছিলেন। ... মীর জাফর চিরকালের বিশ্বাসঘাতক। বাংলার নবাব হবার বাসনা তাঁর অনেক দিনের। বরগির হাঙ্গামার সময় আলীবর্দীকে খুন করিয়ে বাংলার মসনদ নেবার চেষ্টাও একবার করেছিলেন; কিন্তু শেষ পর্যন্ত পেরে ওঠেন নি। তারপর শৌকত জঙ্গের সঙ্গে মিশে সিরাজউদ্দৌলারও সর্বনাশ করার চেষ্টায় ছিলেন। এবার আবার বাংলার নবাবি পদের লোভে তিনি সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করতে রাজী হয়ে গেলেন। ফলাফল ভালো করে বিবেচনা না করেই ইংরেজরা যা যা শর্ত দিলেন, তার সব কটাই মীর জাফর কবুল করে বসলেন। রাজদণ্ড এমনিই লোভের জিনিস।"[১৭]

এরই পরিণামে ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশীতে অভিনীত হয়ে গেল এই ষড়যন্ত্রের 'যুদ্ধ' নামক প্রহসনের অভিনয়। 'মুর্শিদাবাদ নিয়াবত' কালে ১৭৫৭ সালের ২৩ জুনই একমাত্র ষড়যন্ত্রমূলক যুদ্ধ দিবস নয়। অন্য কথায়, পলাশীই শুধুমাত্র বাংলার বিপর্যয়ক্ষেত্র নয়। বিপর্যয়ক্ষেত্র আর দু'টি আছে; তা হচ্ছে গিরিয়ারই দু'টি ভিন্ন ক্ষেত্র। তার একটিতে ১৭৪০ সালের ৯ এপ্রিলে, অন্যটিতে ১৭৬৩ সালের ২ আগস্ট সংঘটিত হয়েছিল দু'টি যুদ্ধ; দু'টিতেই ষড়যন্ত্র ছিল যুদ্ধের ফলাফল নির্ণায়ক। প্রথমটিতে নবাব সরফরাজ খাঁর পরাজয় ও মৃত্যু এবং আলীওয়ার্দী খানের বাংলার মসনদ প্রাপ্তি, দ্বিতীয়টিতে নবাব মীর কাশেমের পরাজয় এবং বাংলার ভাগ্য-নিয়ন্তারূপে ইংরেজদের সুনিশ্চিত অভ্যুদয়। কালানুক্রমিকভাবে বলা যায় গিরিয়া, পলাশী, গিরিয়া–৯ এপ্রিল ১৭৪০ সাল, ২৩ জুন ১৭৫৭ সাল এবং ২ আগস্ট ১৭৬৩ সাল। বাংলার ভাগ্য বিপর্যয়ের জন্য ঐ তিনটি সময়ের তিনটি যুদ্ধ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ; সেই সঙ্গে এদেশীয় হিন্দু-মুসলমান প্রধানদের চরিত্র চিহ্নিতকারী দৃষ্টি আকর্ষণকারী তিনটি কালো দিবস। মধ্যের দ্বিতীয় কালো দিবস অর্থাৎ পলাশীর কথা আগেই বলা হয়েছে। এবার প্রথম ও তৃতীয় কালো দিবসটির কথা।

"গিরিয়ার প্রথম যুদ্ধ নবাব সরফরাজ খাঁ ও আলীবর্দী খাঁর মধ্যে সংঘটিত হয়। নবাব সরফরাজ খাঁকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া আলীবর্দীকে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার একেশ্বর করিবার জন্য সরফরাজের মন্ত্রী হাজী আহ্মদ, জগৎশেঠ, ফতেচাঁদ ও রায়রায়ান আলমচাঁদ প্রমুখ যে ষড়যন্ত্রের সূচনা করেন, গিরিয়া যুদ্ধে তাহার অভিনয় শেষ হয় এবং নবাব সরফরাজকে চিরদিনের জন্য মরধাম পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল"।[১৮] এই অভিনয়ে অংশগ্রহণকারী প্রধান চরিত্রগুলো হচ্ছে নবাব শুজাউদ্দীন মুহম্মদ খানের পুত্র

---

১৭. তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়, পলাশির যুদ্ধ, ১৯৫৩, পৃ. ১৫৮–১৬০।

১৮. শ্রীনিখিলনাথ রায় বি, এল, মুর্শিদাবাদ-কাহিনী, তৃতীয় সংস্করণ, ১৩১৬ সন, পৃ. ১১০–১১১।

নবাব সরফরাজ খাঁ, হাজী আহ্‌মদ, আলীওয়ার্দী খাঁ, জগৎশেঠ ফতেচাঁদ, রায়রায়ান আলমচাঁদ প্রমুখ। অপুত্রক নবাব মুর্শিদ কুলী খাঁর পুত্র হচ্ছেন নবাব সরফরাজ খাঁ।

"It is not known whether Shuja al-Din Khan had sought the emperor's sanction or confirmation of this arrangement. Probably he did not do so in view of the fact that the central government then lay prostrate before Nadir Shah. Shuja al-Din was careful, however, to recommend to his son to regard Haji Ahmad, the Rai Raiyan 'Alam Chand and the Jagat Seth Fateh Chand' as the representatives of his father, and implicitly their advice in all affairs of moment."[১৯]

হাজী আহ্‌মদ আলীওয়ার্দী খার বড় ভাই। এঁদের পরিবার আগে ছিল দিল্লীর বাসিন্দা। দিল্লীর মসনদ নিয়ে শাহ্‌জাদাদের মধ্যে যখন খুনাখুনি চলছে, তখন সেই পরিবার চলে আসে উড়িষ্যায়, সেখানকার নায়েব-সুবাদার শুজাউদ্দীন খাঁর আশ্রয়ে। প্রথমে আসেন আলীওয়ার্দী। শুজাউদ্দীন খাঁর দরবারে সমাদৃত হওয়ার পর আলীওয়ার্দী দিল্লী থেকে বড় ভাই হাজী আহ্‌মদকেও সুবে বাংলায় চলে আসতে বলেন। সপরিবারে হাজী আহ্‌মদ কটকে এসে উপস্থিত হন। তিন ছেলেসহ উপযুক্ত কাজও পেয়ে যান হাজী আহ্‌মদ। কালক্রমে হাজী আহ্‌মদ ও আলীওয়ার্দী হয়ে ওঠেন শুজাউদ্দীন খাঁর বিশ্বস্ত সাহায্যকারী। নবাব মুর্শিদ কুলী খাঁর মৃত্যুর পর বাংলা ও উড়িষ্যার নবাব হলেন শুজাউদ্দীন খাঁ এবং কিছুকালের মধ্যে বিহারের সুবাদারিও পেয়ে যান তিনি। কাজের সুবিধার জন্য তিনি বিহারের নায়েব-সুবাদার নিযুক্ত করেন আলীওয়ার্দী খানকে। আর মুর্শিদাবাদের হাজী আহ্‌মদ নিযুক্ত হন শুজাউদ্দীনের মন্ত্রণাদাতা।

জগৎশেঠ কোন ব্যক্তির নাম নয়, সুদী কারবারী পরিবারের একটা উপাধি। রাজপুতনার যোধপুরের অন্তর্গত নাগর প্রদেশের জৈন সম্প্রদায়ভুক্ত জনৈক হীরানন্দ দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পাওয়ার আশায় পাটনায় চলে এসে খুবই ছোটখাটো ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করেন। তারপর একদিন এই দরিদ্র হীরানন্দ হয়ে ওঠেন রূপকথার রাজপুত্র। 'গুপ্তধন' লাভের মাধ্যমে হয়ে যান প্রচুর ধন-সম্পদের মালিক। "অল্পকাল মধ্যে হীরানন্দ বিপুল সম্পত্তির অধীশ্বর হইয়া আপনার সাত পুত্রকে ভারতের সাত স্থানে গদীয়ানের কার্যে নিযুক্ত করিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র মানিকচাঁদ হইতে মুর্শিদাবাদের জগৎশেঠদিগের উৎপত্তি। যৎকালে ঢাকা নগরী বাংলার রাজধানী পদে প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেই সময়ে মানিকচাঁদ ঢাকায় আসিয়া আপনার গদি সংস্থাপন করেন। এই সময়ে মুর্শিদ কুলী খাঁ বাংলার দেওয়ান হইয়া ঢাকায় উপস্থিত হন। রাজস্ব সম্বন্ধে মুর্শিদের হস্তে সমুদয়

১৯. Dr Muhammad Mohar Ali, History of the Muslims of Bengal, Vol. IA, Imam Muhammad Ibn Sa'ud Islamic University, Riyadh, 1985, p. 598.

ভার অর্পিত হওয়ায়, অর্থের প্রয়োজনবশত মানিকচাঁদের সহিত তাঁহার বিলক্ষণ সৌহার্দ্য ঘটে। তাহার পর নবাব আজিমওশ্বানের সহিত মুর্শিদের মনোবিবাদ উপস্থিত হইলে, দেওয়ান মুর্শিদ কুলী ১৭০৪ খৃঃ অব্দে ঢাকা পরিত্যাগ করিয়া মুর্শিদাবাদে আপনার বাসস্থান নির্দ্দেশ করিলে, রাজস্ব বিভাগের যাবতীয় কর্মচারী ও শেঠ মানিকচাঁদও মুর্শিদাবাদে আসেন। .... মুর্শিদকুলী খাঁর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানিকচাঁদেরও শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকে। ... নবাবের অনুমতিতে বৎসরের প্রথমে প্রতি বারই পুণ্যাহ হইত। এই সময়ে যাবতীয় জমিদার অথবা তাঁহাদের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত হইয়া আপন আপন দেয় রাজস্ব প্রদান করিতেন। সেই রাজস্ব দিল্লীতে প্রেরিত হইত। কিন্তু নগদ টাকা প্রেরণে, সময়ে সময়ে অসুবিধা ঘটিত বলিয়া, শেঠগণ রাজস্ব প্রেরণের ভার গ্রহণ করেন, দিল্লী ও আগরাতে শেঠ মানিকচাঁদের অন্যান্য ভ্রাতাদের যে কুঠী ছিল, তাহাতেই হুণ্ডি পাঠান হইত, পরে তাঁহারা বাদশাহ-সরকারে সমস্ত টাকা উপস্থিত করিতেন। এইরূপে বাংলার সমস্ত রাজস্ব দিল্লীর রাজকোষে নিরাপদে উপস্থিত হইত। ... সরকারী অর্থ ব্যতীত নবাবের নিজ অর্থও শেঠদিগের হস্তে ন্যস্ত থাকিত। এইরূপে প্রবাদ আছে যে, মুর্শিদ কুলীর মৃত্যু সময়ে তাঁহাদিগের নিকট নবাবের প্রায় ৭ কোটি টাকা গচ্ছিত ছিল, এবং মুর্শিদের পরবর্তী কোন নবাব তাহা পুনঃপ্রাপ্ত হন নাই। মুর্শিদ কুলী খাঁর সহিত মানিকচাঁদের বিশিষ্টরূপ সৌহার্দ্দ থাকায় নবাব ১৭১৫ খৃঃ অব্দে বাদশাহ ফর্‌খশেরের নিকট হইতে শেঠ উপাধি আনাইয়া তদ্দারা মানিকচাঁদকে ভূষিত করেন। ১৭২২ খৃ. অব্দে মানিকচাঁদ পরলোক গমন করেন। .... মানিকচাঁদ অপুত্রক থাকায় স্বীয় ভাগিনেয় ফতেচাঁদকে আপনার পোষ্যপুত্র ও উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া যান। বারানসীর প্রধান শেঠ উদয়চাঁদের সহিত মানিকচাঁদের ভগিনী ধনবাই-এর বিবাহ হয়। ফতেচাঁদ তাঁহাদেরই পুত্র। ..... শেঠ বংশীয়দের মধ্যে ফতেচাঁদই প্রথম 'জগৎশেঠ' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। রিয়াজুস্ সালাতীন গ্রন্থে লিখিত আছে যে, যৎকালে সম্রাট ফরখ্‌শের দিল্লীর সিংহাসন অধিকারের জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন, সেই সময়ে তিনি বারানসীর বিখ্যাত মহাজন নগর শেঠের নিকট হইতে অর্থ সাহায্য গ্রহণ করেন। সম্রাট হওয়ার পর তিনি প্রত্যুপকারস্বরূপ নগর শেঠের ভাগিনেয় ও গোমস্তা ফতেচাঁদকে 'জগৎশেঠ' উপাধিতে ভূষিত করিয়া বাংলার রাজস্বের ফৌতদারী (পোদ্দারী) পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।"[২০]

এই তো হলো জগৎশেঠদের পরিচয়। এখানে উল্লেখ্য যে, ১৭৪০ সালের গিরিয়ার ষড়ষন্ত্রে জড়িত জগৎশেঠ ছিলেন এই ফতেচাঁদ; ১৭৫৭ সালের পলাশী-ষড়যন্ত্রে জড়িত জগৎশেঠ ছিলেন মহাতপচাঁদ। জগৎশেঠ ফতেচাঁদের মৃত্যু হয় ১৭৪৪ সালে। তাঁর ছিল

২০. শ্রীনিখিলনাথ রায় বি, এল, মুর্শিদাবাদ-কাহিনী, তৃতীয় সংস্করণ, ১৩১৬ সন, পৃ. ৫১-৫৬।

তিন পুত্র– আনন্দচাঁদ, দয়াচাঁদ ও মহাচাঁদ। আনন্দচাঁদ ও দয়াচাঁদ পিতার জীবদ্দশাতেই মৃত্যুবরণ করায় পৌত্র মহাতপচাঁদ ও স্বরূপচাঁদকে ফতেচাঁদ উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যান। "মহাতপচাঁদ আনন্দচাঁদের ও স্বরূপচাঁদ দয়াচাঁদের পুত্র। বাদশাহের নিকট হইতে মহাতপচাঁদ 'জগৎশেঠ' ও স্বরূপচাঁদ 'মহারাজ' উপাধি লাভ করেন। এই সময়ে শেঠদিগের উন্নতি চরম সীমায় উপনীত হয়। ... এই সময় হইতে শেঠদিগের সহিত ইংরেজদের সম্বন্ধ প্রগাঢ় হইতে আরম্ভ হয়।"[২১] এবং ১৭৬৩ সালে গিরিয়ার দ্বিতীয় ষড়যন্ত্র যুদ্ধের সময়েও জড়িত ছিলেন এই মহাতপচাঁদই, সঙ্গে ছিলেন চাচাতো ভাই মহারাজ স্বরূপচাঁদ।

মুর্শিদ কুলী খাঁর সময় থেকেই বাংলায় কানুনগোর পদে নিযুক্ত ছিলেন শিবনারায়ণ। নবাব শুজাউদ্দীন মুহম্মদ খান শিবনারায়ণকে কানুনগো রেখেই আলমচাঁদ নামক একজন বিশ্বস্ত কর্মচারীকে খালসার দেওয়ানী পদে নিযুক্ত করে সম্রাট দরবার থেকে তাঁর জন্য 'রায়রায়ান' উপাধি এনে আলমচাঁদকে ভূষিত করেন। বাংলায় এই উপাধিধারী আলমচাঁদই প্রথম ব্যক্তি। রায়রায়ান রাজস্ব মন্ত্রীর কাজ করতেন।

আবার ফতেচাঁদের কথায় আসা যাক। নবাব মুর্শিদ খুলী খাঁ মৃত্যুর আগে বন্ধু জগৎশেঠ ফতেচাঁদের কাছে ৭ কোটি টাকা যে গচ্ছিত রেখেছিলেন তার কারণ– মুগলশাহীর নিয়ম অনুসারে সাম্রাজ্যের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মৃত্যুর পর তাঁদের সঞ্চিত ধন-সম্পদ দিল্লীর রাজকোষে জমা দিতে হতো; সব সঞ্চিত ধন-সম্পদই হয়ে যেত রাজকীয় সম্পদ। তাই নিজের বংশধরদের জন্য সঞ্চিত অর্থ যাতে দিল্লীর রাজকোষে চলে না যায়, তারই জন্য মুর্শিদ কুলী খাঁ পরম বন্ধু জগৎশেঠের কাছেই তা গচ্ছিত রেখেছিলেন। কিন্তু শুজাউদ্দীনের মৃত্যুর পর সরফরাজ খাঁ যখন নবাব হলেন, তখনই ঐ টাকা তিনি ফেরত চাইলেন। "মুর্শিদ কুলী খাঁর মৃত্যু সময়ে শেঠদিগের নিকট তাঁহার নিজের যে ৭ কোটি টাকা গচ্ছিত ছিল, এ পর্য্যন্ত তাহা প্রত্যর্পিত না হওয়ায়, সরফরাজ ফতেচাঁদকে অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করিতে থাকেন, এমন কি, তাঁহার প্রতি অপমানসূচক বাক্য পর্যন্ত প্রয়োগ করিয়াছিলেন। তজ্জন্য সেই বৃদ্ধ জগৎশেঠ দুর্মতি নবাবকে পদচ্যুত করিতে কৃতসংকল্প হন। ... যাহা হউক, সরফরাজকে পদচ্যুত করিবার জন্য এক ষড়যন্ত্রের আয়োজন হইল। হাজী আহমদ আলমচাঁদ ও জগৎশেঠ সকলেই অপমানিত হওয়ায়, নিজ নিজ অবমাননার প্রতিশোধের জন্য তৎপর হইলেন। তাঁহারা পাটনা হইতে আলিবর্দী খাঁকে আহ্বান করিলেন।"[২২] আর আলীওয়ার্দী খাঁও রাজ্যলোভে তাঁর ভাগ্য নির্মাতা নবাব শুজাউদ্দীনের পুত্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে এগিয়ে গেলেন। নবাব সরফরাজ খাঁ যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হলেন, আর বাংলার মসনদে অধিষ্ঠিত হলেন নবাব আলীওয়ার্দী খাঁ।

২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২।
২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬ এবং ৫৮।

এই ঘটনার প্রায় ১৭ বছর পর পলাশীর ষড়যন্ত্র এবং পলাশী ষড়যন্ত্রের প্রায় ৬ বছর পর গিরিয়ার দ্বিতীয় ষড়যন্ত্রমূলক যুদ্ধ। এই যুদ্ধেও নবাব মীর কাশেমের বিপক্ষে এবং ইংরেজদের সপক্ষে কাজ করছিলেন জগৎশেঠ মহাতপচাঁদ ও মহারাজ স্বরূপচাঁদ। গিরিয়ার যুদ্ধে নবাব মীর কাশেমের পরাজয় ঘটে। "গিরিয়ার বিস্তৃত সমরক্ষেত্রকে কোন ঐতিহাসিক (H. Beveridge, Calcutta Review, April, 1893) মুর্শিদাবাদের পানিপথ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। পানিপথক্ষেত্র যেরূপ ভারত সাম্রাজ্যের রাজধানী দিল্লী নগরীর নিকটে অবস্থিত, গিরিয়ার বিশাল রণভূমিও সেইরূপ বঙ্গরাজ্যের রাজধানী মুর্শিদাবাদ হইতে অধিক দূরে নহে। পানিপথে যেরূপ মোগল-সাম্রাজ্য স্থাপনের সূচনা ও মহারাষ্ট্রীয় শক্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়, গিরিয়ায়ও সেইরূপ আলীবর্দী খাঁর রাজ্যপ্রাপ্তি ও মীর কাশেমের বাঙ্গলা হইতে চিরবিদায় সংঘটিত হয়। পলাশীর ন্যায় গিরিয়াও মুর্শিদাবাদের একটি স্মরণীয় স্থান। উভয়েই মুর্শিদাবাদ হইতে প্রায় সমদূরবর্তী এবং এই দুইট প্রান্তর ব্যতীত মুর্শিদাবাদের আর কোন স্থল প্রকৃত সমরক্ষেত্রে পরিণত হয় নাই। পলাশীতে ইংরেজ রাজত্বের সূচনা হয়, কিন্তু গিরিয়াতে তাহার পথ একরূপ নিষ্কণ্টক হইয়া যায়। .... মীর কাশেমের সৈন্যের সহিত ইংরেজদিগের শেষ যুদ্ধ গিরিয়াতেই হইয়াছিল।"[২৩]

কিন্তু বাংলার মসনদ নিয়ে এত যে ষড়যন্ত্র, তার কারণ অনুসন্ধান করলে কি উত্তর পাওয়া যায় ? এ প্রসঙ্গে তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের মন্তব্যটা প্রণিধানযোগ্য, "শিবাজী যখন লেগে-পড়ে আস্তে-আস্তে এক রাজ্য গড়ে তুলছিলেন তখন হিন্দুস্থানের সব হিন্দুই পরম আগ্রহে তাঁর দিকে তাকিয়েছিলেন। তাঁদের মনে হল, এতদিনে বুঝি তাঁদের উদ্ধারকর্তা এক অবতার এলেন। ....

কিন্তু হিন্দুস্থানে সর্বদাই যা হয়ে এসেছে, এ ক্ষেত্রেও তাই ঘটল। মহৎ প্রতিষ্ঠান এ দেশে বড় বেশিদিন টেকে না। প্রতিষ্ঠাতার মৃত্যুর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সেটা ভেঙে পড়ে। যেই তিনি সরে যান ওমনি কতকগুলো নীচ স্বার্থবুদ্ধির লোকেরা মাথা জাগিয়ে ওঠে। নিজেদের মধ্যে দলাদলির সৃষ্টি করে, তুচ্ছ বিষয় নিয়ে মান-অভিমান করে মারামারি লাগিয়ে দেয়। কেউ-ই এক প্রাণ নয়। সবাই স্ব-স্ব-প্রধান। ফলে, সবই মাটি!

মারাঠাদেরও বড়-বড় সর্দাররা নিজেদের এক-এক এলাকা ভাগ করে নিলেন। তাঁদের পরস্পরের উপর পরস্পরের প্রচণ্ড ঈর্ষা। সেই সময় নাগপুরের মারাঠাঘাঁটির সর্দার রঘুজি ভোঁসলে। তাঁর প্রধান মন্ত্রী কূটবুদ্ধির এক ব্রাহ্মণ, নাম ভাস্কররাম। সংক্ষেপে লোকে তাঁকে ভাস্কর পণ্ডিত বলেই ডাকত।

---

২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮।

রাজা-মন্ত্রীর দু'জনেরই ইচ্ছে, ডাকাতি করে বাংলাদেশটাকে কেড়ে নিয়ে নাগপুরের সঙ্গে যোগ করে দেওয়া। তখন বাংলাদেশ বলতে তার সঙ্গে বিহার আর উড়িষ্যাকেও বোঝাত।

মৃত নবাব সরফরাজ খাঁর আত্মীয়বন্ধুরা আলীবর্দীর উপর শোধ নেবার সুযোগ খুঁজছিলেন। এইবার সুবিধে পেয়ে তাঁরা রঘুজিকে বাংলায় আসবার জন্যে নিমন্ত্রণ করে পাঠালেন।"[২৪]

ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে বাংলার "হিন্দু ষড়যন্ত্রকারীদের" স্বপ্নটাকে হয়তো বা নাগপুর-স্বপ্নের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা যায়। আর "মুসলমান ষড়যন্ত্রকারীদের" লোভ ও বোকামির সঙ্গে এক কথায় চরিত্রহীনতার সঙ্গে মিলিয়ে দেখা যায়। কিন্তু বাংলার "হিন্দু ষড়যন্ত্রকারীদের" নাগপুরী ভাই বর্গীদের হাত থেকে যে বাংলার "ছেলে-বুড়ো ধনী-নির্ধন পণ্ডিত-মুর্খ স্ত্রী-পুরুষ, কি পৈতেধারী ব্রাহ্মণ কি পৈতেহীন শূদ্র, কি কীর্তনকারী বৈষ্ণব কি বামাচারী শাক্ত, কি হিন্দু কি মুসলমান, কারুরই এই মারাঠা-ডাকুদের হাত থেকে নিষ্কৃতি ছিল না।"[২৫]

আমাদের তো মনে হয়, এসব ষড়যন্ত্র ছিল সামগ্রিক চরিত্রহানিজনিত লোভ-লালসারই পরিণাম। চরিত্রহানিজনিত লোভ-লালসা না থাকলে নবাব আলীওয়ার্দীর উপর প্রতিশোধ নেবার বাসনায় নবাব সরফরাজ খাঁর আত্মীয়বন্ধুরা মুসলমানদের শত্রু মারাঠা বর্গীদেরকে বাংলা আক্রমণের প্ররোচনা দেবেন কেন, আর শিবাজীর উত্তরাধিকারীরাও মুসলমানদের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার হিন্দুদের উপরও এমন অকথ্য অত্যাচার চালাবে কেন? "বরগিদের হাঙ্গামা বর্বরতার চরম সীমায় গিয়ে পৌঁছিয়েছিল। লোকের মনে হতো, বনের পশুরাও তাদের চেয়ে ভালো। সেই সময়ের এক ইংরেজ পর্যটক লিখে গেছেন, ভারতবর্ষের কোনো জায়গায় বরগিদের মতন এমন নিষ্ঠুর অত্যাচারী লোক দেখা যায় নি। এমন কি বুনো কাফ্রিদের মধ্যেও এমন ধারা জঘন্য কাণ্ড নেই।"[২৬]

* * * * *

মুঘল আমলে বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা

দু'শ' বছরেরও বেশি সময় ধরে স্বাধীন বাংলার সুলতানী আমলে এ দেশের সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশ একটা সুস্থির রূপ লাভ করে। কিন্তু এই আমলের অবসানে ১৫৩৮ থেকে ১৫৭৫ সাল পর্যন্ত ৩৭ বছরের জন্য দিল্লী-নিয়ন্ত্রিত আফগান শাসন এবং পরে ১৫৭৫ থেকে ১৭৬৫ সাল পর্যন্ত দিল্লী সাম্রাজ্যভুক্ত মুঘল শাসনের

২৪. তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়, পলাশীর যুদ্ধ, ১৯৫৩, পৃ. ৮০।

২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১।

২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১।

প্রতিষ্ঠাকালে শাসন-ক্ষমতার হাতবদলজনিত কারণে যে অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতা দেখা দেয়, তাতে এ দেশের সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশের সুস্থিতিও বিঘ্নিত হয়ে ওঠে। কোন দেশের শিক্ষা-সাহিত্য তথা সমগ্র সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড তার রাজধানীকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়ে থাকে। ১৫৩৮ সালের পর বাংলা দিল্লী-সাম্রাজ্যের অধীনস্থ হয়ে যাওয়ার পর তার রাজধানীর মর্যাদা প্রাদেশিক পর্যায়ভুক্ত হয়ে পড়ে; তদুপরি, রাজ-ক্ষমতার হাতবদলজনিত কারণে বাংলার রাজধানীও স্থানান্তরিত হতে থাকে।

স্বাধীন সুলতানী আমলে গৌড় ছিল বাংলার রাজধানী এবং সমগ্র দেশের সাংস্কৃতিক স্নায়ুকেন্দ্র। আফগান শাসনামলে সুলায়মান কররানীর রাজত্বকালে (১৫৬৫-৭২) গৌড় থেকে রাজধানী স্থানান্তরিত হয় তান্ডা বা তাঁড়ায়; স্থানটি গৌড় থেকে প্রায় ১৫ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত। ১৫৭৫ সালে আফগান শাসনের অবসান ঘটে; আরম্ভ হয় মুঘল শাসনের প্রতিষ্ঠাকাল। ওই সালেই এক ভয়াবহ মহামারীতে ধ্বংস হয়ে যায় পরিত্যক্ত রাজধানী গৌড় নগরী। তার ১২ লক্ষ অধিবাসীর অনেকেই মারা যায়; আর বাঁচার তাগিদে ও রাজশক্তির পরিবর্তনজনিত কারণে বেশ কিছুসংখ্যক গৌড়বাসী ছড়িয়ে পড়ে দূর-দূরান্তে, আরাকানে, ত্রিপুরায়। ১৫৯৫ সালে তাঁড়া থেকে আবার বাংলার রাজধানী স্থানান্তরিত হয় রাজমহলে। সেখান থেকে ১৬১২ সালে আবার তা স্থানান্তরিত হয় ঢাকায়। তখন মুঘল-সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকাল এবং বাংলার সুবাদার ইসলাম খাঁ। রাজ্যহারা আফগানরা তখন বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে মুঘল-আধিপত্যকে ঘায়েল করার কাজে লিপ্ত; তাদের সাহায্যকারী তখন আরাকানী মঘ ও 'হার্মাদ' বলে অভিহিত পর্তুগীজ জলদস্যুরা। এমনি অবস্থা অবসানের লক্ষ্যেই সুবাদার ইসলাম খাঁ বাংলার রাজধানী ঢাকায় নিয়ে আসেন। তাঁর পরিকল্পনা অনুসারে অচিরেই বাংলায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয় মুঘল-শাসন; আবার সুস্থিত হতে থাকে বাংলার সামাজিক অবস্থা, গড়ে ওঠে সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকাণ্ডের জন্য উপযোগী পরিবেশ। অতঃপর সুদীর্ঘ ৯২ বছর পর ১৭০৪ সালে বাংলার রাজধানী আবার স্থানান্তরিত হয়ে চলে আসে মুর্শিবাদাবাদে; ইংরেজ আমলে সেখান থেকে তা স্থানান্তরিত হয়ে আসে কলকাতায়।

এখানে সুলতান ও সম্রাট বা বাদশা'র মধ্যকার সামান্য পার্থক্যটা তুলে ধরা প্রয়োজন। ত্রয়োদশ শতকের কথাই ধরা যাক। বাগদাদের খলিফা তখনও 'মুসলিম দুনিয়ার' সর্বোচ্চ একক কর্তৃত্বের প্রতীক বলে স্বীকৃত। সেই কর্তৃত্ব অস্বীকার না করা পর্যন্ত সকল মুসলিম রাজ্যের প্রধান শাসক অভিহিত হতেন 'সুলতান' বলে। বিভিন্ন রাজ্যের সুলতানগণ প্রকৃত প্রস্তাবে না হলেও রেওয়াজ অনুসারে বাগদাদের খলিফার আনুগত্য প্রকাশ করতেন।

সেই হিসাবে তখন দিল্লী ও বাংলার সুলতানগণও ছিলেন বাগদাদ-কেন্দ্রিক 'খেলাফতে'র নামেমাত্র অনুগত মিত্র। এখানে উল্লেখ্য যে, অন্যান্য অনেক রাজ্যের

রাজা-মন্ত্রীর দু'জনেরই ইচ্ছে, ডাকাতি করে বাংলাদেশটাকে কেড়ে নিয়ে নাগপুরের সঙ্গে যোগ করে দেওয়া। তখন বাংলাদেশ বলতে তার সঙ্গে বিহার আর উড়িষ্যাকেও বোঝাত।

মৃত নবাব সরফরাজ খাঁর আত্মীয়বন্ধুরা আলীবর্দীর উপর শোধ নেবার সুযোগ খুঁজছিলেন। এইবার সুবিধে পেয়ে তাঁরা রঘুজিকে বাংলায় আসবার জন্যে নিমন্ত্রণ করে পাঠালেন।"[২৪]

ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে বাংলার "হিন্দু ষড়যন্ত্রকারীদের" স্বপ্নটাকে হয়তো বা নাগপুর-স্বপ্নের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা যায়। আর "মুসলমান ষড়যন্ত্রকারীদের" লোভ ও বোকামির সঙ্গে এক কথায় চরিত্রহীনতার সঙ্গে মিলিয়ে দেখা যায়। কিন্তু বাংলার "হিন্দু ষড়যন্ত্রকারীদের" নাগপুরী ভাই বর্গীদের হাত থেকে যে বাংলার "ছেলে-বুড়ো ধনী-নির্ধন পণ্ডিত-মূর্খ স্ত্রী-পুরুষ, কি পৈতেধারী ব্রাহ্মণ কি পৈতেহীন শূদ্র, কি কীর্তনকারী বৈষ্ণব কি বামাচারী শাক্ত, কি হিন্দু কি মুসলমান, কারুরই এই মারাঠা-ডাকুদের হাত থেকে নিষ্কৃতি ছিল না।"[২৫]

আমাদের তো মনে হয়, এসব ষড়যন্ত্র ছিল সামগ্রিক চরিত্রহানিজনিত লোভ-লালসারই পরিণাম। চরিত্রহানিজনিত লোভ-লালসা না থাকলে নবাব আলীওয়ার্দীর উপর প্রতিশোধ নেবার বাসনায় নবাব সরফরাজ খাঁর আত্মীয়বন্ধুরা মুসলমানদের শত্রু মারাঠা বর্গীদেরকে বাংলা আক্রমণের প্ররোচনা দেবেন কেন, আর শিবাজীর উত্তরাধিকারীরাও মুসলমানদের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার হিন্দুদের উপরও এমন অকথ্য অত্যাচার চালাবে কেন? "বরগিদের হাঙ্গামা বর্বরতার চরম সীমায় গিয়ে পৌঁছিয়েছিল। লোকের মনে হতো, বনের পশুরাও তাদের চেয়ে ভালো। সেই সময়ের এক ইংরেজ পর্যটক লিখে গেছেন, ভারতবর্ষের কোনো জায়গায় বরগিদের মতন এমন নিষ্ঠুর অত্যাচারী লোক দেখা যায় নি। এমন কি বুনো কাফ্রিদের মধ্যেও এমন ধারা জঘন্য কাণ্ড নেই।"[২৬]

* * * * *

মুঘল আমলে বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা

দু'শ' বছরেরও বেশি সময় ধরে স্বাধীন বাংলার সুলতানী আমলে এ দেশের সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশ একটা সুস্থির রূপ লাভ করে। কিন্তু এই আমলের অবসানে ১৫৩৮ থেকে ১৫৭৫ সাল পর্যন্ত ৩৭ বছরের জন্য দিল্লী-নিয়ন্ত্রিত আফগান শাসন এবং পরে ১৫৭৫ থেকে ১৭৬৫ সাল পর্যন্ত দিল্লী সাম্রাজ্যভুক্ত মুঘল শাসনের

২৪. তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়, পলাশীর যুদ্ধ, ১৯৫৩, পৃ. ৮০।

২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১।

২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১।

প্রতিষ্ঠাকালে শাসন-ক্ষমতার হাতবদলজনিত কারণে যে অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতা দেখা দেয়, তাতে এ দেশের সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশের সুস্থিতিও বিঘ্নিত হয়ে ওঠে। কোন দেশের শিক্ষা-সাহিত্য তথা সমগ্র সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড তার রাজধানীকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়ে থাকে। ১৫৩৮ সালের পর বাংলা দিল্লী-সাম্রাজ্যের অধীনস্থ হয়ে যাওয়ার পর তার রাজধানীর মর্যাদা প্রাদেশিক পর্যায়ভুক্ত হয়ে পড়ে; তদুপরি, রাজ-ক্ষমতার হাতবদলজনিত কারণে বাংলার রাজধানীও স্থানান্তরিত হতে থাকে।

স্বাধীন সুলতানী আমলে গৌড় ছিল বাংলার রাজধানী এবং সমগ্র দেশের সাংস্কৃতিক স্নায়ুকেন্দ্র। আফগান শাসনামলে সুলায়মান কররানীর রাজত্বকালে (১৫৬৫-৭২) গৌড় থেকে রাজধানী স্থানান্তরিত হয় তান্ডা বা তাঁড়ায়; স্থানটি গৌড় থেকে প্রায় ১৫ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত। ১৫৭৫ সালে আফগান শাসনের অবসান ঘটে; আরম্ভ হয় মুঘল শাসনের প্রতিষ্ঠাকাল। ওই সালেই এক ভয়াবহ মহামারীতে ধ্বংস হয়ে যায় পরিত্যক্ত রাজধানী গৌড় নগরী। তার ১২ লক্ষ অধিবাসীর অনেকেই মারা যায়, আর বাঁচার তাগিদে ও রাজশক্তির পরিবর্তনজনিত কারণে বেশ কিছুসংখ্যক গৌড়বাসী ছড়িয়ে পড়ে দূর-দূরান্তে, আরাকানে, ত্রিপুরায়। ১৫৯৫ সালে তাঁড়া থেকে আবার বাংলার রাজধানী স্থানান্তরিত হয় রাজমহলে। সেখান থেকে ১৬১২ সালে আবার তা স্থানান্তরিত হয় ঢাকায়। তখন মুঘল-সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকাল এবং বাংলার সুবাদার ইসলাম খাঁ। রাজ্যহারা আফগানরা তখন বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে মুঘল-আধিপত্যকে ঘায়েল করার কাজে লিপ্ত; তাদের সাহায্যকারী তখন আরাকানী মঘ ও 'হার্মাদ' বলে অভিহিত পর্তুগীজ জলদস্যুরা। এমনি অবস্থা অবসানের লক্ষ্যেই সুবাদার ইসলাম খাঁ বাংলার রাজধানী ঢাকায় নিয়ে আসেন। তাঁর পরিকল্পনা অনুসারে অচিরেই বাংলায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয় মুঘল-শাসন; আবার সুস্থিত হতে থাকে বাংলার সামাজিক অবস্থা, গড়ে ওঠে সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকাণ্ডের জন্য উপযোগী পরিবেশ। অতঃপর সুদীর্ঘ ৯২ বছর পর ১৭০৪ সালে বাংলার রাজধানী আবার স্থানান্তরিত হয়ে চলে আসে মুর্শিবাদাবাদে; ইংরেজ আমলে সেখান থেকে তা স্থানান্তরিত হয়ে আসে কলকাতায়।

এখানে সুলতান ও সম্রাট বা বাদশা'র মধ্যকার সামান্য পার্থক্যটা তুলে ধরা প্রয়োজন। ত্রয়োদশ শতকের কথাই ধরা যাক। বাগদাদের খলিফা তখনও 'মুসলিম দুনিয়ার' সর্বোচ্চ একক কর্তৃত্বের প্রতীক বলে স্বীকৃত। সেই কর্তৃত্ব অস্বীকার না করা পর্যন্ত সকল মুসলিম রাজ্যের প্রধান শাসক অভিহিত হতেন 'সুলতান' বলে। বিভিন্ন রাজ্যের সুলতানগণ প্রকৃত প্রস্তাবে না হলেও রেওয়াজ অনুসারে বাগদাদের খলিফার আনুগত্য প্রকাশ করতেন।

সেই হিসাবে তখন দিল্লী ও বাংলার সুলতানগণও ছিলেন বাগদাদ-কেন্দ্রিক 'খেলাফতে'র নামেমাত্র অনুগত মিত্র। এখানে উল্লেখ্য যে, অন্যান্য অনেক রাজ্যের

মত বাংলার সুলতানগণও খেলাফতেরও প্রশাসনিক কাঠামো এবং রীতিনীতি বজায় রাখতেন। অতঃপর ভারতে এবং বাংলায়ও প্রতিষ্ঠিত হল মুঘল শাসন। মুঘল শাসকেরা ওইসব খেলাফতী কেতা-কায়দা ঝেড়ে ফেলে সম্রাট বা বাদশাহ্ খেতাবে নিজেদেরকে বিভূষিত করলেন। তখন বাংলার সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটেও সংযোজিত হল মুঘল সংস্কৃতি-সভ্যতার নতুন মাত্রা। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানেও মুঘল-প্রভাব পরিলক্ষিত হল। তখনকার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে যেসব বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠল তা হচ্ছে; (১) রাজানুগ্রহ ছাড়াই বাংলা সাহিত্য তার অভ্যন্তরীণ শক্তিতেই এগিয়ে যাওয়ার প্রবণতা; (২) শিয়া-মতবাদের বিস্তৃতি; (৩) ধর্মীয় উদারতার প্রভাবে হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতির সমন্বয়-প্রয়াস; (৪) সাংস্কৃতিক সমন্বয়-প্রয়াস সত্ত্বেও হিন্দু ও মুসলিম কবিদের কাব্যচর্চায় নিজেদের ধর্ম-ভিত্তিক পরিচয়-স্বাতন্ত্র্যের প্রকাশ; এবং (৫) বাংলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনে ইউরোপীয় পর্তুগীজ-সংস্কৃতির নানা উপাদানের সংমিশ্রণ।

এখানে স্মরণযোগ্য যে, মুঘল শাসন ছিল বাংলার জন্য এক সাম্রাজ্যিক আধিপত্যমূলক শাসন; তখন বাংলার স্বাধীনতা ও তার সঙ্গে রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্য মুঘল সাম্রাজ্যের মধ্যে বিলীন হয়ে গেছে। সুলতানী আমলে বাংলার শাসনকর্তারা বাংলাকেই তাঁদের নিজভূমি বলে গণ্য করতেন। জন্মগতভাবে তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন এ দেশের মানুষ; তাঁদের জীবনের দিনরাত্রিগুলো কাটত এখানেই এবং মৃত্যুর পর তাঁরা কবরস্থ হতেন এই বাংলার মাটিতেই। রাষ্ট্রীয় পরিচয়ে তাঁরা ছিলেন বাঙ্গালী; এবং সেই পরিচয়ের সঙ্গে ধর্মীয় পরিচয়ের সংযুক্তিতে তাঁদের প্রয়োজনীয় একাত্মতা ছিল বাগদাদ-ভিত্তিক খেলাফত তথা মুসলিম উম্মার সঙ্গে; যার ফলে, তাঁদের দ্বিতীয় জাতি-সত্তা সুপ্রা-ন্যাশনাল বা রাষ্ট্রীয় সীমানাতিক্রান্ত জাতীয়তার সঙ্গে যুক্ত ছিল। পরিচয়ের এই দ্বিত্ব সম্পর্কে সুলতানদের মত সচেতন মুসলমানরা এবং কবিরাও অবহিত ছিলেন।

মুঘল আমলে শাসনকর্তাদের সবাই বাংলায় আসতেন দিল্লী-সম্রাটের প্রতিনিধি হয়ে; দায়িত্ব পালন শেষে আবার চলে যেতেন তাঁদের স্থায়ী বাসভূমে। তদুপরি, মুসলিম-পরিচিতি ছাড়িয়েও তাঁদের মুঘল পরিচিতি ছিল বেশি পছন্দনীয়; আর তাই মুঘলদের রাষ্ট্রীয় সীমানাতিক্রান্ত জাতীয়তার প্রতি একাত্মতাবোধেও ঘাটতি ছিল। রাষ্ট্রীয় পরিচয়েও তাঁরা ছিলেন ভারতীয় মুঘল, বাঙ্গালী নয়। কাজেই বাংলার শিল্প-সাহিত্যকে তার স্বীয় বৈশিষ্ট্য অর্জনে সাহায্য করার লক্ষ্যে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য তাঁদের আলাদা কোন আগ্রহ বা আসক্তি থাকার কথা ছিল না। কিন্তু ততদিনে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য তার অগ্রগমনের জন্য প্রয়োজনীয় অভ্যন্তরীণ শক্তি লাভ করে ফেলেছে, এবং তারই প্রেরণায় তা বিশেষ রাজানুগ্রহ ছাড়াই লক্ষ্যপানে এগিয়ে গেছে। অন্যান্য বৈশিষ্ট্য কবিদের কাব্য-কৃতির তালিকা থেকে অনেকটা স্পষ্ট হয়ে ওঠার কথা।

তালিকা-তিন

কবিদের নাম	বাংলায় কাব্য-কৃতি	সম্ভাব্য রচনা-কাল
দ্বিজ মাধব	চণ্ডী-মঙ্গল, গঙ্গা-মঙ্গল, শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল	ষোল শতকের শেষ দিক
কৃষ্ণরাম দাস	রায়-মঙ্গল, কমলা-মঙ্গল, চণ্ডী-মঙ্গল	-ঐ-
কাশীরাম দাস	মহাভারত	সতের শতকের মাঝামাঝি
গদাধর দাস	জগন্নাথ-মঙ্গল	-ঐ-
রূপরাম চক্রবর্তী	ধর্ম-মঙ্গল	-ঐ-
ঘনরাম চক্রবর্তী	ধর্ম-মঙ্গল	সতের শতকের শেষ দিক
ঘনরাম দাস	ধর্ম-মঙ্গল	আঠার শতকের প্রথম দিক
ক্ষেমানন্দ	মনসা-মঙ্গল	আঠার শতক
ঘনরাম চক্রবর্তী	ধর্ম-মঙ্গল	-ঐ-
রামেশ্বর	শিবায়ন কাব্য	-ঐ-
মানিকরাম গাঙ্গুলী	ধর্ম-মঙ্গল	-ঐ-
ভারত চন্দ্র রায় গুণাকর	অন্নদা-মঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর	-ঐ-
কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ	বিদ্যাসুন্দর	-ঐ-

এই তালিকা মোটেই সম্পূর্ণাঙ্গ নয়। আলোচ্য সময়ে চৈতন্যদেবের ভক্তবৃন্দ অনেকেই বৈষ্ণব পদাবলী রচনা করেছেন। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক 'মুসলিম বাংলা সাহিত্যে' বলেন, "এই সময়ে নতুন করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব-মতের প্রচার ও প্রসার বাঙ্গালী হিন্দুর জীবনে এক নবীন সঞ্জীবনী-ধারা প্রবাহিত করিয়াছে। ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে চৈতন্যদেবের তিরোধানের পর গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের কাজ প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরিয়া একরূপ বন্ধ ছিল। হঠাৎ প্রায় অর্ধ শতাব্দী পরে শ্রী নিবাস (১৫২২-১৬০৮), নরোত্তম (১৫৩১-১৬১১) ও শ্যামানন্দের (১৫৩৫-১৬৩০) আবির্ভাবে বাংলার বৈষ্ণব-সমাজ আবার চাঙ্গা হইয়া উঠিল। ইহারা বাংলায় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যেভাবে বৈষ্ণব মত প্রচারে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাহার চমকপ্রদ কাহিনী বহু বৈষ্ণব-বাংলা গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে; তন্মধ্যে ভক্তি-রত্নাকর, প্রেম-বিলাস, নরোত্তম-বিলাস, অনুরাগ-বল্লী প্রভৃতিই প্রধান। বাংলার জনসাধারণের উপর এই বৈষ্ণব-মহাজনদের প্রভাব অত্যন্ত বিস্তৃত ও গভীর। .....ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে জ্ঞান দাস, গোবিন্দ দাস, বলরাম দাস, নরোত্তম দাস, কবি শেখর, কবিরঞ্জন প্রভৃতি বহু বৈষ্ণব পদকর্তারও আবির্ভাব হইল।.....বিদগ্ধ বৈষ্ণবেরা নানা পদ-সঞ্চয়ণ

গ্রন্থে পদগুলিকে স্থান দিয়া ইহাদিগেক একটা স্থায়ী সাহিত্যিক মর্যাদা দান করিতে লাগিলেন।

তন্মধ্যে অষ্টাদশ শতাব্দীর একেবারেই গোড়ার দিকে সংগৃহীত রাধামোহন ঠাকুরের 'পদামৃত-সমুদ্র', বৈষ্ণব দাসের 'পদকল্পতরু' এবং গৌরসুন্দর দাসের 'সংকীর্তনানন্দ' গ্রন্থের নাম করা যায়।.....অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিক হইতে 'রাগমালা' বা 'ধানমালা' নাম দিয়া মুসলমান কবিগণ বহু পদ-সঞ্চয়ণ গ্রন্থ সংকলন করেন। এই সংকলন-গ্রন্থগুলির মধ্যে ফাজিল নাসির মুহম্মদ কৃত 'রাগমালা' প্রাচীনতম।.....ইহাতে হিন্দু কবি ব্যতীত বহু মুসলিম কবির পদও সংগৃহীত আছে।" (পৃঃ ১৩৫-১৩৬)। এই আমলে ভারতে এবং সেই সুবাদে বাংলায় শিয়া-মতবাদের প্রভাবে বাংলার মুসলিম কাব্যচর্চায় কারবালার মর্মান্তিক কাহিনীভিত্তিক মর্সীয়া সাহিত্যের ধারা সংযোজিত হয়। এ দেশে মুসলিম শাসন প্রবর্তনের ফলে জাতিগতভাবে আপামর হিন্দু জনসাধারণ ব্রাহ্মণ্যবাদী সংকীর্ণতা থেকে মুক্তি পেয়ে ইসলামী উদারতার আবহমণ্ডলে নবজীবন লাভ করলেও তারা যে একটি বিজিত জাতি —এই অনুভবটা ক্রমে ক্রমে তাদের মনে জন্ম নিয়েছিল। তদুপরি ছিল ধর্মান্তরণের জন্য ইসলামের সাম্য ও উদারতার আকর্ষণ। এসব বিবেচনায় সমাজের ক্ষয়কে প্রতিরোধ করে তার সামনে নিজেদের ধর্মীয় পরিচয়কে সুস্পষ্ট করে তোলার আগ্রহ গুণীজনদেরকে সক্রিয় করে তুলেছিল। উপরোক্ত কাব্য-কৃতির তালিকা থেকে তারই প্রমাণ পাওয়া যায়।

এবার মুঘল আমলে মুসলিম কবিদের কাব্যচর্চার একটা রূপ-রেখা নেয়া যাক।

তালিকা–চার

কবিদের নাম	বাংলায় কাব্য-কৃতি	সম্ভাব্য জীবন/রচনা কাল
সৈয়দ সুলতান	শব-ই-মিরাজ, নবী-বংশ, রসুল-বিজয়, ওফাৎ-ই-রসুল	১৫৫০-১৬৪৮
হাজী মুহাম্মদ	নূর-জামাল, সুরতনামা	আনুঃ ১৫৫০-১৬২০
শেখ পরান	নূরনামা, নসীহৎনামা	আনুঃ ১৫৬০-১৬২৫
নসরুল্লাহ্ খাঁ	জঙ্গনামা, মুসার সোয়াল, শরীয়ৎনামা	আনুঃ ১৫৬০-১৬২৫
মুহম্মদ কবীর	মধুমালতী	রচনাঃ ১৫৯৩-৯৪
সৈয়দ মর্তুজা	যোগ-কলন্দর, পদাবলী	আনুঃ ১৫৯০-১৬৬২
শেখ মোতালিব	কিফায়িতুল মুসল্লীন	আনুঃ ১৫৯৫-১৬৬০
মীর মুহম্মদ শফী	নূরনামা, নুরকন্দীল, সায়াৎনামা	আনুঃ ১৫৯৫-১৬৬৫

আবদুল হাকিম	ইউসুফ-জলিখা, লালমতী-সয়ফুলমুলক, শিহাবুদ্দীননামা, নূরনামা, নসীহৎনামা, চারি মকামভেদ, কারবালা, শহরনামা	আনুঃ ১৬২০-১৬৯০
মোহাম্মদ খান	মকতুল হোসেন	রচনাকালঃ ১৬৪৫-৪৬
নওয়াজিস খাঁ	গুল-ই-বকাওলী, গীতাবলী	আনুঃ মধ্য-সতের শতক
দৌলত উজীর	লায়লী-মজনু	রচনাঃ অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায়ের মতে ১৬৬৬
আবদুল নবী	আমীর হামযা	আনুঃ ১৬০০-১৭৫৭
ফকীর গরীবুল্লাহ্	ইউসুফ-জলিখা, সত্যপীর, জঙ্গনাম (১ম অংশ)	-ঐ-
মুহম্মদ ইয়াকুব	জঙ্গনামা (২য় অংশ)	-ঐ-
হায়াত মামুদ	জঙ্গনামা, হিতজ্ঞান-বাণী, আম্বীয়া-বাণী	-ঐ-

আরাকান থেকে

দৌলত কাজী	সতী-ময়না ও লোর-চন্দ্রানী	আনুঃ ১৬০০-১৬৩৮ (রচনা)
মরদান	নসীবনামা	আনুঃ ১৬০০-১৬৪৫
কোরেশী মাগন	চন্দ্রাবতী	আনুঃ ১৬০০-১৬৬০
মহাকবি আলাওল	পদ্মাবতী, সতী-ময়না, হপ্তপয়কর, তোহ্ফা, সয়ফুলমুলক, সিকান্দারনামা	আনুঃ ১৬০৭-১৬৮০
আবদুল করিম খোন্দকার	দুল্লা মজলিস, হাজার মাসাইল	আনুঃ সতের শতকের শেষ থেকে মধ্য আঠার শতক

ত্রিপুরা থেকে

শেখ চান্দ্	রসুলবিজয়, শাহ্ দৌলা, কিয়ামতনামা	আনুঃ ১৫৬০-১৬২৫
সৈয়দ মুহম্মদ আকবর	জেবুলমুল্ক্-শামারুখ	আনুঃ ১৬৫৭-১৭২০
শুকুর মাহমুদ	ময়নামতীর গান	আনুঃ ১৬৮০-১৭৫০
মুহম্মদ রফিউদ্দিন	জেবুল্মুলক্-শামারুখ	আনুঃ সতের শতকের শেষার্ধ থেকে মধ্য-আঠার শতক
শেখ সাদী	গদা-মল্লিকা	আনুঃ আঠার শতক
শেরবাজ	মল্লিকার হাজার সওয়াল, কাসেমের লড়াই, ফাতিমার সুরতনামা	আনুঃ সতের-আঠার শতক
মুহম্মদ আবদুর রাজ্জাক	সয়ফুলমুল্ক্-লালবানু	আনুঃ সতের-আঠার শতক

এ-তালিকাও সম্পূর্ণাঙ্গ নয়। তবু এর কাব্য-কৃতির খতিয়ান থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, সুলতানী আমলে মুসলিম কবিরা যে লক্ষ্য সামনে রেখে বাংলা কাব্য চর্চায় নিজেদের নিয়োজিত করেছিলেন, মুঘল আমলেও সে-লক্ষ্য একই থেকেছে। রচিত কাব্যসমূহের শ্রেণীবিভাগ করলে দেখা যাবেঃ সর্বমোট ৬০টি কাব্যের মধ্যে মুসলিম ধর্মীয় ও নীতিজ্ঞানমূলক কাব্য হচ্ছে শতকরা ৪৭ ভাগ, মুসলিম কাহিনী-কাব্য শতকরা ২৭ ভাগ, ভারতীয় কাহিনী-কাব্য ১৩ ভাগ, মর্সীয়া-কাব্য ১০ ভাগ এবং অন্যান্য ৩ ভাগ। এ-ও লক্ষণীয় যে, মুঘল-শাসিত বাংলায় রচিত কাব্য শতকরা ৬৩ ভাগ এবং বহির্বাংলার আরাকান-ত্রিপুরায় ৩৭ ভাগ। অধিকন্তু, মুঘলশাসিত বাংলার অধিকতর খ্যাতিমান কবি সৈয়দ সুলতান-বাহরাম খান-মোহাম্মদ খানদের পাশাপাশি শুধু আরাকানেই রয়েছেন দৌলত কাজী, কোরেশী মাগন এবং মহাকবি আলাওল। এদিক থেকে চিন্তা করলে মুঘল আমলের বাংলা সাহিত্যে আরাকানের অবদান স্মরণীয় বলে স্বীকার করতেই হবে। মর্সীয়া-সাহিত্যের প্রসার মুঘল আমলের আর একটি বৈশিষ্ট্য; এর থেকে বাংলায় শিয়া প্রভাবের প্রমাণ পাওয়া যায়। সর্বোপরি, মুঘল আমলেও হিন্দু কবিদের তুলনায় মুসলিম কবিদের কাব্য-কৃতি বিষয়-বৈচিত্র্যে অনেক বেশি সমৃদ্ধ। মুঘল আমলের বাংলা সাহিত্যের প্রসঙ্গে ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক তাঁর 'মুসলিম বাংলা সাহিত্য' গ্রন্থে বলেনঃ "…..মধ্যযুগীয় বাংলা-সাহিত্যের মধ্যে মুঘল আমলকে স্বর্ণযুগ বলিয়া অভিহিত করিতে হয়। মুঘল আমলে বাংলা সাহিত্য স্বাধীনতা যুগের কিশোর অবস্থা অতিক্রম করিয়া বলদৃপ্ত যৌবনের মহিমা কীর্তন করিতেছে। ইহা কি করিয়া সম্ভবপর হইয়া উঠিল? ইহার উত্তর রাজ-পৃষ্ঠপোষকতায় নহে, মুঘল আমলে দেশের সাংস্কৃতিক বিবর্তনেই পাওয়া যাইবে।" (পৃঃ ২৬০)।

এই আমলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে ফারসী সাহিত্যের প্রভাব খুব বেশি। পুরো মুসলিম আমলের ক্রমবিকশিত বাংলা ভাষা ও তার সাহিত্যের বিষয়বস্তু বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বিশ্লেষণ করলে একদিকে যেমন তার বিকাশ ধরা পড়বে, অন্যদিকে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে ঃ (১) বাংলা ভাষার ভোকেবুলারি বা শব্দ-সমগ্রে আরবী-ফারসী-তুর্কী ও ইউরোপীয় ভাষা থেকে আহরিত শব্দ-সঞ্চয়, এবং (২) তার সাহিত্যে সুসমৃদ্ধ আরবী-ফারসী সাহিত্য থেকে গৃহীত বিষয়-বৈচিত্র্য। এ ব্যাপারে গবেষণা হওয়া উচিত।

পদাবলী ও সত্যপীর-কাহিনী নিয়ে কাব্য-চর্চায় দুই সম্প্রদায়ের কবিদের উপস্থিতি থেকে হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতি সমন্বয়-প্রয়াসের প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে এ সমন্বয় প্রয়াস কতটা সফল হয়েছিল, তার উত্তরের জন্য যথেষ্ট বিচার-বিশ্লেষণের প্রয়োজন। সাহিত্যের ক্ষেত্রে বরং হিন্দু ও মুসলিমদের কাব্য-কৃতিত্বে আমরা সমন্বয়ের চাইতে স্বাতন্ত্র্যই বেশি লক্ষ্য করি। প্রসঙ্গত বলা যায়, রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ধর্ম-সমন্বয়ের প্রয়াস ব্যর্থই হয়েছিল। সম্রাট আকবরের দীন-এ-ইলাহী জনপ্রিয় হয়নি। আইন-ই-আকবরীর উল্লেখ

অনুযায়ী হিন্দু রাজা বীরবল এবং আবুল ফজল, ফৈজী, শেখ মুবারক, মির্জা জানী, আজিজ কোকা প্রমুখ মিলে মোট ১৮ জন ছাড়া আর কেউই দীন-এ-এলাহী গ্রহণ করেননি। সম্রাটের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ওই সমন্বিত ধর্মেরও পরিসমাপ্তি ঘটে।

আবার সাহিত্যের কথায় আসা যাক। হিন্দু ও মুসলিম বাঙ্গালী কবিরা তখন একই ভাষায়, একই কাব্য-রীতিতে, একই শব্দ-সমগ্র ব্যবহার করে সাহিত্যচর্চা করলেও দু'য়ের কাব্য প্রয়াস দু'টি ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়েছিল। দু'য়ের উদ্দেশ্য ও স্বাতন্ত্র্য সুপরিস্ফুট। হিন্দু কবিরা কাব্য-প্রেরণা পেয়েছেন তাঁদের স্বীয় ধর্মীয় উৎস থেকে, আর মুসলিম কবিরা তাঁদের রাষ্ট্রীয় সীমানাতিক্রান্ত ইসলামী উৎসভিত্তিক আরবী-ফারসী সাহিত্য থেকে এবং সামগ্রিক মুসলিম ইতিহাস ও ঐতিহ্য থেকে। প্রকৃত প্রস্তাবে, মুসলিম কবিদের বাংলা ভাষায় কাব্য-প্রয়াসের লক্ষ্য ছিল মুসলিম জনসাধারণের উপর হিন্দু কবিদের ধর্মভিত্তিক কাব্যসুষমার প্রভাবকে মোকাবিলা করে ইসলামের নীতি ও শিক্ষার প্রতি তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা। সে উদ্দেশ্যে তাঁরা অনেকাংশে সফলও হয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, প্রেমকাহিনী-বীরগাঁথা-রম্যকথা এবং অন্যান্য বিষয়ের উপর রচিত কাব্য-মাধুরী দিয়ে সমগ্র বাঙ্গালী সমাজকেই তাঁরা প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। হিন্দু ও মুসলিম কবিরা নিজ নিজ সম্প্রদায়ের কল্যাণের লক্ষ্যেই কাব্যচর্চা করেছিলেন; তাঁদের কাব্যচর্চা ছিল সম্প্রদায়গত, কিন্তু আধুনিক অর্থের সাম্প্রদায়িক নয়।

ত্রয়োদশতম অধ্যায়

মুর্শিদাবাদ নাজিমী আমল
(১৭৬৫-১৮৫৪ সাল)

সৈয়দ হামজা (কাব্য-জীবন ১৭৯০-১৮০৬ খৃ.) রচিত 'আমীর হামজা' বিরাট কাব্য। ডক্টর এনামুল হকের কথায় (মুসলিম বাঙলা সাহিত্য', পৃ. ২৯৫) ঃ কবি এই কাব্যের গোড়ায় আমাদিগকে জানাইয়া দিয়াছেন যে, ইহা তৎপূর্ববর্তী কবি গরীবুল্লাহ্‌র 'আমীর হামজা' নামক ক্ষুদ্র কাব্যের অনুবৃত্তি। কবি মনে করেন, আমীর হামজার সমস্ত গল্প মূল পুস্তকের অভাবে কবি গরীবুল্লাহ্ লিখিয়া যাইতে পারেন নাই ঃ

তামাম কেতাব যদি পাইত দেওয়ান।
গাঁথিত কবিতা-হার মুক্তার সমান॥
যত দূর আছে তার কবিতার হার।
দেখিয়া শুনিয়া লোক হয় জারজার॥

এই সংক্ষিপ্ত কাব্য পাঠ করিয়া জনসাধারণের কাব্য-পিপাসা মিটিতেছে না দেখিয়া কবি এই বিরাট কাব্য রচনা করিতে মনস্থ করিলেন। পুস্তক রচনায় হাত দিবার আগেই কবি তৎপূর্ববর্তী কবি গরীবুল্লাহ্‌র প্রতি এইভাবে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন ঃ

আল্লার মকবুল সাহা গরীবুল্লা নাম।
বালিয়া হাফেজপুর যাহার মোকাম॥
পীর শাহা গরীবুল্লা কবিতার গুরু।
আলমে উজালা যার কবিতার শুরু॥
আমার শায়েরী নয় কেতাব সমান॥
কেবল বুঝিবে লোক কেচ্ছার বয়ান॥

পলাশীর রণক্ষেত্রে একটা যুদ্ধের অভিনয় করিয়া ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের সাহায্যে ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতের সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ দুইটি প্রদেশের– বাংলা ও বিহারের– ক্ষমতা অধিকার করিয়া বসে। কিন্তু তাহারা প্রথমে এই দুই প্রদেশের উপর সর্বময় প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে সাহসী হয় নাই। তাহাদের আশঙ্কা ছিল যে, বাংলা ও বিহারের

জনসাধারণ এই ষড়যন্ত্রকারী বিদেশীদের শাসন নির্বিবাদে মানিয়া লইবে না। সুতরাং তাহারা প্রথমে 'নবাব' নামধারী কয়েকজন সাক্ষী-গোপাল দেশীয় শাসককে সম্মুখে স্থাপন করিয়া পশ্চাৎ হইতে এই দুই প্রদেশের শাসন ও শোষণ চালাইতে থাকে। কিন্তু এই অর্থলোভী বিদেশীরা রাজস্ব আদায়ের নামে এই দুইটি প্রদেশের ধনসম্পদ লুণ্ঠনের কর্তৃত্ব নিজেদের হাতেই রাখিয়া দেয়। 'পলাশীর যুদ্ধ বিজয়ী' ক্লাইভ ছিল বাংলা ও বিহারের প্রকৃত 'নবাব'।[১]

১. সুপ্রকাশ রায়, ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৭২, পৃ. ৭-৮।

১৩

"হিন্দু, মুসলমান এবং ইংরাজ সকলেই মীর জাফরের কথা আলোচনা করিয়া থাকেন। পাঁচশত বৎসর মুসলমানের সম্মুখে কুর্নীশ করিতে করিতে হিন্দু-সন্তানের পক্ষে মুসলমান-শাসন অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল; তাঁহারা কেহ রাজা, কেহ মন্ত্রী, কেহ সেনাপতি হইয়া, মুসলমানের দোহাই দিয়া, শাসন ও শোষণকার্য্য হস্তগত করিয়াছিলেন। সিরাজদ্দৌলা তাহার মূলোচ্ছেদের চেষ্টা করায়, সকলে মিলিয়া মীর জাফরের সহায়তায় সিরাজদ্দৌলার উচ্ছেদ সাধন করেন; সুতরাং হিন্দু কখনও মীর জাফরের কথা বিস্মৃত হইতে পারিবেন না।

মুসলমান অনেক দিনের নবাব। কি ইংরাজ, কি বাঙ্গালী, সকলেই সে নবাব-দরবারে জানু পাতিয়া উপবেশন করিতেন। যে নিতান্ত নগণ্য মুসলমান, তাহার পদভারেও মেদিনী কম্পিত হইয়া উঠিত। মীর জাফরের ব্যবহার গুণেই মুসলমানের সে পূর্ব গৌরব বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। সুতরাং মুসলমানও মীর জাফরের কথা বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। ...

ইংরাজ-রাজ্যের ন্যায় মুসলমান-রাজ্যেও প্রতিভার সমাদর ছিল। সেই সমাদর লাভ করিয়া কত নগণ্য লোকে ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। মুরশিদ কুলী খাঁ এইরূপ একজন নগণ্য লোক; – জাতিতে ব্রাহ্মণ, ধর্মে মুসলমান, অবস্থায় ক্রীতদাস। শিক্ষায় স্বাভাবিক প্রতিভা সমুজ্জ্বল হইয়াছিল বলিয়া, তিনি সম্রাট আওরঙজীবের আদেশে হায়দরাবাদের প্রধানমন্ত্রী পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই সময়ে খোরাসান দেশের আফশার বংশীয় সুজাউদ্দীন খাঁ নামক আর একজন প্রতিভাশালী তরুণ যুবক হায়দরাবাদে বাস করিতেন। কুলী খাঁর একমাত্র কন্যার সঙ্গে সেই তরুণ যুবকের বিবাহ হইয়াছিল। উত্তরকালে মুরশিদ কুলী খাঁর বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব-নাজিমপদে নিযুক্ত হইলে, জামাতা সুজা খাঁ সুবা উড়িষ্যার শাসনভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; তাঁহার পদোন্নতির সন্ধান লাভ করিয়া, তাঁহার আত্মীয় কুটুম্বগণও উড়িষ্যায় উপনীত হইয়াছিলেন। এইরূপে মিরজা মহম্মদ নামক এক দরিদ্র কুটুম্ব আসিয়া সুজা খাঁর সহিত মিলিত হইবার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

মিরজা মহম্মদের দুই পুত্র– হাজি আহম্মদ এবং আলিবর্দী। উভয় পুত্রই বিদ্যাবুদ্ধি ও তীক্ষ্ণ প্রতিভায় বাঙ্গালার ইতিহাসে বিবিধ কীর্তি-কাহিনী সংযুক্ত করিয়া গিয়াছেন। ..... আলিবর্দীর পুত্রসন্তান ছিল না; তিনি তিন কন্যাকে ভ্রাতা হাজি আহম্মদের তিন পুত্রের সহিত বিবাহ দিয়া, দৌহিত্র সিরাজদ্দৌলাকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। হাজি আহম্মদের জামাতা আতাউল্যা এবং ভগিনীপতি মীর জাফর খাঁ এই সময় হইতে

আলিবর্দীর কণ্ঠলগ্ন হন। আতাউল্যার কথা অনেকেই বিস্মৃত হইয়াছেন; কিন্তু মীর জাফরের কথা চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।"[২] এখানে উল্লেখ্য যে, নবাব আলীওয়ার্দীর অনুগ্রহপুষ্ট বৈমাত্রেয় ভগ্নিপতি মীর জাফর আলী খান এবং ভ্রাতুষ্পুত্রীর স্বামী আতাউল্লাহ্ খান বর্গীর হাঙ্গামাকালে নবাব আলীওয়ার্দীকেই হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিলেন। "আলিবর্দীর সুকৌশলে তাহা জয়যুক্ত হয় নাই। আলিবর্দীর সময়ে যাহা বিফল হইয়া গিয়াছিল, সিরাজদ্দৌলার সময়ে তাহাই সফল হইল। মীর জাফর কর্নেল ক্লাইভের হাত ধরিয়া একবার মাত্র 'তখ্‌ত্ মোবারকে' পদার্পণ করিলেন; কিন্তু তাহাতে আর অধিক দিন উপবেশন করিতে পারিলেন না।"[৩]

মীর জাফর আলী খান বাংলার মসনদ পেয়েছিলেন দু'বার — প্রথমবার ১৭৫৭ থেকে ১৭৬০ সাল, আর দ্বিতীয়বার ১৭৬৩ থেকে ১৭৬৫ সালের জানুয়ারী মাস পর্যন্ত। ১৭৬৫ সালের জানুয়ারীতেই দুরারোগ্য কুষ্ঠব্যাধিতে অনেক কষ্টের পর তাঁর মৃত্যু। "জাফরগঞ্জ সিরাজের বধ্যভূমি; বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার স্বাধীনতার সমাধি। এই স্থানের ভূমি বিশ্বাসঘাতকের তরবারির আঘাতে কলুষিত হইয়াছিল, তাই যে ভবনে সেই শোচনীয় হত্যাকাণ্ড সম্পাদিত হয়, মুর্শিদাবাদবাসিগণ অদ্যপি তাহাকে 'নেহকহারামী দেউড়ী' কহিয়া থাকে। যাহার অন্নে, যাহার গৃহে প্রতিপালিত হইয়া, বিশ্বাসঘাতকগণ সংসারে সুপরিচিত হইয়াছিল, আপনাদিগের বাসভবনে তাহারই রক্তপাতের দ্বারা কৃতজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন! ... যে গৃহে সেই শোচনীয় হত্যাকাণ্ড সংসাধিত হইয়াছিল, সে গৃহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া অণু-পরমাণুতে মিশিয়া গেলেও, তাহার স্থানের লোপ হয় নাই। আজিও সে স্থানে উপস্থিত হইলে, বিশ্বাসঘাতকগণের প্রতি আন্তরিক ঘৃণা ও হতভাগ্য সিরাজের প্রতি সহানুভূতির উদয় হইয়া থাকে। জাফরাগঞ্জ আবার বঙ্গের শেষ নবাব- নাজিমগণের সমাধিভবন।"[৪]

জানা মতে, নবাব মীর জাফর আলী খানের তিন স্ত্রী। প্রথমা স্ত্রী বেগম শাহ্ খানম নবাব আলীওয়ার্দী খানের বৈমাত্রেয় ভগিনী। মীর জাফর পুত্র মীরণ হচ্ছেন শাহ্ খানমেরই গর্ভজাত পুত্র। মীর কাশেম শাহ্ খানমের গর্ভজাত কন্যার স্বামী। মীর জাফরের অন্য দুই স্ত্রী হচ্ছেন মণি বেগম ও বিব্বু বেগম। মণি বেগম ও বিব্বু বেগম উভয়েই অপেক্ষাকৃত সাধারণ ঘরের কন্যা। তিন স্ত্রীর মধ্যে মণি বেগমই ছিলেন মীর জাফরের প্রিয়তমা বেগম।

---

২. অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, মীর কাসিম, চতুর্থ সংস্করণ, ১৩২০ সন, পৃ. ৩-৪।

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬।

৪. শ্রীনিখিলনাথ রায়, মুর্শিদাবাদ-কাহিনী, তৃতীয় সংস্করণ, ১৩১৬ সন, পৃ. ২৪৮-২৪৯।

"জাফর আলী খাঁ নবাব হইয়া প্রথমতঃ সিরাজউদ্দৌলার হীরাঝিলে বা মনসুরগঞ্জের প্রাসাদে বাস করিয়াছিলেন, পরে মুর্শিদাবাদ কেল্লামধ্যে আলিবর্দী খাঁর প্রাসাদে আসিয়া বাস করেন।

নবাব হইয়া তিনি স্বীয় জ্যেষ্ঠপুত্র মীরণকে জাফরাগঞ্জের প্রাসাদ প্রদান করেন, তদবধি মীরণের বংশধরেরা জাফরাগঞ্জের প্রাসাদেই বাস করিতেছেন। জাফরাগঞ্জ মুর্শিদাবাদ নগরের মধ্যস্থলে অবস্থিত। ...... সিরাজের বধ্যভূমি জাফরাগঞ্জ প্রাসাদের উত্তর-পূর্ব কোণে। বধ্যভূমিজাত নিম্ববৃক্ষটি সদর রাস্তা হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। ... জাফরাগঞ্জের বর্তমান নবাব ফয়জালি বা মেহেদী হোসেন খাঁ মীরণের বৃদ্ধ প্রপৌত্র নবাব আজম আলি খাঁর পুত্র। জাফরাগঞ্জের নবাবেরা গভর্নমেন্টের নিকট হইতে বাৎসরিক ৬০ হাজার টাকা বৃত্তি পাইয়া থাকেন। .... মীরণের দেহ রাজমহলে সমাহিত করা হয়।"[৫] এখানে স্মরণযোগ্য যে, জাফরাগঞ্জে রয়েছে যেমন মীর জাফর বংশীয়দের সমাধিবভন, তেমনি খোশবাগে রয়েছে নবাব আলীওয়ার্দী বংশীয়দের ও নবাব সিরাজের সমাধিসমূহ। সিরাজ বেগম লুৎফুন্নিসা এই খোশবাগেরই তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হয়ে কন্যা উম্মে জহুরাসহ সেখানে বসবাস করতেন। নবাব সিরাজের বেগম ও কন্যার জন্য মাসিক ভাতা ছিল ১০০ টাকা এবং খোশবাগ সমাধিভবনের ও তৎসংলগ্ন মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মাসিক ৩০৫ টাকা। বেগম লুৎফুন্নিসার মৃত্যুর পর কন্যা উম্মে জহুরার বংশীয়রাও পেন্সন পেতেন। খুবই সামান্য। সিরাজ-বেগমের জন্যই মাসিক মাত্র ১০০ টাকা, তাঁর কন্যা-বংশীয়দের জন্য আর কত হবে। সিরাজ-দুহিতা উম্মে জহুরার চার কন্যা—শরীফুন্নিসা, আসমতুন্নিসা, সাকীনা ও উম্মে মেহেদী বেগম। সিরাজ-বেগম ও সিরাজ-দুহিতার মৃত্যুর পর নবাব সিরাজের এই চার দৌহিত্রী "খোশবাগ প্রভৃতির তত্ত্বাবধানের জন্য ওয়ারেন হেস্টিংসের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন। লর্ড কর্নওয়ালিস তাঁহাদিগকে উক্ত ভার প্রদান করেন। তাঁহাদের মৃত্যু হইলে উক্ত বংশীয়েরা খোশবাগের তত্ত্বাবধানের ভার পাইয়াছিলেন। ১৮৪৫ সালে সাকিনার জ্যেষ্ঠ কন্যা খয়রুন্নেসার কন্যা জীনা বেগম ও তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা ফাতেমার পুত্র মহম্মদ আলি খাঁ এবং উম্মত জায়েনা ও উম্মত কোনসুম বেগম (উম্মে জায়েনা ও উম্মে কুলসুম—লেখক) নামে উক্ত বংশীয় আরও দুইজন মহিলা এই চারজন খোশবাগের মাতোয়ালী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ক্রমে উক্ত বংশীয়গণের হস্ত হইতে গভর্নমেন্ট স্বয়ং সে ভার গ্রহণ করে। সমাধিগৃহে দ্বীপ জ্বালিবার জন্য এক্ষণে মাসে চারি আনা মাত্র তৈলের ব্যবস্থা হইয়া থাকে।"[৬] মাসে চার আনা মানে বার্ষিক তিন টাকা। মীরজাফর বংশীয়দের ভাতা বার্ষিক ৬০ হাজার টাকার

---

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৮-২৫২।

৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৫-২৪৬।

সঙ্গে নবাব আলীওয়ার্দী বংশীয় এবং নবাব সিরাজ বংশীয়দের সমাধি ভবনের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ বার্ষিক ৩ টাকাকে তুলনা করে দেখা যেতে পারে। হিসাবটা বাংলা ১৩১৬ সালের।

১৯১০ সালের দিকে প্রকাশিত গ্রন্থ 'মুর্শিদাবাদ কাহিনী'তে শ্রীনিখিলনাথ রায় লিখেছেন (২০২ পৃষ্ঠায়) যে, আজও অর্থাৎ ১৯১০ সালেও বেগম লুৎফুন্নিসার কন্যা উম্মে জহুরার বংশীয়দের মালবার বেগম ও জাফর কুলী খাঁ নামক দুইজন জীবিত আছেন। (সম্প্রতি কিছু দিন আগে মরহুম ফজলে লোহানী 'যদি কিছু মনে না করেন' অনুষ্ঠানে সেই বংশীয় একজনকে বাংলাদেশ টেলিভিশনে দর্শক-শ্রোতাদের সামনে উপস্থিত করেছিলেন।)

আবার মীর জাফর ও তদ্বংশীয়দের কথায় ফিরে আসা যাক। "সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের নেতা হইয়া, ইংরেজদিগের সহিত যোগদান পূর্বক সিরাজের সর্বনাশের পর মীর জাফর মুর্শিদাবাদের মসনদে উপবিষ্ট হন। মসনদে বসিয়া তিনি ইংরেজদিগের দুর্ব্যবহারে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া উঠেন এবং তাঁহাদিগের হস্ত হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া স্বাধীন হওয়ার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র মীরণের সেই ইচ্ছা অধিকতর বলবতী ছিল। কিন্তু ইংরেজেরা মীর জাফরকে বলপূর্বক পদচ্যুত করিয়া তাঁহার জামাতা মীর কাশেমকে সিংহাসন প্রদান করেন। আবার মীর কাশেমের সহিত মনোবিবাদ উপস্থিত হইলে পুনর্বার মীর জাফরকে নবাব মনোনীত করিতে বাধ্য হন।"[৭] তারপর নামেমাত্র এই নবাবের মৃত্যু হয় ১৭৬৫ সালের জানুয়ারীতে, ৭৪ বছর বয়সে।

অতঃপর বাংলায় আরম্ভ হয় দ্বৈত-শাসন। মীর জাফর বংশীয়রা হন নাজিম; কিন্তু নেহায়েত সম্মানার্থে 'নবাব' শব্দটাও রেখে দেওয়া হয়। পুরো উপাধিটা হয় নবাব-নাজিম। "মীর জাফরের মৃত্যুর পর নজম উদ্দৌলা নিজামতী প্রাপ্ত হন। মীর জাফর জীবিত থাকতেই তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র মীরণের মৃত্যু হইয়াছিল, কলিকাতা কাউন্সিলের সভ্যেরা মীরণের পুত্রগণের আবেদন না শুনিয়া, নজম উদ্দৌলাকেই মসনদ প্রদান করেন। নজম উদ্দৌলা মীর জাফরের জীবিত পুত্রগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিলেন এবং মুসলমান ব্যবহারশাস্ত্রানুসারে তিনিই মীর জাফরের প্রকৃত উত্তরাধিকারী। কারণ, মুসলমান নিয়মানুসারে পিতামহ বর্তমানে পিতার মৃত্যু হইলে এবং পিতৃব্য জীবিত থাকিলে পৌত্রেরা পিতামহের উত্তরাধিকারী হইতে পারেন না।"[৮]

---

৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৪।

৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৫।

৯৭. নবাব-নাজিম নজম-উদ-দৌলাহ্ (১৭৬৫–১৭৬৬ সাল)

নজম-উদ-দৌলাই বাংলার প্রথম নবাব-নাজিম। মুহম্মদ রেজা খাঁ নিযুক্ত হন নায়েব-ই-সুবা হিসাবে। নবাব-নাজিমের বার্ষিক বৃত্তি ইংরেজ কোম্পানী কর্তৃক নির্ধারিত হয় ৫৩, ৮৬,১৩১ টাকা নয় আনা। একেবারে টাকা-আনা-পাইয়ের নিখুঁত হিসাব! তার মধ্যে ১৭,৭৮,৮৫৪ টাকা এক আনা 'নবাব'-এর নিজ ব্যয় নির্বাহের জন্য এবং বাকী টাকা সৈন্য-সামন্তদের ব্যয় নির্বাহের জন্য। রবার্ট ক্লাইভ নজম-উদ-দৌলার সঙ্গে মিলিতভাবে মোতিঝিলে 'কোম্পানী-রাজ্যের' প্রথম পুণ্যাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। তার কিছুদিন পর ১৭৬৬ সালের ৮ মে তারিখে প্রাণত্যাগ করেন বাংলার প্রথম নবাব-নাজিম নজম-উদ-দৌলাহ্।

৯৮. নবাব-নাজিম সৈফ-উদ-দৌলাহ্ (১৭৬৬–১৭৭০ সাল)

মীর জাফর-মণি বেগমের প্রথম পুত্র নজম-উদ-দৌলার মৃত্যুর পর বাংলার পরবর্তী নবাব-নাজিম নিযুক্ত হলেন মীর জাফর-মণি বেগমের দ্বিতীয় পুত্র সৈফ-উদ-দৌলাহ্। মীর কানাইয়া নামেই তিনি পরিচিত ছিলেন। সৈফ-উদ-দৌলার সময় নিজামতের বৃত্তি কমে গিয়ে ৪১,৮৬,১৩১ টাকায় নির্দিষ্ট হয়। মোতিঝিলে পুণ্যাহ অনুষ্ঠানে এবারে সৈফ-উদ-দৌলার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন গভর্নর ভের্লেস্ট। বাংলার সেই ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময়, ১৭৭০ সালে, সৈফ-উদ-দৌলা বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান।

৯৯. নবাব-নাজিম মোবারক-উদ-দৌলাহ্ (১৭৭০-১৭৯৬ সাল)

মীর জাফর-মণি বেগমের আর কোন পুত্র না থাকায় এবারে বাংলার নবাব-নাজিম নিযুক্ত হলেন মীর জাফর-বব্বু বেগমের পুত্র মোবারক-উদ-দোলাহ। তার আগেকার দুই নবাব-নাজিমের অভিভাবিকা হিসাবে বৃত্তি গ্রহণ করতেন তাঁদের মা মণি বেগম। সেই নিয়ম অনুসারে বালক নবাব-নাজিম মোবারক-উদ-দৌলার অভিভাবিকা হিসাবে বৃত্তি পাওয়ার কথা ছিল বব্বু বেগমের। কিন্তু নানারকম কারসাজির মাধ্যমে এবারও মোবারক-উদ-দৌলার অভিভাবিকা থেকে গেলেন মণি বেগমই। তবে মোবারক-উদ-দৌলার সময়ে নিজামতের জন্য নির্দিষ্ট টাকা আরও কমে গিয়ে দাঁড়াল ৩১, ৮১, ৯৯১ টাকায়। পরবর্তীতে আরও কমে গিয়ে দাঁড়ায় ১৬ লক্ষ টাকায়। নবাব-নাজিম মোবারক-উদ-দৌলার সময়ে নবাবের দেওয়ান নিযুক্ত হন মহারাজা নন্দকুমারের পুত্র রাজা গুরুদাস। ১৭৯৬ সালে মৃত্যুমুখে পতিত হন নবাব-নাজিম মোবারক-উদ-দৌলা।

১০০. নবাব-নাজিম বাবর জং (১৭৯৬–১৮১০ সাল)

নবাব-নাজিম বাবর জং ছিলেন মোবারক-উদ-দৌলার পুত্র। তিনি দিলার জং উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। ১৮১০ সালে তিনি পরলোক গমন করেন।

১০১. নবাব-নাজিম আলিজা বা সৈয়দ জৈনুদ্দীন আলি খাঁ (১৮১০–১৮২১ সাল)

ইঁনি নবাব-নাজিম বাবর জঙ্গের পুত্র। ১৮২১ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

১০২. নবাব-নাজিম ওয়ালাজা (১৮২১–১৮২৫ সাল)

নবাব-নাজিম ওয়ালাজা নবাব-নাজিম আলিজার ছোট ভাই। তিনি মারা যান ১৮২৫ সালের প্রথম দিকে।

১০৩. নবাব-নাজিম হুমায়ুনজা (১৮২৫–১৮৩৮ সাল)

নবাব-নাজিম হুমায়ুনজার সময়ে মুর্শিদাবাদের পুরনো প্রাসাদের স্থলে নতুন প্রাসাদ নির্মিত হয়। এই নির্মাণ কাজে ৯ বছরেরও বেশি সময় লেগেছিল। ১৮৩৭ সালে এর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়। এই কাজে খরচ হয়েছিল প্রায় ১৭ লক্ষ টাকা। হুমায়ুনজা প্রাণত্যাগ করেন ১৮৩৮ সালে।

১০৪. নবাব-নাজিম মনসুর আলী খান বা ফেরিদুনজা (১৮৩৮-৫ নভেম্বর, ১৮৮৪ সাল)

এই মনসুর আলি খানই বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার সর্বশেষ নবাব-নাজিম। তাঁর সময়ে নির্মিত হয় মুর্শিদাবাদের বর্তমান ইমামবারা। এই ইমামবারা হুগলীর বিখ্যাত ইমামবারার চাইতেও বড় আকারের। পুরনো ইমামবারা নির্মাণ করেছিলেন নবাব সিরাজউদ্দৌলা। ১৮৪৭ সালে নতুন ইমামবারা নির্মিত হয়। মনসুর আলি খাঁর সময় থেকেই মুর্শিদাবাদের সমস্ত গৌরবের অবসান হয়। এ সময়ে নিজামতের জন্য নির্দিষ্ট বৃত্তি আরও কমিয়ে দেওয়ার কথা ওঠে। নবাব-নাজিম মোবারক-উদ-দৌলার সময় থেকে এই বৃত্তির পরিমাণ ছিল বার্ষিক ১৬ লক্ষ টাকা। তার মধ্যে নবাবের নিজ ব্যয়ের জন্য নির্দিষ্ট ছিল ৭ লক্ষ টাকা। মনসুর আলি খানের সময়ে সরকার থেকে প্রকাশ করা হয় যে, গভর্নর-জেনারেল ইচ্ছা করলে এই বৃত্তির পরিমাণ কমিয়ে দিতে পারবেন। অবিশ্যি মনসুর আলি খানের জীবদ্দশায় তা আর কমানো হয় নাই।

কিন্তু সম্মানের লাঘব ঘটে অন্যান্য ব্যাপারে। এ সময়েই নবাব-নাজিমের সম্মানে ১৯ তোপ দাগানোর স্থলে ১৩ তোপ দাগানোর হুকুম জারি হয়। আগে নবাবের অনুমতি ব্যতীত মুর্শিদাবাদ কেল্লায় কেউ প্রবেশ করতে পারত না। এবারে ইংরেজ সরকার সে অনুমতির নিয়ম রদ করে। তাছাড়া মণি বেগমের সঞ্চিত তহবিলে যে সমস্ত ধন-সম্পদ ছিল, নবাব-নাজিমকে তার অধিকার থেকেও বঞ্চিত করা হয়।

এর মধ্যে অবিশ্যি দিল্লীর 'বাদশা'র সম্মানও ধূলোয় লুণ্ঠিত হয়েছে। মারাঠা শক্তিকে ক্ষমতাচ্যুত করে ১৮০৩ সালে ইংরেজ সেনাপতি লর্ড লেইক দিল্লী অধিকার করলে 'সম্রাট' দ্বিতীয় শাহ্ আলম ইংরেজের আশ্রিত এক বৃত্তিভোগীতে পরিণত হন। দ্বিতীয়

শাহ্ আলমের পুত্র 'সম্রাট' দ্বিতীয় আকবরও (১৮০৮-১৮৩৬ সাল) ইংরেজাশ্রিত বৃত্তিভোগী 'বাদশা'র জীবন অতিবাহিত করেন। এই অবস্থা চলে শেষ মুগল 'বাদশা' বাহাদুর শাহ্ জাফরের কালেও। তারপর ১৮৫৭ সালের সেই ইতিহাসখ্যাত 'সিপাহী যুদ্ধে' জড়িত হয়ে পড়েন বাহাদুর শাহ্ জাফর। ইংরেজের বিরুদ্ধে জোয়ান-জনতার সেই অভ্যুত্থান ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ার পর ১৮৫৮ সালে নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত হন অশীতিপর বৃদ্ধ বাহাদুর শাহ্ জাফর।

এমনি অবস্থার প্রেক্ষাপটে মুর্শিদাবাদের নামেমাত্র নবাব-নাজিমের সম্মান লাঘবের উপরোক্ত চিত্র বিস্ময়ের উদ্রেক করবে কেন! তাছাড়া, স্বাধীনতা হারানোর জ্বালা এদেশের সাধারণ মানুষকে যতটা ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল, মুর্শিদাবাদের তদানীন্তন 'নবাব'গণকে তা হয়তো তেমন কোন কষ্ট দেয় নি। তা না হলে ১৮৫৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মনসুর আলি খান ওরফে ফেরিদুনজা যখন নবাব-নাজিম এবং যখন মীরাট ও দিল্লীর সিপাহীদের অভ্যুত্থানের তিন মাস পূর্বে কলকাতার নিকটবর্তী ব্যারাকপুরের এবং তারপর বহরমপুরের সিপাহীরা বিদ্রোহ করে এবং সে খবর শোনামাত্র হাজার হাজার কৃষক বহরমপুর শহরে সমবেত হয়ে কোন নেতৃত্বের সন্ধান না পেয়ে স্বাধীন বাংলার নবাবের বংশধর বহরমপুরবাসী মনসুর আলি খানের নিকটেই নির্দেশ প্রার্থনা করেছিল, তখন কোন উত্তর না পাওয়ায় তাদেরকে হতাশ হয়ে ফিরে আসতে হয়েছিল কেন ? ইংরেজ ঐতিহাসিক কে'র কথা, "হাজার হাজার মানুষ শহরে সমবেত হইয়াছিল। তাহারা যে ব্যক্তিটির নির্দেশ পাইলেই বিদ্রোহে ঝাঁপাইয়া পড়িত সেই ব্যক্তিটি নিজে দুর্বল হইলেও একটি বিখ্যাত নামের মর্যাদায় যথেষ্ট শক্তিশালী ছিলেন। ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, যদি বহরমপুরের সিপাহীরা ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিত এবং মুর্শিদাবাদের জনসাধারণ নবাবকে সম্মুখে রাখিয়া সিপাহীদের সহিত মিলিত হইত, তাহা হইলে দেখিতে না দেখিতে সমগ্র বাংলায় আগুন জ্বলিয়া উঠিত।"[৯] বাঁকুড়া জেলার গেজেটিয়ার থেকেও জানা যায় যে, বহরমপুরের বিদ্রোহের খবর শোনামাত্র কৃষ্ণনগর, যশোর ও সমগ্র বিভাগে একটা ভয়ঙ্কর অবস্থা দেখা দিয়েছিল। শাসকগণ এই ভেবে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে উঠেছিল যে, যে কোন সময় বাঁকুড়া জেলার সাঁওতাল ও চোয়াড়দের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দিতে পারে। সেই সিপাহী অভ্যুত্থানের সময়ে "বঙ্গীয় সরকারের অধীনে এমন একটিও জেলা ছিল না, যাহা প্রত্যক্ষ বিপদের মধ্য দিয়া অতিক্রম করে নাই অথবা যেখানে ভয়ঙ্কর বিপদের আশঙ্কা ছিল না।"[১০]

নিশ্চয়ই ইংরেজ সরকারের ভয়েই মুর্শিদাবাদের নবাব-নাজিম মনসুর আলি খান সমবেত ইংরেজ বিদ্রোহীদের সামনে দাঁড়িয়ে নির্দেশ দান তো দূরের কথা, তাদেরকে

---

৯. J. W. Kaye, A Hstory of the Se poy War. Vol. I. P. 498.

১০. C. E. Buckland, Bengal Under Lientenant Governors, Vol. I. P.68.

ফিরে যেতেও বলেন নাই। ঐতিহাসিক কে' একটা ভুল শব্দ ব্যবহার করেছেন। নবাব-নাজিম মনসুর আলি খান বাংলার স্বাধীন নবাবের বংশধর ছিলেন না, ছিলেন স্বাধীনতা বিকিয়ে দেওয়া 'নবাবের' বংশধর। তাই হয়তো তাঁর ছিল এত ভয়! মুর্শিদাবাদের নবাব-নাজিমদের প্রতি, বিশেষ করে, মনসুর আলি খানের প্রতি ইংরেজ সরকার তো আর সম্মান বলতে তেমন কিছুই দেখায় নাই!

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে দিল্লীর 'বাদশা' অশীতিপর বৃদ্ধ বাহাদুর শাহ্ জাফরের কথা। উপরোক্ত ঘটনার তিন মাস পরে মীরাটের অভ্যুত্থানকারীরা তাদেরকে নেতৃত্ব দান করার জন্য অতি ভোরে বাদশাহী ফটকের সামনে জমায়েত হয়ে বাদশার উত্তর আশা করছিল, তখন শক্তিধর ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে এমনি অভ্যুত্থানের ভয়ঙ্কর পরিণতির কথা জানা থাকা সত্ত্বেও ইংরেজের সামান্য বৃত্তিভোগী সেই বাহাদুর শাহ্ জাফর সিপাহীদের প্রত্যাশার অনুকূলে জবাব দিয়েছিলেন। বাহাদুর শাহ্ জাফর ছিলেন বাদশা বাবর-হুমায়ুন-আকবর-জাহাঁগীর-শাহ্জাহান-আলমগীরের খান্দানের লোক। তাঁর নেতৃত্বে অভ্যুত্থান-কারীরা পরাজিত হয়েছিল, বাহাদুর শাহ্ জাফরও নির্বাসিত হয়েছিলেন রেঙ্গুনের অতি নিকৃষ্ট একটি স্থানে। তবু জন্মভূমির স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের আহ্বানে তিনি সাড়া দিয়েছিলেন!

ইংরেজ আমলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য

১৭৫৭ সালে পলাশী বিপর্যয়ের পর থেকে প্রকৃত প্রস্তাবে সুবে বাংলা চলে গেল ইংরেজ অধিকারে। আরম্ভ হল মীরজাফরী নবাবীর আড়ালে সমগ্র বাঙালী জাতির, বিশেষ করে বাঙালী মুসলমানের ভাগ্য বিপর্যয়; এবং ইংরেজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়ায় সুবে বাংলার স্বাধীনতার শেষ আশা চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে গেল গিরিয়া-উধুয়ানালা-বকসারে নবাব মীর কাশিমের উপর্যুপরি পরাজয়ে। ১৭৬৫ সালে দিল্লীর 'বাদশাহ্' শাহ্ আলমের ফরমান বলে ইংরেজ কোম্পানী পেল সুবে বাংলার দেওয়ানী বা রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা। ১৭৫৭ সালে পাওয়া দেশ রক্ষার ক্ষমতার সঙ্গে দেওয়ানী ক্ষমতার সমন্বয়ে এ দেশে ইংরেজ আধিপত্য হল নিরংকুশ। পুরোপুরিভাবে আরম্ভ হল কোম্পানী শাসন এবং শাসনের নামে শোষণ ও উৎপীড়ন। কোম্পানী সমর্থক লর্ড মেকলেও লর্ড ক্লাইভের উপর রচিত প্রবন্ধমালার ৬৩ পৃষ্ঠায় বলেন, "ইহা সত্য যে, বাংলার মানুষ শোষণ ও উৎপীড়ন সহ্য করিতে অভ্যস্ত, কিন্তু এই প্রকারের শোষণ ও উৎপীড়ন তাহারাও কোন দিন দেখে নাই।"

১৭৭০ সালে, বাংলা ১১৭৬ সনে, বাংলায় এল এক মহামন্বন্তর, 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর'। ১৭৭২ সালে কোম্পানীর ডিরেকটরদের কাছে লিখিত পত্রে এ দেশের

তদানীন্তন গভর্নর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস নির্লজ্জভাবে উল্লেখ করেন,"....মন্বন্তরে বাংলার সমগ্র জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের মৃত্যু এবং তাহার পরিণামে চাষের চরম অবনতি সত্ত্বেও ১৭৭১ সালের নীট রাজস্ব আদায় এমনকি ১৭৬৮ সালের রাজস্ব অপেক্ষাও অধিক হইয়াছে। যে কোন লোকের পক্ষে ইহা মনে করা স্বাভাবিক যে, এইরূপ একটা ভয়ংকর বিপর্যয়ের মধ্যে রাজস্ব অপেক্ষাকৃত অল্প হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তাহা না হইবার কারণ এই যে, সকল শক্তি দিয়া রাজস্ব আদায় করা হইয়াছে।" কোম্পানী শোষণ-উৎপীড়নের এই-ই ছিল স্বরূপ। কার্ল মার্কস বলেছিলেন, 'বিজিত ভারতবর্ষে এক দ্বিবিধ কর্তব্য পালন করবে ইংরেজঃ একটি ধ্বংসমূলক এবং অন্যটি উজ্জীবনমূলক, অর্থাৎ একটি পুরনো সমাজের ধ্বংস এবং অন্যটি বিজিত দেশে পাশ্চাত্য সমাজের বৈষয়িক ভিত্তির প্রতিষ্ঠা। সুবে বাংলা বিজয়ের পর ইংরেজ কোম্পানী এ দেশে তা-ই করেছিল। 'প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধ' গ্রন্থে কার্ল মার্কস আরও বলেছিলেন, "কলকাতায় ইংরেজদের তত্ত্বাবধানে অনিচ্ছা সহকারে ও স্বল্প পরিমাণে শিক্ষিত ভারতের দেশীয় অধিবাসীদের মধ্য থেকে নতুন একটি শ্রেণী গড়ে উঠছে যারা সরকার পরিচালনার যোগ্যতাসম্পন্ন.... ।" (পৃঃ ৩৪)। এই নতুন শ্রেণীটিই ইংরেজ পক্ষীয় এ দেশের প্রথম দালাল শ্রেণী। এদের সাহায্যেই ইংরেজ কোম্পানী এ দেশের পুরনো সমাজকে ধ্বংস করে দিয়ে পরিবর্তে নিজেদের স্বার্থে উপযোগী বৈষয়িক ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করেছিল।। সেই বৈষয়িক ভিত্তির আওতাভুক্ত ছিল সমাজ-সংসার, ধন-দৌলত শিক্ষা-সাহিত্য সবকিছু।

১৭৭২ থেকে ১৭৯৩ সাল পর্যন্ত কোম্পানী কর্তৃপক্ষ বাংলার শাসনে নানা পরিবর্তন আনতে থাকে। এ সময়ের গোড়ার দিকে বাংলার রাজধানী স্থানান্তরিত হয় কলকাতায়, 'নবাব' হন বৃত্তিভোগী; ১৭৯৩ সালে প্রবর্তিত হয় জমিদারীর 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত'। এই বন্দোবস্তের ফলে বাংলার মুসলমানগণ সর্বনাশের সম্মুখীন হল। ১৮৩৬ সালে অফিস-আদালত থেকে ফারসী ভাষার ব্যবহার উঠে গেল; ফলে, বাংলার সম্ভ্রান্ত মুসলমানদের কিছুটা সম্মান নিয়ে বেঁচে থাকার শেষ সম্বলও নিঃশেষ হয়ে গেল। তার প্রায় ৪০ বছর আগে থেকেই দেশে ইংরেজী শিক্ষা চালু করার চেষ্টা চলতে থাকে। চার্লস গ্রান্ট ছিলেন তার প্রথম উদ্যোক্তা। এই উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত হয় ইংরেজ মিশনারীদের কার্যক্রম। ১৭৯৩ সালে উইলিয়াম কেরী কলকাতায় এসে শ্রীরামপুরের ইংরেজ মিশনে যোগ দেন। তার প্রচেষ্টায় সেখানে স্থাপিত হয় ইংরেজী স্কুল, আর বাইবেলের বাংলা গদ্য অনুবাদ প্রকাশিত হয়। তারপর ডেভিড হেয়ার ও রাজা রামমোহন রায়ও ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারে ব্রতী হয়ে ওঠেন। ১৮০০ সালে কলকাতায় স্থাপিত হয়

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ এবং ১৮২৩ সালে গঠিত হয় 'কমিটি অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন' এবং তাঁর উদ্যোগেই প্রতিষ্ঠিত হয় 'সংস্কৃত কলেজ'। এভাবে দেশে আরম্ভ হল ইংরেজী শিক্ষার অগ্রযাত্রা। হিন্দুরা ইংরেজী শিক্ষার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেন, আর মুসলমানেরা ঘৃণাবশতঃ সে শিক্ষা থেকে সরে থাকেন অনেক দূরে।

১৭৫৭ থেকে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত এই এক শ' বছরের কাহিনী বাংলার মুসলমানদের জন্য লাঞ্ছনা ও বঞ্চনাভরা এক সুদীর্ঘ তমসাকালের রক্তঝরা কাহিনী। তারই সঙ্গে সে কাহিনী যুগপৎ এক দৃঢ়সংকল্প মরণপণ সংগ্রামেরও কাহিনী; সে কাহিনী অপূর্ব ত্যাগ ও অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্টের মোকাবিলায় বীরত্বভরা কাহিনী। সে কাহিনী রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্য, দারিদ্র্য আর লাঞ্ছনার নাগপাশ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য, সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক পুনরুজ্জীবনের জন্য, নিজেদের সভ্যতা ও কৃষ্টিকে ধারণ করে বেঁচে থাকার উপযোগী এক জীবন রচনার জন্য বেদনা ও প্রতিশ্রুতির স্বাক্ষরে উজ্জ্বল এক কাহিনী। সে কাহিনীতে আছে মজনুশাহ্-তিতুমীর-শরীয়তুল্লাহ-দুদুমিয়াদের সংগ্রামের কথা, আছে শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ প্রবর্তিত পুনর্জাগরণ আন্দোলনের 'বালাকোট'মুখী সংগ্রামের কথা, আছে শহীদী খুনে ভাসমান অসংখ্য রক্তপদ্মের কথা। শত বছরের সেসব সংগ্রাম-কথা বুকে নিয়ে বিক্ষুব্ধ অগ্নিগিরি ১৮৫৭'র বিস্ফোরণে নিঃশেষিত হয়ে গেল; মুক্তি তখনও বহু দূরে!

'মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য' গ্রন্থে ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক বলেনঃ "বাংলার মুসলমানের এই কাহিনী অত্যন্ত করুণ ও অতিশয় মর্মবিদারী। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে হান্টার সাহেব তাঁর 'দি ইন্ডিয়ান মুসলমান্স্' নামক গ্রন্থে বাংলার মুসলমানদের যে চিত্র আঁকিয়াছেন, নিম্নে আমি তাহারই সংক্ষিপ্তসার সংকলন করিয়া দিতেছিঃ 'পলাশী যুদ্ধের সময় হইতে সিপাহী বিদ্রোহের বহুদিন পর পর্যন্ত ১২৫ বৎসর যাবৎ বাংলার মুসলমানদের প্রতি আমাদের অবিচারের সীমা ছিল না। এই সেদিন পর্যন্ত যাঁহারা দেশের বিজেতা ও শাসক সম্প্রদায় ছিলেন, তাঁহারা আজ গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ করিতেও অসমর্থ। এই সম্প্রদায় আজ সর্বপ্রকারে নিঃস্ব ও ধ্বংসোন্মুখ। ইহার জন্য দায়ী আমাদের কল্পনাবিরহিত শাসন। বাংলার অভিজাত মুসলমান ধ্বংস হইয়াছে। ....তাঁহাদের আয়ের পথ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বড়-ছোট সমস্ত রাজপদের দরজাও এখন তাঁহাদের জন্য বন্ধ ও হিন্দুর জন্য মুক্ত।' বাংলার মুসলমানদের এই অবস্থার জন্য হান্টার সাহেব একমাত্র তাঁর স্বজাতিকেই দায়ী করিয়াছেন।' (পৃ. ২৭১-২৭৩)। এমনি অবস্থায় বাংলার মুসলিম কবি-সাহিত্যিকদের কাব্যচর্চার কথা ভাবাই তো যায় না! তবুও তাঁরা নিশ্চেষ্ট হয়ে ছিলেন না। এই তমসাকালেও যাঁরা বাংলা ভাষায় কাব্যচর্চা করে যাচ্ছিলেন, কাব্য-কৃতিসহ তাঁদের একটা তালিকা এখানে তুলে ধরতে চাই। উল্লেখ্য, এ প্রবন্ধে ব্যবহৃত প্রায় সব তথ্যই ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক রচিত 'মুসলিম বাংলা সাহিত্য' থেকে নেয়া।

তালিকা–পাঁচ

কবিদের নাম	তাঁদের জীবন/রচনা-কাল	বাংলায় কাব্য-কৃতি
মুহম্মদ রেজা	১৬৯১-১৭৬	তমীম-গোলাম, মিসরী জামাল
আলী রেজা	১৬৯৫-১৭৮০	সিরাজকুলুব, জ্ঞান-সাগর, আগমন, ধ্যান মালা, যোগকলন্দর, ষটচক্রভেদ
মুহম্মদ মকীম	১৭৭৩ সালে জীবিত	গুল-ই-বকাওলী, ফায়দুল মুক্তাদী
মুহম্মদ আলী	১৭৭৩ সালে জীবিত	হায়রাতুল ফিকাহ্, শাহাপরী, মল্লিকজাদা, হাসনা বানু
মুহম্মদ কাসিম	১৭৩০-১৮০০?	হিতোপদেশ, সুলতান জমজমা, সিরাজুল কুলুব
সৈয়দ নূরুদ্দীন	১৭৩০-১৮০০?	দকায়িকুল হকাইক, মুসার সওয়াল, কিয়ামতনামা, হিতোপদেশ
রহিমুন্নিসা	১৭৬৩-১৮০০ (সম্ভবতঃ)	পদ্মাবতীর অনুলিখনে 'আত্মবিবরণী,' ভ্রাতৃবিলাপ, দোরদানার বিলাপ
সৈয়দ হামজা	১৭৯০-১৮০৬ (কাব্য-জীবন)	মধুমালতী, আমীর হামজা, জৈগুনের পুঁথি, হাতিমতাঈ, সোনাভান
কবি চুহর	১৮০৪-১৮৩৫-এর মধ্যে জীবিত	আজর শাহ-সমনরুখ, মনোহর-মধু মালতী, দিলারাম
হামীদুল্লাহ খান	১৮০৮-১৮৭০	রাহ্-ই-নাজাত, গুলজার-ই-শাহাদাত

উপরোক্ত তালিকার কাব্য-কৃতি সম্পর্কে কিছু বলার আগে তার পটভূমি কিছুটা তুলে ধরা প্রয়োজন। এই সময়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য একটা ক্রান্তিলগ্নে উপনীত হয়েছিল। নতুন রাজশক্তির আমলে দেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন হচ্ছে, মিশনারীরা ধর্ম প্রচারের সহায়ক হিসাবে গদ্যে বাইবেলাদি গ্রন্থ প্রকাশের মাধ্যমে বাংলা ভাষায় গদ্যরীতি প্রচলন শুরু করেছে। ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠাকালে পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতিকে এদেশে অনুপ্রবেশের সহায়তাকল্পে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উপরও রাজানুগ্রহ বর্ষিত হচ্ছে। এমনি অবস্থায় যেহেতু হিন্দুরা ছিলেন পরিবর্তিত রাজশক্তির পক্ষে, সেহেতু হিন্দু কবি-সহিত্যিকরা পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করে এক নতুন দিগন্তপানে তাঁদের দৃষ্টি ফেরালেন। সুলতানী ও মুঘল আমলে মুসলিম কবিরা যেমন জাতীয় ও ভারতীয় উৎস ছাড়াও কাব্য প্রেরণার জন্য আরবী-ফারসী সাহিত্যের সঞ্চয়কে আত্মস্থ করে তার প্রকাশে মনোযোগী ছিলেন, এবার হিন্দু কবি-সাহিত্যিকরা দেশের সীমানাতিক্রান্ত সাহিত্য-উৎস হিসেবে, প্রথমদিকে অন্ততঃ ফর্মের জন্য, ইংরেজী সাহিত্যের প্রতি মনোযোগী হলেন।

মুসলিম কবিদের অবস্থা থাকল আগের মতই। গদ্যরীতি গ্রহণ করলেন হিন্দু সাহিত্যিকরা; পদ্যে-গদ্যে পাশ্চাত্যধারায় প্রভাবিত হয়ে এগিয়ে চললেন নব উদ্যমে। আর অসহায় মুসলিম কবিরা বাধ্য হয়ে হাত দিলেন প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী এমন রচনায়, অবজ্ঞাভরে যা চিহ্নিত হল 'বটতলার পুঁথি' বলে। প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়লেন মুসলিম কবিরা। তখনই আবার দেশে কোম্পানী শাসনের বিরুদ্ধে আরম্ভ হয় প্রচণ্ড প্রতিরোধ সংগ্রাম। কার্যতঃ সে সংগ্রাম ছিল মুসলিম নিয়ন্ত্রিত এবং সে সংগ্রামের সঙ্গে একাত্ম ছিলেন মুসলিম কবিরাও। ইংরেজরা সে সংগ্রামকে 'ওহাবী' আন্দোলন বলে অভিহিত করে তার প্রভাবকে খর্ব করতে চাইলেও তা ছিল মুসলিম নেতৃত্বে পরিচালিত এদেশীয়দের মরণপণ মুক্তিসংগ্রাম। এ মনোভাবের প্রভাবে বিদেশী শাসক প্রভাবিত হিন্দু সাহিত্যিকদের সাহিত্য-কৃতির প্রতিবাদেই যেন তাঁদের ব্যবহৃত বাংলা ভাষাকে আরবী, ফারসী ও উর্দু শব্দের আধিক্য দিয়ে তাকে মুসলমানী রূপ দিতে চাইলেন। হিন্দু ও মুসলিম কবিরা আগে থেকেই তো দু'টি ভিন্ন খাতে নিজেদের লক্ষ্য অনুযায়ী তাঁদের কাব্য-কৃতিকে এগিয়ে নিচ্ছিলেন, এবার দু'টি খাতের ভিন্নতা আরও সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। খাত দু'টি এবার সম্প্রদায়গত না থেকে অনেকটাই সাম্প্রদায়িক হয়ে উঠল।

উপরোক্ত কবিদের কাব্য-কৃতির এই হল পটভূমি। কাব্যগুলোর শ্রেণীবিভাগে দেখা যায়, ধর্মীয় কাব্য এবং কাহিনী কাব্যের সংখ্যা প্রায় সমান। অন্য ধরনের কাব্য-কৃতি এখানে অনুপস্থিত। ডক্টর হকের মতে, এইসব কাব্যে "সাহিত্য আছে, রস আছে, শিল্পও আছে। তবে তাহার বেশীর ভাগই মোগলাই।"

আঠার শ' সাতান্ন-আটান্ন'র মুক্তি-প্রয়াস ব্যর্থ হয়ে গেল; মুঘল ঐতিহ্যের পরিমণ্ডলে কাব্যচর্চায় উপরোক্ত মুসলিম কবিদের দিনও গত হয়ে গেল। ইংরেজ সাম্রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হল ভারতবর্ষে। মুসলিম সাহিত্যসেবীরা দেখতে পেলেন, আলো ঝলমল সেই নিরুদ্বিগ্ন দিনে হিন্দু সাহিত্যসেবীরা তাঁদের পথ পরিক্রমায় বহুদূর এগিয়ে গেছেন। ১৮০০ থেকে ১৮৭০ সালের মধ্যে রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, বিহারীলাল চক্রবর্তী, মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ সাহিত্যিকের অক্লান্ত চেষ্টায় আধুনিক বাংলা সাহিত্য হল দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সে-সাহিত্য ততদিনে হিন্দু ঐতিহ্যবাহী। মুসলিম সাহিত্যিকরা স্বাভাবিকভাবেই অনুভব করলেন, হিন্দু সাহিত্যিকদের কাছ থেকে মুসলিম ঐতিহ্যবাহী সাহিত্য সৃষ্টির আশা বাতুলতা মাত্র।

এই অনুভবের প্রেক্ষিতেই আধুনিক বাংলা সাহিত্যাঙ্গনে মুসলমানদের বিলম্বিত পদক্ষেপ। বাস্তবতার তাগিদে ইংরেজী শিক্ষার প্রতি মনোযোগী হওয়া ছাড়া মুসলিম 'মধ্যবিত্ত' শ্রেণীর আর কোন গত্যন্তর রইল না। ভীরু ও ধীর পদক্ষেপে নবজীবনের পথে এগোলেন তাঁরা। এগোলেন সাহিত্যের পথেও। এঁদের মধ্যে প্রথমেই যাঁর নাম

করতে হয়, তিনি মীর মশাররফ হোসেন, 'সাহিত্য-সম্রাট' বঙ্কিমচন্দ্রের (১৮৩৮-১৮৯৪) কনিষ্ঠ সমসাময়িক। ১৮৬৯ সালে প্রকাশিত হল তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'রত্নাবতী' উপন্যাস। ৪০ বছরেরও বেশি সাহিত্য সাধনাকালে তিনি 'বিষাদ সিন্দু'সহ রচনা করেন প্রায় ৩০টি গ্রন্থ। তাঁরই প্রদর্শিত পথে এগিয়ে আসেন অন্যরাও। নীচে দেয়া হল 'আধুনিক' মুসলিম সাহিত্যিকদের একটি তালিকা। আধুনিক মুসলিম বাংলা সাহিত্যের এঁরা প্রথম দল।

তালিকা–ছয়

কবি-সাহিত্যিকদের নাম	জীবন/রচনা-কাল	তাদের সাহিত্য-কৃতি
মীর মশাররফ হোসেন	১৮৪৮-১৯১১	রত্নাবতী, বিষাদ সিন্ধু, মদীনার গৌরব, জমিদার দর্পণ প্রভৃতি উপন্যাস-নাটক-ধর্মীয় রচনা প্রায় ৩০টি গ্রন্থ
কায়কোবাদ	১৮৫৮-১৯৫১	অশ্রুমালা, মহাশ্মশান কাব্যসহ বেশ কটি গ্রন্থ
কবি দাদ আলী	১৮৫৬–১৯২৭	ভাঙ্গাপ্রাণ, শান্তিকুঞ্জ, আশেকে রসুল, অন্তিমে মৃত্যু
শেখ আবদুর রহীম	১৮৫৯-১৯৩১	'সুধাকর' 'মিহির ও সুধাকর' 'মোসলেম-হিতৈষী' সংবাদপত্রের সম্পাদনাসহ প্রায় ১১টি গ্রন্থ
মোজাম্মেল হক	১৮৬০-১৯৩৩	কুসুমাঞ্জলী, প্রেমহার, জাতীয় ফোয়ারাসহ ১৫টি গ্রন্থ
মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ	১৮৬১-১৯০৭	মিশনারীদের বক্তব্য বিরোধী এই সুবক্তার বেশ কিছু গ্রন্থ,
আবদুল করীম সাহিত্য-বিশারদ	১৮৬৯-১৯৫৩	দুই হাজারের মত পাণ্ডুলিপি সংগ্রাহক ও প্রাবন্ধিক
মওলানা মুনীরুজ্জামান ইসলামাবাদী	১৮৭৫-১৯৫০	খগোল শাস্ত্রে মুসলমান, ভূগোল শাস্ত্রে মুসলমান, ভারতে মুসলমান সভ্যতা প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা সুবক্তা ও সমাজসেবক

তাছাড়া ওই সময়ে সাহিত্য চর্চা করেছেন যেসব কবি-সাহিত্যিক, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন পণ্ডিত রেয়াজউদ্দীন মাশহাদী, ডাক্তার আবুল হোসেন, মৌলভী মেয়রাজ উদ্দীন আহমদ, তসলিম উদ্দীন আহমদ, মুনশী মোহাম্মদ জমীরুদ্দীন বিদ্যাবিনোদ, মৌলভী

আব্বাস আলী, কবি আরজুমন্দ আলী, কবি আবু মা'লি মোহাম্মদ হামিদ আলী, আবদুল হামিদ খান ইউসুফ জায়ী, মওলানা রুহুল আমীন প্রভৃতি।

এঁদের সাহিত্য-কৃতি সম্পর্কে 'মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য' গ্রন্থে ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক বলেনঃ "সমগ্র বাংলা সাহিত্যে ইহাদের দান সম্বন্ধে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, বঙ্কিমচন্দ্র ও মধুসূদনকে বাদ দিলে সেই যুগের অন্যান্য হিন্দু সাহিত্যিকদের তুলনায় ইহাদের সাহিত্যিক দান উৎকৃষ্ট বই নিকৃষ্ট নহে। পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষা বাঙালী হিন্দুর মধ্যে হিন্দু ঐতিহ্য ও জাতীয়তাবোধ জাগাইয়াছিল। ঠিক তেমনিভাবে পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষায় অল্প হইলেও এই শিক্ষা মুসলমানদের মধ্যে মুসলিম ঐতিহ্য ও মুসলিম জাতীয়তাবোধ জাগাইয়াছে।......

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব বাংলার হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, তাহা মূলতঃ এক—একেবারেই এক; ইহাকে আত্মবিশ্লেষণের প্রতিক্রিয়া নামে অভিহিত করা যায়।

আত্মবিশ্লেষণের ফলেই আমাদের আত্মোপলব্ধি ও আত্মপরিচিতি ঘটে। এইখানে আসিয়াই বাংলার হিন্দু ও মুসলমান ভিন্ন পথ ধরিল। তাঁরা বুঝিলেন, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে হিন্দু হিন্দুই এবং মুসলমান মুসলমানই, তাঁহারা পরস্পরের সহিত মিশিয়া এক জাতি হইতে পারে নাই ও পারিবে না। তাঁহারা আরও উপলব্ধি করিলেন, মধ্যযুগের বিশেষ করিয়া পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধ ও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ সময়ের হিন্দু মুসলমান সংস্কৃতি-সমন্বয়ের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে।" (পৃঃ ৩১৭)।

উপরোক্ত তালিকার কবি-সাহিত্যিকগণ এই বোধ থেকেই প্রাচীন মুসলিম কাহিনী, ইতিহাস থেকে শৌর্য-কথা ও বীরত্ব গাঁথা তুলে ধরে জীবনমৃত মুসলিম সমাজকে জাগিয়ে তোলার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। উদ্দেশ্য তাঁদের সফল হয়েছিল। সাংস্কৃতিক বোধের এই বাস্তবতা রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর, ইংরেজ কর্তৃপক্ষের যুক্তিতে প্রশাসনিক সুব্যবস্থার কারণে, বাংলা বিভক্ত হয়ে গঠিত হয় দু'টি প্রদেশঃ ঢাকাকে রাজধানী করে পূর্ববঙ্গ আসাম প্রদেশ এবং বিহার-উড়িষ্যার অঞ্চলাদি নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ। পূর্ববঙ্গ আসাম প্রদেশ গঠন ছিল মুসলিম স্বার্থের অনুকূলে। কিন্তু হিন্দু স্বার্থে ঘাটতি পড়ায় ধনে-জ্ঞানে উন্নততর বাঙ্গালী হিন্দুরা এ ব্যবস্থার ঘোর বিরোধিতায় অবতীর্ণ হন। এর আগে ১৮৮৫ সালে নিখিল ভারত কংগ্রেস গঠিত হয়েছিল; ১৯০৬ সালে গঠিত হল নিখিল ভারত মুসলিম লীগ। প্রচণ্ড আন্দোলনের মুখে ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর রহিত হয়ে গেল প্রদেশ গঠনের এই ব্যবস্থা। কয়েক বছর পর ক্ষুব্ধ মুসলিম মনোভাবকে শান্ত করার লক্ষ্যে ১৯২১ সালে চালু করা হল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ওদিকে হিন্দু কবি-সাহিত্যিকদের নেতৃত্বে পাশ্চাত্য ভাবদীপ্ত আধুনিক বাংলা সাহিত্য সৃষ্টির যে সাধনা আরম্ভ হয়, তা পূর্ণতা লাভ করে বিশ্ববিশ্রুত কবি

রবীন্দ্রনাথের (১৮৬১–১৯৪১) অবদানে। আর এদিকে স্বাতন্ত্র্যবোধের প্রেরণায় বাংলা-সাহিত্যের অঙ্গনে যে দ্বিতীয় দলটি এগিয়ে এলেন, তার পুরোভাগে ছিলেন সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী। এঁদের সাহিত্য-কৃতি একাধারে বহুমুখী এবং সংখ্যায়ও অনেক। তাই তাঁদের পরিচয় তুলে ধরতে গিয়ে গ্রন্থাদির নামোল্লেখ না করে শুধুমাত্র নাম আর বন্ধনীর মধ্যে জীবনকাল দিয়েই তা শেষ করছি। তাছাড়া উল্লিখিতদের সাহিত্য-কৃতি সম্পর্কে অনেকেই সুপরিচিত। এই সাহিত্যিকবৃন্দ হচ্ছেনঃ অনল প্রবাহ, রায়নন্দিনী প্রভৃতি বহু গ্রন্থের রচয়িতা সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী (১৮৭০-১৯৩১); ধর্মীয় গ্রন্থাদির প্রণেতা খান বাহাদুর আহসান উল্লাহ্ (১৮৭৮-?); 'আনোয়ারা' ও অন্যান্য উপন্যাস রচয়িতা মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্যরত্ন (১৮৭৮-১৯৩৫); রূপজালাল-এর লেখিকা নওয়াব ফয়জুন্নিসা চৌধুরানী (১৮৩০-১৯০৩); 'অবরোধ বাসিনী', 'মতিচুর' প্রভৃতি লেখিকা বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত (১৮৮০-১৯০২); 'আব্দুল্লাহ' উপন্যাসখ্যাত কাজী ইমদাদুল হক (১৮৮২-১৯২৭); ইকরামুদ্দীন (১৮৮২-১৯৩৫); শেখ ফজলুল করিম (১৮৮২-১৯৩৬); মওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ (১৮৩৮-১৯৬২); স্বনামখ্যাত সুপণ্ডিত ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (১৮৮৫-১৯৬৯); মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী (১৮৮৬-১৯৩৮); ডাঃ লুৎফর রহমান (১৮৮৭-১৯৩৬); এস. ওয়াজেদ আলী (১৮৮৮-১৯৫১); কবি শাহাদাৎ হোসেন (১৮৯৩-১৯৫৩); শেখ মুহম্মদ ইদ্রিস আলী (১৮৯৫-১৯৫৪); ইব্রাহিম খাঁ (১৮৯৪-১৯৭৮); কবি গোলাম মোস্তফা (১৮৯৫-১৯৬৪); মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী (১৮৯৬-১৯৫৪); মুহাম্মদ বরকতুল্লাহ (১৮৯৬-১৯৬৩); কাজী আকরাম হোসেন (১৯৮৬-১৯৬৩); আবুল কালাম শামসুদ্দীন (১৮৯৭-১৯৭৮); কাজী মোতাহার হোসেন (১৮৯৭-১৯৮১); মাহবুব-উল-আলম (১৮৯৮-১৯৮১); আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৮-১৯৭৪); এবং কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)। এই উল্লেখ থেকে নিশ্চয়ই কিছু কিছু নাম বাদ পড়েছে, তবে তা স্মরণে না আসার জন্য। তাছাড়া, প্রবন্ধে আমরা বিশ শতকে জন্মগ্রহণকারী কবি-সাহিত্যিকবৃন্দের নামোল্লেখ করেই ইতি টানছি।

'মুসলিম বাঙলা সাহিত্য' গ্রন্থে ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক বলেনঃ "অতঃপর, বাংলা সাহিত্যে যে মুসলমান সাহিত্যিকের আবির্ভাব হইল, তিনি বাংলার খ্যাতনামা কবি নজরুল ইসলাম। তাঁহার আবির্ভাবে শুধু মুসলিম সাহিত্যের নহে, সমগ্র বাংলা-সাহিত্যের মোড় ফিরিয়া গেল। তিনি বাংলা-সাহিত্যে রবীন্দ্র যুগের অবসান ও নূতন যুগের আগমন বার্তা ঘোষণা করিলেন।" (প্রঃ ৩৩৩)।

এই নূতন যুগ নির্যাতিত মানবতার বন্ধন-মুক্তির যুগ; মানুষকে মানুষেরই মর্যাদাদানের, তার অধিকার প্রতিষ্ঠার ও শান্তিময় বিশ্ব রচনার মহান লক্ষ্য অর্জনের সংগ্রামী যুগ। এ যুগের সংগ্রামীকে দূর করতে হয় মৃত্যু-ভয়, ছিন্ন করতে হয় ক্ষুদ্রতার

বন্ধন আর মিথ্যার মায়াজাল। বজ্র-নির্ঘোষে নবযুগের যৌবন-দীপ্ত কবি এ বাণীই ঘোষণা করলেন। এই ঘোষণা বিপ্লবী ইসলামের মর্মবাণীরই ঘোষণা। এমনি ঘোষণার অপেক্ষাতেই ছিলেন যেন এতদিনকার মুসলিম সমাজ-সেবক আর কবি-সাহিত্যিকবৃন্দ। বিশ শতকে পৌঁছে তারুণ্য-চঞ্চল এই কবির ঘোষণায় ইসলামের সে মর্মবাণীকেই যেন খুঁজে পেলেন তাঁরা। হঠাৎ করেই জীয়ন-কাঠির ছোঁয়ায় যেন প্রাণ-চঞ্চল হয়ে উঠল মুসলিম বাংলা-সাহিত্যের পরিমণ্ডল। দেশ-দেশান্তর ও ভাষা-ভাষান্তরের মনীষা-সঞ্চয় থেকে আহরিত বিষয়-বৈচিত্র্যের আর শব্দ-সম্ভারে নজরুল সাহিত্য যেন শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মুসলিম মানস প্রত্যাশিত এক অনুপম স্বপ্ন-বর্ণালী! অস্পষ্টতা আর বিভ্রান্তিকর পরিবেশে এমনি এক বর্ণালীর সন্ধানেই ছিল যেন শত শত বছরের মুসলিম সাহিত্য-চর্চার পথ পরিক্রমা! এখন আর রইল না কোন অস্পষ্টতা ও বিভ্রান্তি। ইংরেজ আমলে পিছিয়ে পড়া অর্ধ-চেতন জাতি সহসাই হল এক সংগ্রামী কাফেলা।

চতুর্দশতম অধ্যায়

সুফী-দরবেশদের বাংলা

ওয়াক্কুল্ জাআল্ হাক্কু ওয়া জাহাক্বাল্ বাতিল;
ইন্নাল্ বাতিলা কানা জাহুক্বা।
এবং বল, 'সত্য আসিয়াছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হইয়াছে';
মিথ্যা তো বিলুপ্ত হইবারই।
(আল-কুরআন–সূরা ইসরা, আয়াত ৮৯)

তোমাদের মধ্যে এমন একদল হউক যাহারা
সবাইকে আহ্বান করিবে কল্যাণের দিকে
এবং সৎকার্যের নির্দেশ দিবে ও অসৎ
কার্য নিষেধ করিবে; ইহারাই সফলকাম।
(আল-কুরআন– সূরা আল-ই-ইমরান, আয়াত ১০৪)

বাংলা দেশে শুধু বড় বড় শহরের কথা বলি কেন,
এমন কোন গ্রাম কিংবা শহর নেই, যেখানে
পুণ্যাত্মা সুফীবৃন্দ গমন করেন নাই ও বসতি
স্থাপন করেন নাই।
(... মীর সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী)

১৪

"সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য। কি চমৎকার দেশ এই বাংলা-যেখানে অসংখ্য সূফী-দরবেশ ও তাপস বিভিন্ন দিক থেকে আগমন করেন এবং বাংলাকেই তাঁদের দেশ ও বসবাসের স্থান হিসাবে বেছে নেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, পীরানা পীর হযরত শিহাবউদ্দিন সোহ্‌রাওয়ার্দীর সত্তুর জন নেতৃস্থানীয় শিষ্য দেবগাঁয়ে চিরশান্তির কোলে শায়িত আছেন। সোহ্‌রাওয়ার্দী তরীকার কয়েকজন সূফী মাহীসুনে এবং জালালীয়া তরীকার সূফীরা দেওতলায় সমাহিত আছেন। শেখ আহমদ দামেস্কীর কয়েকজন প্রধান শিষ্য আছেন নারকোটিতে। 'কদর খানী' দ্বাদশ সূফীদের অন্যতম হযরত শেখ শরফ-উদ্দিন তাওয়ামা সোনারগাঁয়ে চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন। তাঁরই প্রধান শিষ্য ছিলেন হযরত শেখ শরফউদ্দিন মানেরী। এ ছাড়া, হযরত বদি আলম ও বদর আলম জাহেদী ছিলেন শিষ্য। মোটকথা, বাংলাদেশে শুধু বড় বড় শহরের কথা বলি কেন, এমন কোন গ্রাম কিংবা শহর নেই, যেখানে পুণ্যাত্মা সূফীবৃন্দ গমন করেন নাই ও বসতি স্থাপন করেন নাই। সোহ্‌রাওয়ার্দী তরীকার ক্বামেলগণের অনেকেই আজ বিগত, কিন্তু যাঁরা জীবিত আছেন তাঁদের সংখ্যাও অনেক।" স্বনামখ্যাত বাঙালী সূফী শেখ আলাউল হকের প্রসিদ্ধ শিষ্য মীর সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানি (মৃত্যু ১৩৮০ খৃ.) এই পত্রটি লিখেছিলেন জৌনপুরের সুলতান ইবরাহীম শর্কীর নিকট (উদ্ধৃত–ডক্টর এম. এ. রহিম রচিত 'বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস,' বাংলা একাডেমী ১৯৮২, পৃ. ৮৬)। পুরো পত্রটির অংশমাত্র উপরে উদ্ধৃত করা হলো।

সোহ্‌রাওয়ার্দীয়া তরীকার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শেখ নজিব-উদ-দীন আবদুল কাদির। জিবালের অন্তর্গত সোহরাওয়ার্দ নগরে তাঁর জন্ম। ১১৬৯ সালে তাঁর ইন্তিকালের পর তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র শিহাব-উদ-দীন উমর বিন আবদুল্লাহ্‌ সোহরাওয়ার্দী এই তরীকার বিশেষ উৎকর্ষ সাধন করেন এবং তারই জন্যে অনেকেই তাঁকে সোহ্‌রাওয়ার্দীয়া তরীকার প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা মনে করেন। তাঁরই রচিত বিখ্যাত তাসাওউফ গ্রন্থের নাম 'আওয়ারিফ-উল-মু'আরিফ'। শেখজীর বহু শিষ্য এই উপমহাদেশে আগমন করেন। তাঁদের অন্যতম শেখ জালাল-উদ-দীন তবরেজী মুলতান ও দিল্লী হয়ে বাংলায় আসেন। বাংলায় তাঁর শিষ্যরা 'জালালীয়া' নাম ধারণ করেন। সূফী শেখ জালাল-উদ-দীন তবরেজীর সম্মানার্থে দেওতলার নাম হয় তবরীজাবাদ সূফী সৈয়দ আশরাফ সিমনানীর পত্রে 'আলাই', 'খালিদীয়া', 'নূরী' তরীকার উল্লেখও রয়েছে। পাণ্ডুয়ার খ্যাতনামা দরবেশ শেখ আলাউল হক থেকেই 'আলাই' তরীকার উদ্‌ভব এবং শেখ আলাউল হক বিখ্যাত কোরেশ সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদের বংশধর হওয়ায় তাঁর শিষ্য সম্প্রদায় 'খালিদীয়া'

পরিচিতিও ব্যবহার করেন। শেখ আলাউল হকের সুযোগ্য পুত্র হযরত নূর কুতুব-ই-আলম থেকে তাঁর শিষ্য সম্প্রদায় 'নূরী' নামেও পরিচিত। এমনি আরও আরও তরীকার উদ্‌ভব হয় এই বাংলায়। সূফীবাদের এইসব শাখা-প্রশাখা এবং সূফী-দরবেশদের প্রতিষ্ঠিত অসংখ্য খানকাহ ও দরগার অস্তিত্ব বাংলায় সূফীবাদের জনপ্রিয়তারই স্মৃতি বহন করে।

উপরোক্ত শাখা-প্রশাখা তরীকা ছাড়াও পরবর্তীতে বাংলায় আরও প্রধান প্রধান তরীকার উদ্‌ভব ঘটে, যার মধ্যে রয়েছে কাদেরীয়া তরীকা, চিশতীয়া তরীকা, নক্‌শ্‌বন্দীয়া তরীকা এবং শত্‌তারীয়া, মাদারীয়া, কলন্দরীয়া প্রভৃতি তরীকা। কিন্তু তরীকা ছাড়িয়েও মূল কথা হচ্ছে সূফী-দরবেশদের দ্বারা বাংলায় ইসলাম প্রচার-প্রসার ও প্রতিষ্ঠার কথা।

বাংলার মুসলমানদের আগমন এবং এখানে মুসলিম রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ও বিস্তৃতি প্রসঙ্গে একটা বিশেষ প্রশ্ন আজও চালু আছে, এবং তা হচ্ছে ঃ সূফী-সাধকরা প্রথমে ইসলাম প্রচার করতে গিয়ে অমুসলিমদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হলে মুসলিম শাসকরা তাঁদের সাহায্যে এগিয়ে যেতেন, অথবা মুসলিম শাসকদের সঙ্গে সীমান্তবর্তী অমুসলিম রাজাদের মধ্যে যুদ্ধ বাধলে সূফী-সাধকরাও মুসলিম সৈন্যদের সঙ্গে যোগ দিতেন ? অন্য কথায়, প্রশ্নটা হলো ঃ ইসলামের প্রসারে প্রতিষ্ঠায় এবং সেই সঙ্গে মুসলিম অধিকার বিস্তারে সূফী-সাধকদের ভূমিকা ছিল মুখ্য বা গৌণ ? উত্তরে ডক্টর আবদুল করিমের কথায় বলা যায়, "বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে সূফীদের ভূমিকা আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, সুফীরা প্রথমে ধর্ম প্রচারে বাহির হইতেন। তাঁহারা হিন্দুদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হইলে সুলতানের সাহায্য ভিক্ষা করিতেন।"[১] দৃষ্টান্তস্বরূপ বাংলার সুলতান শামস-উদ-দীন ফিরোজ শাহ্‌র আমলে হুগলী জেলার সাতগাঁও এলাকা ও সিলেট বিজয় এবং সুলতান ফখর-উদ-দীন মুবারক শাহ্‌র সময়ে চট্টগ্রাম এলাকা বিজয়ের কথা স্মরণ করা যায়। সাতগাঁও এলাকা জয়ের পেছনে ছিল শাহ্ সফি-উদ-দীনের ঐ অঞ্চলে ইসলাম প্রচার কালে স্থানীয় হিন্দু প্রধানের সঙ্গে সংঘর্ষের অবতারণা এবং এ সংঘর্ষে শাহ্ সফি-উদ-দীনকে সাহায্য করার জন্য সুলতান ফিরোজ শাহ্‌র পক্ষ থেকে সৈন্যবাহিনীসহ জাফর খানকে প্রেরণ। সিলেট বিজয়ের ব্যাপারেও রাজা গৌর গোবিন্দের বাহিনীর হাতে পরপর পরাজিত হন সুলতানের সেনাপতি সিকান্দার খান গাজী। তারপর আসেন সুহেল-ই-ইয়েমন হযরত শাহ্-ই-জালাল। সৈয়দ নাসির-উদ-দীনকে নিযুক্ত করা হয় শাহ-ই-জালালের সঙ্গে আগত শিষ্যবৃন্দের সেনাপাতি। বিজিত হয় সিলেট অঞ্চল। চট্টগ্রাম এলাকা বিজয়েও প্রথমে আসে কদল খান গাজীর নাম। সূফী কদল গাজী ও তাঁর

---

১. ডক্টর আবদুল করিম, বাংলার ইতিহাস, সুলতানী আমল, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭, পৃ. ৬৮।

শিষ্য-সঙ্গীরা চট্টগ্রাম এলাকায় এসে স্থানীয় প্রধানদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হন। সুলতান ফখর-উদ-দীন মুবারক শাহ্ তাঁদেরকে সৈন্য দিয়ে সাহায্য করেন এবং চট্টগ্রাম এলাকা মুসলমানদের অধিকারে আসে।

তবে কখনও অন্য রকমটি হতেও দেখা গেছে। যেমন, দরবেশ শাহ্ ইসমাইল গাজী কামরূপ ও উড়িষ্যা বিজয়ে সুলতান রুকন-উদ-দীন বারবক শাহ্‌কে সাহায্য করেন। বাগেরহাটে উলুগ খান জাহান সুলতান নাসির-উদ-দীন মাহমুদ শাহ্‌র শাসনামলে দক্ষিণ বঙ্গে ইসলাম প্রচার করে ঐ অঞ্চল জয় করেন। সুলতান তাঁকেই সেখানকার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। কিন্তু মোটামুটিভাবে একথাই বলা চলে যে, বাংলায় ইসলাম প্রচার-প্রসার-প্রতিষ্ঠার জন্য প্রধান ভূমিকা পালন করেছেন সূফী-দরবেশগণ।

যে কোন জনপদে ইসলামের বাণী প্রচার করার দায়িত্ব প্রতিটি জ্ঞানবান মুসলমানের; তাতে করে তাঁকে সাহায্য করার জন্য কোন সৈন্যবল থাকুক বা না থাকুক। যে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন প্রতিটি মুসলমানের জীবন দিশারী, তার বাণী ঃ "তোমাদের মধ্যে এমন একদল হউক যাহারা সবাইকে আহবান করিবে কল্যাণের দিকে এবং সৎকার্যের নির্দেশ দিবে ও অসৎ কার্য নিষেধ করিবে; ইহারাই সফলকাম।" (আল-কুরআন, সূরা-আল-ই-ইমরান, আয়াত - ১০৪)।

মহানবীরও নির্দেশ ঃ "একটি আয়াত হইলেও তোমরা আমার পক্ষ হইতে তাহা প্রচার কর।" আরব-আযমের মুসলিমগণ অক্ষরে অক্ষরেই পালন করতেন আল-কুরআন ও হাদীসের এই নির্দেশ। সময়ের উজান বেয়ে নবীজির ওফাতের যতই কাছাকাছি যাওয়া যাবে, এই নির্দেশ পালনকারীর সাক্ষাতও পাওয়া যাবে তত বেশি। এই নির্দেশ পালনের তাগিদেই সে যুগের ধর্মনিষ্ঠ মুসলমানেরা ইসলামের বাণী প্রচারের জন্য ছড়িয়ে পড়েছিলেন পৃথিবীর দিকে দিকে; এসেছিলেন ভারতবর্ষে, বাংলায়। গিয়েছিলেন সুদূর সেই মহাচীনে। সেই কবে সপ্তম শতক থেকে আরম্ভ হয়েছিল দুর্গম দূর পথের এই অভিযাত্রা। মহাচীনস্থ ক্যান্টনের মাটি আজও সেই অভিযাত্রীদের স্মৃতিতে স্বপ্নমগ্ন!

মানুষের মধ্যে যাঁরা আল্লাহ্‌র অধিকতর নিকটবর্তী, তাঁরাই 'সূফী' নামে পরিচিত। সূফীরা তাঁদের অনুপ্রেরণা লাভ করেন আল-কুরআন থেকেই এবং তার কিছু কিছু আয়াতের ব্যাখ্যা করেন গুপ্তজ্ঞান বা 'মা'রিফাত'-এর আলোকে। "তিনিই তোমার প্রতি এই কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন যাহার কতক আয়াত সুস্পষ্ট, দ্ব্যর্থহীন (মুহকাম); এইগুলি কিতাবের মূল অংশ; আর অন্যগুলি রূপক (মুতাশাবিহা);" (আল-কুরআন, সূরা–আল-ই-ইমরান, আয়াত - ৭)। সূফী মতে ইসলামের প্রকৃত লক্ষ্য হলো আত্মার সংযম, কেবল কতকগুলো বাহ্যিক ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের সমষ্টিমাত্র নয়। সূফীবাদ হচ্ছে স্রষ্টার জন্য গভীর ও তীব্র ভালবাসার মাধ্যমে আত্মার উন্নয়ন, আল্লাহ্‌র নৈকট্যলাভের সাধনা। মানব সেবাকেই তাঁরা স্রষ্টার প্রতি গভীর নিষ্ঠা ও প্রেমরূপে

বিবেচনা করে থাকেন। মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে মানব সেবার অমৃত ধারায় আপ্লুত সূফী-দরবেশরা সেই পরম ও চরমের সান্নিধ্যে যেতে চান, যেখান থেকে তাঁরা এসেছেন এই মাটির ধরণীতে। মৌলানা রুমীর রুবাইতে সেই মিলন কামনার ঝঙ্কার–

বোশ্‌নো আয্‌নায় চুঁ হেকায়েত মীকুনাদ,
ও আয্‌ জুদায়ী হা শেকায়েত মীকুনাদ।

শুন, বাঁশরী (আত্মা) কি বলে। যে বেনুবন থেকে চ্যুত হয়ে এসেছে সে, সেখানে ফিরে যাবার জন্য করছে সে বিলাপ।

সূফীগণ তাঁদের ইবাদতকে দুই ভাগে বিভক্ত করেন ঃ (১) শরীয়ত বা প্রকাশ্য ইবাদত, এবং (২) তরীকত বা গুপ্ত ইবাদত। ইসলামের প্রকাশ্য বিধি-নিষেধ সম্বলিত আইন-কানুন মেনে চলাই শরীয়ত। তরীকতের পথে উপযুক্ত শিক্ষক বা মুর্শিদের নিকট দীক্ষা নিয়ে বিশেষ প্রক্রিয়ায় অনুশীলনের দ্বারা সাধনা করতে হয়। তরীকতের পথ অনুসরণকারী তখন সালিক বা পথিক। সালিককে বিভিন্ন উন্নতির স্তর (মুকামাত) ও অবস্থা (আহ্‌ওয়াল) পার হতে হয়। এই স্তরগুলি হলো মা'রিফাত (আল্লাহ্‌র পূর্ণ জ্ঞান) ও হকীকত (আল্লাহ্‌র প্রকৃত সত্তা উপলব্ধি)। তরীকতের বিশেষ শিক্ষা লাভ করেই আল্লাহ্‌র মা'রিফাত হাসিল করতে হয়। মা'রিফাতের দ্বারাই হয় আল্লাহ্‌র নৈকট্যলাভ। তরীকতের যাত্রাপথে চলবার প্রক্রিয়া অনুসরণের ভিন্নতা থেকেই বিভিন্ন তরীকার সৃষ্টি। কিন্তু সকল তরীকারই মূল লক্ষ্য অভিন্ন।

আমাদের মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর মাধ্যমে যাবতীয় বাণী মানুষের জন্য পাঠিয়ে আল্লাহ্‌ রাব্বুল 'আলামীন যখন দ্বীনকে পূর্ণ করে তার নাম দিলেন ইসলাম, তখন থেকেই পৃথিবীর দিকে দিকে প্রচারিত হতে আরম্ভ হয় ইসলামের বাণী। আল্লাহ্‌র প্রেমে সর্বত্যাগী সূফী-দরবেশরাই যে এ কাজে অগ্রণী হবেন, জান-মাল আরাম-আয়েশ আল্লাহ্‌র রাহে কোরবান করে তাঁরাই যে বাধাবিঘ্ন তুচ্ছ করে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে পাহাড় ডিঙ্গিয়ে সবার চাইতে এগিয়ে যাবেন– এই তো স্বাভাবিক। বাংলাতেও তাঁরা এসেছিলেন, মুসলিমদের বাংলা বিজয়ের আগেই। তাঁরা এখানে এসেছেন, পতিত মানবতাকে উদ্ধার করার কাজে নিজেদের নিয়োজিত করেছেন।

বাধা যদি এসেছে অত্যাচারী অমুসলিম শক্তির কাছ থেকে, মোকাবিলা করেছেন সে শক্তির। কখনো জয়ী হয়েছেন, কখনো হয়েছেন শহীদ। ইসলাম প্রচারের কাজ এগিয়েই চলেছে। এসেছেন একের পর এক সূফী-দরবেশ। লোকশ্রুতি বলে– এসেছিলেন হরযত শাহ্‌ মুহম্মদ সুলতান রুমী, হযরত শাহ্‌ সুলতান বলখী মাহীসওয়ার, হযরত বাবা আদম শহীদ, হযরত মখদুম শাহ্‌দৌলা শহীদ, হযরত শাহ্‌ নেয়ামতুল্লাহ্‌ বুতশিকন, হযরত শাহ্‌ মখদুম রুপোশ, হযরত শেখ ফরিদুদ্দীন শকরগঞ্জ এবং মুহম্মদ

বিন বখতিয়ারের বাংলা বিজয়ের অব্যবহিত পরে হযরত শেখ জালাল-উদ-দীন তবরেজী।

বাংলার মুসলিম বিজয়ের আগে এসব সর্বত্যাগী ওলি-আউলিয়া সূফীবৃন্দ ইসলাম প্রচারের ব্রত নিয়ে এদেশে এসেছেন, দুর্গম গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বসতি স্থাপন করে মানুষকে শুনিয়েছেন আল্লাহ্-রসূলের বাণী। প্রজ্বলিত করেছেন ইসলামের আলো। পতিত মানবতা আবার শির উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। বাংলার এখানে-ওখানে গড়ে উঠেছে নবালোকপ্রাপ্তদের ছোট ছোট মুসলিম জনগোষ্ঠী।

আর বাংলা-বিজয়ী মুসলিম সৈনিক-নেতৃবৃন্দ ? জীবনকে বাজি রেখে কেন তাঁরা ছুটে এসেছিলেন বিধর্মী শক্তি কবলিত এই দূরদেশ বাংলায় ? মানুষের রক্ত-পিপাসায় ক্ষিপ্ত হয়ে ? ধন লালসায় অধীর হয়ে ? উত্তরের আগে প্রসঙ্গত এ প্রশ্নও করা যায় ঃ মুহম্মদ বিন বখতিয়ারের না হয় কোন রাজ্য ছিল না বলে রাজ্য লাভ-লোভে ছুটে এসেছিলেন বাংলায়, কিন্তু গযনী সাম্রাজ্যের অধীশ্বর সুলতান মাহমুদ কেন সতের বার তাঁর অভিযান চালিয়েছিলেন এই ভারতবর্ষে ?

সুলতান মাহমুদদের দৃষ্টিতে (অন্যের কাছে যে দৃষ্টি ভ্রান্ত মনে হতে পারে), পৌত্তলিক ভারতবর্ষে কুসংস্কারের যাঁতাকলে পিষ্ট মানবতার সামনে নেমে আসা রাতের অন্ধকারে আলো জ্বালাতে এগিয়ে গেছেন যেসব সূফী-দরবেশ, বিধর্মীর বহু প্রবল শক্তির ফুৎকারে তাঁদের অনেকেরই হাতের আলো নিভে গেছে বারবার। তাই প্রবল শক্তিকে ধ্বংস করার লক্ষ্যেই বারবার সশস্ত্র অভিযানে ভারতে আসতে আদিষ্ট হয়েছেন উপযুক্ত মুর্শিদের মুরীদ শক্তিধর সুলতান মাহমুদ। সোমনাথ অধিকারের যুদ্ধে সত্তর বছর বয়স্ক তাঁর পীর ভাইও তলোয়ার হাতে সুলতান মাহমুদের পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করেছিলেন। সেই যুগে দেশ বিজয়ের পেছনকার কারণ সম্বলিত অলিখিত ইতিহাস উদ্ঘাটিত হলে উত্তর পাওয়া যাবে, কেন সুলতান মাহমুদেরা, মুহম্মদ বিন বখতিয়ার ও তাঁর সহযোদ্ধারা বহু দূর দেশেও চালিয়েছিলেন যুদ্ধাভিযান।

একথা সত্য, সকল মুসলিম দেশ বিজয়ী শাসকই সমপরিমাণে ছিলেন না ইসলাম অনুসারী; কিন্তু অনেকেই ছিলেন ইসলামের বিশেষ পা'বন্দ্। প্রকৃত প্রস্তাবে, ইসলামের বিধান অনুযায়ী সামাজিক অবস্থান ও বৃত্তি নির্বিশেষে সকল মুসলমানকেই ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্যই কাজ করতে হয়। এখানে আমরা মসজিদ-এ-নববীতে নবীজি মুহম্মদ (সা) তাঁর অনুসারীদের দিয়ে ইসলামী রাষ্ট্রের যে পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার কাঠামো ও প্রশিক্ষণ পদ্ধতি গড়ে তুলেছিলেন, তার প্রতি কিছুটা দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে পারি। মসজিদ-এ-নববীর ঐসব কর্মকাণ্ড নিয়ে প্রশিক্ষণের যে ব্যবস্থা, তাতে মসজিদ-এ-নববীকে মুহম্মদী বিদ্যায়তন বা মদীনার বিশ্ববিদ্যালয়ও বলা যেতে পারে। সেখানে আমাদের 'উম্মী' নবীজির দরবারে আদেশ-উপদেশ গ্রহণ করতেন একদিকে হযরত আবু

বকর-উমর-উসমান='আলী-মুয়াবিয়ার মত প্রজ্ঞাবান রাজনীতিজ্ঞের দল, অন্যদিকে খালিদ বিন ওয়ালীদ, সা'দ বিন আবি ওক্কাস, আবু উবায়দা, আমর ইবনে আস'-এর মত দিগ্বিজয়ী সেনাপতিরা, বাজান ইবনে সাসান-খালিদ ইবনে সাঈদ-মুহাজির-বিন উমাইয়ার মত সুপ্রশাসকবৃন্দ, আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ-উবাই বিন কা'আব-ইবনে জুবায়ের প্রমুখ উলামা ও ফুকাহা-শাস্ত্রবেত্তার দল, সর্বত্যাগী আসহাবে সূফ্ফার দল এবং আরও আরও বিভিন্ন দিকের বিশেষজ্ঞগণ। এত বৈচিত্র্য ও যোগ্যতার বিভিন্নতা সত্ত্বেও একটা বস্তু সকলের মধ্যে সাধারণভাবে বিদ্যমান ছিল, আর তা হলো– "তৌহিদের নূর, নিষ্ঠার প্রবাহ, আত্মত্যাগের জোশ, বিশ্ব-জাহানের পথ প্রদর্শনের প্রেরণা, সর্বোপরি সকল কাজে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের উদগ্র বাসনা। ... মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্‌র জীবনচরিত ছিল সকল মানবীয় গুণের একটা অপূর্ব সমন্বয়, এ ছিল তাঁরই ব্যাপকতার নানান রূপ, নানা জাল্ওয়া–যা কখনো সিদ্দীক ও ফারূক হয়ে চম্‌কেছে, কখনো যুন্নুরায়ন ও মরতুজারূপে আত্মপ্রকাশ করেছে, কখনও খালিদ ও আবু উবায়দা, আবার কখনও সা'দ ও জাফর তাইয়ার রূপে দেখা দিয়েছে; কখনও ইবনে উমর, আবুজর, সালমান ও আবুদ্‌দারদা রূপে মসজিদ ও মেহ্‌রাবে পরিদৃষ্ট হয়েছে, আবার কখনো ইবনে আব্বাস, উবাই বিন কা'আব, যায়েদ ইবনে সাবিত ও আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রূপে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিতরণক্ষেত্র ও চারণ ভূমির রূপ ধরেছে। কখনো বেলাল, সোহায়েব, আম্মার ও খুবায়বের চরম পরীক্ষামুহূর্তে সান্ত্বনার বাণী রূপে আবির্ভূত হয়েছে; যেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ ছিলেন বিশ্ব জাহানের তমসা মোচনকারী সূর্য, সুউচ্চ পর্বত; ঊষর মরু, প্রবহমান ঝরনা, সবুজ শ্যামল খামার– সকলেই সে উৎস থেকে প্রয়োজন ও সামর্থ্য অনুসারে উত্তাপ ও আলো গ্রহণ করেছে। অথবা তিনি যেন জলধি– পাহাড়ে জংগলে, মাঠে-ময়দানে, ক্ষেতে-খামারে, বাগ-বাগিচায়, মরুতে-উপত্যকায় সমান ভাবে যা বর্ষিত হয়েছে আর সকলেই প্রয়োজন ও যোগ্যতা অনুসারে তা থেকে উপকৃত হয়েছে, আর তাতেই নানাবিধ বৃক্ষ-গুল্ম রঙ-বেরঙের ফল-ফুল, চিত্র-বিচিত্র শাকসব্জি ও শ্যামল বনানী গজিয়ে উঠেছে।"[২]

ইসলাম-অনুসারীদের সামনে এই তো মডেল–আদর্শ! নবীজির ওফাতের পর যতই দিন গেছে, ততই ইসলাম অনুসারীদের দৃষ্টিতে অস্পষ্ট থেকে অস্পষ্টতর হয়ে পড়েছে এই আদর্শ। ক্রমে আবার রাজা-বাদশা হয়ে দাঁড়িয়েছেন ইসলামের পরবর্তী 'খলিফা'রা, ভিন্নি ভিন্ন জনপদের শাসনকর্তারা; আদর্শের রূপ জানা থাকলেও সে রূপের বাস্তবায়নে বিচ্যুতি ঘটেছে জীবন পথের বিভিন্ন অবস্থানের বিভিন্ন বৃত্তিধারী ইসলাম-অনুসারীদের

২. আল্লামা সৈয়দ সুলায়মান নদভী (মূল), নবী চিরন্তন, অনুবাদ ঃ মওলানা আবদুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদী, ১৯৭৫, পৃ. ১০১।

মধ্যেও। তবুও, এসব বিচ্যুতি সত্ত্বেও, তৌহিদের প্রতি আনুগত্য থেকে গেছে অনড়, অটল। তৌহিদের নূর সকলের হৃদয়ে সমান আলো দিচ্ছে না, ইসলামের প্রতি নিষ্ঠার প্রবাহ সকলের হৃদয়ে সমান নয়, সমান নয় সকলের আত্মত্যাগের জোশ ও মানব-মুক্তির লক্ষ্যে পথপ্রদর্শনের প্রেরণা; তবুও এমনি অবস্থাতেও, ঐ আলোচ্য কালেও, সবাই ইসলামের অনুসারী-শাসনকর্তা-সুলতান, মালিক-আমীর, শেখ-সৈয়দ, উলামা-সূফী সবাই।

এমনি একটা প্রেক্ষিতে মুসলিম বাংলার রূপদানে সূফী-শাসনকর্তা-উলামাদের ভূমিকা আমরা পর্যালোচনা করব। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, নবীজির আমলের এবং পরে খোলাফায়ে রাশেদা আমলেরও ইসলামের যে বিশুদ্ধ রূপ, সময় অতিক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে রূপ স্বাভাবিকভাবেই একটু একটু করে পরিবর্তিত হয়েছে। ক্রমে রাজ্য শাসকগণ কিছু কিছু করে সরে এসেছেন খোলাফায়ে রাশেদার রাজ্য-পরিচালনার আদর্শ থেকে। আলেম-উলামাগণও অল্প অল্প করে বিভ্রান্তির টানাপড়েনের সম্মুখীন হয়েছেন। সূফীগণের বেলায়ও যে বিচ্যুতির মেঘ মাথার উপর দিয়ে ভেসে বেড়ায় নি, তা বলা চলে না। কিন্তু যেহেতু সূফী ও উলামা সম্প্রদায় ধর্মীয় বিষয়াদি নিয়ে নিয়মিত গবেষণা চালাতেন এবং যেহেতু সূফীরা ছিলেন বিশেষভাবে আল্লাহ্-প্রেমে বিভোর, সে জন্যই শাসকদের চাইতে উলামাদের বিচ্যুতি অনেকাংশে কম এবং উলামাদের চাইতে সূফীদের বিচ্যুতি ছিল আরও অনেক কম।

বাংলায় মুসলিম সমাজ উন্নয়নে এই তিন শ্রেণীরই উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। এক্ষেত্রে মুসলিম শাসকবর্গের অবদান সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ডক্টর এম. এ. রহিম বলেন, "বাংলাদেশে মুসলিম সম্প্রদায় গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মুসলমান বিজেতা এবং শাসকগণও কৃতিত্বের অংশীদার। এ ব্যাপারে তাঁদের কৃতিত্ব সূফী-দরবেশদের অবদানের তুলনায় ততটা তাৎপর্যপূর্ণ না হলেও উল্লেখযোগ্য। বহু ক্ষেত্রে তাঁদের কার্যাবলী সেইসব মহান আধ্যাত্মিক সাধকদের কার্যের পরিপূরক ছিল। পীর-দরবেশদের ধর্মীয় কার্যাবলী বাংলার আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বিজয়ে এবং প্রদেশে মুসলমান শাসন সংহতকরণে সাহায্য করেছে; মুসলিম বিজেতা ও শাসনকর্তাগণ তাঁদের মহান ব্রতের অগ্রগতির জন্য নানাভাবে সুযোগ-সুবিধা করে দিয়েছেন। ধর্মান্তরিত লোক সংগ্রহে এবং ধর্মের প্রতি মুসলমানদের অনুরাগ সৃষ্টিতে বাস্তবিকই রাজকীয় শক্তির সহযোগিতা ও সমর্থন ধর্মীয় নেতাদেরকে যথেষ্ট পরিমাণে সহায়তা করেছিল। ... ধর্মের প্রতি শাসনকর্তাগণ নিজেরা অনুরক্ত ছিলেন এবং স্বভাবতই তাঁরা তাঁদের নিজ নিজ এলাকায় এর উন্নতি বিধান করতে আগ্রহী ছিলেন। তাঁরা অনুভব করেন যে, মুসলমান সম্প্রদায়

বাংলাদেশে শক্তিশালী থাকলে ইহা প্রদেশে মুসলিম রাষ্ট্রের পক্ষে একটা সমর্থনের উৎস হবে এবং একে শক্তি যোগাবে। সুতরাং তারা উলামা ও পীর-দরবেশদের যথেষ্ট সম্মান দিতেন এবং ইসলামের উন্নতিকল্পে তাঁদেরকে সমর্থন দান করতেন।"৩

বাংলায় মুসলিম শাসনামলে আলেমগণের ভূমিকাও ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামের অনুশাসনেই বিদ্যার্জনের প্রতি সবিশেষ তাগিদ রয়েছে। যেহেতু দেশের শাসকবৃন্দ খোলাফায়ে রাশেদার অনুসৃত শাসন রীতি অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করতে চেষ্টা করতেন এবং বাগদাদের আব্বাসীয় 'খলিফাদের ' শাসন কাঠামো প্রতিষ্ঠিত করে তদনুযায়ী শাসনকার্য চালাতেন, তাই প্রশাসনের জন্য প্রয়োজন হত ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত আলেমের। এমনকি, সূফীবাদের ব্যুৎপত্তি লাভের জন্য ইসলামী শিক্ষায় যথার্থ শিক্ষা লাভ ছিল অপরিহার্য। শেখ আখী সিরাজ-উদ-দীন যখন হযরত নিযাম-উদ-দীন আউলিয়ার শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে চাইলেন, তখন হযরত নিযাম-উদ-দীন বলেছিলেন, "আধ্যাত্মিক ব্রতের জন্য শিক্ষাই হলো প্রথম স্তর; কিন্তু তার (আখী সিরাজের) সেরূপ শিক্ষা নাই।"[৪] খাজিনাতুল আসফিয়া'র গ্রন্থকার লিখেছেন, "শিক্ষাহীন সুফী শয়তানের ভাঁড়স্বরূপ।"[৫] এখানে উল্লেখ্য যে, আধ্যাত্মিক সাধনায় অগ্রসর হওয়ার আগে শেখ আখী সিরাজ-উদ-দীন মওলানা ফখর-উদ-দীন এবং মওলানা রুকন-উদ-দীনের কাছে প্রয়োজনীয় বিদ্যা অর্জন করেছিলেন।

ইসলামী শিক্ষায় সুশিক্ষিত আলেমগণ সে যুগে নিজেদের গৃহে মাদ্রাসা ও শিক্ষা কেন্দ্র পরিচালনা করতেন। এক কথায় বলা যায়, সূফীরাও সুশিক্ষিত আলেম ছিলেন। তবে সকল আলেমই সূফী ছিলেন না। সূফী হতে হলে উপযুক্ত এলেম আয়ত্ত করে সূফীতত্ত্বে শিক্ষা নিয়ে সাধনা করে মনযিলে মকসুদে পৌঁছুতে হতো। মুসলিম শাসনামলে বাংলাদেশে আরবী ও ফারসীতে বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। সুসমৃদ্ধ হয়েছিল ইসলামী জ্ঞানভাণ্ডার। আর এসব গ্রন্থ রচনার কৃতিত্ব আলেম ও সূফী উভয়েরই। তাছাড়া, খানকাহ্ একাডেমী সেমিনারিতেও শিক্ষাদান ব্রতে সূফীদের সঙ্গে আলেমগণ নিয়োজিত থাকতেন।

একথা স্বীকৃত যে, বাংলার সূফীবাদ উত্তর-ভারতীয় সূফীবাদের আধ্যাত্মিক বিস্তৃতি: তাই বলা চলে এদেশে মুসলিম শাসনের প্রথম দিকে বাংলার সূফীবৃন্দ ছিলেন

---

৩. ডক্টর এম. এ. রহিম, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, অনুবাদ ঃ মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান, বাংলা একাডেমী, ১৯৮২, পৃ. ১৭৫-১৭৬।

৪. প্রাগুক্ত, উদ্ধৃত পৃ. ১২২।

৫. প্রাগুক্ত, উদ্ধৃত, পৃ. ১২২।

উত্তর-ভারতের সূফী প্রাধান্যের প্রতিনিধি। পরের দিকে বাংলার পরিস্থিতির সঙ্গে এখানকার সূফীবৃন্দ তাঁদের কর্মপদ্ধতি খাপ খাইয়ে নিয়েছিলেন। হিন্দু ও বৌদ্ধদের মরমী চিন্তাধারার সান্নিধ্যে এসে অধিকতর উদার দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছিলেন। 'পরবর্তী কালে, বাংলার সূফীরা উত্তর-ভারতের আধ্যাত্মিক কর্তৃত্বাধীন থেকে সরে আসেন এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও তাঁদের চিন্তাধারায় এই পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।"[৬]

বাংলার মুসলিম শাসক-উলামা-সূফীবৃন্দের অবদান-কথা পর্যালোচনা করলে স্বীকার করতেই হয় যে, সূফীবৃন্দের অবদানের পাল্লাই সবচাইতে ভারি।

এবারে বাংলায় আগত সূফী-দরবেশদের একটা ছক আমরা তুলে ধরছি। এই ছকে প্রধান প্রধান সূফী-দরবেশদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। এই ছকে মুসলমানদের বঙ্গ বিজয়ের পূর্বেকার যেসব সূফীর পরিচয় দেওয়া হয়েছে তাদের আগমন কাল সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতান্তর রয়েছে এসব পুণ্যাত্মা সূফীর আগমনকাল কিছু প্রমাণ কিছু জনশ্রুতিকে ভিত্তি করেই প্রতিষ্ঠিত। উল্লিখিত আগমন কাল বিজ্ঞানসম্মত ঐতিহাসিকতায় প্রমাণিত নয় সত্য, কিন্তু পুরুষানুক্রমে সংরক্ষিত ও প্রচলিত যে জনশ্রুতি বা উপাখ্যান, তারও কোন মূল্য কি নেই? তদুপরি মুসলমানদের বঙ্গ বিজয়ের পরে এসে থাকলেও তাঁদের আগমনের সেই সময়কালের কোন বিজ্ঞান-সম্মত ঐতিহাসিক প্রমাণ দেওয়া হচ্ছে না কেন? অগত্যা জনশ্রুতি বা উপাখ্যানকে সম্বল করেই আমরা অগ্রসর হচ্ছি।

(ক) বাংলায় মুসলিম বিজয়ের আগে

সুফীবৃন্দ	কখন কোথা থেকে বাংলায় এলেন; কার্যকাল ও কর্মস্থল	তখন বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন
শাহ্ মুহম্মদ সুলতান রুমী	ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোনা মহকুমার (বর্তমান জেলা) মদনপুরে তাঁর মাযার বিদ্যমান। বাঙ্গালার সুবাদার শাহ্ শুজার সনদপত্রে উল্লিখিত হয়েছে যে, শাহ্ সাহেব ১০৫৩ সালে তাঁর মুর্শিদ সৈয়দ শাহ্ সুর্খখুল আনতিয়াসহ মদনপুরে আসেন।[৭]	

৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭।

৭. আবদুল মান্নান তালিব, বাংলাদেশে ইসলাম, ১৯৮০, পৃ. ৬৪-৮৮।

সুফীবৃন্দ	কখন কোথা থেকে বাংলায় এলেন; কার্যকাল ও কর্মস্থল	তখন বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন
শাহ্ সুলতান বলখী মাহীসওয়ার	প্রথমে ঢাকা জেলার হরিরাম নগরে এবং পরে বগুড়া জেলার মহাস্থান গড়ে ইসলাম প্রচার করেন। এখানেই তাঁর মাযার অবস্থিত।[৮]	
বাবা আদম শহীদ	ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগনার অন্তর্গত আবদুল্লাহপুর গ্রাম; এখানে তাঁর মাযার রয়েছে।[৯]	রাজা বল্লালসেন (১১৫৮–১১৭৯ সাল)
মখদুম শাহ্দৌলা শহীদ	পাবনা জেলার শাহজাদপুরে; সেখানে তার মাযার অবস্থিত। এসেছিলেন ইয়েমন থেকে। আগমন-কাল সম্ভবত ১২৪০ সালের পর।[১০]	
শাহ্ নিয়ামতুল্লাহ্ বুতশিকন	ঢাকা শহরের সন্নিহিত এলাকায় ইসলাম প্রচার করেন। পুরানা পল্টন এলাকায় দিলকুশা বাগে তাঁর মাযার অবস্থিত।[১১]	
সৈয়দ নাসির-উদ-দীন শাহ্ আউলিয়া	দিনাজপুর জেলার প্রাচীনতম ইসলাম প্রচারক ওই অঞ্চলে সৈয়দ নেক মর্দ বা নেক বাবা বলে পরিচিত।[১২]	

তাছাড়া মখদুম শাহ্ মাহমুদ গজনবী বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট পরগনায় ইসলাম প্রচার করেন, আগমন কাল অজ্ঞাত।

৮.৯. আবদুল মান্নান তালিব, বাংলাদেশে ইসলাম, ১৯৮০, পৃ. ৬৪-৮৮।

১০. আবদুল মান্নান তালিব, বাংলাদেশে ইসলাম, ১৯৮০, পৃ. ৬৪-৮৮।

১১. আবদুল মান্নান তালিব, বাংলাদেশে ইসলাম, ১৯৮০, পৃ. ৬৪-৮৮।

১২. সূফীবাদ ও আমাদের সমাজ, নওরোজ কিতাবিস্তান ১৯৬৯, পৃ. ১৬৩।

(খ) মুসলিম বিজয়ের পর

সুফীবৃন্দ	কখন কোথা থেকে বাংলায় এলেন; কার্যকাল ও কর্মস্থল	তখন বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন
শেখ জালাল-উদ-দীন তবরেজী (১১৬২-১২৪৭ সাল, আনুমানিক)	শেখ আবু সৈয়দ তবরেজী ও শেখ শিহাব-উদ-দীন সোহ্‌রাওয়ার্দীর শিষ্য; বাগদাদ থেকে ভারতের মুলতান ও দিল্লী হয়ে বাংলায় আসেন ১২১৩ সালে এবং পাণ্ডুয়ায় একটি হিন্দু মন্দিরের কাছে আস্তানা পাতেন। ইন্তিকালের পর ওই এলাকার দেওতলায় তিনি সমাহিত হন এবং তাঁর সম্মানার্থে ওই স্থানের নাম হয় তবরীজাবাদ। অধঃপতিত বৌদ্ধ ও হিন্দুদের ইসলামে দীক্ষিত করে উত্তরবঙ্গে একটি শক্তিশালী মুসলিম জনগোষ্ঠীর সৃষ্টি করেন এবং বাংলায় নব-প্রতিষ্ঠিত মুসলিম শাসনকে সংহত করার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখেন।[১]	সুলতান গিয়াস-উদ-দীন ইওজ খিলজী (১২১২-১২২৭ সাল) ; নাসির-উদ-দীন মাহ্‌মুদ শাহ্ (১২২৭-১২২৯ সাল); দওলত শাহ্ বিন মওদুদ ইখতিয়ার-উদ-দীন বলখা খিলজী, মালিক আলা-উদ-দীন জানী, মালিক সাইফ-উদ-দীন আইবক আওর খান (সবাই মিলে ১২২৭-১২৩৬ সাল) ; তুগরল তুগান খাঁ (১২৩৬-১২৪৫ সাল) ; মালিক তমর খান (১২৪৫-১২৪৭ সাল)।
শেখ শরফ-উদ-দীন আবু তাওয়ামা	বুখারার অধিবাসী সূফী আবু তাওয়ামা ১২৬০ সালে দিল্লীতে এবং সেখান থেকে বিহারের 'মানের হয়ে বাংলার সোনারগাঁও-এ আসেন ১২৭৪ থেকে ১২৭৭ সালের মধ্যে। পরিবার-পরিজন নিয়ে এখানেই	সুলতান বুগরা খান (১২৮১-১২৯১ সাল) সুলতান রুকন-উদ-দীন কায়কাউস (১২৯১-১৩০১ সাল)

১. ডক্টর এম. এ. রহিম, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, অনুবাদ ঃ মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান, বাংলা একাডেমী, ১৯৮২, পৃ. ৯৯-১১৭।

সুফীবৃন্দ	কখন কোথা থেকে বাংলায় এলেন; কার্যকাল ও কর্মস্থল	তখন বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন
	বসবাস করেন এবং ১৩০০ সালে ইন্তিকালের পর সোনারগাঁও-এ সমাধিস্থ হন। তারই প্রচেষ্টায় সোনারগাঁও গড়ে ওঠে ইসলামী শিক্ষা ও জ্ঞানের এক বিখ্যাত কেন্দ্র হিসাবে।[২]	
শেখ শরফ-উদ-দীন এহিয়া মানেরী	বিহারের অন্তর্গত 'মানের '-এর অধিবাসী শেখ মানেরী আনুমানিক ১৫ বছর বয়সে শেখ শরফ-উদ-দীন আবু তাওয়ামার ছাত্র হয়ে সোনারগাঁও আসেন। শেখ তাওয়ামার যোগ্য মুরীদ এই শেখ মানেরী ছিলেন সোনারগাঁও-এ শিক্ষাকেন্দ্রের জ্ঞানের নিদর্শন।[৩]	সুলতান বুগরা খান (১২৮১-১২৯১ সাল); সুলতান রুকন-উদ-দীন কায়কাউস (১২৯১-১৩০১ সাল)
উলুগ-ই-আজম হুয়ামুন জাফর খান বাহ্‌রাম	ধর্মপ্রচারক ও রাজ-প্রতিনিধি জাফর খান দিনাজপুর জেলার দেবীকোট অঞ্চলে ইসলামের ঝাণ্ডা প্রোথিত করে ১২৯৭ সালে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন।[৪]	সুলতান রুকন-উদ-দীন কায়কাউস(১২৯১-১৩০১ সাল)
পীর বদর-উদ-দীন	দিনাজপুর জেলার হেমতাবাদ নামক স্থানে ইসলাম প্রচার করে সাফল্য লাভ করেন। তাঁর প্রধান শিষ্যের নাম মখদুম গরীবুল ইসলাম।[৫]	সুলতান রুকন-উদ-দীন কায়কাউস (১২৯১-১৩০১ সাল)।

২. ডক্টর এম. এ. রহিম, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, অনুবাদ ঃ মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান, বাংলা একাডেমী, ১৯৮২, পৃ. ৯৯-১১৭।

৩. ডক্টর এম. এ. রহিম, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, অনুবাদ ঃ মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান, বাংলা একাডেমী, ১৯৮২, পৃ. ৯৯-১১৭।

৪. সুফীবাদ ও আমাদের সমাজ, নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৬৯, পৃ. ১৬৩-১৬৪।

৫. সুফীবাদ ও আমাদের সমাজ, নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৬৯, পৃ. ১৬৩-১৬৪।

সুফীবৃন্দ	কখন কোথা থেকে বাংলায় এলেন; কার্যকাল ও কর্মস্থল	তখন বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন
মাওলানা আতা	আনুমানিক ১৩০০ থেকে ১৩৫০ সালের মধ্যে দরবেশ মাওলানা আতা দিনাজপুরে ইসলাম প্রচার করেন। ১৩৬৩ সালে নির্মিত একটি গুহের শিলালিপিতে তাঁকে ইসলামের বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত এবং সত্য ও ধর্মের 'প্রদীপ' বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[৬]	সুলতান শামস-উদ-দীন ফিরোজ শাহ্ (১৩০১ -১৩২২ সাল) এবং পরবর্তী স্বল্পকালীন শাসনকর্তাগণ।
শাহ সফি-উদ-দীন	দিল্লী দরবারের আমীর বারখুর্দারের পুত্র এবং সুলতান শামস-উদ-দীন ফিরোজ শাহ্‌র ভাগ্নে ইসলাম প্রচারের জন্য বাংলায় এসে হুগলী জেলার ত্রিবেণী অঞ্চলে হিন্দুরাজা পাণ্ডবের শত্রুতার সম্মুখীন হন। তাই সুলতান ফিরোজ শাহর কাছে সাহায্য চেয়ে পাঠালে সুলতান দিনাজপুর অঞ্চলের সূফী ও শাসনকর্তা জাফর খান বাহ্‌রামকে সৈন্যসহ হুগলী পাঠান। তাঁরা কিছুদিন ধরে সংগ্রামের পর সাতগাঁওসহ ওই অঞ্চল দখল করেন।[৭]	সুলতান শামস-উদ-দীন ফিরোজ শাহ্ (১৩০১ -১৩২২ সাল)

৬. সুফীবাদ ও আমাদের সমাজ, নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৬৯, পৃ. ১৬৩-১৬৪।

৭. ডক্টর এম. এ. রহিম, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, অনুবাদ ঃ মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান, বাংলা একাডেমী, ১৯৮২, পৃ. ১৩৫-১৪১।

সুফীবৃন্দ	কখন কোথা থেকে বাংলায় এলেন; কার্যকাল ও কর্মস্থল	তখন বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন
শাহ্ জালাল মুজাররদ ইয়েমেনী	পূর্ববঙ্গে ইসলাম প্রচারের প্রধান পথিকৃৎ এই স্বনামধন্য সূফী দরবেশ ১৩০৩ সালে রাজা গৌর গোবিন্দকে পরাজিত করে সিলেট অধিকার করেন। এই যুদ্ধে তাঁর সিপাহসালার ছিলেন সৈয়দ নাসির-উদ-দীন। মুসলিম বাংলার ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে এই মহান সাধক সিলেটেই ইন্তেকাল করেন আনুমানিক ১৩৪৭ সালে। সাতগাঁও বিজয়ে যেমন শাহ্ সফি-উদ-দীন ও জাফর খান গাজীর নাম জড়িত, সিলেট বিজয়েও তেমনি শাহ্ জালালের সঙ্গে সৈয়দ নাসির-উদ-দীনের নাম চিরস্মরণীয়।[৮]	সুলতান শামস উদ্দীন ফিরোজ শাহ ও তাঁর পুত্রগণসহ অন্যান্য স্বল্প-কালীন শাসনকর্তা, এবং সুলতান ফখর উদ্দীন মুবারক শাহ্ (১৩৩৮-১৩৪৯ সাল)।
মখদুম শাহ্ দৌলাহ্ শহীদ	খৃষ্টীয় তের শতকের প্রথম ভাগে ইয়েমন থেকে এসে পাবনা জেলার শাহ্যাদপুরে আস্তানা প্রতিষ্ঠা করেন মখদুম শাহ্ দৌলাহ্। সঙ্গে আসেন এক ভগ্নী, তিন ভাগ্নে ও বহু সংখ্যক মুরীদ। স্থানীয় হিন্দু রাজার সঙ্গে সংঘর্ষে তিনি বহু মুরীদসহ শহীদ হন, কিন্তু ওই অঞ্চলে ইসলামের প্রচার ও প্রসার অব্যাহত থাকে।[৯]	সুলতান শামস-উদ-দীন ফিরোজ শাহ্ ও তাঁর পুত্রগণসহ অন্যান্য স্বল্পকালীন শাসনকর্তা, এবং সুলতান ফখর- উদ-দীন মুবারক শাহ্ (১৩৩৮-১৩৪৯ সাল)।

৮. ডক্টর আবদুল করিম, বাংলার ইতিহাস, সুলতানী আমল, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭, পৃ. ১৬৮-১৬৯।
৯. সুফীবাদ ও আমাদের সমাজ, নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৬৯, পৃ. ১৬৫-১৬৯।

সুফীবৃন্দ	কখন কোথা থেকে বাংলায় এলেন; কার্যকাল ও কর্মস্থল	তখন বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন
শাহ্ মখদুম রূপোশ	যেখানে এখন রাজশাহী জেলা শহর, তার পূর্বনাম ছিল মহাকাল গড়। এই মহাকাল গড়ে ১২৮৮ সালে তুরকান বা তুরফান শাহ্ নামক এক দরবেশ ইসলাম প্রচার করতে এসে এই গড়ের অধিপতি হিন্দু রাজার সঙ্গে এক সংঘর্ষে শহীদ হন। এই ঘটনার পরই বাগদাদ থেকে সেখানে ইসলাম প্রচার করতে আসেন শাহ্ মখদুম রূপোশ। ১৩২৫ সালে মহাকাল গড় জয় করেন তিনি এবং এলাকায় ইসলামের ঝাণ্ডা প্রোথিত করে ১৩৩০ সালে রামপুর বোয়ালিয়ায় ইন্তেকাল করেন।[১০]	সুলতান গিয়াস-উদ-দীন বাহাদুর (১৩২২-১২২৮ সাল); বাহ্‌রাম খান (১৩২৮-১৩৩৮ সাল)।
মীর সৈয়দ জালাল -উদ-দীন বুখারী (১৩০৭-১৩৮৩ সাল)	রংপুর জেলার মাহীগঞ্জের হযরত শাহ্ জালাল বুখারীর আস্তানা সবচেয়ে প্রাচীন। এই আস্তানার সঙ্গে উত্তর ভারতের বিখ্যাত সূফী হযরত মীর সৈয়দ জালাল-উদ-দীন বুখারী ওরফে মখদুম জাহানিয়া জাহানগশৎ সংশ্লিষ্ট।[১১]	বাহ্‌রাম খান; সুলতান ফখর-উদ-দীন মুবারক শাহ্ (১৩৩৮-১৩৭৯); সুলতান গাজী শাহ্ (১৩৪৯-১৩৫২)।

১০. সুফীবাদ ও আমাদের সমাজ, নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৬৯, পৃ. ১৬৫-১৬৯।

১১. ডক্টর আবদুল করিম, বাংলার ইতিহাস, সুলতানী আমল, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭, পৃ. ১৮৭।

সুফীবৃন্দ	কখন কোথা থেকে বাংলায় এলেন; কার্যকাল ও কর্মস্থল	তখন বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন
শাহ্ জালাল মুজাররদ ইয়েমেনী	পূর্ববঙ্গে ইসলাম প্রচারের প্রধান পথিকৃৎ এই স্বনামধন্য সূফী দরবেশ ১৩০৩ সালে রাজা গৌর গোবিন্দকে পরাজিত করে সিলেট অধিকার করেন। এই যুদ্ধে তাঁর সিপাহসালার ছিলেন সৈয়দ নাসির-উদ-দীন। মুসলিম বাংলার ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে এই মহান সাধক সিলেটেই ইন্তেকাল করেন আনুমানিক ১৩৪৭ সালে। সাতগাঁও বিজয়ে যেমন শাহ্ সফি-উদ-দীন ও জাফর খান গাজীর নাম জড়িত, সিলেট বিজয়েও তেমনি শাহ্ জালালের সঙ্গে সৈয়দ নাসির-উদ-দীনের নাম চিরস্মরণীয়।[৮]	সুলতান শামস উদ্দীন ফিরোজ শাহ ও তাঁর পুত্রগণসহ অন্যান্য স্বল্প-কালীন শাসনকর্তা, এবং সুলতান ফখর উদ্দীন মুবারক শাহ্ (১৩৩৮-১৩৪৯ সাল)।
মখদুম শাহ্ দৌলাহ্ শহীদ	খৃষ্টীয় তের শতকের প্রথম ভাগে ইয়েমন থেকে এসে পাবনা জেলার শাহ্যাদপুরে আস্তানা প্রতিষ্ঠা করেন মখদুম শাহ্ দৌলাহ্। সঙ্গে আসেন এক ভগ্নী, তিন ভাগ্নে ও বহু সংখ্যক মুরীদ। স্থানীয় হিন্দু রাজার সঙ্গে সংঘর্ষে তিনি বহু মুরীদসহ শহীদ হন, কিন্তু ওই অঞ্চলে ইসলামের প্রচার ও প্রসার অব্যাহত থাকে।[৯]	সুলতান শামস-উদ-দীন ফিরোজ শাহ্ ও তাঁর পুত্রগণসহ অন্যান্য স্বল্পকালীন শাসনকর্তা, এবং সুলতান ফখর- উদ-দীন মুবারক শাহ্ (১৩৩৮-১৩৪৯ সাল)।

৮. ডক্টর আবদুল করিম, বাংলার ইতিহাস, সুলতানী আমল, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭, পৃ. ১৬৮-১৬৯।
৯. সুফীবাদ ও আমাদের সমাজ, নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৬৯, পৃ. ১৬৫-১৬৯।

সুফীবৃন্দ	কখন কোথা থেকে বাংলায় এলেন; কার্যকাল ও কর্মস্থল	তখন বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন
শাহ্ মখদুম রূপোশ	যেখানে এখন রাজশাহী জেলা শহর, তার পূর্বনাম ছিল মহাকাল গড়। এই মহাকাল গড়ে ১২৮৮ সালে তুরকান বা তুরফান শাহ্ নামক এক দরবেশ ইসলাম প্রচার করতে এসে এই গড়ের অধিপতি হিন্দু রাজার সঙ্গে এক সংঘর্ষে শহীদ হন। এই ঘটনার পরই বাগদাদ থেকে সেখানে ইসলাম প্রচার করতে আসেন শাহ্ মখদুম রূপোশ। ১৩২৫ সালে মহাকাল গড় জয় করেন তিনি এবং এলাকায় ইসলামের ঝাণ্ডা প্রোথিত করে ১৩৩০ সালে রামপুর বোয়ালিয়ায় ইন্তেকাল করেন।[১০]	সুলতান গিয়াস-উদ-দীন বাহাদুর (১৩২২-১২২৮ সাল); বাহরাম খান (১৩২৮-১৩৩৮ সাল)।
মীর সৈয়দ জালাল -উদ-দীন বুখারী (১৩০৭-১৩৮৩ সাল)	রংপুর জেলার মাহীগঞ্জের হযরত শাহ্ জালাল বুখারীর আস্তানা সবচেয়ে প্রাচীন। এই আস্তানার সঙ্গে উত্তর ভারতের বিখ্যাত সূফী হযরত মীর সৈয়দ জালাল-উদ-দীন বুখারী ওরফে মখদুম জাহানিয়া জাহানগশৎ সংশ্লিষ্ট।[১১]	বাহরাম খান; সুলতান ফখর-উদ-দীন মুবারক শাহ্ (১৩৩৮-১৩৭৯); সুলতান গাজী শাহ্ (১৩৪৯-১৩৫২)।

১০. সুফীবাদ ও আমাদের সমাজ, নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৬৯, পৃ. ১৬৫-১৬৯।
১১. ডক্টর আবদুল করিম, বাংলার ইতিহাস, সুলতানী আমল, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭, পৃ. ১৮৭।

সুফীবৃন্দ	কখন কোথা থেকে বাংলায় এলেন; কার্যকাল ও কর্মস্থল	তখন বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন
কদল খান গাজী ও পীর বদর আলম	ত্রিবেণী বিজয়ে যেমন শাহ্ সফি-উদ-দীন ও জাফর খান গাজী এবং সিলেট বিজয়ে যেমন শাহ্ জালাল ও সৈয়দ নাসির-উদ-দীনের নাম একই সঙ্গে উচ্চারিত হয়, চট্টগ্রাম বিজয়েও তেমিন পীর বদর আলম ও কদল খান গাজীর নাম এক সঙ্গে উচ্চারিত হয়। এঁদের সংগ্রামের ফলে ১৩৩৮ সাল থেকে ১৩৪৫ সালের মধ্যে চট্টগ্রাম এলাকা ইসলাম অনুসারীদের অধিকারে আসে। চট্টগ্রামে প্রচলিত জনশ্রুতিতে কদল খান গাজী ছিলেন সুলতান ফখর-উদ-দীন মুবারক শাহ্র সেনাপতি, এবং বলা চলে যোদ্ধা-সুফী।[১২] শাহ্ বদর আলমের ভক্তরা তাঁকে চট্টগ্রাম শহরের ওয়ালী বলে মনে করেন। শাহ্ বদরের পূর্বপুরুষ ছিলেন হযরত শিহাব-উদ-দীন ইমাম মক্কী। হযরত ইমাম মক্কীর পুত্র ভারতের মিরাঠাবাদে এসে বসবাস আরম্ভ করেন। তাঁর পুত্র শাহ্ বদর আলম তিন-চার শ' শিষ্যসহ ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে বাংলায় এসে চট্টগ্রামের	সুলতান ফখর-উদ-দীন মুবারক শাহ্ (১৩৩৮-১৩৪৯ সাল)।

১২. সুফীবাদ ও আমাদের সমাজ, নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৬৯, পৃ. ১৭৬।

সুফীবৃন্দ	কখন কোথা থেকে বাংলায় এলেন; কার্যকাল ও কর্মস্থল	তখন বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন
	সমুদ্রোপকূলে আস্তানা স্থাপন করেন। তার পরই অমুসলিম শক্তির সঙ্গে সংঘর্ষ, কদল খান গাজীর সহযোগিতা লাভ এবং চট্টগ্রাম বিজয়। শাহ্ বদরের সমসাময়িক কয়েকজন দরবেশের কবর চট্টগ্রামের চন্দনপুরা মহল্লায় একটি টিলার উপর অবস্থিত। তাঁদের নাম—শাহ্ মোল্লা মিসকিন, শাহ্ নূর, শাহ্ আশরাফ, কাকুলী শাহ, বান্দা রিযা শাহ্, শাহ্ মুবারক আলী। চট্টগ্রাম শহরের উত্তর দিকে শাহ্ বদরের সঙ্গী কতল পীরের মাযার। অন্য এক সঙ্গী শাহ্ মুহসিনের মাযার আনোয়ারা থানার ঝিয়ারী গ্রামে অবস্থিত।	
সৈয়দ শাহ্ মুর	সূফী শাহ্ মুরের মাযার ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের অন্তর্গত সৈয়দপুর গ্রামে অবস্থিত। বোঝাই যায়, শাহ্ সাহেবের বংশ পরিচয় সৈয়দ থেকেই গ্রামের নাম সৈয়দপুর। তিনি ১৩৩১ সালে বহু শিষ্যসহ মক্কা শরীফ থেকে এদেশে এসে সুদীর্ঘ ৫০ বছরকাল ইসলাম প্রচারে নিয়োজিত থাকেন। এখানেও স্থানীয় রাজা রঘু রামের সঙ্গে হয় তাঁর সংঘর্ষ। এই সংঘর্ষে তিনিই বিজয়ী হন। সৈয়দ সাহেবের ইন্তেকাল সন হচ্ছে ১৩৮০।[১৩]	বাহরাম খান (১৩২৮-১৩৩৮); সুলতান ফখর-উদ-দীন মুবারক শাহ (১৩৩৮-১৩৪৯ সাল); সুলতান গাজী শাহ (১৩৪৯-১৩৫২ সাল); সুলতান শামস-উদ-দীন ইলিয়াস শাহ্ (১৩৪২-৫৭); সুলতান সিকান্দার শাহ্ (১৩৫৭- ১৩৯৩ সাল)।

১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮২।

সুফীবৃন্দ	কখন কোথা থেকে বাংলায় এলেন; কার্যকাল ও কর্মস্থল	তখন বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন
শেখ রেযা বিয়াবানী ও আখী সিরাজ-উদ-দীন উসমান	দু'জনই সমসাময়িক সূফী; পাণ্ডুয়াতে শেখ রেযা বিয়াবানীর মাযার বিদ্যমান। আর শেখ আখী সিরাজ-উদ-দীন উসমান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে, তিনি ছিলেন বাঙালী সূফী এবং তিনি বাংলায় এমন এক সূফী গোষ্ঠির প্রতিষ্ঠা করেন, যাঁদের অবদানে বাংলার ইসলামী সমাজ ও তার শিক্ষা ও সংস্কৃতি গৌরবের উচ্চ শিখরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছি। চিশতীয়া তরীকার সাধক আখী সিরাজ-উদ-দীনের মুর্শিদ ছিলেন হযরত নিযাম-উদ-দীন আউলিয়া (১২৩৬-১৩২৫ সাল)। মুর্শিদের নির্দেশে তিনি বাংলায় ফিরে এসে ইসলাম প্রচারে নিজেকে নিয়োজিত করেন। আধ্যাত্মিক সাধনার জন্য যে ব্যাপক শিক্ষার প্রয়োজন, তা তিনি অর্জন করেন তাঁর মুর্শিদেরই অন্যতম বিদ্বান শিষ্য মাওলানা ফখর-উদ-দীন জাররাদীর কাছ থেকে। লক্ষ্মণাবতীতে তিনি যে খানকাহ্ প্রতিষ্ঠা করেন, তা ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও মানব সেবামূলক কার্যাবলীর কেন্দ্রে পরিণত হয়ে সারা দেশে বিস্তার করে তার প্রভাব। মুর্শিদের	সুলতান শামস-উদ-দীন ইলিয়াস শাহ্ (১৩১২-১৩৫৭ সাল)। তাঁর সময়েই রাঢ়, বরেন্দ্রী, বঙ্গ, সমতট প্রভৃতি বিভিন্ন জনপদ একীভূত হয়ে 'বাঙ্গালাহ্' নামে অভিহিত হয়; আর সুলতান শামস-উদ-দীন ইলিয়াস শাহ্ অভিহিত হন 'শাহ্ এ-বাঙ্গালাহ্' ও 'শাহ্-এ-বাঙ্গালীয়ান' বলে। ১৩৩৮ সালে বাংলা যে স্বাধীনতা লাভ করে এবং সুলতান ইলিয়াস শাহ্ যে একীভূত বাঙ্গালার স্বাধীনতা সংহত করেন, তা টিকে থাকে দু'শ' বছর ধরে।

সুফীবৃন্দ	কখন কোথা থেকে বাংলায় এলেন; কার্যকাল ও কর্মস্থল	তখন বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন
	গ্রন্থাগারের কিছু সংখ্যক পুস্তক শেখ আখী সিরাজ-উদ-দীন সঙ্গে করে এনেছিলেন; এগুলোকে কেন্দ্র করেই বাংলায় গড়ে উঠেছিল ইসলামী মরমীবাদ সংক্রান্ত প্রথম গ্রন্থাগার।[১৪]	
শেখ আলাউল হক	বাঙালী সূফী শেখ আলাউল হকের পিতা লাহোর থেকে পাণ্ডুয়ায় এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করছিলেন। সুশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত বংশীয় এই সূফী হয়েছিলেন আখী সিরাজ-উদ-দীনের অন্যতম প্রিয় শিষ্য ও খলিফা। আখী সিরাজ-উদ-দীনকে কেন্দ্র করে পাণ্ডুয়ায় যে খানকাহ্ ও লঙ্গরখানা গড়ে ওঠে, তার পরিচালনা-ভার শেষ পর্যন্ত বর্তায় শেখ আলাউল হকের উপর। এই খানকায় ও লঙ্গরখানায় আশ্রয় পেত অসহায় দুস্থ মানুষেরা; সেখানে তারা বিনা খরচে খাদ্য পেত, চিকিৎসা পেত, পেত মানুষের মত বেঁচে থাকার জন্য উপযুক্ত শিক্ষা ও সেবাযত্ন। শেখ আলাউল হক এই খানকাহ্ ও লঙ্গরখানার জন্য পারিবারিক সঞ্চয় থেকে এত অর্থ ব্যয় করতেন যে, তার জন্য ঈর্ষান্বিত হয়ে ওঠেন সুলতান সিকান্দার	সুলতান সিকান্দার শাহ্ (১৩৫৭-১৩৯৩ সাল); সুলতান গিয়াস-উদ-দীন আজম শাহ্ (১৩৯৩-১৪১০/১১ সাল)।

১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৯।

সুফীবৃন্দ	কখন কোথা থেকে বাংলায় এলেন; কার্যকাল ও কর্মস্থল	তখন বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন
	শাহ্, এবং তার পরিণামে সুলতানের নির্দেশে শেখ আলাউল হক সোনারগাঁও-এ নির্বাসিত হন। কিন্তু সোনারগাঁও-এ এসে সেখানেও গড়ে তোলেন এক নতুন খানকাহ্ ও লঙ্গরখানা এবং তাতে দ্বিগুণ অর্থ ব্যয় করতে থাকেন।[১৫]	
শেখ নূর কুতুব আলম (মৃত্যুঃ আনুমানিক ১৪১৫ সাল)	চিশ্‌তীয়া তরীকার সাধক ইসলামী ধর্মতত্ত্ব ও বিদ্যাবত্তায় সুপণ্ডিত শেখ নূর কুতুব আলম শেখ আলাউল হকের পুত্র ও আধ্যাত্মিক খলিফা। নূর কুতুব আলম ছিলেন সুলতান সিকান্দারের পুত্র সুলতান গিয়াস-উদ-দীন আজম শাহ্‌র সহধ্যায়ী। শেখ আলাউল হকের খান্দানী প্রভাব সুলতানের দরবারে বিশেষ কার্যকর ছিল। শেখ নূর কুতুব আলম যদিও ইসলামের খেদমতে নিজেকে উৎসর্গিত করেছিলেন, বাংলার মুসলিম সমাজে হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন সবচেয়ে প্রভাবশালী ধর্মীয় নেতা, তবুও রাজা গণেশ যখন ইলিয়াস শাহী সুলতানদের ধ্বংস করে বাংলায় হিন্দু শাসনের পুনরভ্যুদয়	সুলতান গিয়াস-উদ-দীন আজম শাহ্ (১৩৯৩ - ১৪১০/ ১১সাল) সুলতান সাইফ-উদ-দীন হামজা শাহ্ (১৪১০/ ১১-১৪১১/ ১২ সাল); সুলতান শিহাব-উদ-দীন বায়েজীদ শাহ্, (১৪১১/১২–১৪১৪/ ১৫)

১৫. ডক্টর এম. এ. রহিম, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, অনুবাদ ঃ মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান, বাংলা একাডেমী, ১৯৮২, পৃ. ১২৩।

সুফীবৃন্দ	কখন কোথা থেকে বাংলায় এলেন; কার্যকাল ও কর্মস্থল	তখন বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন
	ঘটাতে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন, তখন মুসলিম বাংলাকে বিপদমুক্ত করতে শেখ নূর কুতুব আলম রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করলেন। ব্যর্থ হলো রাজা গণেশের পরিকল্পনা। এই ষড়যন্ত্রের কিছুটা বিস্তৃত বিবরণ এ অধ্যায়ের শেষে সংযুক্তি রূপে দেওয়া হলো।	
মীর সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী (নূর কুতুব আলমের সমসাময়িক)	ইরান থেকে আগত সূফী সৈয়দ সিমনানী দিল্লী হয়ে বাংলায় আসেন এবং শেখ আলাউল হকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ছয় বছর কাল তিনি ছিলেন পাণ্ডুয়ায়, তার পর শেখ আলাউল হকের নির্দেশে তাঁরই খলিফা হয়ে জৌনপুরে গিয়ে ইসলামের খেদমতে নিয়োজিত হন।[১৬]	ঐ
শেখ বদরুল ইসলাম (নূর কুতুব আলমের সমসাময়িক)	সূফী শেখ আলাউল হকের শিষ্য শেখ বদরুল ইসলাম তেজস্বী এক ধর্মনিষ্ঠ হিসাবে রাজা গণেশের কোপে পতিত হন এবং রাজার আদেশে নিহত হন।[১৭]	সুলতান গিয়াস-উদ-দীন আজম শাহ্ ১৩৯৩-১৪১০/১১ সাল); সুলতান সাইফ-উদ-দীন হামজা শাহ্ (১৪১০/১১-১৪১১/১২ সাল) ; সুলতান শিহাব-উদ-দীন বায়েজীদ শাহ্ (১৪১১/১২- ১৪১৪/১৫);

১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২-১৩৩।

১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭, ১৩৪-১৩৫।

সুফীবৃন্দ	কখন কোথা থেকে বাংলায় এলেন; কার্যকাল ও কর্মস্থল	তখন বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন
শেখ হুসাম-উদ-দীন মানিকপুরী	শেখ নূর কুতুব আলমের শিষ্য বদরুল ইসলাম ছিলেন মওলানা খাজার পুত্র এবং যুক্ত প্রদেশের অন্তর্গত মানিকপুরের মওলানা জালাল-উদ-দীনের দৌহিত্র। পাণ্ডুয়ায় থেকে মুর্শিদের কাছ থেকে যাবতীয় শিক্ষা গ্রহণ করে তাঁরই নির্দেশে ইসলামের খেদমতের জন্য তিনি চলে যান মানিকপুরে।[১৮]	
শেখ আনোয়ার	শেখ নূর কুতুব আলমের পুত্র শেখ আনোয়ার রাজা গণেশ কর্তৃক নির্যাতিত হয়ে পরে সোনারগাঁও-এ নির্বাসিত হন। অবশেষে ওই নির্বাসিত অবস্থায়ই গণেশের আদেশে ১৪১৮ সালে নিহত হন তিনি।[১৯]	
শেখ জাহিদ	শেখ জাহিদ ছিলেন শেখ নূর কুতুব আলমের জ্যেষ্ঠ পুত্র রিফাত-উদ-দীনের সন্তান এবং পিতামহেরই মুরীদ। তিনি রাজা গণেশ কর্তৃক সোনারগাঁও-এ নির্বাসিত হয়েছিলেন, কিন্তু ইসলামে দীক্ষিত গণেশ পুত্র সুলতান জালাল-উদ-দীন মুহম্মদ শাহ্ তাঁকে পাণ্ডুয়ায় ফিরিয়ে আনেন। ইন্তিকাল করেন ১৪৫৫ সালে।	এবং সুলতান জালাল-উদ-দীন মুহাম্মদ শাহ (১৪১৮-১৪৩৩ সাল)।

১৮.১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭, ১৩৪-১৩৫।

সুফীবৃন্দ	কখন কোথা থেকে বাংলায় এলেন; কার্যকাল ও কর্মস্থল	তখন বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন
খান জাহান আলী	দক্ষিণবঙ্গ জয়ের যে কৃতিত্ব তার অধিকারী ইসলাম প্রচারক ও বীর যোদ্ধা ও রাজকর্মচারী খান জাহান আলী এক সর্বজনমান্য দরবেশ হিসাবেই বাংলায় সুপরিচিত। সুলতান নাসির-উদ-দীন মাহ্মুদ শাহ্ ছিলেন ইসলামে দীক্ষিত রাজা গণেশ বংশের দ্বিতীয় সুলতান আহ্মদ শাহ্র মৃত্যুর পর ইলিয়াস শাহী শাসনের পুনঃ প্রবর্তনকারী প্রথম সুলতান। তাঁর থেকেই আরম্ভ হয় 'পরবর্তী ইলিয়াস শাহী' বংশের শাসনামল। এই সুলতানের আমলেই খান জাহান আলী দক্ষিণবঙ্গ জয় করে সেখানকার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। তাঁর সংগঠনী ক্ষমতা, দূরদর্শিতা ও আদর্শ চরিত্র মাহাত্ম্যে এ অঞ্চলের অসংখ্য অমুসলিম ইসলামে দীক্ষিত হয়॥ তিনি ছিলেন খ্যাতনামা এক সূফী সাধক। তাঁর শিষ্যগণের মধ্যে গরীব শাহ্, বুড়া খান, ফতেহ খান, পীর মুহীউদ্দীন, পীর জয়ন্তী, পীর সুজান শাহ্, মুহম্মদ তাহির ওরফে পীর আলী প্রমুখের নাম খুলনা-যশোর অঞ্চলে সুপরিচিত। ১৪৫৮ সালে ইন্তিকালের পর তিনি বাগেরহাটে সমাহিত হন।	সুলতান নাসির-উদ-দীন মাহ্মুদ শাহ্ (১৪৩৫/৩৬-১৪৫৯/৬০ সাল)।

সুফীবৃন্দ	কখন কোথা থেকে বাংলায় এলেন; কার্যকাল ও কর্মস্থল	তখন বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন
	খোলাফায়ে রাশেদা আমলে স্বাপ্নিক এই দরবেশ শাসনকর্তা বাগেরহাট শহর নির্মাণ করেন ও ওই অঞ্চলের নামকরণ করেন 'খলিফতাবাদ'। বহু রাস্তা, দীঘি, মসজিদ, শিক্ষালয় এবং বাগেরহাটের ষাট-গম্বুজ মসজিদ তিনিই নির্মাণ করান।[২১]	
শাহ্ ইসমাইল গাজী	আমাদের নবীজির বংশধর বলে কথিত শাহ্ ইসমাইর গাজী ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে সুলতান বারবক শাহ্র শাসনামলে লক্ষ্মণাবতীতে আসেন। তিনি ছিলেন একাধারে দরবেশ, যোদ্ধা ও ইসলাম প্রচারক। সুলতান বারবক শাহ্ তাঁরই সাহায্যে জয় করেন উড়িষ্যা ও কামরূপ। রংপুর জেলার কাঁটাদুয়ার নামক স্থানে আস্তানা ও সৈন্য ঘাঁটি নির্মাণ করে শাহ্ ইসমাইল গাজী রংপুর অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন। ঘোড়াঘাট সীমান্ত দুর্গের অধিনায়ক ভান্দশী রায় এই ইসলাম প্রচারকের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে ষড়যন্ত্র করে সুলতানের নিকট অভিযোগ আনেন। ফলে, সুলতানের হুকুমে তিনি নিহত হন	সুলতান রকন-উদ্দীন বারবক শাহ্ (১৪৫৯/৬০-১৪৭৪ সাল)।

২১. সুফীবাদ ও আমাদের সমাজ, নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৬৯, পৃ. ২০৩-২০৪।

সুফীবৃন্দ	কখন কোথা থেকে বাংলায় এলেন; কার্যকাল ও কর্মস্থল	তখন বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন
	১৪৭৪ সালে। পরে ষড়যন্ত্রের কথা ফাঁস হয়ে গেলে সুলতান অনুতপ্ত হন। কথিত আছে যে, নিহত গাজী সাহেবের মাথা কাঁটাদুয়ারে এবং মস্তকহীন দেহ পশ্চিবঙ্গের গড় মান্দারনে সমাহিত করা হয়। একথার সত্যতা আজও প্রমাণিত হয়নি।[২২]	
শাহ্ জালাল দকীনী	প্রখ্যাত সূফী শাহ্ জালাল দকীনী ছিলেন খুবই প্রভাবশালী দরবেশ। বাঙ্গালার সুলতান তাঁর প্রভাবপ্রতিপত্তিতে শঙ্কিত হয়ে ১৪৭৬ সালে তাঁকে হত্যা করেন। মরহুম হাকীম হাবীবুর রহমানের মতে ঢাকার পুরনো 'গভর্নমেন্ট হাউসের এলাকায় তিনি শিষ্যগণসহ সমাহিত আছেন।[২৩]	হাবশী সুলতান শামস-উদ-দীন ইউসুফ শাহ্ (১৪৭৪-১৪৮১ সাল)

এ পর্যন্ত যে সব সূফী-দরবেশের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হলো, তাঁদের ছাড়া আরও আরও সূফী-দরবেশ সারা বাংলায় সমাহিত আছেন। এ অধ্যায়ে সকলের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরার উদ্দেশ্যও আমাদের নেই। আমরা শুধু এই সত্যটি তুলে ধরতে চেয়েছি যে, বাংলায় মুসলিম সমাজের প্রতিষ্ঠার পেছনে রয়েছেন সূফী-দরবেশগণ। বাংলার শাসনকর্তাগণ তাঁদেরকে এ কাজে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন।

বাংলায় বিদেশাগত সূফী-দরবেশদের আগমন ধারাকে তিন ভাগে বিভক্ত করা চলে। প্রথম ধারা তের শতকের প্রারম্ভে মুসলিম বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত, দ্বিতীয় ধারা

২২. সুফীবাদ ও আমাদের সমাজ, নওরোজ কিতাবিস্তান ১৯৬৯, পৃ. ১৬৫।
২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২।

মুসলিম বিজয় থেকে ১২৫৮ সালে হালাকু খান কর্তৃক বাগদাদ ধ্বংসের কাছাকাছি সময় পর্যন্ত এবং তৃতীয় ধারা দ্বিতীয় ধারার পরবর্তী কাল অর্থাৎ ধরা যাক অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত। প্রথম ও দ্বিতীয় ধারার তুলনায় তৃতীয় ধারায় অর্থাৎ চৌদ্দ শতকের শেষার্ধ এবং পনের শতকেই বাংলায় সূফী-দরবেশদের আগমন ঘটেছে অনেক বেশি সংখ্যায়। বাগদাদ ধ্বংসের পর ভারতে ও বাংলায় সূফী-দরবেশদের আগমন স্রোত অবাধ গতিতে বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হতে থাকে। এই সময়েই আরব-পারস্য, ইরাক-ইয়েমন ও মধ্য-এশিয়ার সূফী-দরবেশগণ এই উপমহাদেশের চারদিকে ছড়িয়ে পড়েন। ছড়িয়ে পড়েন এই বাংলার শহরে বন্দরে, প্রতিটি প্রত্যন্ত অঞ্চলে।

সর্বশ্রেণীর জনসমাজেই সূফী-দরবেশদের প্রভাব ছিল অপরিসীম । এই প্রভাব পর্ণকুটিরবাসী সাধারণ মানুষের গৃহাঙ্গন থেকে সুলতান শাসনকর্তাদের প্রাসাদ পর্যন্ত সমভাবে পরিলক্ষিত হয়। মীর সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানীর কথায়, সমগ্র বাংলার শহর বন্দর বা এমন কোন গ্রামাঞ্চল নেই, যেখানে সূফী-দরবেশগণ আসেন নি এবং আস্তানা স্থাপন করেন নি। অসংখ্য সূফী-দরবেশ এদেশে এসে আস্তানা স্থাপন করেছেন, স্থাপন করেছেন খানকাহ্ ও লঙ্গরখানা। সেখান থেকে মানব ধর্ম ইসলামের মুক্তিবাণী প্রচার করেছেন, পতিত মানুষকে দিয়েছেন মুক্তির আস্বাদন, প্রতিষ্ঠিত করেছেন মুসলিম সমাজ। প্রয়োজনে অস্ত্রহাতে শত্রুর মোকাবিলা করেছেন! হয় গাজী হয়েছেন, নয় তো শহীদ। কিন্তু ইসলামের আলো জ্বলেছে অনির্বাণ। ইন্তিকাল করে সূফী-দরবেশগণ সমাহিত হয়েছেন এই বাংলার মাটিতেই। জীবনকালেই তাঁরা শুধু সমাজে প্রভাব বিস্তার করেন নি, মৃত্যুর পরেও জনসমাজে তাঁরা রয়ে গেছেন জীবিত। বাস্তবিকই, মুসলিম সমাজে সর্বস্তরের মানুষের কাছে তাঁরাই ছিলেন প্রকৃত বাদশা, সালতানাত ছিল তাঁদেরই। এমনিতে যাঁরা সুলতান-বাদশা, তাঁদের সালতানাত এক সময়ে শেষ হয়ে গেছে; বাদশাহী বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু সূফী-দরবেশদের বাদশাহী, তাঁদের সালতানাত থেকে গেছে অক্ষয়, অম্লান।

বাংলায় সূফী-দরবেশদের প্রভাব ছিল বহুমুখী। মোটামুটিভাবে তাঁদের প্রভাবকে চারটি ভাগে বিভক্ত করা যায় ; (১) ইসলামী শক্তি বিস্তারে সূফী-দরবেশদের প্রভাব, (২) শাসন কর্তৃপক্ষের উপর তাঁদের প্রভাব, (৩) ধর্মীয় শিক্ষা বিস্তারে তাঁদের প্রভাব এবং (৪) জনসমাজে তাঁদের প্রভাব। এসব প্রভাব সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে বলা যায় ঃ

(১) ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী বাংলায় মুসলিম রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করেন যখন, তখন তাঁর অধিকৃত ভূখণ্ডের বিস্তৃতি বেশি ছিল না। তাঁর রাষ্ট্রের সীমানা ছিল উত্তরে দেবকোট, দক্ষিণে পদ্মা নদী, পূর্বে তিস্তা ও করতোয়া এবং পশ্চিমে

তাঁর পূর্ব-অধিকৃত বিহার প্রদেশ। পরবর্তীতে ক্রমে ক্রমে মুসলিম শাসকগণ জয় করেন সমগ্র উত্তরবঙ্গ, পূর্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গ। আর এই বিজয়ের কৃতিত্ব শুধু শাসকগণের নয়, এ বিজয়ের কৃতিত্ব অনেকাংশে সূফী-দরবেশগণেরই প্রাপ্য। কখনো কোথাও মুসলিম সেনাপতি সূফী-দরবেশদের সাহায্যে এগিয়ে গেছেন, কখনো কোথাও সেনাবাহিনীর সঙ্গে থেকে অস্ত্র ধরেছেন সূফী-দরবেশগণ, আবার কখনো কোথাও সূফী-দরবেশগণই হয়েছেন যুদ্ধের সিপাহ্সালার। আবার এমনও হয়েছে যে, বিজয়ী সিপাহ্সালার বিজিত ভূখণ্ডের শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছেন। খাঁটি ইসলামী আদর্শে শাসন করেছেন বিজিত ভূখণ্ড, জনসমাজে পরিচিত হয়েছেন সূফী-দরবেশ রূপে। ত্রিবেণী-হুগলী বিজয়ী খান জাহান, রংপুর বিজয়ী শাহ্ ইসমাইল গাজী, চট্টগ্রাম বিজয়ী কদল খান গাজী, দক্ষিণ বঙ্গ বিজয়ী খান জাহান আলী এমনি সিপাহ্সালার-সূফীর দৃষ্টান্ত। এক কথায়, সুফী-দরবেশগণ বাংলায় মুসলিম রাজ্য বিস্তারে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁদের প্রভাব তাই শুধু ধর্ম বিস্তারে নয়, রাজ্য বিস্তারেও বিশেষ সহায়ক ছিল।

(২) ইসলামে পেশাদার ধর্মপ্রচারকের কোন ব্যবস্থা নেই। ধর্মীয় কর্তব্য বোধের তাগিদে সূফী-দরবেশগণ শহরে-বন্দরে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ইসলামের বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার কাজে নিয়োজিত থাকতেন। শুধুমাত্র ভাল কথার ফুলঝুরি ছড়িয়ে নয়, নিজেদের চরিত্র-মাহাত্ম্যে ও মানব-সেবার মাধ্যমে তাঁরা মানুষের কাছে প্রতিভাত হতেন পরম শ্রদ্ধেয় পুণ্যাত্মা হিসাবে। মানুষ আকৃষ্ট হতো তাঁদের কাছে কথায়, তাঁদের মহত্ত্বে। দীক্ষিত হতো ইসলামে। নিজেদের জীবিকা নির্বাহের জন্য দুশ্চিন্তা না করে জানমাল কোরবান করেই তাঁরা ইসলামের বাণী প্রচারে নিয়োজিত থাকতেন। মুসলিম শাসক-সুলতান ও শাসন-কর্তৃপক্ষের নানা স্তরের ব্যক্তিরা স্বেচ্ছায় বহন করতেন তাঁদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয়-ভার। তাঁরা প্রায় সকলেই ইসলামী দায়িত্ব পালনের তাগিদেই দেশের নানা স্থানে প্রতিষ্ঠা করতেন মসজিদ-মাদ্রাসা-খানকাহ্-লঙ্গরখানা। এসব মসজিদ-মাদ্রাসা-খানকাহ্-লঙ্গরখানা নিয়ে গড়ে উঠত এক একটা বিশালায়তন ও বহুমুখী প্রতিষ্ঠান যেখানে শিক্ষার্থী ও দুস্থ মানুষের জন্য থাকত শিক্ষা-খাদ্য-চিকিৎসার ব্যবস্থা, থাকত ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের আয়োজন। সময় অতিক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বাংলায় ছড়িয়ে পড়লেন যখন সূফী-দরবেশগণ, এসব মানব-কল্যাণমুখী প্রতিষ্ঠানেও তখন ছেয়ে গেল সারা দেশ। কোথাও বিশালায়তন এসব বহুমুখী প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরূপ প্রতিষ্ঠানে রূপ নিত, কোথাও তা হতো মহাবিদ্যালয়ের অনুরূপ। এসব প্রতিষ্ঠান বংশ পরম্পরায় সূফী, দরবেশ, উলামাগণের শিক্ষা-জ্ঞান ও প্রচার কেন্দ্রে পরিণত হতো এবং সেসব প্রতিষ্ঠান থেকে ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শের আলো বিস্তৃত হতো সারা দেশে।

অধিকাংশ শাসক তাঁদের অনুসৃত শাসন নীতিতে প্রতিফলিত করতে চাইতেন ইসলামী আদর্শ। এবং তা করতে গিয়ে তাঁরা সূফী-দরবেশ-আলেমদেরই শরণাপন্ন হতেন। অন্য কথায়, বিপুলভাবে জনপ্রিয় সূফী-দরবেশ ও আলেমগণের দ্বারা প্রভাবিত হতেন দেশের শাসকবৃন্দ। কখনো তাঁদের প্রভাব এত বেশি অনুভূত হতো যে, শাসক বৃন্দ সূফী-দরবেশগণকে রীতিমত ভয়ের চক্ষে দেখতেন। আর সে ভয়কে দূর করার জন্য কোন কোন শাসক সূফী-দরবেশগণকে নির্বাসনের মাধ্যমে রাজধানীর নিকট থেকে দূরেও সরিয়ে দিয়েছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় সুলতান সিকান্দার শাহ্ কর্তৃক শেখ আলাউল হককে পাণ্ডুয়া থেকে সোনারগাঁও-এ নির্বাসন দানের কথা। পাণ্ডুয়ার খানকাহ্ ও লঙ্গরখানায় শেখ আলাউল হক বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতেন। ফলে মহৎপ্রাণ সূফী হিসাবে তাঁর খ্যাতিও দেশময় অনুরূপভাবেই ছড়িয়ে পড়েছিল। তার জন্যই ঈর্ষান্বিত সুলতান শেখজীকে রাজধানীর সন্নিকট থেকে পাঠিয়ে দেন সুদূর পূর্ববঙ্গের সোনারগাঁও-এ। অবিশ্যি, শেখজী তাঁর সোনারগাঁও-এর খানকায় আরও বেশি অর্থ ব্যয় করতে থাকেন। কিছুকাল পরে সুলতান সূফী সাহেবকে পাণ্ডুয়ায় ফিরিয়ে নিয়ে যান। এমনি দৃষ্টান্ত আরও রয়েছে। আবার এমন সুলতানও ছিলেন, যিনি তার শ্রদ্ধেয় সূফীর প্রতি সম্মান দেখাতে গিয়ে নিজের জীবনের উপরেও চরম ঝুঁকি নিয়েছেন। সমগ্র বাঙ্গালার সুলতান শামস-উদ-দীন ইলিয়াস শাহ্ যখন দিল্লীর সুলতান ফিরোজ তুগলকের বাহিনী দ্বারা একডালা দুর্গে অবরুদ্ধ, তখন ইলিয়াস শাহ্‌র শ্রদ্ধেয় সূফী শেখ রেযা বিয়াবানী ইন্তিকাল করেন। সুলতান ইলিয়াস শাহ্ তখন ছদ্মবেশে একডালা দুর্গের বাইরে এসে সূফী সাহেবের নামায-এ-জানাজায় শরীক হন।

(৩) সূফী-দরবেশগণ বাংলায় এসে প্রথম থেকেই লোকদের শিক্ষাদানের দিকে মনোযোগ দেন। খানকা'র সঙ্গে মসজিদ-মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে তাঁরা লোক-শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। এ শিক্ষা শুধুমাত্র প্রাথমিক স্তরের ছিল না; প্রাথমিক স্তর ছাড়িয়ে আরও উচ্চ থেকে উচ্চতর শিক্ষার ব্যবস্থাও ছিল বিভিন্ন খানকায় ও মসজিদ-কেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠানে। সূফী-দরবেশ শেখ শরফ-উদ-দীন আবু তাওয়ামা ছিলেন মুসলিম বাংলার প্রথম দিককার একজন বিদ্বান ব্যক্তি। সোনারগাঁও-এ তাঁর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি ছিল ওই সময়কার এক সুবিখ্যাত জ্ঞানকেন্দ্র। ধর্মীয় ও লোক-বিজ্ঞানে বাংলার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন তিনিই। তাঁর সঙ্কলিত গ্রন্থ 'মা'কামাত' ইসলামী মরমীবাদের উপর একটি অতি উঁচুদরের গ্রন্থ। তেমনি সোনারগাঁও থেকে ফিকাহ্ বিজ্ঞানের উপর রচিত 'নাম-ই-হক' সমগ্র উপমহাদেশে শ্রেষ্ঠ অবদান হিসাবে স্বীকৃত একটি গ্রন্থ। সোনারগাঁও-এর এই জ্ঞান-পীঠ থেকে উচ্চতম শিক্ষার আলো ছড়িয়ে পড়েছিল সমগ্র উপমহাদেশে। সোনারগাঁও-এর মত উচ্চতম মানের শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল লক্ষ্মণাবতীতে,

বর্তমান রাজশাহী জেলার অন্তর্গত মাহীসুনে, সাতগাঁও-এ, নগোর-এ, মান্দারনে, পাণ্ডুয়ায়, রাজশাহী জেলার বাঘায়, রংপুরে ও চট্টগ্রমে।[২৪]

প্রতিটি মসজিদে ও ধনশালী ব্যক্তিদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত মক্তবে ছিল প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা। মাধ্যমিক শিক্ষা ও উচ্চতর পাঠক্রম সম্পর্কে ডক্টর এম.এ. রহিম বলেন, "... এ প্রদেশে (অর্থাৎ বাংলায় –লেখক) বহু সংখ্যক মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং বেশির ভাগ শহর ও গুরুত্বপূর্ণ মুসলমান এলাকাসমূহে মুসলমান অধিবাসীদের শিক্ষাগত প্রয়োজন মিটাবার জন্যে মাধ্যমিক বিদ্যালয় ছিল।...সরকার ও অবস্থাশালী ব্যক্তিরা মাদ্রাসা ও মসজিদগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে উদারভাবে লাখেরাজ জমি দান করেছেন। কাজী নাসির-উদ-দীন ত্রিবেণীতে প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসা ও ছাত্রদের ব্যয়ভার বহন করার জন্যে সুব্যবস্থা করেছিলেন। বাঘার মাদ্রাসার জন্য ৪২টি গ্রাম দান করা হয়েছিল। শিক্ষা ছাড়াও ছাত্ররা বিনা খরচে আহার, বাসস্থান, কাপড়-চোপড়, তেল, প্রসাধনী দ্রব্যাদি এবং মূল গ্রন্থ ব্যবহারের প্রয়োজনে পাণ্ডুলিপি নকল করার জন্যে দরকারী জিনিসপত্রসহ সব কিছু পেত। ... বৃটিশ সরকারের লাখেরাজ বাজেয়াপ্তির বিবরণ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বাংলাদেশে মুসলমান শাসনামলে ধর্মীয় ও শিক্ষা সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান এবং ধর্মপ্রাণ ও বিদ্বান ব্যক্তিদের জন্য অসংখ্য নিষ্কর জমির ব্যবস্থা ছিল।"[২৫] ডক্টর রহিম উপরোক্ত মন্তব্যগুলো প্রামাণ্য দলিল পত্রের উপর ভিত্তি করেই করেছেন, বাহুল্য ভয়ে সে সব রেফারেন্স এখানে দেওয়া হলো না। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠ্য তালিকায় থাকত "কোরান, হাদীস, ধর্মতত্ত্ব, আইনশাস্ত্র ওঅন্যান্য বিষয়াদি।...লোকায়ত সাধারণ বিজ্ঞান, যেমন–যুক্তিবিদ্যা, অঙ্কশাস্ত্র, চিকিৎসাবিদ্যা, রসায়ন, জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যামিতি এবং অন্যান্য বিষয়ও মাদ্রাসায় পড়ান হতো। পাঠ্য-তালিকার কথা বলতে গিয়ে আবুল ফজল লিখেছেন,'প্রত্যেক শিক্ষার্থীরই নীতিশাস্ত্র, গণিত, কৃষি, পরিমাপশাস্ত্র, জ্যামিতি, জ্যোতিষশাস্ত্র, চরিত্র নির্ণয়বিদ্যা ও গার্হস্থ্য বিদ্যা, সরকারী আইন-কানুন, চিকিৎসাবিদ্যা, যুক্তিবিদ্যা, উচ্চতর অঙ্কশাস্ত্র, বিজ্ঞানসমূহ, ইতিহাস ইত্যাদি পাঠ করা উচিত।'... আবুল ফজলের বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, মাধ্যমিক পর্যায়ে পাঠ্যতালিকা বিস্তৃত ও ভারী ছিল।" [২৬]

উচ্চতম শিক্ষা কেন্দ্রের কথা তো আগেই বলা হয়েছে। এবং এই যে শিক্ষার জন্য বিভিন্ন স্তরের শিক্ষাদান ব্যবস্থা, তার পেছনে ছিল সূফী-দরবেশদের প্রত্যক্ষ

---

২৪. ডক্টর এম. এ. রহিম, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, অনুবাদ ঃ মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান, বাংলা একাডেমী, ১৯৮২. পৃ.২০৩-২১৩।

২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৯-২২০।

২৬. প্রাগুক্ত, পৃ .২২১।

প্রভাব। মাদ্রাসার বাইরে উচ্চতম শিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় সদৃশ একাডেমী বা সেমিনারির কথা প্রসঙ্গে ডক্টর মোহাম্মদ মোহর আলী বলেন, "A Part from the Madrasas, and perhaps more important in their scope and influence were the academies or 'seminaries' that grew up at a number of places ... One of the earliest of such centres of learning was organized by Makhdum Shaikh Jalal Tabrizi at Deotala about 15 miles north of Pandua ... Another centre of (higher) education which came into being early in the Muslim period was at Gangarampur, Dinajupur, at the instance of Shaikh Ata who ... was also the leader of a Muslim settlement there ... parallel to and in some ways outshining these was the seminary organized at Pandua by Shaikh Ala-ul-Haq."[২৭]

(৪) সূফী-দরবেশগণ বাংলাদেশের জনসমাজে এমন ব্যাপক ও গভীর প্রভাব বিস্তার করেন যে, জনসাধারণ তাঁদেরকে স্বাভাবিক মানুষের তুলনায় অস্বাভাবিক ও অলৌকিক শক্তির অধিকারী বলে বিশ্বাস করে। জনসাধারণের এই ধারণা দৃঢ়মূল হয় যে, সূফী দরবেশগণের উপর আল্লাহর বিশেষ রহমতের কারণে তাঁদের সব প্রার্থনা ও দোয়া আল্লাহর দরবারে অবশ্যই কবুল হয়, সূফী-দরবেশদের দোয়ার বরকতে মানুষের জীবনে নেমে আসতে পারে কল্যাণ ও উন্নতি। তাঁদের প্রতি জনসাধারণের এই বিশ্বাস এত গভীর ও অন্ধপ্রায় হয়ে দাঁড়ায় যে, সূফী-দরবেশগণ অতিমানব বলে পরিগণিত হতে থাকেন, এবং তারই সুযোগে অনেক তথাকথিত 'সূফী দরবেশ'ও মানুষের কাছে পরম শ্রদ্ধেয় ও মাননীয় বলে গৃহীত হতে থাকে। অন্ধবিশ্বাসের এই চোরাপথে চলে আজও অনেক 'সাজানো সুফী দরবেশ ' জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করে চলছে। তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, প্রকৃত সূফী-দরবেশদের অর্জিত ফসলে ভাগ বসিয়েছে নকল 'সূফীদরবেশ'রাও।

কিন্তু এই ফসল যাঁরা অর্জন করেছিলেন, তাঁরা ছিলেন প্রকৃতই সর্বত্যাগী রাহে লিল্লাহ্‌র পথিক। দীন-দরিদ্রের ন্যায় সরল সহজ ও কঠোর সাধনার জীবন যাপন করতেন তাঁরা। সাধনার পথে নিজেদের অহঙ্কারকে চিরতরে নস্যাৎ করার লক্ষ্যে মুর্শিদের নির্দেশ তাঁরা নীচু বলে স্বীকৃত কাজও সন্তুষ্ট চিত্তে উৎসাহের সঙ্গে সম্পাদন করতেন। সূফী শেখ জালাল-উদ-দীন তবরেজী শিক্ষার্থী হিসাবে তাঁর মুর্শিদ শেখ শিহাব-উদ-দীন সোহরাওয়ার্দীর জন্য এবং শেখ আলাউল হক তাঁর মুর্শিদ শেখ আখী সিরাজ-উদ-দীন উসমানের জন্য খাদ্যসহ উত্তপ্ত চুলা সর্বদা মাথায় নিয়ে চলতেন; শেখ নূর কুতুব আলম তাঁর মুর্শিদ পিতা শেখ আলাউল হকের নির্দেশে জঙ্গল থেকে

২৭. Dr Muhammad Mohar Ali, History of the Muslims of Bengal, Vol. IB, Imam Muhammad Ibn Sa'ud, Islamic University, Riyadh, 1985, Pp. 832-836.

জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করেছেন, এমনকি খানকায় মেথরের কাজও সম্পন্ন করেছেন। অথচ খান্দানী বৈভব ও বিত্তপ্রতিপত্তিতে তাঁদের পরিবার ছিল রাজধানীতে ও আশেপাশে খুবই সম্ভ্রান্ত। এমনি কঠোর জীবনযাত্রা, সুদৃঢ় চরিত্রবল ও স্নেহপ্রবণ আন্তরিক দরদ নিয়ে তাঁরা মানুষের হৃদয় জয় করতেন। এদের কাছেই মানুষ পেত জীবনপথে চলার প্রয়োজনীয় নির্দেশ-উপদেশ, পেত ক্ষুধার অন্ন, রোগের প্রতিকার, শোক-দুঃখের সান্ত্বনা ও নিরাশার আশা। বাংলায় ইসলাম প্রচারিত হয়েছিল এই সূফী-দরবেশগণের দ্বারাই, দেশ বিজয়ীদের তরবারির জোরে নয়। তাই তো তাঁরা মরেও অমর, তাঁদের মাযার যুগ-যুগান্তর পেরিয়েও মানুষের যিকিরে-মোনাজাতে মুখর।

সূফী-দরবেশদের আগমনকালে বাংলার সর্বত্র ছিল উৎকট তান্ত্রিক গুরুবাদের বিশেষ প্রভাব। সুরাপায়ী তান্ত্রিকতাবাদের বীভৎস নরবলির ভয়ে যখন সমগ্র বাংলা আতঙ্কিত, তান্ত্রিকদের মারণ-উচাটন-বশীকরণের জ্বালায় বাংলার জনসমাজ দিশাহারা যখন, তখনই বাংলায় প্রবাহিত হয় মানবতাবাদী সূফী-দরবেশগণের প্রচারিত ইসলামের অমিয় ধারা। মানব সেবার ব্রত নিয়ে সূফী-দরবেশগণ দাঁড়ান এসে পতিত ও লাঞ্ছিত মানুষের পাশে। ধ্বনিত হয় ইসলামের আহবান ঃ আল্লাহু আকবর; আল্লাহ ছাড়া উপাস্য নেই কেউ, নবীজি মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র রাসূল... । সিরাতুল মুস্তাকীম স্পষ্ট হয়ে ওঠে পথভ্রান্ত মানুষের কাছে। মাথা উঁচু করে দাঁড়ায় পতিত লাঞ্ছিত মানুষের কাফেলা। তান্ত্রিকদের তন্ত্র-মন্ত্র নিস্ফল হয়ে যায়। সূফী-দরবেশদের নিকট পরাজিত হয়ে তান্ত্রিকেরা হয় ইসলাম গ্রহণ করে অথবা পলায়নে বাধ্য হয়। গুরুর পরাজয়ে স্থানীয় লোকজন দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে। এভাবে সুগম হয় ইসলাম প্রচারের পথ। দিন যায়। শতাব্দীর পর শতাব্দী পার হয়ে আসে যখন ষোল শতক, প্রচারে প্রসারে যখন সারা বাংলায় তৌহীদের ঘোষণা নিয়ে ইসলামের জোয়ার বেগবান, তখনই হিন্দু সমাজে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব। স্বীয় সমাজকে বিলুপ্তির পথ থেকে রক্ষা করতে তিনি প্রচার করলেন এক নতুন মতবাদ... শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণববাদ। এই মতবাদে জাতিভেদ নেই, আছে সাম্য-মৈত্রী-উদারতা-প্রেম ও কৃষ্ণনামের দলগত কীর্তন। এ যেন হিন্দুধর্মের এক জাতীয় সূফীবাদ! বস্তুত, এই মতবাদ প্রচার করে শ্রীচৈতন্য ইসলামী স্রোতবেগ থেকে হিন্দু ধর্ম ও সমাজকে অনেকটাই রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। ততদিনে অবিশ্যি বাংলায় মুসলিম সমাজ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। আর তা হয়েছে সূফী-দরবেশগণের অক্লান্ত কর্তব্য পালনের পরিণামেই। বাংলাদেশ বিশেষ করে মুসলিম বাংলা তাই সূফী-দরবেশদের বাংলা।

সংযুক্তি

রাজা গণেশ ও নূর কুতুব আলম সমাচার

“বাংলাদেশের ‘মধ্য’ যুগের ইতিহাসে যাঁদের নাম ভাস্বর অক্ষরে লেখা রয়েছে, রাজা গণেশ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। একক কৃতিত্বের দিক দিয়ে গণেশের সঙ্গে খুব কম লোকেরই তুলনা চলতে পারে। ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলা ছিল মুসলমানদের অধিকারে। এর মধ্যে কোন কোন সময় অঞ্চল বিশেষে হিন্দুদের প্রাধান্য স্থাপিত হয়েছে বটে, কিন্তু সমগ্র বাংলার সিংহাসন অধিকার এই একটিমাত্র হিন্দুর পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে গণেশ বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গের মত আবির্ভূত হয়ে অসাধ্য সাধন করেছিলেন, প্রবল বিরুদ্ধ শক্তির বাধাকে জয় করে বাংলায় হিন্দু রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। গণেশের কীর্তির অসামান্যতা সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মধ্যে দ্বিমত নেই।

অবশ্য এই হিন্দু অভ্যুদয় বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। গণেশের বংশধররা পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে ধর্মান্তর গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও তাঁরা বাংলার সিংহাসন বেশিদিন নিজেদের অধিকারে রাখতে পারেন নি। কিন্তু স্বল্পস্থায়ী হলেও গণেশ ও তাঁর বংশের রাজত্ব বাংলার ইতিহাসের এক অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অধ্যায়।”[১]

রাজা গণেশ ছিলেন বর্তমান রাজশাহী জেলার অন্তর্গত ‘ভাতুড়িয়া’ নামক এক বিস্তৃত অঞ্চলের জমিদার এবং ইলিয়াস শাহী বংশের সুলতান গিয়াস-উদ্-দীন আজম শাহ্‌র অন্যতম আমীর।

এই বক্ষ্যমাণ সমাচারে ঘটনাগুলো হিন্দু ও মুসলমান সংক্রান্ত বলে ওই আমলের অথরিটি বলে স্বীকৃত ঐতিহাসিকদের বক্তব্য ও মন্তব্যের উদ্ধৃতির উপর নির্ভর করেই আমরা এগুতে চাই।

“সমগ্র বাংলার অধীশ্বর হবার পরেও গিয়াসুদ্দীন কয়েকবার বিভিন্ন শক্তির সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন এবং তারও ফল ভাল হয়নি। বুকাননের বিবরণী মতে গিয়াসুদ্দীন শাহাব খান নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে দীর্ঘকাল ধরে যুদ্ধ করেন, কিন্তু সাফল্য লাভ

---

১. শ্রী সুখময় মুখোপাধ্যায়, বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর ঃ স্বাধীন সুলতানদের আমল. তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৮০, পৃ. ৯৮।

করতে পারেন নি। এই জাতীয় দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ ও অসাফল্যের ফলে যে কোন রাজারই শক্তি হ্রাস পেতে বাধ্য। ... বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায় যে, গিয়াসুদ্দীন কামতা ও কামরূপ রাজ্যে অভিযান করেছিলেন।

এই সমস্ত বিবরণ পড়লে মনে হয়, গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের সামরিক অভিযানগুলির একটা বড় অংশই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল এবং অনেক শক্তি ক্ষয়ের পর কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি মাত্র আংশিক সাফল্য অর্জন করেছিলেন।

সমসাময়িক কবি বিদ্যাপতির বিভিন্ন গ্রন্থ পড়লে মনে হয়, তাঁর পৃষ্ঠপোষক (মিথিলার) রাজা শিবসিংহ গিয়াসুদ্দীন আজম শাহকে যুদ্ধে পরাজিত করেছিলেন। .... ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতি শিবসিংহের কাছে যদি গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ্ পরাজিত হয়ে থাকেন, তাহলে বলতে হবে ঐ সময়ে তাঁর সামরিক শক্তি একেবারে দৈন্যদশায় এসে পৌঁছেছিল। এর আগেকার দীর্ঘবিলম্বিত এবং অনেকাংশে ব্যর্থ সমর প্রচেষ্টাগুলিই বোধ হয় এর প্রধান কারণ। শিবসিংহের সঙ্গে রাজা গণেশের বন্ধুত্ব ছিল; গণেশের অভ্যুত্থানে সাহায্য করার জন্য সম্ভবত শিবসিংহ গৌড়েশ্বরের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন।...

ইলিয়াস শাহী বংশের সুলতানেরা যুদ্ধ-বিগ্রহ ও শাসনকার্যের ব্যাপারে কেবলমাত্র মুসলমানদের উপরই নির্ভর করতেন না, হিন্দুদেরও সাহায্য নিতেন। দিল্লীর পরাক্রান্ত সম্রাট ফিরোজ শাহ তোগলকের আক্রমণকে প্রতিহত করে শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ যে নিজের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখতে পেরেছিলেন, এর পিছনে হিন্দুদের সাহায্য একটা বড় উপাদান যুগিয়েছিল। একডালার রণক্ষেত্রে ফিরোজ শাহের বিরুদ্ধে ইলিয়াস শাহের শক্তির প্রধান স্তম্ভ ছিল হিন্দু পাইক-বাহিনী এবং তাদের নেতা সহদেব। অনুমান করতে পারি ইলিয়াস শাহের পুত্র সিকন্দর শাহের রাজত্বকালেও হিন্দুদের প্রাধান্য হ্রাস পায়নি। সিকন্দরের পুত্র গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ্ রাজত্বকালের অন্তত প্রথমার্ধ পর্যন্ত যে হিন্দুরা বহু উচ্চ সরকারী পদে অধিষ্ঠিত ছিল তা আমরা জানতে পারি গিয়াসুদ্দীনকে লেখা মুজাফ্ফর শাম্‌স্ বলখির একটি চিঠি (Proceedings , Ind. Hist. Cong. 1956, pp. 215-216 দ্রষ্টব্য) থেকে। ... এই চিঠিতেই বল্‌খি গিয়াসুদ্দীনকে লিখেছেন ঃ

মহান আল্লাহ্ বলিয়াছেন, বিশ্বাসীগণ! তোমাদের শ্রেণীর বাহিরের কাহারও সঙ্গে মিত্রতা করিও না। তফসীর এবং অভিযানে বলা হইয়াছে যে বিশ্বাসীরা অবিশ্বাসী এবং অপরিচিত লোকদিগকে কর্মচারী বা উজীর নিযুক্ত করিবে না। যদি তাহারা (বিশ্বাসীরা) বলে যে, তাহারা অবিশ্বাসীদিগকে বন্ধু বা প্রিয়জন বানাইতেছে না, বরং সুবিধার খাতিরে এইরূপ করিতেছে, তাহা হইলে উত্তর এই যে, ইহাতে সুবিধা হয় না, বরং

বিদ্রোহ এবং গোলযোগ হয়। আল্লাহ বলিয়াছেন যে, তাহারা (অবিশ্বাসীরা) তোমাকে বিপথে চালিত করিতে ব্যর্থ হইবে না এবং তাহারা তোমার কাজে গোলযোগ সৃষ্টি করিতে ইতস্তত করিবে না। অতএব আল্লার আদেশ পালন করা এবং আমাদের ক্ষুদ্র বিচার শক্তিকে ত্যাগ করাই আমাদের উচিত। ... বিধর্মীদের সামান্য কাজে নিয়োগ করা যায়, কিন্তু তাহাদের ওয়ালি (শাসনকর্তা বা গভর্নর) নিযুক্ত করা উচিত নয়, কারণ তাহা হইলে তাহারা মুসলমানদের উপর কর্তৃত্ব করিবে। আল্লাহ বলিয়াছেন যে, আল্লাহকে উপেক্ষা করিয়া বিধর্মীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা উচিত নয়। যদি কেহ তাহা করে সে আল্লাহর নিকট হইতে সাহায্য লাভ করিবে না।– শুধু বিধর্মীদের হাত হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য সতর্কবাণীই পাইবে। যাহারা মুসলমানদের উপর বিধর্মীদের কর্তৃত্ব প্রদান করে তাহাদের বিরুদ্ধে কোরাণ, হাদীস এবং ইতিহাস গ্রন্থগুলিতে অনেক সতর্কবাণী রহিয়াছে। আল্লাহ অপ্রত্যাশিত স্থান হইতে সাহায্য দেন এবং তিনিই মুক্তি দেন। খাদ্য, জয় এবং অর্থ দান করিতে তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। পরাজিত বিধর্মীরা নতমস্তকে তাহাদের নিজ এলাকায় কর্তৃত্ব করে এবং শাসন করে। কিন্তু তাহারা ইসলামের আয়ত্তাধীন দেশগুলিতেও উচ্চপদে নিযুক্ত হইয়াছে এবং মুসলমানদের উপর কর্তৃত্ব করিতেছে। এইরূপ হওয়া উচিত নয়।'* ....

এই চিঠিখানি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর থেকে দুটি বিষয় খুবই পরিষ্কার ভাবে জানা যাচ্ছে।

(১) অন্তত ৮০০ হিজরা পর্যন্ত গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের রাজ্যে বহু হিন্দু উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং অনেক মুসলমান ঐসব হিন্দুর অধীনে কাজ করতেন।

(২) বিধর্মী বিদ্বেষী মুজাফ্ফর শামস্ বল্খী অমুসলমানদের উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত করা পছন্দ করেন নি এবং গিয়াসুদ্দীনকে এই নীতি পরিত্যাগ করতে উপদেশ দিয়েছিলেন।...

অধ্যাপক সৈয়দ হাসান আসকারী বল্খির মতকে সমর্থন করে লিখেছেন, In view of what happened shortly after to the Ilyas Shahi dynasty at the hands of the Hindu Minister, Raja Kans or Ganesh, the warning given by the saint of Bihar to Ghayasuddin Azam Shah appears to be rather prophetic. (Proceedings Ind Hist. Cong. 1956, p. 216)...

---

* এই পত্রটির বাংলা অনুবাদ শ্রী সুখময় মুখোপাধ্যায় এবং ডক্টর আবদুল করিম (বাংলার ইতিহাস, সুলতানী আমল, বাংলা একাডেমী ১৯৭৭, পৃ. ২৪১-২৪২) উভয়েই করেছেন। ইসলামী শব্দ ব্যবহারের যাথার্থ্যের জন্য আমরা ডক্টর আবদুল করিমের অনুবাদটিই উদ্ধৃত করলাম।

গিয়াসুদ্দীন যে বল্খির উপদেশ সত্যই শুনেছিলেন, তার প্রমাণ আছে। ....আমাদের মনে হয়, গিয়াসুদ্দীনের এই ধর্মান্ধতা ও অদূরদর্শী নীতির ফলেই রাজা গণেশ, যাঁর অপরিমিত সামরিক শক্তি ছিল** এবং যিনি ইলিয়াস শাহী বংশীয় সুলতানদের মিত্র ও সেবক ছিলেন, তিনি এখন তাঁদেরই বিপক্ষে গেলেন এবং গিয়াসুদ্দীনকে চক্রান্ত করে হত্যা করিয়ে তাঁর বংশকে উচ্ছেদ করে নিজে ক্ষমতা অধিকার করলেন। রাজা গণেশের অভ্যুত্থান কেবলমাত্র তাঁর ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাষের দরুন ঘটে নি। হিন্দুদের সম্বন্ধে গিয়াসুদ্দীন যে ভ্রান্ত নীতি অনুসরণ করেছিলেন, সেই নীতিই এজন্য দায়ী।"[২] এ সম্পর্কে ডক্টর আবদুল করিমও অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন। তিনিও বলেন, "মুসলমান সুফীরা মুসলমান রাজ্যে হিন্দুদের উচ্চপদে নিযুক্তির বিরোধী ছিলেন... সুলতান শামস-উদ-দীন ইলিয়াস শাহের সময়ে হিন্দুরা উচ্চপদ লাভ করিতে থাকে। হিন্দু সৈনিক ও সেনাপতিরা মুসলমানদের সঙ্গে মিলিতভাবে দিল্লীর সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধও করে। মনে হয় ইলিয়াস শাহী আমলে এই নিয়ম চলিতে থাকে এবং আজম শাহের সময়েও হিন্দুরা উচ্চপদ এমনকি উজীর পদেও নিযুক্ত হয়। রাজা গণেশের নাম উল্লেখযোগ্য; তিনি আজম শাহের সময়ে উচ্চপদ লাভ করেন। আজম শাহ্ মুজফ্ফর শাম্স্ বল্খীর উপদেশ গ্রহণ করেন কিনা বলা যায় না। তবে পরবর্তী ঘটনাবলীতে দেখা যায় যে, মওলানা সাহেবের উক্তি যথার্থ। কিন্তু উচ্চপদস্থ কর্মচারীরাই ইলিয়াস শাহী বংশ নিধন করেন এবং গণেশ এই ব্যাপারে নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ... গিয়াস-উদ-দীন আজম শাহের মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র সাইফ-উদ-দীন হামজা শাহ্ সিংহাসনে আরোহণ করেন। ... তিনি মোট দুই বৎসরের মত রাজত্ব করেন। ..... কারণ গণেশের চক্রান্তে সুলতানের ক্রীতদাস শিহাব-উদ-দীন তাঁহাকে হত্যা করেন এবং নিজে সিংহাসনে আরোহণ করেন।.... আসলে বাংলা দেশের কর্তৃত্ব তখন গণেশের হাতে চলিয়া যায় এবং গণেশই শিহাব-উদ-দীনকে শিখণ্ডী খাড়া করিয়া দেশ শাসন করিতে থাকেন। (শিহাব-উদ-দীন পরিচিত হন সুলতান শিহাব-উদ-দীন বায়েজীদ শাহ্ নামে–লেখক) ... সম্ভবত রাজা হওয়ার পরে বায়েজীদ গণেশের প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া সর্বময় কর্তৃত্ব লাভের চেষ্টা করেন। তাই গণেশ তাঁহাকে হত্যা করেন। ... গণেশ বায়েজীদেকে হত্যা করার পরে

** ইলিয়াস শাহী বংশের রাজত্বকালের প্রথম থেকেই বাংলায় হিন্দু জমিদারগণ ছিল শক্তিশালী। এই যুগের হিন্দু জমিদারদের মধ্যে গণেশ বংশও ছিল বিপুল শক্তির অধিকারী। অন্যদিকে, নানা অপ্রয়োজনীয় যুদ্ধে গিয়াস-উদ-দীন আজম শাহ্র শক্তি অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছিল। ফলে আজম শাহ্র আমীর জমিদার গণেশের শক্তি তুলনায় 'অপরিমিত' ই ছিল বলা যায়।

২. শ্রী সুখময় মুখোপাধ্যায়, বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর ঃ স্বাধীন সুলতানদের আমল, তৃতীয় সংস্করণ ১৯৮১, পৃ. ৭৭-৮৪।

আলা-উদ-দীন ফিরোজ শাহ কোনক্রমে ফিরোজাবাদে পলাইয়া সৈন্যদের সহায়তায় পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গে স্বীয় কর্তৃত্ব স্থাপনের চেষ্টা করেন। (ডক্টর আবদুল করিম আলা-উদ-দীন ফিরূজ শাহ্ কর্তৃক উৎকীর্ণ মুদ্রার উল্লেখ অনুসারে এই সুলতান বায়েজীদ শাহ্র পুত্র বলে মনে করেন; কিন্তু শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায় এই সুলতানকে সাইফ-উদ-দীন হামজা শাহ্র পুত্র বলে দাবি করেন। –লেখক) কিন্তু গণেশ নিশ্চয়ই তাঁহাকে আক্রমণ করেন এবং পরাস্ত করিয়া হত্যা করেন। তাই তাঁহার রাজত্বও অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী হয়। ফলে গণেশের চক্রান্তে ইলিয়াস শাহী বংশের পতন হয়।”[৩]

এইবার গণেশ নিজেই বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু “গণেশ নিজে সিংহাসনে বসাতে রাজনৈতিক দলাদলিতে মগ্ন মুসলমান আমীর অমাত্যরা তাহাদের ভুল বুঝিতে পারিল, তাহারা দলাদলি করিতেছিল যুবরাজের পক্ষে বা বিপক্ষে, যাহাতে তাহাদের মনোনীত যুবরাজ সিংহাসনে বসিলে তাহাদের বৈষয়িক উপকার হয় বা রাজনৈতিক প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। তাহারা নিশ্চয়ই গণেশকে সিংহাসনে বসাইবার জন্য দলাদলি করে নাই। পঞ্চদশ শতাব্দীতে এইরূপ ধর্মনিরপেক্ষ দলাদলি আশা করা যায় না। কিন্তু গণেশের বিরোধিতা করার মত ক্ষমতা তখন তাহাদের নাই। কিন্তু নেতৃত্ব আসিল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে। রাজনীতিতে যাঁহার কোন আসক্তি ছিল না। যিনি পার্থিব ভোগবিলাসে বিমুখ, সেই জ্ঞানবৃদ্ধ দরবেশ নূর কুতব আলম যখন দেখিলেন যে, দেশের মুসলমান আমীর-ওমরাহরা হতবল, তখন তিনি পার্শ্ববর্তী স্বাধীন রাজ্য জৌনপুরের সুলতান ইবরাহীম শর্কীকে বাংলা দেশ আক্রমণের আমন্ত্রণ জানাইলেন। গণেশ কর্তৃক মুসলমানদের উৎপীড়ন বিশেষ করিয়া মুসলমান দরবেশদের উপর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া তিনি রাজনৈতিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিলেন। ইবরাহীম শর্কী বাংলা দেশ আক্রমণ করেন। এই সংবাদ পাইয়া গণেশ ভীত হইয়া পড়েন এবং নিজের ছেলেকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করিয়া তাহার হাতে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া তিনি নূর কুতব আলমের সঙ্গে সমঝোতা করিয়া ফেলেন। রাজনীতিবিদ গণেশ যে চাতুরী করিলেন, তাহা নূর কুতব আলম বুঝিতে পারিলেন না। তিনি সরলভাবে যদুকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন এবং একজন মুসলমানকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত দেখিয়া তিনি ইবরাহীম শর্কীকে ফিরিয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু ইবরাহীম শর্কী ফিরিয়া গেলে নূর কুতব আলম দেখিলেন যে, যদিও একজন মুসলমান সিংহাসনে অধিষ্ঠিত, সমস্ত ক্ষমতা গণেশের হাতেই এবং

৩. ডক্টর আবদুল করিম, বাংলার ইতিহাস, সুলতানী আমল, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭, পৃ. ২৪২-২৫০।

মুসলমানদের উপর অত্যাচারও পূর্বের মতই চলিতেছে। পূর্বে উদ্ধৃত নূর কুতব আলমের চিঠি (এ চিঠি কিছু পরে উদ্ধৃত করছি –লেখক) এই জন্যই হতাশাব্যঞ্জক।"[৪]

সিংহাসনে বসে মুসলমানদের উপর কি অত্যাচার করেছিলেন রাজা গণেশ ? পাণ্ডুয়া অঞ্চলে প্রচলিত একটি পুরনো প্রবাদ আছে। "প্রবাদটি এই যে, রাজা গণেশ ক্ষমতা লাভের পরে আদিনা মসজিদকে তাঁর কাছারি বাড়ীতে পরিণত করেছিলেন। এ সম্বন্ধে এইচ.এস. স্টেপলটন লিখেছিলেন, "It may also be added with reference to the supposed connection of Raja Kans with the Eklakhi building that local tradition states that when the Raja obtained supreme power over Bengal after the death of the short-lived successors of Ghyasuddin out of contempt for Muhammadanism he used the adjacent Adina mosque as his Kacheri (Magistrate's Court or Zamindari Office).' (Memoirs of Gaur and Pandua, p. 196).

এই প্রবাদ সত্য হওয়া অসম্ভব নয় । এই প্রবাদ যদি সত্য হয় তাহলে এমন হতে পারে যে, আদিনা মসজিদ যখন প্রথম নির্মিত হয়, তখন তাতে কোন হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি ছিল না; রাজা গণেশ যখন ক্ষমতালাভ করে আদিনা মসজিদকে কাছারিতে পরিণত করেছিলেন, সেই সময়ে তাঁরই আদেশে হয়তো এই মসজিদের মধ্যে দেবদেবীর মূর্তিগুলি খোদাই করা হয়েছিল।"[৫]

শ্রী সুখময় মুখোপাধ্যায় ও ডক্টর আবদুল করিম উভয়েই 'রিয়াজ' ও বুকাননের বিবরণী মতে বলেন ঃ[৬] সিংহাসনে বসেই রাজা গণেশ মুসলমানদের বিশেষ করে মুসলমান দরবেশদের ধ্বংস সাধনে তৎপর হয়ে ওঠেন, এবং "তাহাদের জ্ঞানী এবং ধর্মভক্তদের অনেককে হত্যা করেন। তাঁহার রাজ্য হইতে ইসলামকে সমূলে উৎপাটিত করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। কথিত আছে যে, শায়খ মুঈন-উদ-দীন আব্বাসের পিতা শায়খ বদর-উল-ইসলাম অভিবাদন না করিয়াই" রাজা গণেশের সামনে বসেন। রাজা গণেশ এমনটি করার কারণ জিজ্ঞেস করায় শেখ বদর-উল-ইসলাম বলেন, 'বিধর্মীকে অভিবাদন করা জ্ঞানীদের পক্ষে শোভনীয় নয়। বিশেষ করিয়া তোমার মত নিষ্ঠুর এবং রক্ত -পিপাসু বিধর্মী যে মুসলমানদের রক্তপাত করিয়াছে। (ডক্টর আবদুল করিমের উদ্ধৃতি) "গণেশ সেদিনকার মত তাঁকে কিছু বলেন না, কিন্তু আরও একদিন

---

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫-১৮৬।

৫. শ্রী সুখময় মুখোপাধ্যায়, বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর ঃ স্বাধীন সুলতানদের আমল, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৮০, পৃ. ৫১-৫১।

৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮; এবং ডক্টর আবদুল করিম, বাংলার ইতিহাস ইত্যাদি, পৃ. ২৫১-২৫২।

বদর-উল-ইসলাম তাঁকে অপমান করাতে তিনি তাঁকে হত্যা করেন। সেইদিনেই পাণ্ডুয়ার অন্যান্য দরবেশ এবং উলেমাকে তাঁর আদেশে জলে ডুবিয়ে বধ করা হয়।"[৭]

এমনি যখন পরিস্থিতি, তখন নূর কুতব আলম জৌনপুরের সুলতানকে চিঠি লেখেন। জৌনপুরের সুলতান নূর কুতব আলমের আকুল আহ্বান এবং জৌনপুরের প্রসিদ্ধ সূফী মীর সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানীর উৎসাহপূর্ণ উপদেশে বাংলার পথে ছুটে আসেন। কিন্তু বাংলায় আসার পথে মিথিলার শিবসিংহের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ বাঁধে। তাতে শিবসিংহ ভীষণভাবে পরাজিত হন। "গণেশের মত শিবসিংহও মুসলমানদের প্রাধান্য হ্রাস করে হিন্দু অভ্যুদয় ঘটাবার চেষ্টা করেছিলেন। ... সম্ভবত ত্রিহুতের দরবেশরা নূর কুতুব্ আলম প্রমুখের পক্ষ নিয়েছিলেন বলে গণেশের অনুরোধে শিবসিংহ তাঁদের দমন করেছিলেন। ... পূর্ব ভারতের দুই স্বাধীনচেতা হিন্দু রাজা মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন এবং গণেশের বিপদে সাহায্য করতে শিবসিংহ নিজে চরম বিপদ বরণ করেছিলেন। সমসাময়িক ইতিহাসে এই ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যাপার।"[৮]

এর পরের ঘটনা পুত্র যদুকে মুসলমান বানিয়ে তাঁর সপক্ষে রাজা গণেশের সিংহাসন ত্যাগ। তাতে আপাতভাবে এবং আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, সূফী নূর কুতব আলমের অভিপ্রায় সিদ্ধ হয়। এখানে খানিকটা বিচার-বিবেচনার প্রয়োজন আছে। শ্রী সুখময় মুখোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন যে, "রাজা গণেশের অভ্যুত্থান কেবল মাত্র তাঁর ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাষের দরুন ঘটে নি, তাঁর লক্ষ্য ছিল বাংলা থেকে মুসলিম শক্তির ধ্বংস সাধন করে হিন্দু রাষ্ট্রগুলির পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং অতি অল্পকালের জন্য হলেও "ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার সময় গণেশ সর্বপ্রকারে হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু সংস্কৃতির পুনরভ্যুদয় ঘটিয়েছিলেন।"[৯]

আর এই পরিকল্পনার মোকাবিলায় বাংলার মুসলিম আমীর-ওমরাহরা যখন হতবল তখন তৎকালীন বাংলার সূফীকুলের নেতা নূর কুতব আলমকেই এগিয়ে আসতে হয়েছিল। যিনি ছিলেন 'রফীক আল-আরেফীন' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত শিষ্যদের প্রতি সূফী শেখ হুসাম-উদ-দীন মানিকপুরীর উক্তি অনুসারে "ধর্মজগতের রাজা।"[১০]

বাংলায় সূফী দরবেশদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাষ্ট্রীয় প্রভাব সম্পর্কে ডক্টর এম. এ. রহিম বলেন. " মুসলমান শাসনামলে বাংলা ছিল সূফী অধ্যুষিত দেশ। এই

৭. শ্রী সুখময় মুখোপাধ্যায়, বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর ঃ স্বাধীন সুলতানদের আমল, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৮০, পৃ. ১০৮।

৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪-১১৫।

৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪ এবং ১৪২।

১০. প্রাগুক্ত -উদ্ধৃত , পৃ. ৬৬।

সূফীরা প্রদেশে মুসলিম সম্প্রদায়ের তরক্কীর জন্যে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে গেছেন। কি ইসলাম বিস্তারে, কি মুসলমান শাসন সম্প্রসারণ ও সংহতি বিধানে, কি শিক্ষা সংস্কৃতি ও সাধারণভাবে বাঙ্গালী অধিবাসীদের, বিশেষ করে মুসলমানদের মানসিক ও নৈতিক উন্নতি-উৎকর্ষ বিধানে সুফীদের কৃতিত্ব ছিল– মুসলিম সেনাপতি, বিজেতা ও শাসকবর্গ অপেক্ষা অনেক বেশী স্থায়ী ও কার্যকর।"[১১] প্রকৃত প্রস্তাবে, বাংলার মুসলিম রাষ্ট্র ও সমাজ তরণীর অগ্রগমনে সুফী-দরবেশগণই ছিলেন সেই তরণীর হাল ধারণকারী নিয়ামক শক্তি। বাংলায় তখন এই শক্তিরই প্রধান পুরুষ ও নেতা ছিলেন হযরত নূর কুতব আলম। ভোগবিলাস-বিরোধী সর্বত্যাগী দরবেশ হওয়া ছাড়া তিনি ছিলেন রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রভাবশালী এক পরিবারের সন্তান । দরবেশদের প্রাচীন জীবনী-গ্রন্থ 'আখবার -অল-আখিয়ার'-এর লেখা উল্লেখ করে শ্রী সুখময় মুখোপাধ্যায় বলেন, "নূর কুৎব্ আলমের ভ্রাতা আজম খান সুলতানের উজীর ছিলেন। আজম খান নূর কুৎব্ আলমকে রাজদরবারে একটি উচ্চপদ দিতে চান, কিন্তু নূর কুৎব্ প্রত্যাখ্যান করেন।"[১২] এই মহাপুরুষই রাজা গণেশের পরিকল্পনার মোকাবিলায় দাঁড়িয়েছিলেন। স্পষ্টতই, আলোচ্য রাজশক্তির এমনি পরিবর্তনটা কোন একজন রাজপুরুষের পরিবর্তন-প্রয়াস ছিল না। ছিল মুসলিম রাজশক্তির ধ্বংস সাধন করে হিন্দু রাজশক্তির পুনরুত্থানের পরিকল্পনা। এবং এই পরিকল্পনা যখন কার্যকরী করে রাজা গণেশ বাংলা থেকে মুসলিম রাজ্যটির হাল ধারণকারী সেই নিয়ামক শক্তির ধ্বংস সাধনে অগ্রসরমান, তখন উপায়ান্তর না দেখে নূর কুতব আলম বাংলার মুসলিম সমাজকে রক্ষা করার আবেদন জানিয়ে জৌনপুরের সুলতানকে বাংলা আক্রমণের অনুরোধ জানালেন। তদনুযায়ী সুলতান ইবরাহীম শর্কী বাংলায় এলেন এবং পুত্রের ধর্মান্তরণ ও মস্‌নদ আরোহণের মাধ্যমে পিতা রাজা গণেশ যুদ্ধ সমস্যার সমাধান করলেন। কিন্তু সমস্যার এই সমাধানটা রাজা গণেশ কার সঙ্গে করলেন, এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। ডক্টর আবদুল করিমের 'রিয়াজ' ভিত্তিক উদ্ধৃতিতে বলা হয়েছে যে, রাজা গণেশ সুফী-দরবেশ নূর কুতব আলমের সঙ্গেই সমস্যাটার নিষ্পত্তি করে ফেলেন। এবং সুলতান ইবরাহীম শর্কী হয়তো কিছুটা অসন্তুষ্ট হয়েই জৌনপুরে ফিরে গেলেন। কিন্তু শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায় বলছেন অন্যরকম কথা । এবং সে-কথা নূর কুতব আলমের লেখা একটা চিঠিকে ভিত্তি করেই বলা। এই চিঠিটি এখানে উদ্ধৃত করা

১১. ডক্টর এম. এ. রহিম, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, অনুবাদ ঃ মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান, বাংলা একাডেমী, ১৯৮২. পৃ. ৮৯।

১২. শ্রী সুখময় মুখোপাধ্যায়, বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর ঃ স্বাধীন সুলতানদের আমল, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৮০, পৃ. ৬৬।

হলো। (বাংলা অনুবাদটি শ্রী সুখময় মুখোপাধ্যায়ের । আমরা শুধু মাত্র 'ঈশ্বর' ও 'ভগবানের' স্থলে 'আল্লাহ' শব্দটি বসিয়েছি। -লেখক)

"কোন প্রিয়জন পাণ্ডুয়া থেকে চলে যাবার পর তাকে লেখা।

"(কবিতা)

আমি যদি এই কাহিনী বলি, কী করে সুস্থ লোকেরা
জানবে আহত হৃদয়সমূহে আছে কী ব্যথারাশি।

"এই বেচারা অসহায় দীন নূর—সময়ের দুর্ভাগ্যের দ্বারা যন্ত্রণাপ্রাপ্ত, পৃথিবী সম্বন্ধে সম্পূর্ণ আগ্রহবান, কিন্তু দুঃখ-দুর্দশায় পীড়িত, নিজের সত্তা ও অস্তিত্বের বেদনার জন্য অস্থির ও বিহবল, আল্লাহকে সেবা ও উপাসনা করা থেকে বিরত, আধ্যাত্মিক জগতের প্রভুদের সেবা করতে অক্ষম হওয়ার দরুন নতমস্তক–আশীর্বাদ জানাচ্ছে এবং প্রতি মুহূর্তেই আমার সেই রাজার (আল্লাহ্‌র) কথা স্মরণ করছে। কিন্তু এই সময়ে মন এত খারাপ এবং বিষাদের ভার এত গুরু যে আমি—দীন ব্যক্তি—অত্যন্ত বিব্রত ও বিচলিত বোধ করছি।

"(কবিতা)

নিজের অস্তিত্বের বেদনা আমাকে এত বিকল করে ফেলেছে যে,
পৃথিবীর সঙ্গে সব সম্পর্ক আমি ছিন্ন করেছি।
তিনি (আল্লাহ্‌) যেন আমার দোষত্রুটির তালিকার উপর কলম চালিয়ে দেন
(মার্জনা করেন)।

হে পিতার হৃদয় (অর্থাৎ প্রিয় পুত্র)। কী অদ্ভুত ব্যাপার এবং কী বিস্ময়কর সময়—যার সন্নিহিত হওয়া যায় না এবং যা নড়ানো যায় না, সেই আল্লাহ্‌র নদীতে এক বিক্ষোভ এসেছে এবং হাজার হাজার ধার্মিকশ্রেষ্ঠ ও পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ এবং দরবেশ ও ভক্ত ৪০০ বছরের জমিদার একজন বিধর্মীর অধীনস্থ হয়েছে, যে সনদের আবরণের মধ্যে তথ্যকে গোপন করেছে এবং প্রকৃত পথনির্দেশের (ধর্মের) সমস্ত ফলই চলে গেছে। আল্লাহ্‌র ভিত্তিই (মানুষই আল্লাহ্‌র ভিত্তি) ধ্বংস হয়েছে।

"(কবিতা)

তাঁর ত্রুটিতে বিচারকার্য সম্পাদনে গোলমাল হল,
চিরকাল তিনিই দোষের ভাজন হয়ে থাকবেন।

পার্থিব সম্পদের প্রতি তাঁর লোভের জন্য তিনি (শরিয়ৎ অনুসারে) বিচারকার্য সম্পাদন করতে প্রস্তুত হলেন না এবং আদেশ ও নিষেধ (অর্থাৎ রাজ্যের কর্তৃত্ব) একজন বিধর্মীর নিয়ন্ত্রণে যেতে দিলেন। নিজে নিলেন প্রাত্যহিক জীবনের কাঠিন্য। ইসলামের বল্‌গা আজ তাদের হাতে গিয়ে পড়ছে, যারা অন্যদের আল্লাহর সঙ্গে

একাসনে বসায়। তিনি কাফেরী দিয়ে ইসলামের স্থান অধিকার করিয়েছেন। তার পরিণাম হয়েছে এই যে, ধর্মের সুফল নষ্ট হয়েছে এবং অবিশ্বাসের (বিধর্মের) ধ্বজা তার স্থান গ্রহণ করেছে। তিনি সুবিধাবাদী হয়ে গিয়েছেন। অসার অর্থের লোভ তাঁকে সুখী ও আনন্দিত করেছে, তার ফলে তিনি আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাস সম্বন্ধে উদাসীন। আল্লাহ্ প্রশংসিত হোন, যিনি এই জাতীয় লোকদের সম্বন্ধে বলেছেন, 'তারা পশুদের চেয়েও বেশি বিভ্রান্ত।' তিনি (পূর্বোক্ত ব্যক্তি) তত্ত্বজ্ঞ লোকদের সঙ্গ করেন না। সঙ্কট মুহূর্তে আল্লাহর সুবিবেচনার খুঁটিনাটি বিষয়গুলো সম্বন্ধে বলার মত জ্ঞানও তাঁর নেই। (আল্লাহর পথের) একজন পথিকের আল্লাহ ভিন্ন অন্য কারও সঙ্গে থাকার লোভ কেন হবে ? (অর্থাৎ একজন মুসলমানের চিত্ত আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কিছুর প্রতি আকৃষ্ট হওয়া উচিত নয়।)

"(কবিতা)
আমি যদি স্থির করে থাকি– যাচ্ছি,
আমি আমার রক্ষাকর্তার আলয়েই যাব।

আল্লাহ্‌র কী মহিমা! আপাত কোন কারণ ভিন্নই একজন কাফেরের বাচ্চাকে তিনি বিশ্বাসের (ইসলাম ধর্মের) পোশাক দিয়ে দেশের সিংহাসনে, তার বন্ধুদের উপরে অধিষ্ঠিত করেছেন। কাফেরী প্রাধান্য লাভ করেছে এবং ইসলামের ... রাজ্য নষ্ট হয়েছে। প্রত্যেকটি মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের প্রয়োজনে সাহায্য করা এবং সেই বিশ্বাসকে জয়যুক্ত করা। যদিও আপাতত যা লক্ষণ দেখা যাচ্ছে—তাতে আমাদের কাছে কোন সাহায্য আসবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নেই, তবু সব জিনিসের ভিতরে তাকিয়ে এবং আল্লাহর দিকে ফিরে প্রত্যেকের উচিত ব্যগ্রচিত্তে আবেদন জানানো, আন্তরিক চিত্তে প্রার্থনা করা, সারা রাত্রি ধরে শোক করা ও আল্লাহর কাছে সাহায্য ভিক্ষা করা। আল্লাহ অনুরোধ শোনেন ও রাখেন। দেখ, অন্ধকার রাত্রি এবং বেদনাদায়ক পরিস্থিতি থেকে কী আসে।

"(কবিতা)
যদি তুমি আল্লাহ্‌র মিলনের ফলে সুখী হয়ে থাক,
ওঠ এবং (তাঁর সঙ্গে) বিচ্ছেদের জন্য শোক কর।
তোমার প্রার্থনার সময়ে এই ফকিরের জন্য প্রার্থনা কোরো।
"(কবিতা)
যদিও আমি দূরে আছি কিন্তু আল্লাহ্ জানেন
আমার আত্মা ওখানেই (তোমার কাছে) আছে।"

নূর কুৎব্ আলমের এই চিঠিখানির মূল্য অপরিসীম। এটি বিশ্লেষণ করে আমরা দেখতে পাই ঃ

(১) এই চিঠি লেখবার সময়ে এমন একজন রাজা সিংহাসনে উপবিষ্ট, যিনি কাফেরের সন্তান হয়েও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। বলা বাহুল্য, এই রাজা জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ।

(২) কিন্তু রাজ্যের সমস্ত কর্তৃত্ব গিয়ে পড়েছে একজন বিধর্মীর হাতে। এই 'বিধর্মী' নিঃসন্দেহে রাজা গণেশ।

(৩) রাজা গণেশ ছিলেন ৪০০ বছরের পুরানো জমিদার-বংশের সন্তান জমিদার। তিনি সনদের আবরণের মধ্যে এই তথ্যকে গোপন করেছেন। সম্ভবত, ইলিয়াস শাহী সুলতানরা গণেশকে উচ্চ থেকে উচ্চতর মর্যাদা দান করে অনেক সনদ জারি করেছিলেন এবং তার ফলে গণেশ যে 'সামান্য একজন জমিদার'–এই তথ্যটা চাপা পড়ে গিয়েছিল; সেই কথাই এই চিঠির মধ্যে বলা হয়েছে।

(৪) বিধর্মীর হাতে রাজ্যের কর্তৃত্ব যে গিয়ে পড়েছে, এর জন্য নূর কুৎব্ আলমের মতে 'দোষের ভাজন হয়ে থাকবেন' এমন কোন এক ব্যক্তি (এঁকে নূর কুৎব্ও 'তিনি' বলে উল্লেখ করেছেন), যিনি পার্থিব সম্পদের প্রতি লোভের জন্য (শরিয়ত অনুসারে) বিচারকার্য সম্পাদন করতে পারলেন না এবং সুবিধাবাদী হয়ে গেলেন; অসার অর্থের লোভ তাঁকে সুখী ও আনন্দিত করল; তিনিই কাফেরী দিয়ে ইসলামের স্থান অধিকার করেছেন। ... এই ব্যক্তি নিঃসন্দেহে জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শর্কী। 'সঙ্গীত শিরোমণি'তে লেখা আছে যে, ইব্রাহীম শর্কী গণেশের পুত্রকে মুসলমান করে সিংহাসনে বসিয়েছিলেন। কিন্তু 'রিয়াজ'-এর মতে নূর কুৎব্ই গণেশ-নন্দনকে মুসলমান করে রাজপদ লাভের অধিকারী বলে ঘোষণা করেছিলেন– ইব্রাহিম শর্কীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে। নূর কুৎব্ আলমের এই চিঠি 'সঙ্গীত শিরোমণি'-র উক্তিকেই সমর্থন করছে। এই চিঠি পড়লে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, জলালুদ্দীনকে মুসলমান ও রাজা করার পিছনে নূর কুৎব্ আলমের কোন অনুমোদন ছিল না– কারণ নূর কুৎব্ পরিষ্কার বলেছেন যে, 'আপাত কোন কারণ ভিন্নই' আল্লাহ্ এই কাফের-নন্দনকে মুসলমান করে সিংহাসনে বসিয়েছেন, অর্থাৎ এর দ্বারা নিষ্ঠাবান মুসলমানদের একটুকু সুবিধা হয় নি। নূর কুৎব্ আলমের অননুমোদন সত্ত্বেও ইব্রাহিম শর্কী গণেশের পুত্রকে মুসলমান করে সিংহাসনে বসালেন, জলালুদ্দীন তাঁকে প্রভূত পরিমাণ অর্থ দিয়েছিলেন, তাতেই তিনি 'সুখী ও আনন্দিত' হয়ে দেশে ফিরে গেলেন। গণেশ ইতিপূর্বে মুসলমানদের উপর যে অত্যাচার করেছিলেন—তার জন্য তাঁর বিচার করে তাঁকে শাস্তি (অবশ্যই প্রাণদণ্ড) দেওয়াই ইব্রাহিমের পক্ষে উচিত ছিল, কিন্তু ইব্রাহিম তা করলেন না–এই কথাই নূর কুৎব্ বলেছেন 'পার্থিব সম্পদের প্রতি তাঁর লোভের জন্য তিনি (শরিয়ত অনুসারে) বিচারকার্য সম্পাদন করতে প্রস্তুত হলেন না' উক্তির মধ্যে। ইব্রাহিম 'নিজে

নিলেন প্রাত্যহিক জীবনের কাঠিন্য'–এই উক্তির অর্থ, ইব্রাহিম তাঁর আচরণের ফলে মুসলমানদের অপ্রীতিভাজন হলেন ও তাঁর দৈনন্দিন জীবন যাপন কঠিন হয়ে পড়ল।

(৫) জলালুদ্দীনের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ ও সিংহাসনে আরোহণের অল্পকাল পরেই গণেশ আবার ক্ষমতা পুনরাধিকার করেন ও তাঁর বিরোধীদের অনেককে বধ করেন;...

(৬) কোন এক প্রিয়জন পাণ্ডুয়া থেকে চলে যাবার পরে নূর কুৎব্ তাঁকে এই চিঠি লিখেছেন।–এই চিঠিখানি নূর কুৎব্ আলম তাঁর একমাত্র জীবিত পুত্র শেখ আনোয়ারকে লিখেছিলেন ঠিকই—কিন্তু আনোয়ার স্বেচ্ছায় পাণ্ডুয়া থেকে অন্য কোথাও যাবার পর লিখেছিলেন। সোনারগাঁওয়ে নির্বাসন তখনও ঘটেনি।

(৭) গণেশের এই অভ্যুত্থান একেবারে নিরঙ্কুশ। তাঁর বিরুদ্ধে কোন সাহায্য পাবার আশাই নূর কুৎব্ আলম আর করছেন না। আগের বার সাহায্য করেছিলেন ইব্রাহিম শর্কী। এবার সে পথ বন্ধ। তাই নূর কুৎব্ অত্যন্ত বিব্রত ও বিচলিত বোধ করছেন। সম্ভবত এর কিছুদিন পরেই তিনি পরলোকগমন করেন।

আসল ব্যাপারটা এখন পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। মুসলমান করে জলালুদ্দীনকে সিংহাসনে বসিয়ে এবং প্রভূত অর্থ লাভ করে ইব্রাহিম শর্কী দেশে ফিরে যান। –ইব্রাহিম ফিরে যাবার কিছুদিন পরে তিনি সুযোগ বুঝে আবার প্রত্যাবর্তন করেন এবং ক্ষমতা অধিকার করেন।"[১৩]

রাজা গণেশ দুই দফায় বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইলিয়াস শাহী বংশ আপাতভাবে ধ্বংস করে প্রথমবার, এবং নানারকম লোমহর্ষক ক্রিয়াকাণ্ডের পর ইসলামে দীক্ষিত পুত্র জালাল-উদ-দীনকে সরিয়ে দ্বিতীয়বার। প্রথম দফায় গণেশের রাজত্বকালের স্থায়িত্ব সম্পর্কে ডক্টর আবদুল করিম বলেন, "সুখময় বাবুর মতে এই দফায় গণেশের রাজত্ব ছয়মাস কাল স্থায়ী হয়। —দ্বিতীয় দফায় গণেশ ১ বৎসরের কিছু বেশী সময়, ১৩/১৪ মাস, রাজত্ব করেন।"[১৪] এই দফায় তাঁর উপাধি ছিল 'দনুজমর্দন দেব'। "ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী দেখিয়েছেন, 'দনুজমর্দন' নামটি বিশেষভাবে ইঙ্গিতপূর্ণ; এর দ্বারা বিধর্মী প্রতিপক্ষদের (অর্থাৎ মুসলমানদের –লেখক) দমন করার অভিপ্রায় প্রকাশ পাচ্ছে।"[১৫]

"কী ভাবে গণেশের মৃত্যু হল, সে সম্বন্ধে 'রিয়াজ'-রচয়িতা বলেছেন, কেউ কেউ বলেন, 'তাঁর (গণেশের) ছেলে জলালুদ্দীন, যিনি বন্দী ছিলেন, ভৃত্যদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র

---

১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০–১২৫।

১৪. ডক্টর আবদুল করিম, বাংলার ইতিহাস, সুলতানী আমল, বাংলা একাডেমী ১৯৭৭, পৃ.১৮৬-১৮৭।

১৫. শ্রী সুখময় মুখোপাধ্যায়, বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর ঃ স্বাধীন সুলতানদের আমল, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৮০, পৃ. ১৩৪।

করে পিতাকে হত্যা করেছিলেন।' সমসাময়িক আরবী ঐতিহাসিক ইব্‌ন্-ই-হজরের লেখা 'ইনবাউ'ল গুমর' থেকে জানা যায় যে, গণেশের পুত্র জলালুদ্দীন গণেশকে আক্রমণ করে বধ করেছিলেন।"[১৬] এটা এখানে উল্লেখ্য যে, "কথিত আছে, একই বছরে রাজা কংশের (গণেশের –লেখক) জীবনেরও পরিসমাপ্তি ঘটে।"[১৭] আর রাজা গণেশের হত্যাকারী ছিলেন তাঁরই পুত্র জালাল-উদ-দীন।

গণেশের মৃত্যুর পর তাঁর ছোট ছেলে 'মহেন্দ্রদেব' উপাধি গ্রহণ করে মাস দুয়েকের জন্য সিংহাসনে বসেছিলেন। তারপর ছোট ভাইকে সহজেই সরিয়ে বড় ভাই 'জালাল-উদ-দীন মুহম্মদ শাহ্' উপাধি গ্রহণ করে ১৫ বছরের জন্য (১৪১৮-১৪৩৩ সাল) বাংলার মসনদে আরোহণ করেন। কিন্তু এর আগেই হযরত নূর কুতুব আলম ইন্তেকাল করেছিলেন।

সুলতান জালাল-উদ-দীন মুহম্মদ শাহ্‌র মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সুলতান শামস-উদ-দীন আহমদ শাহ্ ১৪ বছর বয়সে বাংলার মসনদে বসেন। মাত্র তিন বছরকাল রাজত্ব করার পর রাজধানীতে নতুন ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে এই তরুণ সুলতান নিজ ক্রীতদাসের হাতে নিহত হন। সম্ভবত এই ষড়যন্ত্র ছিল গণেশী ষড়যন্ত্রীদের প্রতিপক্ষের ষড়যন্ত্র। ষড়যন্ত্রের বিষবৃক্ষ হয়তো দৃষ্টির আড়ালেও এমনি করেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। সুলতান শামস-উদ-দীন আহমদ শাহ্‌র মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে রাজা গণেশের বংশও বিলুপ্ত হয়। বাংলার মসনদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয় 'পরবর্তী ইলিয়াস শাহী বংশের' প্রথম ব্যক্তি সুলতান নাসির-উদ-দীন মাহমুদ শাহ্ (১৪৩৫/ ৩৬-১৪৫৯/৬০ সাল)।

উপরোক্ত গণেশ-কুতুব আলম সমাচারে দু'জন প্রথিতযশা ঐতিহাসিক শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায় ও ডক্টর আবদুল করিম—নানা প্রামাণিক সূত্র ঘেঁটে ও বিচার-বিশ্লেষণ করে যা যা বলেছেন, তার থেকে একটা সঠিক বিবরণ তুলে ধরতে চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু এই হিন্দু-মুসলমান রাষ্ট্রীয় এবং শক্তির-দ্বন্দ্বে যিনি ছিলেন দাবার গুটি, সেই যদুসেন জালাল-উদ-দীনের ভূমিকা গৌণই রয়ে গেছে বলে মনে হয়। মনে হয়, এই 'গোপাল-মার্কা' তরুণটির কোন ব্যক্তিসত্তাই ছিল না। অথচ খেলা শেষে সুলতান জালাল-উদ-দীন মুহম্মদ শাহকে শাসক হিসাবে মূল্যায়ন করতে গিয়ে বিভিন্ন ঐতিহাসিকের মন্তব্য উদ্ধৃত করে শ্রী সুখময় মুখোপাধ্যায় বলেন ঃ মুসলমান ঐতিহাসিকরা শাসক হিসাবে জালাল-উদ-দীনের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। ফিরিশ্‌তা বলেছেন, 'তিনি ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে শাসন করে সে যুগের নওশেরোয়াঁ

---

১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮।

১৭. ডক্টর এম. এ. রহিম, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, অনুবাদ ঃ মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান, বাংলা একাডেমী, ১৯৮২, পৃ. ১৩৭।

হয়েছিলেন। অপূর্ব দৃঢ়তা ও শক্তির সঙ্গে সতেরো বছর ধরে বাংলা ও লাখ্নৌতি শাসন করবার পরে তিনি পরলোকগমন করেন। বখ্শী নিজামুদ্দীন 'তবকা-ই-আকবরী'তে বলেছেন, 'তিনি যোগ্য ভাবে শাসনকার্য সংক্রান্ত ব্যাপার পরিচালনা করতেন। তাঁর রাজত্বকালে লোকেরা আরাম এবং স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্য দিয়ে দিন কাটাত। কথিত আছে, তাঁর সময়ে পাণ্ডুয়া এত জনাকীর্ণ হয়েছিল যে তা বর্ণনার অতীত। ... ইত্যাদি।"[১৮]

তাই স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগতে পারে ঃ সত্যিই কি তিনি ওই রাষ্ট্রীয় খেলার সময় একেবারেই ব্যক্তি-সত্তাহীন ছিলেন ? এ সম্পর্কে কিছু কথা।

১. সূফী নুর কুতুব আলমের আমন্ত্রণে জৌনপুরের সুলতান ইবরাহীম শর্কী সসৈন্যে বাংলায় এসে রাজা গণেশকে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব থেকে আপসারণ করে জালাল-উদ-দীনকে সিংহাসনে বসিয়ে (প্রথম বারের মত) ফিরে গেলেন যখন, তখন জালাল-উদ-দীনের বয়স সম্পর্কে শ্রী মুখোপাধ্যায় বলেন," রিয়াজ-উস-সালাতীন-এর মতে প্রথম সিংহাসনে অরোহণের সময়ে জালাল-উদ-দীনের বয়স ১২ বছর ছিল। কিন্তু এ কথা সত্য হতে পারে না। ১২ বছরের বালকের পক্ষে এই রাজনীতি চতুরতার পরিচয় দেওয়া ও প্রকাশ্যে পিতার পক্ষ ত্যাগ করে শত্রুর পক্ষে যোগ দেওয়া অসম্ভব।"[১৯] অর্থাৎ জালাল-উদ-দীন তখন অন্ততপক্ষে তরুণ যুবক এবং তিনি পিতার পক্ষ ত্যাগ করে গণেশ-বিরোধীদের পক্ষে যোগ দিয়েছিলেন।

২. "নুর কুৎব্ আলমের যে চিঠিটি আগে উদ্ধৃত হয়েছে, সেটি জলালুদ্দীনের প্রথমবার সিংহাসনে আরোহণের কিছু পরেই রচিত। এই চিঠিতে নূর কুৎবের নৈরাশ্য ও ক্ষোভ চরমে পৌঁছেছে। যতদূর মনে হয়, ৮১৮ হিজরার কোন এক সময়ে এই চিঠিটি লেখবার কিছু পরেই নূর কুৎব্ আলম ভগ্নহৃদয়ে প্রাণ ত্যাগ করেন। রাজা গণেশও এই শক্তিশালী দরবেশের মৃত্যুতে নিষ্কণ্টক হন এবং পুত্রকে অপসারিত করে নিজের মস্তকে রাজমুকুট ধারণ করেন। ... গণেশের দ্বিতীয় বার সিংহাসনে আরোহণের আনুষঙ্গিক দুটি ঘটনা রিয়াজ-উস-সালাতীনে উল্লিখিত হয়েছে। প্রথমটি হচ্ছে জলালুদ্দীনকে তিনি শুদ্ধি করিয়ে হিন্দু করেছিলেন, দ্বিতীয়টি হচ্ছে তাঁর আদেশে নূর কুৎব্ আলমের ছেলে আনোয়ারকে হত্যা করা হয়েছিল। দুটি ঘটনাই সত্য বলে আমাদের মনে হয়।[২০]

---

১৮. শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায় , বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর ঃ স্বাধীন সুলতানদের আমল, তৃতীয় সংস্করণ ১৯৮০, পৃ. ১৫১।

১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮-পাদটিকা।

২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬।

শুদ্ধি প্রক্রিয়াটি ছিল সোনায় গড়া গাভীর মুখ দিয়ে জালাল-উদ-দীনকে "প্রবেশ করিয়ে গাভীটির অধোদ্বার দিয়ে নির্গত"[২১] করা। গাভীটি নিশ্চয়ই খুব বড় আকারের ছিল, নইলে একটা মানুষকে মুখ দিয়ে প্রবেশ করিয়ে অধোদ্বার দিয়ে নির্গত করা যাবে কিভাবে ? "পরে সুবর্ণনির্মিত গাভীর অংশগুলি ব্রাহ্মণদের (শুদ্ধি প্রক্রিয়ার বিধান দানকারীদের -লেখক) দান করা হয়েছিল। সুলতান জালাল-উদ-দীন হিসাবে তিনি কি করেছিলেন সে সম্পর্কে শ্রী মুখোপাধ্যায় বলেন ... রিয়াজ-উস-সালাতীনে পাই তিনি(জালাল-উদ-দীন-লেখক) বহু হিন্দুকে মুসলিম ধর্মান্তরিত করেন এবং যে সমস্ত ব্রাহ্মণ তাঁর শুদ্ধি অনুষ্ঠানে স্বর্ণনির্মিত গাভীর অংশ নিয়েছিল, তাদের যন্ত্রণা দিয়ে গোমাংস খেতে বাধ্য করেন।"[২২]

৩. দনুজমর্দনদেব উপাধি গ্রহণ করে দ্বিতীয় বার বাংলার সিংহাসনে বসে রাজা গণেশ হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির পুনরভ্যুদয়ে নিজেকে নিয়োজিত করলেন। শুদ্ধিকৃত যদুকে কারারুদ্ধ করলেন এবং এক বছরেরও কিছু সময় ধরে রাজত্ব চালিয়ে পুত্র যদুর (জালাল-উদ-দীনের) হাতেই নিহত হলেন।"[২৩]

৪. রাজা গণেশের নিহত হওয়ার পর মাস দুয়েকের জন্য সিংহাসনে বসলেন তাঁর ছোট ছেলে— উপাধি হলো মহেন্দ্রদেব ; গণেশ-পক্ষীয়দের সমর্থনে নিশ্চয়ই। "কিন্তু জলালুদ্দীন রাজ্যের বহু ক্ষমতাশালী লোককে নিজের দলে ভিড়িয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁকে অপসারিত করে সিংহাসন পুনরুদ্ধার করেন।"[২৪]

৫. এবার সুলতান ইবরাহীমের বাংলা আক্রমণ প্রসঙ্গে আসা যাক। হযরত নূর কুতুব আলম সুলতান শর্কীকে বাংলা আক্রমণের আমন্ত্রণ জানিয়ে লিখেছিলেন,"... কান্‌স্ নামক এই দেশের শাসনকর্তা একজন বিধর্মী। তিনি অত্যাচার করিতেছেন এবং রক্তপাত করিতেছেন। এখন তিনি অবশিষ্ট মুসলমানকে হত্যা করার এবং ইসলামকে এই দেশ হইতে ধ্বংস করার মনস্থ করিয়াছেন। যেহেতু মুসলমানদিগকে সাহায্য করা এবং রক্ষা করা মুসলমান রাষ্ট্রনায়কের অবশ্য কর্তব্য, সেহেতু আমি এই কয়েক ছত্র লিখিয়ে আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট করিতেছি। এই দেশের বাসিন্দাদের খাতিরে এবং আমাকে বাধিত করার জন্য আমি এখানে আপনার শুভাগমন প্রার্থনা করিতেছি যাহাতে মুসলমানেরা এই অত্যাচারী শাসকের অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি পায়। আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। এই চিঠি পাইয়া সুলতান ইবরাহীম অত্যন্ত ভক্তি সহকারে ইহা খোলেন এবং পাঠ করেন। সেই সময় কাজী শাহাব-উদ-দীন

---

২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭।

২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৬।

২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮।

২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০।

জৌনপুরী ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত এবং জ্ঞানীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; সুলতান ইবরাহীম তাঁহাকে অত্যন্ত সম্মান করিতেন এবং উৎসবাদিতে রৌপ্য নির্মিত আসনে বসাইতেন। তিনি সুলতানকে বলেন, আপনার তাড়াতাড়ি যাত্রা করা উচিত, কারণ এই অভিযানে জাগতিক এবং পারলৌকিক সুফল পাওয়া যাইবে– ইহাতে বঙ্গদেশ জয় হইবে। সুলতান ইবরাহীম শিবির তুলিয়া যাত্রার বাদ্য বাজাইলেন।[২৫] বোঝা যাচ্ছে অত্যাচারী গণেশকে দমন করার অভিপ্রায়ের সঙ্গে বঙ্গদেশ জয় হইবে— এই ইচ্ছাটাও সুলতান শর্কীর মনে হয়তো ছিল। তিনি বাংলায় এসে ফিরোজপুরে শিবির স্থাপন করলেন।".

৬. "... তুরুষ্কং নির্ম্মায় প্রকটিতনয়ং তষ্য তনয়ং

ব্যধাদ্ গৌড়ান্ প্রৌঢ় ঃ পুনরপি শকানাং জনপদান্ ঃ ... অনুবাদ হচ্ছে ঃ রাজনীতিজ্ঞ তাঁর পুত্রকে তুরষ্ক নির্মাণ করে (মুসলমান করে) গৌড় দেশকে আবার শকরাজ্যে (মুসলমান রাজ্যে) পরিণত করেছিলেন।...

উদ্ধৃতাংশটি 'সঙ্গীত শিরোমণি' (রচনাকাল ১৪২৮-২৯ সাল) গ্রন্থের প্রশস্তি অংশ থেকে নেওয়া। এই অংশের 'তুরুষ্কং নির্ম্মায়... তস্য তনয়ং উক্তি নিয়ে বিতর্কের অবতারণা আছে। শ্রী সুখময় মুখোপাধ্যায়ের মতে, এই শ্লোকের অর্থ অনুযায়ী "ইবরাহীম নিজেই গণেশের ছেলেকে ধর্মান্তরিত করে সিংহাসনে বসিয়েছিলেন। (কিন্তু ডঃ দানী তা মানতে চান না। তাঁর মতে ইব্রাহীমের আগমনের আগেই গণেশের পুত্র মুসলমান হয়েছিলেন। তিনি 'তুরুষ্কং নির্ম্মায়.... তস্য তনয়ং'-এর অনুবাদ করেছেন, having established his son, who was a Turushka. এ সম্বন্ধে তিনি বলেন, nirmaya (meaning having constructed, built or established. It can hardly be construed to mean having converted) ঠিক কথা, কিন্তু 'তুরুষ্কং... তনয়ং-এর আক্ষরিক অনুবাদ তো আমরা having converted his son into a Turushka (Muslim) করছি না। করছি having made his son a Turushka (Muslim) এবং এইটিই এর সহজ অর্থ।...)

কিন্তু উদ্ধৃত অংশটির 'প্রকটিতনয়ং তস্য তনয়ং' উক্তিটির অর্থ আরও বেশি গভীর। এর আসল তাৎপর্য সম্বন্ধে ড. সুকুমার সেন লিখেছেন 'যদু জালালুদ্দীন যে চালাকি করে (বাপের সঙ্গে বিরোধ করে ?) ধর্মান্তর গ্রহণ করে ইবরাহিম শাহ্ শর্কীর সাহায্য রাজ্য লাভ করেছিলেন এতে তারই ইঙ্গিত।' সুতরাং আসল ব্যাপারটা এখন মোটামুটি বোঝা যাচ্ছে। ইবরাহীম শর্কী সসৈন্যে বাংলায় উপস্থিত হলে রাজা গণেশের সমূহ বিপদ উপস্থিত হয়। তার সুচতুর পুত্র তখন সুযোগ বুঝে পিতার বিরোধী পক্ষে যোগ দেন এবং তাঁরা তাঁকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন।

---

২৫. ডক্টর আবদুর করিম, বাংলার ইতিহাস, সুলতানী আমল, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭, পৃ. ২৫২।

প্রশ্ন উঠতে পারে, তাহলে রাজা গণেশ তখন কী করছিলেন? এ সম্বন্ধে কতকটা নিঃসংশয়েই অনুমান করা যেতে পারে যে, রাজা গণেশ ইবরাহিমের বিপুল সামরিক শক্তির কাছে দাঁড়াতে না পেরে পশ্চাদপসরণ করেছিলেন। ইবরাহীমের সঙ্গে গণেশ খুব বেশি যুদ্ধ করেছিলেন বলে মনে হয় না। মোটেও না করতে পারেন।

যা হোক, গণেশের অপসারণ এবং তাঁর ধর্মান্তরিত পুত্রের সিংহাসনে আরোহণের ফলে গণেশের প্রতিপক্ষেরা মনে করলেন তাঁদেরই জয় হলো। ইবরাহীম শর্কীও তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে দেশে ফিরে গেলেন। ড. দানী মনে করেন জলালুদ্দীন ইবরাহিম শর্কীর সামন্ত (feudatory) হিসাবে বাংলাদেশ শাসন করতে সম্মত হয়েছিলেন। এই অভিমত অযৌক্তিক নয়, অবশ্য ইতিপূর্বে উদ্ধৃত 'সঙ্গীত শিরোমণির' অগৌড়াদুজ্জলংরাজ্যমিবরাহিমভূভুজঃ' উক্তি থেকে বোঝা যায় যে, জৌনপুরের লোকেরা গৌড়কে ইবরাহিমের রাজ্যে অন্তর্ভুক্ত বলেই মনে করতেন।"[২৬] যদুসেন সম্পর্কে মোটামুটি এই ধারণা করা যায় যে, ধর্মবিশ্বাসের দিক দিয়ে তিনি আগেই অন্তত প্রায় মুসলমান ছিলেন এবং পিতা গণেশের রাষ্ট্রীয় ব্যাপার এত নির্মম পাশবিক রক্তপাতের মাধ্যমে ধর্মীয় বিপ্লব সমর্থন করতেন না। রাজা গণেশও এই বড় ছেলেটাকে তাই তেমন পছন্দও করতেন না। এজন্যই পরবর্তীতে শুদ্ধির মাধ্যমে হিন্দু বানিয়েও ছেলেকে বন্দী করে রাখেন। ছোট ছেলেই তার ভবিষ্যতের আশা। এবং পিতার এই মনোভাব সম্পর্কে অবহিত ছিলেন বলেই যদু জালাল-উদ-দীন নিজ পিতাকে হত্যাও করেছিলেন। ছেলেদের প্রতি পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপারটা গণেশ পক্ষীয়দের জানা ছিল বলেই গণেশের মৃত্যুর পর যদুকে সিংহাসনে না বসিয়ে মহেন্দ্রদেবকে সিংহাসনে বসিয়েছিলেন। কিন্তু গণেশ বিরোধীদের সমর্থন লাভ করে শেষতক 'গণেশ উল্টে' দিলেন যদুসেন। তিনি লাখনৌতির শিক্ষিত ও গণ্যমান্য লোকদের আমন্ত্রণ করে এনে কল্‌মা উচ্চারণ করলেন এবং জলালুদ্দীন উপাধি নিয়ে সিংহাসনে আরোহণ করলেন।"[২৭]

দ্বিতীয় বার সিংহাসনে বসে যদুকে শুদ্ধির মাধ্যমে পুনরায় হিন্দু বানিয়ে রাজা গণেশ সেই শুদ্ধিকৃত ছেলেকে মুক্ত না রেখে কারারুদ্ধ করলেন— এর থেকে যদুর সঙ্গে তার মতবিরোধের কথাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাছাড়াও ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, যদু ছিলেন গণেশ বিরোধীদের পক্ষে এবং সেই বিরোধী পক্ষটা যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল। নইলে মতবিরোধ থাকলেও যদু তাঁর ছেলে তো! অপছন্দ করতে থাকবেন, কিন্তু একেবারে কারারুদ্ধ করতে যাবেন কেন ? বিরোধীদের চাইতেও শক্তিশালী ছিলেন

২৬. শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায় , বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর, স্বাধীন সুলতানী আমল, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৮০ পৃ. ১১৬-১১৮।

২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০।

রাজা গণেশ। তা না হলে অনিচ্ছুক ধর্মান্তরিত যদুকে শুদ্ধি করাতে পারবেন কেন ? ব্যাপারটা ততদিনে আর গণেশের পারিবারিক ছিল না, হয়ে দাঁড়িয়েছিল রাজনৈতিক। এখানে একটা কথা বলে রাখা দরকার । পরবর্তী ইলিয়াস শাহী বংশ বা মাহমুদ শাহী বংশের প্রথম সুলতান নাসির-উদ-দীন মাহমুদ শাহ্‌র কথা। রাজা গণেশ যখন ইলিয়াস শাহী বংশের ধ্বংস সাধনে প্রবৃত্ত হলেন এবং ইলিয়াস শাহী বংশের লোকেরা (যারা বা যিনি বেঁচেছিলেন) এবং সে বংশের বিশ্বস্ত সমর্থক আমীর বা আমীররা প্রাণের ভয়ে রাজধানী ছেড়ে দূর গ্রামাঞ্চলে স্বেচ্ছা নির্বাসনে চলে গিয়েছিলেন। চলে যেতে হয়েছিল, এত শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন রাজা গণেশ। কিন্তু এও ধারণা করা যায় যে, দেশের অভ্যন্তরে গণেশ বিরোধী ষড়যন্ত্রটাও যথেষ্ট প্রবল ছিল। যদুসেনও পিতা গণেশের প্রতাপের কাছে স্বাভাবিকভাবেই নীরব ছিলেন এবং শুদ্ধিকরণসহ কারাবরণ নতমস্তকে মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু দেশে চলমান ষড়যন্ত্রের এক পর্যায়ে পিতা রাজা গণেশকে হত্যা করে এবং পিতার প্রিয়তর পুত্র সদ্য সিংহাসনপ্রাপ্ত মহেন্দ্রদেবকে সহজেই অপসারিত করে পিতৃবিরোধী কারারুদ্ধ এই যদুই বাংলার সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তবুও তিনি ছিলেন এবং তার পুত্র সুলতান আহমদ শাহও ছিলেন গণেশ বংশেরই সন্তান। বাংলার হিন্দু শক্তির পুনরভ্যুদয় ঘটানোর যে বিরাট পরিকল্পনার বিষবৃক্ষ রাজা গণেশ রোপণ করেছিলেন, দুই যুগ অতিক্রান্ত হতে না হতেই গণেশ বিরোধীরা সফলভাবে সেই বিষবৃক্ষের মূলোৎপাটন করলেন আনুমানিক ১৪৩৫-৩৬ সালে। গণেশ দৌহিত্র সুলতান শামস-উদ-দীন আহমদ শাহ্‌কে হত্যার মাধ্যমে। "শামসুদ্দীনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই বাংলাদেশে রাজা গণেশের বংশের রাজত্ব চিরদিনের মত শেষ হলো।"[২৮] বাংলার মসনদে আবার এসে সুপ্রতিষ্ঠিত হলেন ইলিয়াস শাহী বংশের স্বেচ্ছা নির্বাসিত সন্তান বা ইলিয়াস বংশের বিশ্বস্ততম কোন আমীর সুলতান নাসির-উদ-দীন মাহমুদ শাহ্।

৭. সুলতান জালাল-উদ-দীন মুহম্মদ শাহ্ গণেশ সংক্রান্ত জটিলতামুক্ত হয়েই জৌনপুরের সুলতান ইবরাহীম শর্কীর বঙ্গদেশ জয়ের পোষিত ইচ্ছাটির প্রতি মনোনিবেশ করলেন। ১৪১৮ সালে বাংলার মসনদে আরোহণ করে ধর্মনিষ্ঠ এক মুসলমান সুলতান হিসাবেই বাংলার স্বাধীনতা সুসংহত করে আনলেন যখন, তখনই জৌনপুরের সুলতান ইব্‌রাহীম শর্কীর বঙ্গদেশ জয়ের ইচ্ছাটা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। কারণ 'বাঙ্গালার' সুলতান জালাল-উদ-দীন মুহম্মদ শাহ্ জৌনপুরের 'সামন্ত' হিসাবে কোন লক্ষণই দেখালেন না। তাই সুলতান ইবরাহীম শর্কী 'বঙ্গদেশ' জয়ের জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন।

---

২৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬।

"প্রামাণিক সূত্র থেকে জলালুদ্দীনের রাজত্বকালের কয়েকটি মাত্র ঘটনার কথা জানতে পারা যায়। সেগুলি এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথম ঘটনাটি জানতে পারা যায় চীনের 'মিং' রাজবংশের ইতিহাস 'মিং-শ্-র্' থেকে। 'মিং-শ্-র্ এর ৩২৬ শ অধ্যায়ে জৌনপুরের সঙ্গে চীনের রাজনৈতিক সম্পর্ক বর্ণিত হয়েছে। তার মধ্যে এই কথাগুলি পাওয়া যায়।

স্‌সে-ন্-পু-আড় (Sse-na-pu-eul – জৌনপুর) বাংলার পশ্চিমে অবস্থিত । একে মহাভারতও বলা হয়। প্রাচীন যুগে এখানে বুদ্ধ থাকতেন। 'য়ুং লো'র রাজত্বের দশম বর্ষে (১৪১২ খ্রীঃ) তাদের রাজা য়ি-পু-লা (ইব্রা=ইব্রাহিম শর্কী)র কাছে ... একজন দূত পাঠানো হয়। 'য়ুং লো'র রাজত্বের অষ্টাদশ বর্ষে (১৪২০ খ্রীঃ) বাংলার রাজদূত (চীনের সম্রাটকে) জানান যে, তাদের (জৌনপুরের) রাজা কয়েকবার বাংলা আক্রমণ করেছেন। ... হৌ-শিয়েনকে তখন (চীন) সম্রাটের আদেশ দিয়ে পাঠানো হল তাঁকে (জৌনপুরের রাজাকে) বলবার জন্য যে, প্রতিবেশীর প্রতি ভাল ব্যবহার করেই তিনি নিজের সম্পত্তি রক্ষা করতে পারেন। তাঁকে রেশম ও টাকা-কড়ি উপহার দেওয়া হলোঃ

'মিং-শ-র'-এর ৩৪০ শ অধ্যায়ে এই ঘটনাটির উল্লেখ একটু ভিন্ন ভাষায় পাওয়া যায়। এই বিবরণের শেষাংশ নীচে উদ্ধৃত হল।

'য়ুং লো'র রাজত্বের অষ্টাদশ বর্ষের (১৪২০ খ্রীঃ) নবম মাসে (চীন) সম্রাট হৌ-শিয়েনকে আদেশ দিলেন, (জৌনপুরে) গিয়ে তাদের (জৌনপুর ও বাংলার রাজাদের) শান্ত করতে। (জৌনপুরের রাজাকে) সোনা এবং টাকাকড়ি উপহার দিয়ে যুদ্ধ বন্ধ করা হল'।

১৪২০ খ্রীস্টাব্দে জলালুদ্দীনই বাংলার রাজা ছিলেন। ঐ বছরই জৌনপুরের রাজা বাংলা আক্রমণ করেছিলেন। 'মিং-শ্-র্'-এর ৩২৬ শ অধ্যায়ে বলা হয়েছে ইবরাহীম শর্কী কয়েকবার বাংলা আক্রমণ করেছিলেন। এর দ্বারা সম্ভবত ১৪১৫ ও ১৪২০ খ্রীস্টাব্দে, এই দু'বারের আক্রমণের কথাই বোঝাচ্ছে।

তৈমুরের পুত্র শাহ্‌রুখ কর্তৃক দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলিতে প্রেরিত দূত আবদুল রজ্জাকের লেখা বিখ্যাত বই 'মৎলা-ই-সদাইনে' (রচনাকাল ১৪৪২ খ্রী.) জৌনপুর-রাজ ইবরাহীম শর্কীর বাংলা আক্রমণের কথা পাওয়া যায়, যদিও আক্রমণের সাল এবং বাংলার রাজার নাম তার মধ্যে মেলে না। আবদুল রজ্জাক লিখেছেন,...

বাংলা থেকে সম্রাটের (শাহ্‌রুখ, রাজত্বকাল ১৪০৪-৪৭ খ্রী) রাজদূতেরা যখন দেশে ফিরে যাচ্ছিলেন, এমন সময় কালিকটে এক দুর্ঘটনা ঘটে। ঐ জায়গায় রাজার কাছে সম্রাটের শক্তির কথা পৌঁছেছিল। তিনি বিশ্বস্ত লোকদের কাছে শুনেছিলেন যে, মহামান্য সম্রাটের দরবারে সমস্ত দেশের রাজারা দূত এবং আবেদন-নিবেদন পাঠিয়ে

থাকেন। তাঁরা জানেন যে, এইখানে সমস্ত প্রয়োজন মেটে, সমস্ত প্রার্থনা সফল হয় এবং ঐ সময়ে বাংলার রাজা সুলতান ইবরাহীম জৌনপুরের জুলুমের বিরুদ্ধে নালিশ জানিয়ে দরবারে সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন; সম্রাট (শাহ্রুখ) জনাব শেখ অল-ইসলাম খওয়াজা-করিমের মারফৎ এই মর্মে একটি ফরমান পাঠান যে, তিনি (ইবরাহীম) বাংলার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবেন না। করলে তাঁকে ফলভোগ করতে হবে। জৌনপুরের রাজা এই পবিত্র ফরমানের মর্ম শুনে বাংলাদেশ থেকে হিংসার হস্ত প্রত্যাহার করে নিলেন। ... দুই বিবরণীতেই দেখি, বাংলার রাজা ইবরাহীমের আক্রমণের বিরুদ্ধে বিদেশের সম্রাটের কাছে নালিশ জানাচ্ছেন এবং বিদেশী সম্রাটের কথাতে ইবরাহীম আক্রমণ প্রত্যাহার করে নিচ্ছেন। ... যাহোক আমরা দেখছি জলালুদ্দীন ইব্রাহীমের আক্রমণের সময় একই সঙ্গে পারস্যের শাহ্রুখ ও চীনের সম্রাট য়ুং-লো'র কাছে সাহায্য চেয়েছিলেন এবং পেয়েও ছিলেন। শক্তিশালী বৈদেশিক রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে যে তাঁর বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল, তা এর থেকে প্রমাণ হচ্ছে। এই পররাষ্ট্রনীতি নিঃসন্দেহে জলালুদ্দীনের রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচায়ক।"[২৯]

এভাবে গণেশ-পুত্র এবং পুরোপুরি বাস্তব জ্ঞানসম্পন্ন ধর্মান্তরিত মুসলমান সুলতান জালাল-উদ-দীন মুহম্মদ শাহ্ বাংলায় মুসলিম শাসনকে তো পূর্ণ সংহত করলেনই, জৌনপুরের বঙ্গ জয়াভিলাষী সুলতান ইবরাহীম শর্কীর সম্প্রসারণবাদী ইচ্ছাকেও নস্যাৎ করে দিলেন। তিনি সুলতান হওয়ায় বাংলায় কার পরিকল্পনাটি সার্থকতার পথে অগ্রসর হয়েছিল ? রাজা গণেশের মুসলিম শাসন ধ্বংস করে হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির পুনরভ্যুদয়ের পরিকল্পনা অথবা হযরত নুর কুতুব আলমের ইসলাম ও মুসলিম সমাজকে রক্ষা করার পরিকল্পনা? যে পরিকল্পনায় সূফী জ্ঞানী মুসলমানদের শোণিত প্রবাহের রক্ত-লাল বাস্তবতায় অধীর হয়ে ভিন্‌দেশী মুসলিম সুলতান ইবরাহীম শর্কীকেই আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। এই বাংলায় এবং সুলতানের ইসলামী রূপের আড়ালে সুলতানী রূপের পরিচয় পেয়ে ভগ্ন হৃদয়ের হাহাকার জানিয়েছিলেন নির্বাসিত পুত্র শেখ আনোয়ারের কাছে ?

মুসলিম সুলতান হিসাবে জালাল-উদ-দীন মুহাম্মদ শাহ্‌র কার্যাবলীর মূল্যায়ন প্রসঙ্গে শ্রী মুখোপাধ্যায় বলেন, "কিন্তু জলালুদ্দীনের ইসলাম ধর্ম গ্রহণের কারণ যাই হোক না কেন, ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পরে এই ধর্মে তার গভীর নিষ্ঠা জন্মেছিল। তার পিতা সম্ভবত তার শুদ্ধি করিয়েছিলেন, কিন্তু তাতে কোনই ফল হয়নি। পিতার মৃত্যুর পরেই (বস্তুত পিতাকে হত্যা করার পরেই–লেখক) তিনি ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসের কথা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন। ধর্মনিষ্ঠার ব্যাপারে তিনি তার পূর্ববর্তী জাত মুসলমান

---

২৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২- ১৫৪।

সুলতানদেরও অতিক্রম করে গিয়েছিলেন। তার আগে প্রায় ২০০ বছর ধরে বাংলার মুসলমান সুলতানরা তাদের মুদ্রায় কল্‌মা খোদাই করতেন না। জলালুদ্দীন কিন্তু তার মুদ্রায় কল্‌মা খোদাই করে বাংলাদেশে আবার এই প্রথা চালু করেন। তিনি আরাকানরাজকে তার হৃত সিংহাসনে পুনরধিষ্ঠিত করার পর থেকে ঐ রাজা ও তার উত্তরাধিকারীদের মুদ্রায় ফার্সী অক্ষরে মুসলমানী নাম লেখার প্রথা চালু হয়, এর পিছনেও সম্ভবত জলালুদ্দীনের নির্দেশ ছিল এবং তার ধর্ম প্রীতিই এর কারণ বলে মনে হয়।

শুধু তাই নয়, আর এক ব্যাপারেও জলালুদ্দীন নতুনত্ব দেখিয়েছিলেন। তার পূর্ববর্তী সুলতানরা সকলেই খলীফার (বাগদাদের -লেখক) আনুগত্য স্বীকার করতেন। এবং কখনও কখনও তাদের মুদ্রায় বা শিলালিপিতে নিজেকে খলীফার সহায়ক বলে অভিহিত করেছেন। জলালুদ্দীনও প্রথম দিকে তাই করেছেন । কিন্তু জলালুদ্দীন তাঁর শেষ দিক্‌কার মুদ্রা ও শিলালিপিতে 'খলীফৎ আল্লাহ্' উপাধি ধারণ করেছেন। অর্থাৎ নিজেকেই খলীফা বা ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলে দাবি করেছেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আহ্‌মদ শাহ্ নাবালকত্বের জন্য এই উপাধি ধারণ করেন নি। কিন্তু আহমদ শাহের পরবর্তী সুলতানদের মধ্যে অনেকেই এই উপাধি ধারণ করেছিলেন।

জলালুদ্দীনের ধর্মনিষ্ঠা সম্বন্ধে সম্প্রতি আরও কতকগুলি তথ্য পাওয়া গিয়েছে। সমসাময়িক আরবী গ্রন্থকার ইব্‌ন-ই-হজরের (১৩৭২-১৪৪৯ খ্রী.) লেখা 'ইন্‌বাউ'ল গুম্‌র্' গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, জলালুদ্দীন ইসলামের উন্নতি সাধন করেন। ইসলামের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন, তার পিতা যে সমস্ত মসজিদ প্রভৃতি ধ্বংস করেছিলেন সেগুলি সংস্কার করেন এবং আবু হানিফা সম্প্রদায়ের মতবাদ গ্রহণ করেন। মক্কাধামে তিনি অনেকগুলি ভবন বিশেষত একটি সুন্দর মাদ্রাসা তৈরি করান। ৮৩২ হিজরায় তিনি মক্কার অধিবাসীদের দান করার জন্য অনেক অর্থ পাঠিয়েছিলেন। (তাঁর আগে বাংলার সুলতান গিয়াস-উদ-দীন আজম শাহ্‌ও মক্কা-মদীনায় এসব কাজ করিয়েছিলেন। এ ব্যাপারে এবং চীন সম্রাটের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপনে বাংলার সুলতানদের মধ্যে সুলতান গিয়াস-উদ-দীন আজম শাহ্-ই ছিলেন পথিকৃৎ -লেখক) পরে জলালুদ্দীন মিশরের রাজা আশরফ অর্থাৎ আল আশরফ বার্‌স্‌বায়-এর কাছে উপহার পাঠিয়েছিলেন এবং খলীফার অনুমোদন প্রার্থনা করেছিলেন; খলীফা ৮৩৩ হিজরায় সুহৈল ও যরগাব (?) নামক দুজন দূত মারফৎ জলালুদ্দীনকে সম্মান-পরিচ্ছদ পাঠান; জলালুদ্দীন সে সম্মান-পরিচ্ছদ অঙ্গে ধারণ করেন এবং খলীফাকে অনেক উপহার পাঠান। শেখ আলাউদ্দীন বুখারি নামক একজন প্রবাসী ভারতীয় সাধুকে এবং মিশর ও দামাস্কাসের অনেক লোককেও তিনি উপহার পাঠিয়েছেন।

জলালুদ্দীন ৮৩৪ হিজরার মুদ্রায় সর্বপ্রথম 'খলীফৎ আল্লাহ' উপাধি মুদ্রিত দেখা যায়। এর ঠিক আগের বছর তিনি খলীফার কাছ থেকে সম্মান-পরিচ্ছদ লাভ

করেছিলেন। সুতরাং তিনি তাঁর মুদ্রায় খলীফার প্রতি আনুগত্য স্বীকার না করে নিজেকে 'আল্লাহ্‌র খলীফা' বলে ঘোষণা করলেন কেন ? যতদূর মনে হয়, জলালুদ্দীন খলীফার অনুমতি নিয়েই নিজেকে 'আল্লাহ্‌র খলীফা' বলে ঘোষণা করেছিলেন; খলীফার জলালুদ্দীনকে সম্মান-পরিচ্ছদ দান আসলে এই ঘোষণা করারই অনুমোদন দান বলে মনে হয়।...

এই সমস্ত বিষয় থেকে বোঝা যায়, ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পরে জালালুদ্দীন মনে প্রাণে একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান হয়ে উঠেছিলেন এবং নানা সাধারণ ও অসাধারণ বিষয়ের অনুষ্ঠান করে তিনি তাঁর ধর্ম-প্রীতি চরিতার্থ করেছিলেন।"[৩১]

দেখা যাচ্ছে, একজন 'জাত মুসলমান' না হয়েও সুলতান জলাল-উদ-দীন মুহম্মদ শাহ্ বাংলার মুসলিম সালতানাতের সুপ্রতিষ্ঠার জন্য অনেক কিছুই করেছেন। তাতে রাজা গণেশের পরিকল্পনা বাংলায় সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে এবং বাংলাদেশ অগ্রসর হয়েছে হযরত নূর কুতুব আলমের প্রত্যাশিত পথেই।

---

৩১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৯-১৬২।

পঞ্চদশতম অধ্যায়

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট–ক	ঃ	বাংলার স্বাধীন সুলতানদের বংশ ও কালানুক্রমিক তালিকা
পরিশিষ্ট–খ	ঃ	মুসলিম আমলে বাংলার শাসনকর্তাদের কালানুক্রমিক তালিকা
পরিশিষ্ট -গ	ঃ	British·Governors General and Viceroys
পরিশিষ্ট - ঘ	ঃ	পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নরগণ
পরিশিষ্ট -ঙ	ঃ	স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতিগণ
পরিশিষ্ট -চ	ঃ	ইংরেজদের প্রাথমিক লুণ্ঠন তালিকা
পরিশিষ্ট-ছ	ঃ	পলাশী ষড়যন্ত্রীদের কয়েকজন কে কিভাবে মরেছিলেন
পরিশিষ্ট-জ	ঃ	'তখ্‌ত্‌ মোবারক'
পরিশিষ্ট-ঝ	ঃ	হিজরা ও খ্রীস্টাব্দের তালিকা
পরিশিষ্ট-ঞ	ঃ	ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কীর্তি কাহিনী
পরিশিষ্ট-ট	ঃ	বাংলা সাহিত্যের ধারা ঃ একুশে ফেব্রুয়ারী
পরিশিষ্ট-ঠ	ঃ	আমাদের সাহিত্য চর্চায় মহান একুশের তাৎপর্য
পরিশিষ্ট-ড	ঃ	'বায়ান্ন-তেপান্ন-চুয়ান্ন'র দ্যুতি

পরিশিষ্ট-ক

বাংলার স্বাধীন সুলতানদের বংশ ও কালানুক্রমিক তালিকা

মুসলিম আমলে ১৩৩৮ সাল থেকে ১৫৩৮ সাল পর্যন্ত দু'শ বছর বাংলা ছিল স্বাধীন। তখন বিভিন্ন বংশের সুলতানেরা এই দেশ শাসন করেন। এর আগে ও পরে বাংলা যখন দিল্লী-সালতানাত ও দিল্লী-বাদশাহীর অন্তর্ভুক্ত একটি রাজ্য বা সুবামাত্র, তখনকার শাসনকর্তাগণ বংশানুক্রমিকভাবে এখানে নিয়োজিত হননি। ১২০৩ সাল থেকে ১২২৭ সাল পর্যন্ত সময়টা ছিল খিলজীদের শাসন আমল । তখন চারজন শাসনকর্তা পাঁচটি 'টার্মে' বাংলা (লখনৌতি রাজ্য) শাসন করেন; তাঁরা ছিলেন পরস্পরের সহকর্মী বা সহযোদ্ধা– তাদের পরিচয় বংশানুক্রমিক ছিল না। মুঘল যুগেও ১৫৭৬ সাল থেকে ১৭১৭ সাল পর্যন্ত সময়টাও বিভিন্ন শাসনকর্তা দিল্লী কর্তৃক নিয়োজিত হয়েছেন। কিন্তু ১৭১৭ সালের পর নবাব মুর্শিদ কুলী খানের সময় থেকে আবার বংশানুক্রমিক বা বংশ সংশ্লিষ্ট শাসনের রীতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। নিচে সুলতান বা নবাবদের বংশ ও কালানুক্রমিক পরিচয় তুলে ধরা হলো।

(ক) মুবারক শাহী বংশের সুলতানগণ ও আলী শাহ্

	নাম	শাসনকাল
(১)	ফখর-উদ-দীন মুবারক শাহ্ [১]	৭৩৯-৭৫০ হিজরা
(২)	ইখতিয়ার-উদ-দীন গাজী শাহ্[২] {(১)-এর পুত্র}	৭৫০-৭৫৩ হিজরা
(৩)	আলা-উদ-দীন আলী শাহ্[৩]	৭৪২-৭৪৩ হিজরা

(খ) ইলিয়াস শাহী বংশের সুলতানগণ

	নাম	শাসনকাল
(৪)	শামস-উদ-দীন ইলিয়াস শাহ্	৭৪৩-৭৫৯ হিজরা
(৫)	সিকান্দার শাহ্ {(৪)-এর পুত্র।	আনুঃ ৭৫৯-৭৯৩ হিজরা
(৬)	গিয়াস-উদ-দীন আজম শাহ্ {(৫)-এর পুত্র}	আনুঃ ৭৯৩-৮১৩[৩] হিজরা
(৭)	সাইফ-উদ-দীন হামজা শাহ্ {(৬)-এর পুত্র}	৮১৩-৮১৫ হিজরা
(৮)	শামস-উদ-দীন (?)মুহম্মদ শাহ্ {(৭)-এর পুত্র}	

---

১. সোনারগাঁও-এর সুলতান।

২. লাখনৌতির সুলতান।

৩. এর আগে অন্তত ৭৯১-৭৯২ হিজরায় ইনি পূর্ব বঙ্গে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেছিলেন।

(গ) বায়েজীদ শাহী বংশের সুলতানগণ

	নাম	শাসনকাল
(৯)	শিহাব-উদ-দীন বায়েজীদ শাহ্	৮১৫-৮১৭ হিজরা
(১০)	আলা-উদ-দীন ফিরোজ শাহ্ {(১ম) (৯)-এর পুত্র}	৮১৭ হিজরা

(ঘ) রাজা গণেশ ও তার বংশের সুলতানগণ

	নাম	শাসনকাল
(১১)	রাজা গণেশ বা দনুজমর্দনদেব	৮১৮ হি- ৮২০-৮২১ হিজরা
(১২)	জালাল-উদ-দীন মুহম্মদ শাহ্ {(১১)-এর পুত্র}	৮১৮-৮১৯ হিজরা
		৮২১-৮৩৬ হিজরা
(১৩)	মহেন্দ্রদেব {(১১)-এর দ্বিতীয় পুত্র }	৮২১ হিজরা
(১৪)	শামস-উদ-দীন আহ্মদ শাহ্ {(‘১২)-এর পুত্র}	আনু. ৮৩৬-৮৩৯ হিজরা

(ঙ) পরবর্তী ইলিয়াস শাহী বা মাহ্মুদ শাহী বংশের সুলতানগণ

	নাম	শাসনকাল
(১৫)	নাসির-উদ-দীন মাহ্মুদ শাহ্	আনু.ঃ ৮৩৯-৮৬৪ হিজরা
(১৬)	রুকন-উদ-দীন বারবক শাহ্ {(১৫)-এর পুত্র}	আনু.৮৬০-৮৮১[৪] ”
(১৭)	শামস-উদ-দীন ইউসুফ শাহ্ { (১৬)-এর পুত্র}	৮৭৯-৮৮৫ ’
(১৮)	সিকান্দার শাহ্ {(১৭)-এর পুত্র}	কিছুদিন
(১৯)	জালাল-উদ-দীন ফতেহ শাহ্ {(১৫)-এর পুত্র}	৮৮৬-৮৯৩ ”

(চ) আবিসিনীয় সুলতানগণ

	নাম	শাসনকাল
(২০)	বারবক শাহ্ বা সুলতান শাহজাদা	৮৯৩ হিজরা (মাস ছ’য়েক)
(২১)	সাইফ-উদ-দীন ফিরোজ শাহ্	৮৯৩-৮৯৬[৫] ”
(২২)	কুতুব-উদ-দীন মাহ্মুদ শাহ্ {(২১)-এর পুত্র}	৮৯৬ ”
(২৩)	শামস-উদ-দীন মুজাফ্ফর শাহ্	৮৯৬-৮৯৮”

---

৪. রুকন-উদ-দীন বারবক শাহ্ ৮৬০-৮৬৪ হিজরায় তাঁর পিতা নাসির-উদ-দীন মাহমুদ শাহ্র সঙ্গে এবং ৮৭৯-(আনুঃ) ৮৮১ হিজরায় পুত্র শামস-উদ-দীন ইউসুফ শাহ্র সঙ্গে যুক্তভাবে রাজত্ব করেন।

৫. এর আগে ৮৮৭-৮৯৩ হিজরায় উত্তরঙ্গে ‘বিরল’-এর ছোট অঞ্চলে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেছিলেন।

(ছ) হোসেন শাহী বংশের সুলতানগণ

	নাম	শাসনকাল	
(২৪)	আলা-উদ-দীন হোসেন শাহ্	৮৯৮–৯২৫	হিজরা
২৫.	নাসির-উদ-দীন নসরত শাহ্ [(২৪)-এর পুত্র]	৯২৫–৯৩৮[৬]	"
(২৬)	আলা-উদ-দীন ফিরোজ শাহ্ (২য়) [(২৫)-এর পুত্র]	৯৩৮–৯৩৯	"
(২৭)	গিয়াস-উদ-দীন মাহ্মুদ শাহ্ [(২৪)-এর পুত্র]	৯৩৯–৯৪৫[৭]	"

(জ) মুর্শিদাবাদের নবাবগণ

	নাম	শাসনকাল	
(২৮)	নবাব মুর্শিদ কুলী জাফর খান	১৭১৭–১৭২৭	খৃস্টাব্দ
(২৯)	নবাব শুজা-উদ-দীন মুহম্মদ খান [(২৮)-এর জামাতা]	১৭২৭–১৭৩৯	"
(৩০)	নবাব সরফরাজ খান [(২৯)-এর পুত্র, (২৮)-এর দৌহিত্র]	১৭৩৯–১৭৪০	"
(৩১)	নবাব আলীওয়ার্দী খান (নবাব সরফরাজকে যুদ্ধে হত্যা করে মসনদ অধিকার করেন)	১৭৪০–১৭৫৬	"
(৩২)	নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাহ্ [(৩১)-এর দৌহিত্র]	১৭৫৬–১৭৫৭	"
(৩৩)	নবাব মীর জাফর আলী খান [(৩১)-এর বৈমাত্রেয় বোনের স্বামী]	১৭৫৭–১৭৬০	"
(৩৪)	নবাব মীর কাশেম আলী খান [(৩৩)-এর জামাতা]	১৭৬০–১৭৬৩	"
(৩৫)	নবাব মীর জাফর আলী খান	১৭৬৩–১৭৬৫	"
(৩৬)	নবাব-নাজিম নজম-উদ-দৌলাহ্ [(৩৩)-এর পুত্র]	১৭৬৫–১৭৬৬	"
(৩৭)	নবাব-নাজিম সাইফ-উদ-দৌলাহ্ [(৩৩-এর পুত্র]	১৭৬৬-১৭৭০	"

---

৬. নসরত শাহ্ ৯২৫ হিজরার আগে কয়েক বছর পিতা আলা-উদ-দীন হোসেন শাহ্‌র সঙ্গে যুক্তভাবে রাজত্ব করেছিলেন।

৭. মাহমুদ শাহ্ নসরত শাহ্‌র রাজত্বের শেষ দিকে স্বনামে মুদ্রা প্রকাশ করেছিলেন।

পরিশিষ্ট–খ

মুসলিম আমলে বাংলার শাসনকর্তাদের কালানুক্রমিক তালিকা

(ক) বাংলায় লাখনৌতি রাজ্যের প্রতিষ্ঠা-কাল (১২০৩–১২২৭ সাল)

বাংলার শাসনকর্তা (শাসন-কাল)	দিল্লীর মসনদে উপবিষ্ট তখন–
ইখতিয়ার-উদ-দীন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী (১২০৩–১২০৬)	সুলতান মুহম্মদ গূরীর প্রতিনিধি কুতুব-উদ-দীন আইবক
মুহম্মদ শীরন খিলজী (১২০৬–১২০৮)	সুলতান কুতুব-উদ-দীন আইবক (১২০৬–১২২১)
হুসাম-উদ-দীন ইওজ খিলজী (১২০৮–১২১০)	ঐ
আলা-উদ-দীন আলী মর্দান খিলজী (১২১০–১২১২) হুসাম-উদ-দীন ইওজ খিলজী ওরফে সুলতান গিয়াস-উদ-দীন ইওজ খিলজী (১২১২–১২২৭)	সুলতান কুতুব-উদ-দীন আইবকের পুত্র আরাম শাহ্, পরে জামাতা সুলতান ইলতুতমিশ বা আলতামাশ (১২১১-১২৩৬)

(খ) বাংলায় লাখনৌতি রাজ্যের বিস্তৃতি-কাল (১২২৭–১২৩৮ সাল) দিল্লীর পূর্ণ আনুগত্য কাল (১২২৭–১২৭২)

নাসির-উদ-দীন মাহ্মুদ (১২২৭–১২২৯) (সুলতান আলতামাশের জ্যেষ্ঠ পুত্র)	ঐ
দওলত শাহ্ বিন মওদুদ (১২২৯-এ কিছুদিন)	ঐ
ইখতিয়ার-উদ-দীন বলখা খিলজী (১২৩০ সাল)	ঐ
মালিক আলা-উদ-দীন জানী (১২৩১–১২৩২)	ঐ
মালিক সাইফ-উদ-দীন আইবক (১২৩২-১২৩৫)	ঐ
আওর খান (১২৩৫-এ কিছুদিন)	ঐ

তুগরল তুগান খাঁ (১২৩৬–১২৪৫)	সুলতানা রাজিয়া (১২৩৬–১২৪০); তাঁর ভাই বাহরাম শাহ্ (১২৪০–১২৪২); অন্য ভাই মাসউদ শাহ্ (১২৪২–১২৪৬)।
মালিক ওমর খান কিরান (১২৪৫–১২৪৭)	সুলতান নাসির-উদ-দীন মাহ্মুদ, সুলতান আলতামাশের কনিষ্ঠ পুত্র (১২৪৬–১২৬৬)
মালিক জালাল-উদ-দীন মাসুদ জানী (১২৪৭–১২৫১)	ঐ
মালিক ইখতিয়ার-উদ-দীন ইওজবক (১২৫১–১২৫৭)	ঐ
মালিক ইয্যুদ্দীন বলবন-ই-ইওজবকী (১২৫৭–১২৫৯)	ঐ
মালিক তাজ-উদ-দীন আরসালান খাঁ (১২৫৯–১২৬৫)	ঐ
তাতার খান (১২৬৫–১২৬৮)	সুলতান নাসির-উদ-দীনের শ্বশুর
শের খান আমীন খান ও তুগরীল (১২৭২)	সুলতান গিয়াস-উদ-দীন বলবন (১২৬৬–১২৮৭)

(গ) স্বাধীনতা প্রয়াস-কাল (১২৭২–১৩৩৮)

সুলতান মুগীস-উদ-দীন তুগরীল (১২৭২-১২৮১)	ঐ
সুলতান নাসির-উদ-দীন বুগরা খান (১২৮১–১২৯১) (সুলতান বলবনের দ্বিতীয় ও কনিষ্ঠ পুত্র)	১২৮৭ সালে সুলতান বলবনের মৃত্যুর পর বুগরা খানের পুত্র সুলতান কায়কোবাদ (১২৮৭–১২৮৯) ; সুলতান কায়কোবাদ পুত্র সুলতান কায়মোর্স (১২৮৯–১২৯০); অতঃপর সুলতান জালাল-উদ-দীন ফিরোজ খিলজী (১২৯০–১২৯৬)
সুলতান রুকন-উদ-দীন কায়কাউস (১২৯১–১৩০১)	সুলতান ফিরোজ খিলজী; অতঃপর সুলতান ফিরোজের ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা সুলতান আলা-উদ-দীন খিলজী (১২৯৬–১৩১৬)

সুলতান শামস-উদ-দীন ফিরোজ শাহ্ দেহলভী (১৩০১-১৩২২)	সুলতান আলা-উদ-দীন খিলজীর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র কুতুব-উদ-দীন মুবারক শাহ্ (১৩১৬-১৩২০)
সুলতান গিয়াস-উদ-দীন বাহাদুর (১৩২২-১৩২৮)	সুলতান গিয়াস-উদ-দীন তুগলক(১৩২০-১৩২৫); অতঃপর তাঁর পুত্র সুলতান মুহম্মদ বিন তুগলক (১৩২৫-১৩৫১)
বাহরাম খান–সোনারগাঁও (১৩২৮-১৩৩৮) নাসির-উদ-দীন ইবরাহীম–লাখনৌতি আযম-উল-মুল্ক–সাতগাঁও	সুলতান মুহম্মদ বিন তুগলক

(ঘ) বাংলায় ভিন্ন ভিন্ন স্বাধীন জনপদ (১৩৩৮-১৩৫২ সাল)

সোনারগাঁও

সুলতান ফখর-উদ-দীন মুবারক শাহ্ (১৩৩৮-১৩৪৮)	ঐ
সুলতান ইখতিয়ার-উদ-দীন গাজী শাহ্ (১৩৪৯-১৩৫২) **লাখনৌতি ও সাতগাঁও** সুলতান আলা-উদ-দীন আলীশাহ্ (১৩৩৮-১৩৪২) সুলতান শামস-উদ-দীন ইলিয়াস শাহ্ (১৩৪২-১৩৫২)	১৩৫২ সালে সুলতান মুহম্মদ বিন তুগলকের মৃত্যু হলে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র সুলতান ফিরোজ শাহ্ তুগলক(১৩৫১-১৩৮৮)।

(ঙ) একীভূত স্বাধীন বাঙ্গালা সালতানাত (১৩৫২-১৫৩৮ সাল)

(এক) ইলিয়াস শাহী বংশ

সুলতান শামস-উদ-দীন ইলিয়াস শাহ্ (১৩৫২-১৩৫৭); সুলতান সিকান্দার শাহ্ (১৩৫৭-১৩৯৩); সুলতান গিয়াস-উদ-দীন আজম শাহ্ (১৩৯৩-১৪১১); সুলতান সাইফ-উদ-দীন হামজা শাহ্ (১৪১১-১৪১২)	১৩৮৮ সালে সুলতান ফিরোজ তুগলকের মৃত্যু হলে তাঁর বংশের ৫ জন দুর্বল সুলতান একের পর এক মসনদে বসেন। শেষের জনের নাম সুলতান নাসির-উদ-দীন মাহ্মুদ শাহ্ (১৩৯৪-১৪১৩)।

(চ) ব্রাক্ষণ্য পুনরুত্থান প্রয়াস-কাল (১৪১২–১৪১৮ সাল)

সুলতান শিহাব-উদ-দীন বায়েজীদ শাহ্ (১৪১২–১৪১৫)
সুলতান আলা-উদ-দীন ফিরোজ শাহ্ (১৪১৫-এর কিছুদিন)
রাজা গণেশ (বিশৃঙ্খলা পরিবর্তনসহ (১৪১৫–১৪১৮)

খিজির খান* (১৩১০–১৩২১)

(ছ) আবার সালতানাত আমল (১৪১৮–১৪৩৫/৩৬ সাল)

সুলতান জালাল-উদ-দীন মুহম্মদ শাহ্(১৪১৮–১৪৩৩)
সুলতান শামস্-উদ-দীন আহমদ শাহ্(১৪৩৩–১৪৩৫/৩৬)

খিজির খানের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মুইজ-উদ-দীন মুবারক শাহ্ (১৩২১–১৩৩৪) মসনদে বসেন।

(জ) পরবর্তী ইলিয়াস শাহী আমল (১৪৩৬–১৪৮৭ সাল)

সুলতান নাসির-উদ-দীন মাহ্মুদ শাহ্ (১৪৩৬–১৪৫৯-৬০)
সুলতান রুকন-উদ-দীন বারবক শাহ্ (১৪৫৯-৬০–১৪৭৪)
সুলতান শামস-উদ-দীন ইউসুফ শাহ্ (১৪৭৪–১৪৮১)
সুলতান জালাল-উদ-দীন ফতেহ্ শাহ্ (১৪৮১–১৪৮৭)

মুবারক শা'র ভ্রাতুষ্পুত্র মুহম্মদ শাহ্ (১৪৩৪–১৪৪৪); তাঁর পুত্র আলা-উদ-দীন আলম শাহ (১৪৪৪–১৪৫১)। অতঃপর দিল্লীর মসনদ অধিকার করেন বাহ্লুল লোদী (১৪৫১–১৪৮৯)

---

* ১৩৯৮ সালে তৈমুর লং ভারত আক্রমণ করলে দিল্লী ও অন্যান্য অঞ্চল তৈমুরের পদানত হয়। সৈয়দ খিজির খাঁকে মুলতান, লাহোর ও দিপালপুরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে তৈমুর লং ভারত ত্যাগ করেন। পলায়িত দিল্লীর সুলতান মাহমুদ শাহ্ এর পর দিল্লীতে ফিরে এসে ৯ বছরের মত কোন রকমে মসনদে টিকে থাকেন। দিল্লী সাম্রাজ্য তখন ভেঙে গিয়ে জৌনপুর, গুজরাট, মলব, খান্দেশ, গোয়ালিয়র প্রভৃতি কয়েকটি স্বাধীন রাজ্যের সৃষ্টি হয়। মাহ্মুদ শা'র মৃত্যুর পর আমীরগণ দৌলত খান লোদীকে মসনদে বসান। কিন্তু খিজির খান তাঁকে বিতাড়িত করে নিজেই দিল্লীর মসনদে বসেন।

(ঝ) আবিসিনীয় শাসন আমল (১৪৮৭-১৪৯৩ সাল)

সুলতান শাহ্জাদা বারবক শাহ (১৪৮৭-তে প্রায় ৬ মাস)	সুলতান বাহ্লুল লোদী
সুলতান সাইফ-উদ-দীন ফিরোজ শাহ্ (১৪৮৭-১৪৯০)	ঐ
সুলতান কুতুব-উদ-দীন শাহ্ (১৪৯০-১৪৯১)	সুলতান সিকান্দার লোদী (১৪৮৯-১৫১৭)
সুলতান শামস-উদ-দীন মুজাফফর শাহ্ (১৪৯১-১৪৯৩)	ঐ

(ঞ) হোসেন শাহী আমল (১৪৯৩-১৫৩৮ সাল)

সুলতান আলা-উদ-দীন হোসেন শাহ্ (১৪৯৩-১৫১৯) সুলতান নাসির-উদ-দীন নসরত শাহ্ (১৫১৯-১৫৩১-৩২) সুলতান আলা-উদ-দীন ফিরোজ শাহ্ (১৫৩১-৩২-১৫৩৩) সুলতান গিয়াস-উদ-দীন মাহ্মুদ শাহ্ (১৫৩৩-১৫৩৮)	১৫১৭ সালে সুলতান সিকান্দার লোদীর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সুলতান ইবরাহীম লোদী (১৫১৭-১৫২৬)। অতঃপর দিল্লী অধিকার করেন মুগল সম্রাট জহির-উদ-দীন বাবর (১৫২৬-১৫৩০)। তারপর বাবর-পুত্র সম্রাট হুমায়ুন (১৫৩০-১৫৪০)।

(ট) আফগান শাসন আমল (১৫৩৯-১৫৭৫ সাল)

জাহাঁগীর কুলী বেগ (১৫৩৯-১৫৪০)	সম্রাট হুমায়ুন। সুলতান ফরীদ-উদ-দীন
খিজির খান (১৫৪০-১৫৪৫)	শের শাহ্ (১৫৪০-১৫৪৫) শের শাহের পুত্র ইসলাম শাহ্ (১৫৪৫-১৫৫৪)।
শামস-উদ-দীন মুহম্মদ খান সূর (১৫৪৫-১৫৫৫)	সম্রাট হুমায়ুন (১৫৫৫-১৫৫৬)। সম্রাট জালাল-উদ-দীন মুহম্মদ আকবর(১৫৫৬-১৬০৫)।
সুলতান গিয়াস-উদ-দীন বাহাদুর শাহ্	ঐ
সুলতান গিয়াস-উদ-দীন জালাল শাহ্ (১৫৬০-১৫৬৩)	সম্রাট জালাল-উদ-দীন মুহম্মদ আকবর (১৫৫৬-১৬০৫ সাল)

সুলতান গিয়াস উদ-দীন (১৫৬৩–১৫৬৪)	ঐ
সুলতান তাজ খান কররানী (১৫৬৪–১৫৬৫)	ঐ
সুলায়মান খান কররানী (১৫৬৫–১৫৭২)	ঐ
দাউদ খান কররানী (১৫৭২–১৫৭৫)	ঐ

(ঠ) মুঘল সাম্রাজ্যের অধীনে সুবে বাঙ্গালা (১৫৭৬–১৭১৭ সাল)

সুবাদার হোসেইন কুলী (১৫৭৬–১৫৭৮)	ঐ
সুবাদার মুজাফ্‌ফর খান তুরবতী (১৫৭৯–১৫৮০)	ঐ
সুবাদার খান-ই-আযম মির্যা আযীয কোকাহ্‌ (১৫৮১–১৫৮৩)	ঐ
সুবাদার শাহ্‌বাজ খান (১৫৮৩–১৫৮৫)	ঐ
সুবাদার সাদেক খান (১৫৮৫–১৫৮৬)	ঐ
সুবাদার ওয়াযির খান (১৫৮৬–১৫৮৭)	ঐ
সুবাদার সাঈদ খান (১৫৮৭–১৫৯৪)	ঐ
সুবাদার রাজা মানসিংহ (১৫৯৪–১৬০৬)	ঐ
সুবাদার শেখ কুতুব-উদ-দীন খান কোকাহ্‌ (১৬০৬–১৬০৭)	১৬০৫ সালে সম্রাট আকবরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র নূর-উদ-দীন মুহম্মদ জাহাঁগীর বা জাহাঙ্গীর (১৬০৫–১৬২৭)।
সুবাদার জাহাঁগীর কুলী (১৬০৭–১৬০৮)	
সুবাদার ইসলাম খান (১৬০৮–১৬১৩)	
সুবাদার শেখ কাশেম খান চিশ্‌তী (১৬১৩–১৬১৭)	ঐ
সুবাদার ইবরাহীম খান ফতেহ্‌ জং (১৬১৭–১৬২৫)	ঐ
সুবাদার দারাব খান (১৬২৪–১৬২৫)	ঐ
সুবাদার মহব্বত খান (১৬২৫–১৬২৬)	ঐ
সুবাদার শেখ মুকাররম খান চিশ্‌তী (১৬২৬–১৬২৭)	সম্রাট জাহাঁগীরের তৃতীয় পুত্র (শাহ্‌যাদা খুররম) আবুল মুজাফ্‌ফর শিহাব-উদ-দীন মুহম্মদ শাহ্‌জাহান (১৬২৭–১৬৫৮)।
সুবাদার মির্যা হেদায়েতুল্লাহ্‌ ফিদাই খান (১৬২৭–১৬২৮)	ঐ
সুবাদার কাশেম খান জুইনী (১৬২৮–১৬৩২)	ঐ

সুবাদার মীর মুহম্মদ বকর আজম খান (১৬৩২–১৬৩৫)	ঐ
সুবাদার ইসলাম খান মাশ্‌হাদী (১৬৩৫–১৬৩৯)	সম্রাট মুহি-উদ-দীন মুহম্মদ আওরঙ্গজেব আলমগীর (১৬৫৮–১৭০৭)।
সুবাদার শাহ্‌যাদা শুজা (১৬৩৯–১৬৬০)	ঐ
সুবাদার মীর জুমলা (১৬৬০–১৬৬৩)	
সুবাদার শায়েস্তা খান (১৬৬৩–১৬৭৮)	
সুবাদার ফিদাই খান (১৬৭৮ সাল)	
সুবাদার শাহ্‌যাদা মুহম্মদ আজম (১৬৭৮–১৬৭৯)	
সুবাদার শায়েস্তা খান (১৬৭৯–১৬৮৮)	
সুবাদার খান-ই-জাহান (১৬৮৮–১৬৮৯)	
সুবাদার ইবরাহীম খান (১৬৮৯–১৬৯৭)	
সুবাদার আযীম-উশ্‌-শান (১৬৯৭–১৭১২)	সম্রাট শাহ্‌ আলম বাহাদুর শাহ্‌ (১৭০৭–১৭১২)।
সুবাদার খান-ই-আলম (১৭১২–১৭১৩ জানুয়ারী)	সম্রাট জাহান্দার শাহ্‌ (১৭১২–১৭১৩ জানুয়ারী)
সুবাদার দ্বিতীয় মীর জুমলা (অনুপস্থিত) (১৭১৩–১৭১৭)	সম্রাট ফররুখসিয়র (১৭১৩–১৭১৯)

(ড) মুর্শিদাবাদ নিয়াবত (শাসন) আমল (১৭১৭–১৭৬৫ সাল)

নবাব-সুবাদার মুর্শিদ কুলী খান (১৭১৭-১৭২৭) নবাব সুবাদার শুজা-উদ-দীন মুহম্মদ খান (১৭২৭–১৭৩৯) নবাব-সুবাদার সরফরাজ খান (১৭৩৯–১৭৪০) নবাব-সুবাদার আলী ওয়ার্দী খান (১৭৪০–১৭৫৬) নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাহ্‌ (১৭৫৬–১৭৫৭) নবাব মীর জাফর আলী খান (১৭৫৭-১৭৬০) নবাব মীর কাশেম আলী খান (১৭৬০-১৭৬৩) নবাব মীর জাফর আলী খান (১৭৬৩-১৭৬৫)	১৭১৯ সালে সম্রাট ফররুখসিয়রের মৃত্যুর পর কিছুদিন সম্রাট রফি-উদ-দরজাত ও সম্রাট রফি-উদ- দৌলাহ্‌ ; অতঃপর সম্রাট মুহম্মদ শাহ্‌ (১৭১৯–১৭৪৮)। অতঃপর তাঁর পুত্র সম্রাট আহ্‌মদ শাহ্‌ (১৭৪৮- ১৭৫৪) ; জাহান্দার শা'র পুত্র দ্বিতীয় আলমগীর (১৭৫৪–১৭৫৯); সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্‌ আলম (১৭৫৯–১৮০৬)।

(ঢ) মুর্শিদাবাদ নাজিমী আমল (১৭৬৫–১৮৫৪ সাল)

নবাব-নাজিম নজম-উদ-দৌলাহ্ (১৭৬৫–১৭৬৬, মে)	ঐ
নবাব-নাজিম সাইফ-উদ-দৌলাহ্ (১৭৬৬–১৭৭০)	ঐ
নবাব-নাজিম মুবারক-উদ-দৌলাহ্ (১৭৭০–১৭৯৬)	ঐ
নবাব-নাজিম বাবর জং (১৭৯৬–১৮১০)	১৮০৬ সালে দ্বিতীয় শাহ্ আলমের মৃত্যুর পর দ্বিতীয় আকবর।
নবাব-নাজিম আলী খাঁ (১৮১০–১৮২১)	
নবাব-নাজিম ওয়ালাজাঁ (১৮১২–১৮২৫)	ঐ
নবাব-নাজিম হুমায়ুন জাঁ (১৮২৫–১৮৩৮)	
নবাব-নাজিম মনসুর আলী খান বা ফেরিদুন জাঁ (১৮৩৮–১৮৮৪)	তদীয় পুত্র দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্ জাফর (১৮৩৭–১৮৫৭)।

পরিশিষ্ট -গ

British Governors-General and Viceroys 1774-1947
(Temporary and officiating in asterisk*)

Governor-Generals of Fort William in Bengal, Regulating Act 1773

	Appointment date	
Warren Hastings	October	1774
Sir John Macpherson*	February	1785
Earl (Marquess) Cornwallis	September	1786
Sir John Shore		1793
Sir A Clarke*	March	1798
Earl of Mornington (Marquess Wellesley)	May	1798
Marquess Cornwallis (Second term)	July	1805
Sir George Barlow*	October	1805
Baron (Earl of) Minto [1]	July	1807
Earl of Moira (Marquess of Hastings)	October	1813
John Adam*	Jnuary	1823
Baron (East Amherst)	August	1823
W. B. Bailey*	March	1828
Governor-Generals of India, Charter Act	**1833**	
Lord william Bentinck		1833
Sir Charles Metcalfe*	March	1835
Baron (Earl of) Auckland	March	1836
Baron (Earl) Ellenborough	February	1842
W. W. Bird*	June	1844
Sir Henry (Viscount) Hardinge	July	1844
Earl (Marquess) of Dalhousie	January	1848
Viscount (Earl) Canning	February	1856
Governor-Generals and Viceroys		
Viscount (Earl) Canning	November	1858
Earl of Elgin 1	March	1862
Sir Robert Napler*		1863
Sir William Denison*		1863

Sir John (Lord) Lawrence	January	1864
Earl of Mayo	January	1869
Sir John Strachey*		1872
Lord Napier of Merchistoun*		1872
Baron (Earl of) Northbrook	May	1872
Baron (Earl of) Lytton1	April	1876
Marquess of Ripon	June	1880
Earl of Dufferin (Marquess of Dufferin and Ava)	December	1884
Marquess of Lansdowne	December	1888
Earl of Elgin ll	January	1894
Baron (Marquess) Curzon	January	1899
Lord Ampthill*	April	1904
Marquess Curzon (reappointed)	December	1904
Earl of Minto ll	November	1905
Baron Hardinge of Penshurst	November	1910
Baron Chelmsford	April	1916
Earl of Reading	April	1921
Lord Lytton ll*		1925
Lord lrwin	April	1926
Earl of Willingdon	April	1931
Sir George Stanley*		1934
Marquess of Linlithgow	April	1936
Governor-Generals and Crown Representatives Act of 1935		
Marquess of Linlithgow	March	1937
Baron Brabourne*		1938
Marquess of Linlithgow		1938
Viscount (War) Wavell		1943
Sir John Colvill*		1945
Viscount (Earl) Mountbatten	March-August Last Viceroy of United India	1947
Governor-General, Indian Independence Act 1947		
Pakistan	August 1947-died	
M.A. Jinnah	September	1948

(Quoted from `A History of India' by Michael Edwardes, pp. 326-327)

এই পরিশিষ্টে গভর্নর, গভর্নর-জেনারেল ও ভাইসরয়দের নামের ও নিযুক্তি তারিখের উল্লেখসহ যে তালিকা দেওয়া হলো, তাতে কারও কারও মনে প্রশ্ন জাগতে পারে ঃ এঁদের অনেকেই তো ছিলেন সমগ্র ভারতের শাসনকর্তা! বাংলার শাসনকর্তা হিসাবে তাঁদের নাম আসবে কেন ? তাছাড়া বেশ কিছুদিন ধরে বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন লেফ্‌টেন্যান্ট-গভর্নরগণ– তাঁদের নাম কোথায় ? তদুপরি, বিভিন্ন এ্যাক্টের উল্লেখ রয়েছে তালিকায়। তারই বা প্রয়োজন কি ?

এসব সম্ভাব্য প্রশ্নের উত্তরের জন্যই শাসনকর্তাদের সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করা প্রয়োজন। বাংলা-বিহার-উড়িষ্যায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম গভর্নর ছিলেন লর্ড ক্লাইভ (১৭৬৫-১৭৬৭ সাল)। গভর্নর হিসাবে লর্ড ক্লাইভ দিল্লীর নামেমাত্র সম্রাট শাহ্ আলমকে কারা ও এলাহাবাদ প্রদেশ দু'টি (এসব জায়গা তখন কোম্পানীর অধিকারে এসে গেছে) দান করে তার বিনিময়ে বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা কর দানের শর্তে সম্রাটের নিকট থেকে কোম্পানীর পক্ষে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানীর দায়িত্ব লাভ করেন। তখন থেকে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার রাজস্ব আদায়ের অধিকার লাভ করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী। নবাব-নাজিমগণের উপর ন্যস্ত থেকে যায় দেওয়ানীর দায়িত্বটুকু ছাড়া বাদবাকী প্রশাসনের দায়িত্ব। এই ব্যবস্থাকেই বলা হয় দ্বৈত শাসন। এই ব্যবস্থায় বাংলায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর গভর্নরগণ হচ্ছেন ঃ

লর্ড ক্লাইভ.....১৭৬৫-১৭৬৭ সাল।
ভেরেলস্ট ...১৭৬৭-১৭৬৯ সাল।
কার্টিয়ার ..... ১৭৬৯-১৭৭২ সাল।
ওয়ারেন হেস্টিংস ...... ১৭৭২-১৭৭৪ সাল।

১৭৭৩ সালেই পাস ও প্রবর্তিত হয় রেগুলেটিং এ্যাক্ট। "বৃটিশ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত চার্টার (Charter)-এর উপর নির্ভরশীল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর গঠনতন্ত্র পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রয়োজন মিটাইবার জন্য এবং কোম্পানীর কর্মচারিবর্গের অন্যায়-অত্যাচার বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে ১৭৭৩ খৃস্টাব্দে রেগুলেটিং এ্যাক্ট নামে একটি আইন বৃটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক গৃহীত হইল। রেগুলেটিং এ্যাক্ট অনুসারে কোম্পানীর গঠনতন্ত্রের পরিবর্তন সাধিত হইল। বাংলা দেশের গভর্নরকে 'গভর্নর জেনারেল' আখ্যা দেওয়া হইল।" (এ. কে. এম. আবদুল আলিম, ভারতে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস, কেন্দ্রীয় বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড, ১৯৬৯, পৃ. ৩৯৭)। ১৭৭৪ সাল থেকে গভর্নর ওয়ারেন হেস্টিংস হন প্রথম গভর্নর জেনারেল।

১৭৭৪ সাল থেকে ১৮৩৩ সাল পর্যন্ত গভর্নর জেনারেলগণ ছিলেন `Governors General Of Fort William in Bengal' এই পদবীর গভর্নর-জেনারেলগণ হলেন ঃ

ওয়ারেন হেস্টিংস...	অক্টোবর ১৭৭৪-১৭৮৬ সাল।
লর্ড কর্নওয়ালিস ...	সেপ্টেম্বর ১৭৮৬-১৭৯৩ সাল।

স্যার জন শোর ...	১৭৯৩ – মার্চ, ১৭৯৮ সাল।
লর্ড ওয়েলেসলি ...	মে ১৭৯৮ – জুলাই ১৮০৫ সাল।
স্যার জর্জ বাথো ...	অক্টোবর ১৮০৫ – জুলাই ১৮০৭ সাল।
লর্ড মিন্টো ...	জুলাই ১৮০৭ – অক্টোবর ১৮১৩ সাল।
লর্ড ময়রা বা মার্কুইস হেস্টিংস ...	অক্টোবর ১৮১৩ – আগস্ট ১৮২৩ সাল।
লর্ড আমহার্স্ট ...	আগস্ট ১৮২৩ – মার্চ ১৮২৮ সাল।
লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক ...	জুলাই ১৮২৮ – ১৮৩৫ সাল।

পরিশিষ্টের ইংরেজী তালিকায় আরও বিশদভাবে অস্থায়ী গভর্নর-জেনারেলদের নাম তারিখসহ উল্লিখিত আছে। ১৮৩৩ সালে বৃটিশ পার্লামেন্টে পাস হয় চার্টার এ্যাক্ট ১৮৩৩। এই এ্যাক্টে কোম্পানীকে আরও ২০ বছরের জন্য ভারতে বাণিজ্য করবার এবং ভারতে কোম্পানী অধিকৃত রাজ্যসমূহ 'ইংল্যান্ড-রাজের পক্ষে' শাসন করবার অনুমতি দেওয়া হয়। আর এই এ্যাক্ট অনুসারেই 'Governors General of Fort William in Bengal' আখ্যায়িত হন `Governors-General of India' রূপে। তখন কোম্পানী অধিকৃত ভারত-রাজ্যের প্রতি প্রদেশে একজন করে গভর্নর নিযুক্ত হন। 'গভর্নর-জেনারেল অব ইন্ডিয়া' সকলের প্রধান হয়ে থাকেন কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে। কারণ, কলকাতা তখন কোম্পানীর রাজ্যের রাজধানী। আর কলকাতায় গভর্নর-জেনারেল থাকতেন বলেই বাংলায় অর্থাৎ 'বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিতে কোন গভর্নর নিযুক্ত না করে তা গভর্নর-জেনারেলের দায়িত্বেই রাখা হয়। গভর্নর-জেনারেল হন একই সঙ্গে ভারতের গভর্নর-জেনারেল ও বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির গভর্নর। এতে করে গভর্নর-জেনারেলের কর্ম-পরিধি অনেক বেড়ে যাওয়ায় শুধুমাত্র বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির প্রশাসনে তাঁকে সাহায্য করার জন্য একজন লেফটেন্যান্ট গভর্নর বা উপশাসনকর্তা নিযুক্ত করার নিয়ম চালু হয়। ফলে, ভারতের গভর্নর-জেনারেলই থিয়োরেটিক্যালি থাকেন বাংলারও শাসনকর্তা। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির শাসনকর্তা থাকেন লেফ্‌টেন্যান্ট-গভর্নরগণ। ১৯১২ সালে কলকাতা থেকে রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত করার আগে পর্যন্ত এই ব্যবস্থাই চলতে থাকে। ১৯১২ সাল থেকে ইম্‌পেরিয়্যাল রাজধানী দিল্লীতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর 'গভর্নর-জেনারেল অব ইন্ডিয়া' দিল্লীতে থাকতে আরম্ভ করেন এবং প্রতি প্রদেশের বা প্রেসিডেন্সির মত বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিকেও একজন গভর্নরের শাসনাধীনে আনা হয়।

লেফ্‌টেন্যান্ট-গভর্নরের পদ সৃষ্টির আগে অবশ্য ডেপুটি গভর্নরের পদ সৃষ্টি করা হয়েছিল।"Under the Charter Act of 1833 the Governor-General of India was to be 'Governor of Presidency of Fort William in Bengal" and he was to be assisted in regard to the administration of Bengal–by

a Council consisting of three members. But no such council was created, and the Governor-General acting as Governor of Bengal was empowered to appoint any Ordinary Member of the Governor-General's Council as Deputy Governor of Bengal. The Deputy Governor would be `invested with all the powers and perform all the duties of the Governor without any additional salary.

This arrangement. although extremely unsatisfactory. remained in force for twenty years till the Charter Act of 1853 provided for the appointment of a Lieutenant-Governor for Bengal. But until the appointment of a separate Governor the Court of Directors could `authorise and direct the Governor-General of India in Council to Appoint from time to time any servant of the said Company who shall have been ten years in their service in India to the office of Lieutenant-Governor of such part of the territories under the presidency of Fort William in Bengal as for the time being may not be under the Lieutenant Governor of the North-Western Provinces, and to declare and limit the extent of the authority of the Lieutenant-Governor so appointed''(Dr. Dipasri Banerjee, Aspects of Administration in Bengal-1898-1912, 1980, P P. 3-4).

বোঝাই যাচ্ছে, বাংলায় গভর্নর নিয়োগের কোন সদিচ্ছা কোম্পানী-কর্তৃপক্ষের ছিল না। বোর্ড অব কন্ট্রোলের সভাপতি স্যার চার্লস উডের বক্তব্য থেকেও তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যাক, ১৮৫৩ সালের এ্যাক্ট অনুসারে লেফ্‌টেন্যান্ট-গভর্নর নিযুক্ত করা হলো। প্রথম লেফ্‌টেন্যান্ট-গভর্নর হলেন স্যার ফ্রেডারিক হ্যালিডে। ১৮৫৪ সালের ১লা মে তিনি দায়িত্ব বুঝে নিলেন। সে দায়িত্ব এক বিশাল এলাকা শাসনের দায়িত্ব।

``When the Lieutenant-Governorship of Bengal was created the territories under its jurisdiction had a total area of 2,53,000 square miles and an approximate population of about 40 millions. the territories were divided into seven portions, namely; (1) Bengal (about 85, 000 square miles) ; (2) Bihar (about 42,000 square miles); (3) Orissa (7,000 square miles); (4) Orissa Tributary Mahals (15,500 square miles); (5) Chhoto Nagpur and the Tributary States on the South-Western Frontier (62,000 square miles); (6) Assam (27,500 square miles); and (7) Arakan (14,000 square miles). Arakan was transferred to the Chief Commissioner of Burma in 1862. Assam was

placed under a Chief Commissioner in 1874; the Bengal districts of Sylhet and Cachhar were included in this new province. The South Lushai Hills district was transferred to Assam in 1898. After these adjustments Bengal had a total population of 7.84,93, 410 in 1901." (ibid. PP. 5-6)

এই বিশাল জনপদের যাবতীয় প্রশাসন কার্য যে এক গুরুভার দায়িত্ব ছিল, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। একথাই ১৮৬৭ সালে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছিলেন স্যর স্ট্যাফোর্ড নর্থকোট ঃ

"The position of the Lieutenant-Governor of Bengal is, in many respects, a difficult one. He is charged with the administration of an extensive and highly important presidency, and has to attend to a vast amount and a great variety of business, without being allowed the assistance of a Council, such as is attached to the Governments of the other presidencies, or of a Secretariat equal to those of Madras and Bombay. He is, therefore, necessarily overburdened with the details of daily work, and must have less time and less energy to devote to questions which are not absolutely forced upon his attention than the Governors of other presidencies are able to command."(ibid quoted, P. 8)

এই বিশালত্বের অসুবিধাই পরবর্তীতে লর্ড কার্জন দূর করতে চেয়েছিলেন বাংলাকে বিভক্ত করে। কিন্তু বাংলার অমুসলিমদের আন্দোলনের মুখে সেই বিভক্তি রদ হয়ে যায় ১৯১১ সালের শেষ দিকে। এই বিভক্তিকে রদ করতে আন্দোলনকারীদের যে যে শর্তে রাজী হতে হয়েছিল, তার মধ্যে কলকাতা থেকে রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত করায় সম্মতিদান ছিল অন্যতম।

এবার আমরা বাংলায় লেফ্‌টেন্যান্ট-গভর্নরদের তালিকা নিচে তুলে ধরছি ঃ

The Lieutenant-Governors of Bengal

1.	Sir Frederick James Halliday, K.C.B...	May 1, 1851
2.	Sir John Peter Grant, K.C.B ... G. C. M. G...	May 1, 1859
3.	Sir Cecil Beadon, K. C.S.I...	April 23, 1862
4.	Sir William Grey. K.C.S. I...	April 23, 1867
5.	Sir George Campbell, M.P.K.C.S.I,D.C.L.	March 1, 1871
6.	The Right Hon`ble Sir Richard Temple, Bart., M.P.,G.C.S.I.,C.I.E.,D,C.L.,F.R.S...	April 9, 1874

7. The Hon`ble Sir Ashley Eden, K.C.S.I. Officiating,	January 8, 1877; Confirmed May1,1877
Sir Steuart Colvin Bayley, K.C.S.I., C.I.F. Officiating...	July 15, 1879—December 1. 1879
8. Sir Augustus Rivers Thompson, K.C.S. I., C.I.E	April 24, 1882
Mr. Horace Abel Cockerell, C.S.I. officiating	August 11, 1885 September 17, 1885
9. Sir Steuart Colvin Baylbey. K.C.S.I., C.I.E.	April 2, 1887
10. Sir Charles Alfred Elliott, K.C.S.I.	December 17,1890
Sir Antony Patrick Macdonnell, G.C.S.I. Officiating	May 30, 1893 to November 30, 1893
11. Sir Alexander Mackenzie, K.C.S.I.	December 18, 1895 to April 7, 1898
Sir Charles Cecil Stevens, K.C.S.I., Officiating	June 22, 1897 to December 21, 1897
12. Sir. John Woodburn	1898—Nov., 1902
13. Sir Andrew Fraser	1902—1908
14. J.A Bourdillon—officiating in place of Sir Andrew Fraser from	November, 1902—November, 1903
15. Sir Edward Baker	1908—April 1, 1912

(*Information from 1 Through 11 have been taken from ``Bengal under the Lieutenant-Governors, Vol. 1 by C.E. Buckland. Information from 12 through 15 have been taken from ``Aspects of Administration in Bengal 1898-1912" by Dr. Dipasri Banerjee, New Delhi, 1980.)

বিশ শতকের প্রথম ও দ্বিতীয় দশক ছিল বাংলা তথা ভারতের জন্য এক চরম উত্তেজনাময় ক্রান্তিকাল। এটা ছিল বঙ্গভঙ্গের কাল, এটা ছিল স্বদেশী আন্দোলনের কাল,

এটা ছিল বঙ্গভঙ্গ রদের কাল, এটা ছিল ভারতের নানা স্থানে বিশেষ করে বাংলায় সন্ত্রাসী হিন্দু জাতীয়তাবাদের কাল, এটা ছিল মুসলিম জাগরণের সূচনা কাল এবং এটা ছিল বাংলায় শাসন-ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের কাল।

বঙ্গভঙ্গ নিয়ে বাদ-প্রতিবাদ ও ভিন্ন মতামতের যে জটিলতার সৃষ্টি হলো এবং তার সূত্র ধরে রাজনৈতিক শক্তির যে সাম্প্রদায়িক রূপ এদেশে ফুটে উঠল, বঙ্গভঙ্গ রদেও তার অবসান হলো না। বিশালায়তন বাংলার সরকারী ব্যবস্থা ছিল অপ্রতুল; ১৮৫৩ সাল পর্যন্ত তো বটেই, ১৮৫৪ সাল থেকে লেফ্‌টেন্যান্ট-গভর্নরশীপ প্রথা চালু করার পরেও। তখনই বাংলায় গভর্নর নিয়োগের প্রশ্নটা প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। ১৯০৫ সালে বাংলাকে ভেঙ্গে দু'টি প্রদেশে বিভক্ত করা হয়। উত্তেজনাময় ক্রান্তিকালের সূচনা হয় তখনই।

"By partitioning Bengal Lord Curzon released political forces which had disastrous consequences not only for this province but for India as a whole. The new administrative arrangements lasted for less than seven years, but the provocation to national sentiment created the Swadeshi Movement and gave an impetus to militant nationalism......... The Partition was conceived initially as an administrative measure; it led to political Consequences without parallel in modern Indian history." (Dr. Dipasri Banerjee Aspect of Administration In Bengal; 1898-1912, 1980, PP. 277-278).

১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর সম্রাট পঞ্চম জর্জের সস্ত্রীক ভারত আগমন উপলক্ষে দিল্লীতে যে দরবার হয়, সে দরবারে তিনটি ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করা হয় ঃ প্রথম বঙ্গভঙ্গ রদ, দ্বিতীয় বাংলা প্রদেশটি একজন গভর্নরের শাসনাধীন করা এবং তৃতীয় কলকাতা থেকে দিল্লীতে ভারতের রাজধানী স্থানান্তর করা। এই ব্যবস্থায়ও বাংলা থেকে রাজধানী স্থানান্তরে হিন্দু নেতৃবর্গ এই কারণে রাজী হয়ে যান যে তাতে করে বঙ্গভঙ্গ তো রদ হলো! (অথচ পরবর্তীতে ১৯৪৭ সালে বাংলার মুসলিম নেতৃবর্গের দাবী 'বৃহত্তর বঙ্গ'কে স্বাধীন করার প্রচেষ্টাকে নস্যাৎ করে দিয়ে হিন্দু নেতৃবর্গ বাংলাকে বিভক্ত করার পরিকল্পনায় সায় দেন!) এভাবে ১৯১২ সাল থেকে বাংলায় প্রচলিত হয় গভর্নরের শাসন। গভর্নরকে সাহায্য করার জন্য থাকে একটি কাউন্সিল-গভর্নর ইন কাউন্সিল। নিচে বাংলার গভর্নরদের একটি তালিকা দেওয়া হলো কিন্তু তথ্যের অভাবে ও বিচ্ছিন্নতায় এ তালিকাকে কালানুক্রমিকভাবে নির্ভুল করা সম্ভব হয়নি। তদুপরি ১৯২২ সালের আগেকার কোন গভর্নরের রেফারেন্স এ পর্যন্ত আমরা কোথাও পাইনি। বিচ্ছিন্নভাবে পেয়েছি গোটা তিনেক নাম। যাঁদের নাম পাওয়া যাচ্ছে, তাঁরা হলেন ঃ

স্যার চার্লস ইলিয়ট, লর্ড ব্র্যাবোর্ন এবং লর্ড কারমাইকেল।

Governors of the Presidency of Fort William in Bengal*

Name	Assumed charge of office	Remarks
Baron Carmichael of Skirling. G.C.I.E.,K.C.M.G	1 April, 1912	(Aft. G.C.S.I.) Previously Governor to Madras.
Earl of Ronaldshay, G.C.I.E.	26 march, 1917	(Aft. G.C.S. I. and (by Succession) Marquess of Zetland.)
Earl of Lytton P.C.G.C.I.E.	28 March, 1922	(Actg, Governor-General, 10 April to 6 Aug., 1925. Sir John kerr, K.C.S.I., K.C.I.E. acted as Governor of Bengal during his absence.) Afterwards K.G., G.C.S.I.
Sir H.L. Stephenson, K.C.I.E.,C.S.I.	10 June, 1926	(Aft. G.C.I.E. and K.C.S.I.) Acting 10 June to 9 Oct., 1926,and from 5 June to 21 Sept., 1930
Sir F. Stanley Jackson, P.C, G.C.I.E.	28 March, 1927	(Aft. G.C.S.I)
Sir J. Anderson, G.C.B., G.C.I.E.	29 March, 1932	(Aft, P.C.,G.C.S.I.)
Sir J. A. Woodhead, K.C.S.I., C.I.E.	10 Aug., 1934	Temporary to 1 Dec., 1934 (Aft. Temporary Gov. of Bengal)
Sir J. Anderson, G.C.B., G.C.I.E.	1 April, 1937	(Aft. P,C., G.C.S.I.)
Baron Brabourne, G.C.S.I., G.C.I.E., M.C.	27 Nov., 1937	Acting Gov., General, 25 June to 24 Oct., 1938.
Sir R.N. Reid. K.C.S.I., K.C.I.E.	25 June. 1938	Acting to 24 Oct., 1938 and again 24 Feb., 1939 to 11 June, 1939.
Sir J.A. Woodhead, K.C.S.I.,C.I.E.	12 June, 1939	Temporary (Aft. G.C.I.E.).
Lt.-Col. Sir J. Herbert, G.C.I.E.	18 Nov.,1939	Died 11 dec., 1943.
Sir T.G. Rutherford, K.C.S.I., C.I.E.	6 Sept.,1943	Acting to 21 Jan., 1944.
Rt. Hon. R.G.Casey, D.S.O., M.C.	22 Jan, 1944	Vacated 18 Feb., 1946.
Sir H.J. Twynam, K.C S.I., C.I.E.	13 Sept.,1945	Acting to 11 Oct., 1945.
Sir F. J. Burrows, G. C. I. E.	19 Feb., 1946	Vacated 14 Aug., 1947.

Gocrrnor General of Pakistan

Mr. M. A. Jinnah	14 Aug. 1947	Died Sept. 1948.

* ঢাকাস্থ বৃটিশ কাউন্সিল থেকে প্রাপ্ত

বঙ্গবিভাগ রহিত হলো বটে, কিন্তু তাতেই দেশের আন্দোলন থেমে গেল না। আন্দোলনকারীরা চাইছিল ' স্বরাজ' মানে স্বাধীনতা। আর ঠিক তখনই আরম্ভ হলো প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। ভারতের গভর্নর-জেনারেল হয়ে এলেন লর্ড চেম্স্ফোর্ড। বিশাল ভারতবর্ষে তখন 'স্বরাজ' আন্দোলন, বাইরে বিশ্বযুদ্ধ। এমনি অবস্থায় ইংরেজ সরকার পড়ে যায় উভয় সঙ্কটে। বিশ্বযুদ্ধে বৃটেন খুবই জড়িত হয়ে পড়েছে। এমন একটা সময়ে ভারতবর্ষ থেকে তাদের জন্য চাই জনসমর্থন, ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন না। বিশ্বযুদ্ধে সহায়তা লাভের জন্য তাই ভারতকে আনুগত্যের পথে ফিরিয়ে আনা প্রয়োজন। অথচ আন্দোলন দ্রুত প্রসার লাভ করছে! বৃটিশরা তখন এক শাসন সংস্কারের কথা ঘোষণা করল। তৎকালীন ভারত-সচিব মন্টেগু সাহেবই ঘোষণাটি করলেন, যার নাম দেওয়া হলো মন্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন-সংস্কার। সেই ঘোষণায় বলা হয় ঃ

> বৃটিশ সাম্রাজ্যের অচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে ভারতবর্ষে ক্রমশ দায়িত্বশীল সরকার গঠনের উদ্দেশ্যে প্রত্যেকটি শাসন বিভাগে ভারতীয়দের অধিকতর যোগদানের ব্যবস্থা ও স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির ক্রমবিকাশ সাধনই বৃটিশ সরকারের ঘোষিত নীতি।
>
> বৃটিশ সরকার ও ভারত সরকারের উপর ভারতের জনগণের মঙ্গল ও উন্নতি বিধানের দায়িত্ব ন্যস্ত বলে তারাই হবে ভারতীয় জনগণের শাসন-সংক্রান্ত অগ্রগতির সময় ও পরিমাণের নির্ণায়ক। এই দুই সরকারের সঙ্গে যাঁরা সহযোগিতা করবেন, সরকার দু'টি তাঁদের সহযোগিতা দ্বারাই চালিত হবে এবং তাঁদের হাতেই শাসনকার্য পরিচালনার নতুন সুবিধা অর্পণ করা হবে; ভারতীয়দের হাতে দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া যায় কিনা তা নির্ধারণ করা হবে সেই সহযোগিতার পরিমাণের দ্বারাই।

মন্টেগু-চেমসফোর্ডের সংস্কার ঘোষণার ফলাফল কিছুটা বৃটিশদের পক্ষেই গেল। স্বরাজের আন্দোলনকারীরা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। ভারতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ এই শাসন-সংস্কার প্রস্তাবের বিরোধিতা করার ফলে ১৯১৮ সালে আন্দোলনের 'উদারনীতিবাদী'রা কংগ্রেস ত্যাগ করে ভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সঙ্গবদ্ধ হলো। 'চরমপন্থী'দের কাছে এই শাসন-সংস্কারের ঘোষণা ছিল 'তুচ্ছ, বিরক্তিকর ও নৈরাশ্যজনক'। ক্রমে সকলের পক্ষ থেকেই এই শাসন-সংস্কারের বদলে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

লর্ড রেডিংয়ের সময় (১৯২৬-৩১) সমগ্র দেশে অসহযোগ আন্দোলনের তীব্রতা বাড়তে থাকে। ইংরেজদের দেওয়া স্বায়ত্তশাসন ভারতীয়দের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারেনি। তারপরই আসে বিলাতে ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে বৃটিশ সরকারের

গোল-টেবিল বৈঠকের কথা। সে-বৈঠকও ব্যর্থ হয়। পরবর্তী গভর্নর জেনারেল লর্ড উইলিংডন (১৯৩১-৩৬) ভারতীয়দের আইন অমান্য আন্দোলন ও সন্ত্রাসবাদ দমনের জন্য কঠোর নীতি অবলম্বন করেন। কিন্তু তাতেও কোন ফায়দা হয় না। শেষ পর্যন্ত শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা হিসাবে ইংরেজ সরকার কর্তৃক প্রবর্তন করা হলো ১৯৩৫ সালের ভারতবর্ষ শাসন আইন। এই আইন অনুযায়ী ১৯৩৭ সালে ভারতবর্ষে অনুষ্ঠিত হলো সাধারণ নির্বাচন। ফলাফলের ভিত্তিতে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলিতে প্রতিষ্ঠিত হলো কংগ্রেস সরকার, আর মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশে মুসলিম লীগ সরকার।

ইতোমধ্যে হিন্দু-মুসলমান প্রশ্নটি রাজনীতিতে প্রধান সমস্যা হয়ে দেখা দেয়। ১৯৩৭-৩৯ সালের কংগ্রেসী শাসনের অভিজ্ঞতা থেকে একথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে হিন্দু-মুসলমান মিলে ভারতে এক রাষ্ট্র গঠন সম্ভবপর নয়। ১৯৪০ সালে লাহোরে মুসলিম লীগের সভায় 'পাকিস্তান প্রস্তাব' অনুমোদিত হয়। তারপর বহুদিন কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে অনেক আলাপ-আলোচনা; কিন্তু ফলাফল শূন্য।

এদিকে বিশ্বযুদ্ধের অবসানে ১৯৪৬ সালে আবার ভারতবর্ষে অনুষ্ঠিত হয় সাধারণ নির্বাচন। এই নির্বাচনে পাকিস্তান দাবির উপর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে মুসলিম লীগ মুসলিম আসনের শতকরা ৯৫টি আসন দখল করে। ফলাফল দেখে সুচতুর বৃটিশ সরকার বুঝতে পারেন, হিন্দু-মুসলিমের এক রাষ্ট্র ভারতবর্ষে সম্ভবপর নয় এবং এই উপলব্ধির পথ ধরেই আসে ভারতবর্ষ বিভক্তির কথা। ভারত ও পাকিস্তান এই দুই রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভ করে ভারতবর্ষ। বাংলায় গভর্নর তখন স্যার ফ্রেডারিক বোর্ন, আর ভারতবর্ষের ভাইসরয় আগে থেকেই লর্ড মাউন্টব্যাটেন।

বিভক্তির পর ভারতের গভর্নর-জেনারেল হলেন সি রাজা গোপালাচারিয়া, আর পাকিস্তানের গভর্নর-জেনারেল হলেন মুহম্মদ আলী জিন্নাহ্। এই যে ঘটনাবহুল বিশ শতকের প্রথমার্ধের ভারতবর্ষ, এই ভারতবর্ষে সর্বভারতীয় প্রশ্নই সমধিক গুরুত্ব লাভ করে, প্রাদেশিক প্রশ্ন হয়ে পড়ে গৌণ ব্যাপার। সেই দিক থেকে বিবেচনা করলে বোঝা যায়, কেন এই সময়টায় বাংলায় নিয়োজিত গভর্নরগণ গুরুত্বে অনেকাংশেই গভর্নর-জেনারেল বা ভাইসরয়দের পেছনে পড়ে আছেন।

যাক, স্বাধীনতা লাভের পর পাকিস্তানের অন্তর্গত পূর্ববঙ্গ বা পূর্ববাংলা প্রদেশের প্রাদেশিক গভর্নর হন স্যার ফ্রেডারিক বোর্ন, যিনি এর আগে পর্যন্ত ছিলেন অখণ্ড বাংলার গভর্নর।

পরিশিষ্ট–ঘ*

পাকিস্তান আমলে পূর্ব-পাকিস্তানের গভর্নরগণ

স্যার ফ্রেডারিক বোর্ন	১৯৪৭–৪৯	সাল
মালিক ফিরোজ খান নুন	১৯৫০–৫৩	”
চৌধুরী খালিকুজ্জামান	১৯৫৩–৫৪	”
ইস্কান্দার মির্জা	১৯৫৩–৫৪	”
টমাস হোবার্ট এলিস	১৯৫৪–৫৫	”
মোহাম্মদ শাহাবুদ্দীন	১৯৫৫	”
আমিরুদ্দীন আহমদ	১৯৫৫–৫৬	”
এ. কে. ফজলুল হক	১৯৫৬–৫৮	”
সুলতানুদ্দীন আহমদ	১৯৫৮	”
জাকির হোসেন	১৯৫৮–৬০	”
আজম খান	১৯৬০–৬২	”
গোলাম ফারুক	১৯৬২	”
আবদুল মোনেম খান	১৯৬২–৬৯	”
মির্জা নূরুল হুদা	১৯৬৯ (৩ দিন)	”
মোজাফফর উদ্দীন	১৯৬৯	”
এস, এম. আহসান	১৯৬৯–৭১	”
টিক্কা খান/ আবদুল মোতালিব মালিক	১৯৭১	”

পরিশিষ্ট—ঙ*

স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতিগণ

সৈয়দ নজরুল ইসলাম (ভারপ্রাপ্ত)[১]	১৯৭১	”
শেখ মুজিবুর রহমান	১৯৭১	”
বিচারপতি আবু সায়ীদ চৌধুরী	১৯৭২	”
মোহাম্মদ মুহাম্মদ উল্লাহ্	১৯৭৩	”
শেখ মুজিবুর রহমান[২]	১৯৭৫	”
খন্দকার মোশতাক আহমদ	১৯৭৫	”
বিচারপতি আবু সা'দাত মুহাম্মদ সায়েম	১৯৭৫	”
জিয়াউর রহমান[৩]	১৯৭৭	”
বিচারপতি আবদুস সাত্তার	১৯৮১	”
বিচারপতি আহসান উদ্দীন চৌধুরী	১৯৮২	”
হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ	১৯৮৩	”

---

১. ১৯৭৭ সালের ৫ ই নভেম্বর নিহত।
২. ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট নিহত।
৩. ১৯৮১ সালের ৩০ মে নিহত।
* পরিশিষ্ট—ঘ এবং পরিশিষ্ট-ঙ শিরোনামবিশিষ্ট তথ্যগুলো জনাব ফজলুল হাসান রচিত 'বাংলাদেশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' থেকে উদ্ধৃত।

পরিশিষ্ট-চ

নবাব সিরাজের বাসস্থান হীরাঝিলের ধনাগার থেকে ইংরেজদের প্রাথমিক লুণ্ঠন-তালিকা

নবাব সিরাজের বাসস্থান হীরাঝিলের ধনাগার থেকে ইংরেজগণ প্রাথমিকভাবে যা লুণ্ঠন করে, তার তালিকা ঃ

১ কোটি ৭৬ লক্ষ রৌপ্য মুদ্রা, ৩২ লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা, ২ সিন্দুক স্বর্ণপিণ্ড, ৪ বাক্স হীরা-জহরত, ২ বাক্স চুনী-পান্না। তাছাড়া ৮ কোটি গোপনে লুকানো টাকা মেরে দেয় ইংরেজরা, মীর জাফর-পত্নী মণি বেগম এবং রামচাঁদ ও নবকৃষ্ণ নামক ক্লাইভের দুই অনুচর।

রামচাঁদ	নবকৃষ্ণ
৬০ টাকা মাস মাহিনার কর্মচারী। কোম্পানী-চাকরির ১০ বছর পর রেখে যায় ৭২ লক্ষ টাকা, ৮০টি স্বর্ণ কলস, ৩০০-এর উপরে রৌপ্য কলস।	৬০ টাকা মাস মাহিনার কর্মচারী। কোম্পানী-চাকরিতে বহাল থাকা কালে মাতৃ-শ্রাদ্ধেই খরচ করে ৯ লক্ষ টাকা।

পলাশী-যুদ্ধে (!) অংশগ্রহণের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ঃ

বৃটিশ স্থল ও নৌ-সেনারা পেল ঃ ৪ লক্ষ পাউণ্ড

সিলেক্ট্ কমিটির ৬ জন সদস্য পেল ঃ ৯ লক্ষ পাউণ্ড

কাউন্সিল মেম্বাররা পেল (কোম্পানীর) ঃ ৫ লক্ষ ৮০ হাজার পাউণ্ড

এবং রবার্ট ক্লাইভ নিজে পেল ঃ ২ লক্ষ ৩৪ হাজার পাউণ্ড এবং ২৪ পরগনার জমিদারী আর 'সাবাত জঙ্গ' উপাধি।

এ ছাড়া সাধারণ ইংরেজরা কি পরিমাণ আত্মসাৎ করেছিল বলা দুঃসাধ্য।

"পলাশীর যুদ্ধাবসানে সেনাপতি ক্লাইভ গভর্নর ড্রেক সাহেবকে যে পত্র প্রেরণ করেন, সেই পত্রে ২৫ এ জুন কলিকাতার ইংরাজমণ্ডলী এই দেবদুল্লভ বিজয়বার্তা প্রাপ্ত হইয়া আনন্দে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। কলিকাতার ইংরাজ-দরবার কালক্ষয় না করিয়া, এক ত্বরিতগতি জাহাজ সাজাইয়া মহা সমারোহে ম্যানিংহাম সাহেবকে তাহাতে উঠাইয়া দিয়া বিলাতে বিজয়বার্তা প্রেরণ করিলেন। এদিকে সেনাপতি ক্লাইবের অক্ষুণ্ন

অধ্যবসায়ে মুর্শিদাবাদের নবাব-দত্ত ধনরত্ন সাতশত সিন্দুকে বোঝাই হইয়া, একশত সুসজ্জিত তরণী-সংযোগে বৃটিশ বিজয়-বৈজয়ন্তী সুবিস্তৃত করিয়া, বৃটিশের রণবাদ্যনিনাদে ভাগীরথীর উভয় তীর প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে নবদ্বীপে উপনীত হইল; তথা হইতে ইংরাজবন্ধু রাজরাজেন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্র ভুপবাহাদুরের সেনাদল পরিচালিত হইয়া, যথাকালে তাহা কলিকাতার ইংরাজ বন্দরে নিরাপদে তীরসংলগ্ন হইল। (Orme, Vol ll, PP. 187-188. উদ্ধৃত-শ্রীঅক্ষয় কুমার মৈত্রেয়, মীর কাসিম, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, চতুর্থ সংস্করণ, পৃ. ১৮–১৯)

"ইতিহাসে এরূপ অকস্মাৎ ভাগ্যবিবর্তনের বিবরণ অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। ইংরাজেরাও বলিয়া থাকেন– এই উপলক্ষে তাঁহাদের চিত্তবৃত্তি যেরূপ উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল, অল্প যুদ্ধেই সেরূপ আনন্দোচ্ছ্বাস অনুভূত হইয়াছে।" (Early Records of British India, P. 261.উদ্ধৃত-প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯)।

এরপর মীরজাফরী নবাবীকালে আরম্ভ হয় ইংরেজ কর্মচারীদের ব্যক্তিগত উৎকোচ গ্রহণ, ব্যবসায়ের নামে কোম্পানীর অবাধ লুণ্ঠন ও ক্রমবর্ধমান হারে রাজস্ব আদায় এবং তা করতে গিয়ে আদায়কারীদের আরও লুণ্ঠন। ১৭৬৬ খৃস্টাব্দে ইংল্যান্ডের বৃটিশ পার্লামেন্ট ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীদের উৎকোচ গ্রহণের ব্যাপারে অনুসন্ধান করবার জন্য একটি ইন্‌কোয়ারি কমিটি গঠন করে। অনুসন্ধানের পর কমিটি যে তালিকা প্রস্তত করে তাতে দেখা যায় যে, ১৭৫৭ থেকে ১৭৬৬ সাল পর্যন্ত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীরা বাংলা ও বিহার থেকে মোট ৬০ লক্ষ পাউন্ড অর্থাৎ তখনকার টাকার মূল্যমানে ৯ কোটি টাকা উৎকোচ গ্রহণ করেছিল।(Fourth Parliamentary Report 1773. P.535)

"কোম্পানীর কর্মচারীরা– তাহাদের প্রভু ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর জন্য নহে, নিজেদের জন্য-প্রায় সমগ্র আভ্যন্তরিক বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার আদায় করিয়া লয়! তাহারা দেশীয় লোকদের অত্যন্ত অল্প দামে তাহাদের উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করিতে, আর অত্যধিক চড়া দরে বৃটিশ পণ্য ক্রয় করিতে বাধ্য করিত। কোম্পানীর কর্মচারীরা তাহাদের আশ্রয়ে একদল দেশীয় কর্মচারী নিয়োগ করিত।

এই দেশীয় কর্মচারীরা যে অঞ্চলেই উপস্থিত হইত সেই অঞ্চলই ছারখার করিয়া দিত, সেইখানেই সন্ত্রাসের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করিত। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর প্রত্যেকটি কর্মচারী ছিল তাহার প্রভুর (উচ্চপদস্থ কর্মচারীর) শক্তিতে শক্তিমান, আর প্রত্যেকটি প্রভুর শক্তির উৎস ছিল স্বয়ং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী। শীঘ্রই কলিকাতায় বিপুল ধনসম্পদ সঞ্চিত হইয়া উঠিল, তাহার সঙ্গে সঙ্গে তিন কোটি মানুষ দুর্দশার শেষ স্তরে আসিয়া দাঁড়াইল। ইহা সত্য যে, বাংলার মানুষ শোষণ ও উৎপীড়ন সহ্য করিতে অভ্যস্ত; এই

প্রকারের শোষণ ও উৎপীড়ন তাহারাও কোনদিন দেখে নাই।" (T.B. Macaulay, Essays on Lord Clive. P. 63)

ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্তের মতে, ``In the days of the Muslim Rulers the income of the State, spent in the country directly or Indirectly, benefitted the people." (R. C. Dutt, Economic History of India, P. Ix) কিন্তু কোম্পানী কর্তৃক সুবে বাঙ্গালার দেওয়ানী গ্রহণের পর আদায়কৃত রাজস্বের অনেকাংশই চলে যেত ইংল্যাণ্ডে। এই সময়ে রাজস্বও বেড়ে প্রায় দ্বিগুণ হয়। In 1766-67 the net amount collcted was 25,27,594 as against 16,81,427 in 1756-66. " Ibid. P 46).

ইংরেজ শাসকেরা তাদের পক্ষ হয়ে জমিদারদের নিকট থেকে রাজস্ব আদায়ের জন্য ' নাজিম' নামক এক পদস্থ কর্মচারী নিযুক্ত করে। ১৭৭২ সালে (ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পরেই) রাজস্ব-কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট কোম্পানীর 'বোর্ড অব ডাইরেকটরস'-এর নিকট এক পত্রে লিখেন; The Nazims exacted what they could from the Zemindars and great farmers of the revenue, who they left at liberty to plunder all below, reserving to themselves the prerogative of plundering them in their turn, when they were supposed to have enriched themselves with the spoils of the country. " (Fifth Report, Sel. Comm.) (H.C.1832, Vol. 1, P. 4) কার্ল মার্কস্, রেজিনাল্ড রেনল্ডস প্রমুখ এই ব্যবস্থাকে ' প্রকাশ্য দস্যুতা বলে অভিহিত করেছেন।

অথচ ১৭৭০ সালের অর্থাৎ বাংলা ১১৭৬ সনের মহামন্বন্তরে মরে গেল এদেশের এক-তৃতীয়াংশ মানুষ। এটাই ' ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামে অভিহিত। এই মন্বন্তরের প্রত্যক্ষদর্শী লেখক Younghusband এই মহামন্বন্তরের দায়িত্ব অনাবৃষ্টি বা অন্য কোন দৈব-দুর্বিপাকের উপর চাপিয়ে দেননি। ১৭৬৮ সালে তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থে তিনি লিখেছিলেন ঃ

তাহাদের (কোম্পানীর কর্মচারীদের) মুনাফা শিকারের পরবর্তী উপায় হইল চাউল কিনিয়া গুদামজাত করিয়া রাখা। তাহারা নিশ্চিত ছিল যে, জীবন ধারণের পক্ষে অপরিহার্য এই দ্রব্যটির জন্য তাহারা যে মূল্যই চাহিবে তাহাই পাইবে। .... চাষীরা তাহাদের প্রাণপাত করা পরিশ্রমের ফসল অপরের গুদামে মজুদ হইতে দেখিয়া চাষবাস সম্বন্ধে উদাসীন হইয়া পড়িল। ইহার ফলে দেখা দিল খাদ্যাভাব। দেশে যাহা কিছু খাদ্য ছিল তাহা ইংরেজ বণিকগণের একচেটিয়া দখলে চলিয়া গেল। ..... খাদ্যের পরিমাণ যত কমিতে লাগিল ততই দাম বাড়িতে লাগিল। শ্রমজীবী দরিদ্র জনগণের চিরদুঃখময়

জীবনের উপর পতিত হইল এই পুঞ্জীভূত দুর্যোগের প্রথম আঘাত। কিন্তু ইহা এক অশ্রুতপূর্ব বিপর্যয়ের আরম্ভ মাত্র। ... চরম খাদ্যাভাবের এক বিভীষিকাময় ইঙ্গিত লইয়া দেখা দিল ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দ; সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ও বিহারের সমস্ত ইংরেজ বণিক, তাহাদের সমস্ত আমলা-গোমস্তা, রাজস্ব-বিভাগের সকল কর্মচারী, যে যেখানে নিযুক্ত ছিল সেইখানেই দিবারাত্র অক্লান্ত পরিশ্রমে ধান-চাউল ক্রয় করিতে লাগিল। এই জঘন্যতম ব্যবসায়ে মুনাফা হইল এত শীঘ্র ও এরূপ বিপুল পরিমাণে যে, মুর্শিদাবাদের.... একজন কপর্দকশূন্য ইংরেজ ভদ্রলোক এই ব্যবসা করিয়া দুর্ভিক্ষ শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় ৬০ হাজার পাউণ্ড (তখনকার টাকার মূল্যমানে দেড় লক্ষাধিক টাকা) য়ুরোপে পাঠাইয়াছিলেন।" Younghusband, Transactions in India, 1786, PP. 123-124)

চাষীরা ক্ষুধার জ্বালায় " তাহাদের সন্তান বিক্রয় করিতে বাধ্য হইল। কিন্তু তাহাদের কে কিনিবে, কে খাওয়াইবে ? বহু অঞ্চলে জীবিত মানুষ মৃতের মাংস খাইয়া প্রাণ বাঁচাইবার চেষ্টা করিয়াছিল এবং নদীতীর মৃতদেহে ও মুমূর্ষুদেহে ছাইয়া গিয়াছিল। মরিবার পূর্বেই মুমূর্ষুদের দেহের মাংস শিয়াল-কুকুরে খাইয়া ফেলিত।" L.S.S.O Malley. Bengal. Bihar and Orissa under British Rule, P. 113)

উত্তরকালে এই-সব টাকাকড়ি নেওয়ার বিষয় তদন্ত করবার জন্যে পার্লমেন্ট এক কমিটি বসিয়েছিলেন। কমিটির কাছে অভিযোগের উত্তর দিতে-দিতে গরম হয়ে উঠে ক্লাইভ টেবিল থাপড়িয়ে বলে উঠলেন, সভাপতি মশায় এবং উপস্থিত সভ্যবৃন্দ, আমি আমার তখনকার সংযমের কথা ভেবে এখন একেবারে অবাক হয়ে যাচ্ছি। যখন নবাবের সমস্ত ধনদৌলত আমার পায়ের নিচে, যখন মীর জাফর থেকে আরম্ভ করে রাজ্যের সমস্ত আমীর-ওমরাও আমার পায়ে মাথা নত করে দাঁড়িয়ে, তখন আমি সিরাজউদ্দৌলার তোষাখানা থেকে নিজের জন্যে মাত্র একুশ লাখ টাকা নিয়েছিলুম। আমি কি করে যে তখন নিজের লোভ সামলেছিলুম, তা শুধু ভাবতে গিয়েই এখন আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি।

(তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় রচিত 'পলাশির যুদ্ধ' থেকে, পৃ. ১৭৭)

ইংরেজী ১৭৬৯-৭০ সালে, বাংলা ১১৭৬ সনের 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে' বাংলার এক-তৃতীয়াংশ লোক অনাহারে মরেছিল, কিন্তু ওয়ারেন হেস্টিংস চাপ প্রয়োগ করে তখনও নির্ধারিত রাজস্বেরও বেশি রাজস্ব আদায় করেছিলেন বাংলার ধুকে-মরা মানুষের কাছ থেকে। তদুপরি, এই দুর্ভিক্ষটা ছিল মুনাফা লোভী ইংরেজ বণিক-রাজেরই সৃষ্টি।

পরিশিষ্ট–ছ

পলাশী ষড়যন্ত্রের কয়েকজন কুশলীর কে কিভাবে মরেছিলেন

মীরণ	ঃ	বিনামেঘে বজ্রপাতে মৃত্যু অথবা ক্লাইভের চক্রান্তে করুণ মৃত্যু।
মুহম্মদী বেগ	ঃ	মাথায় গড়বড় অবস্থায় বিনা কারণে কূপে ঝাঁপিয়ে পড়ে মৃত্যু।
মীর জাফর	ঃ	দুরারোগ্য কুষ্ঠব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে ক্রমে ক্রমে মৃত্যু। মৃত্যুর আগে ঘনিষ্ঠতম বন্ধু মহারাজা নন্দকুমার দেবী কিরীটেশ্বরীর চরণামৃত আনিয়ে মীর জাফরের মুখে প্রদান করেছিলেন এবং তা-ই ছিল ' নবাব' মীর জাফরের শেষ জলপান।
মহারাজা নন্দকুমার	ঃ	তহবিল তসরূফ ও অন্যান্য অভিযোগের বিচারে ফাঁসিকাষ্ঠে মৃত্যু।
জগৎশেঠ মহাতপচাঁদ এবং তাঁরই পিতৃব্য-পুত্র মহা রাজা স্বরূপচাঁদ	ঃ	নবাব মীর কাশেমের আদেশে নব নব বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তিস্বরূপ মুঙ্গের দুর্গ থেকে গঙ্গাবক্ষে নিক্ষেপের ফলে ডুবন্ত অবস্থায় মৃত্যু।
ইয়ার লুত্ফ্ খান	ঃ	অকস্মাৎ নিরুদ্দিষ্ট অথবা গোপনে নিহত।
রায় দুর্লভ	ঃ	কারাগারে ভগ্নস্বাস্থ্য হয়ে মৃত্যু।
দানিশ শাহ্ বা দানা শাহ্	ঃ	বিষাক্ত সর্প দংশনে মৃত্যু।
রাজা রাজবল্লভ	ঃ	রাজা রাজবল্লভের কীর্তি নাশ করেই পদ্মা হয় কীর্তিনাশা।
উমিচাঁদ	ঃ	ষড়যন্ত্র বাবদ অর্থ প্রাপ্তির ব্যাপারে প্রতারিত হয়ে স্মৃতিভ্রংশ উন্মাদ অবস্থায় পথে পথে ভ্রমণ ও মৃত্যু।
রবার্ট ক্লাইভ	ঃ	ইংরেজদের 'প্লাসি হিরো' বিলেতে ধন-সম্মানে আশাতিরিক্তভাবে ভূষিত হয়েও বিনাকারণে বাথরুমে ঢুকে নিজের গলায় নিজের হাতেই ক্ষুর চালিয়ে আত্মঘাতে মৃত্যু।
ওয়াট্স্	ঃ	কোম্পানীর কাজ থেকে বরখাস্ত হয়ে মনের দুঃখে ও অনুশোচনায় বিলেতেই অকস্মাৎ মৃত্যু।

স্ক্রাফটন	ঃ	বাংলায় যা করবার করে বিলেতে যাওয়ার পথে জাহাজডুবিতে মৃত্যু।
ওয়াটসন	ঃ	ক্রমাগত ভগ্নস্বাস্থ্য হয়ে কোন ওষুধেই ফল না পেয়ে কলকাতাতেই করুণ মৃত্যু।
মীর কাশেম	ঃ	'নবাব' মীর জাফরের ভাই রাজমহলের ফৌজদার মীর দায়ুদের নির্দেশে মীর কাশেম নবাব সিরাজকে দানা শা'র আস্তানা থেকে বেঁধে এনেছিলেন মুর্শিদাবাদে। তারপর ষড়ষন্ত্রের মাধ্যমে নবাব হয়ে প্রকৃত নবাব হওয়ার চেষ্টা, দেশ থেকে বিদেশী প্রভাব বিদূরিত করার প্রাণপণ প্রয়াস এবং তাতে ব্যর্থ হয়ে কপর্দকহীন অবস্থায় নানা স্থানে ঘুরে বেড়ানো। অবশেষে অজ্ঞাতনামা হয়ে দিল্লীর পথে করুণ মৃত্যুবরণ। মৃতের শিয়রে পড়ে থাকা একটা পোটলায় পাওয়া যায় ' নবাব মীর কাশেম হিসাবে' ব্যবহৃত চাপকান। তার থেকেই জানা যায়, মৃত ব্যক্তি বাংলার ভূতপূর্ব নবাব মীর কাশেম আলী খান!

পরিশিষ্ট-জ

'তখ্‌ত্ মোবারক' একটি সিংহাসন বা মসনদ। সম্রাট শাহ্‌জাহানের দ্বিতীয় পুত্র শাহ্‌জাদা শুজা যখন বাংলার সুবাদার হয়ে আসেন, তখন এই সিংহাসনটি তিনি তৈরি করান। এটি খুব বড় নয়। গঠনগৌরবহীন ঈষদুন্নত চারটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত সুসজ্জিতস্তর ফলকের পাশে খোদিত আছে ঃ

তৈয়ার শোদ তখ্‌ত্ মোবারক বতারিখ্ বিস্তওহফ্‌তম্ সহর সাবানুলমণ আজ্‌জাম ১০৫২ বএতমাম্ কমতারিণে বান্দাহা খাজা নজরে বোখারী কি মোকামে মুঙ্গের মিন্ সুবা বেহার।

এই পরম কল্যাণময় রাজসিংহাসন সুবা বিহারের অন্তর্গত মুঙ্গের শহরে ১০৫২ সালের ২৭-এ শাবান তারিখে দাসানুদাস খাজা নজর বোখারী কর্তৃক নির্মিত।

শাহ্‌জাদা সুবাদার শুজা এই সিংহাসনে উপবেশন করে রাজকার্য চালাতেন। তখন থেকে একে বলা হতো 'তখ্‌ত্ মোবারক'। প্রথমে রাজমহল, তারপর ঢাকা, অতঃপর মুর্শিদাবাদে এই সিংহাসন নীত হয়। কারণ সুবা বাংলার রাজধানী শাহ্‌জাদা শুজা থেকে আরম্ভ করে প্রথমে রাজমহল, পরে ঢাকা, তারও পরে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত হয়। তারপর থেকে এই বহুমূল্য রত্ন-সিংহাসন আরও বিস্তৃত করে তাতে বাংলার সুবাদারগণ ও পরে নবাব-নাজিমগণ সগৌরবে উপবেশন করতেন। নবাব সিরাজ এই সিংহাসনকে হীরাঝিল প্রাসাদে স্থানান্তরিত করেছিলেন। তাতে তিনি উপবেশন করেছেন মাত্র সোয়া এক বছর, এক বছর আড়াই মাস। নবাব সিরাজের ক্ষমতাচ্যুতির পর আর কেউ এই সিংহাসনের গৌরব রক্ষার জন্য চেষ্টা করেন নাই।

পরবর্তীকালে এই সিংহাসন অনাবৃত অবস্থায় বাইরে পড়ে থেকে রৌদ্রতাপ আর বৃষ্টিতে ভিজত। পরবর্তী নবাব-নাজিমগণ হয়তো মনে করতেন, এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে তাঁদের 'শত্রু' নবাব সিরাজের স্মৃতি। তাই হয়তো এর প্রতি তাঁদের যত্নের অনীহা! রৌদ্রবৃষ্টি এই সিংহাসন গাত্রে কতগুলো রেখাচিহ্নের সৃষ্টি করেছিল। আগ্রার প্রাসাদে রক্ষিত বৃহদায়তন যে রাজ-সিংহাসন, তাতেও এ জাতীয় রেখাচিহ্ন দৃষ্টিগোচর হয়। 'তখ্‌ত্ মোবারক' সম্পর্কে মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের মুসলমানদিগের বিশ্বাস ঃ মুসলমানের অতীত গৌরব স্মরণ করে 'তখ্‌ত্ মোবারক' এখনও নীরবে রোদন করে; গৈরিক রেখাচিহ্ন সেই নীরব রোদনের অশ্রুলেখা।

ইংরেজ ঐতিহাসিক বেভারিজের কথায়, "The Stone has reddish stains, due to the presence of iron; and it sometimes swells so much that water trickles over the edge. Then the stone is weeping. according to the natives, for the passing away of the glory of the Subahdari"- H. Beberidge.

পাথরে লোহা মিশ্রিত আছে বলেই কখনো তা এত স্ফীত হয় যে রেখাচিহ্নের প্রান্ত বেয়ে পানি ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরে পড়ে। এটা নিশ্চয়ই ব্যাখ্যা এবং এই ব্যাখ্যাই গ্রহণীয়। কিন্তু মুর্শিদাবাদের মুসলমানেরা, যাদের কাছে অতীতের মুসলমান গৌরব স্মৃতি ও শ্রুতি হয়ে এই সিংহাসনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে, তাদের কাছে এই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার অতীতও কিছু আছে। তা নিছক মনের অনুভূতি হতে পারে; কিন্তু এ-জাতীয় অনুভূতিও সত্য-জাত। তাই এই অনুভূতিও অর্থহীন নয়, নয় মূল্যহীন।

"এই বহুমানাস্পদ মোগল-রাজ সিংহাসনের সঙ্গে মীর জাফরের কলঙ্ক কাহিনী চিরসংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে। কি হিন্দু, কি মুসলমান, কেহই মীর জাফরের কথা বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। ---- পাঁচ শত বৎসর মুসলমানের সম্মুখে কুর্ণিশ করিতে করিতে হিন্দু-সন্তানের পক্ষে মুসলমান-শাসন অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল; তাহারা কেহ রাজা, কেহ মন্ত্রী, কেহ সেনাপতি হইয়া, মুসলমানের দোহাই দিয়া, শাসন ও শোষণকার্য হস্তগত করিয়াছিলেন। সিরাজদ্দৌলা তাহার মূলোচ্ছেদের চেষ্টা করায়, সকলে মিলিয়া মীর জাফরের সহায়তায় সিরাজদ্দৌলার উচ্ছেদ সাধন করেন; সুতরাং হিন্দু কখনও মীর জাফরের কথা বিস্মৃত হইতে পারিবেন না!

মুসলমান অনেক দিনের নবাব। কি ইংরাজ, কি বাঙ্গালী, সকলেই সে নবাব দরবারে জানু পাতিয়া উপবেশন করিতেন। যে নিতান্ত নগণ্য মুসলমান, তাহার পদভরেও মেদিনী কম্পিত হইয়া উঠিত। মীর জাফরের ব্যবহার গুণেই মুসলমানের সে পূর্ব গৌরব বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। সুতরাং মুসলমানও মীর জাফরের কথা বিস্মৃত হইতে পারেন নাই।

ইংরাজের কথা বিশেষভাবে আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। বিদেশে বাণিজ্য করিতে আসিয়া, যাঁহার প্রাসাদে এমন স্বর্ণসিংহাসন কুড়াইয়া পাইয়াছেন, তাঁহার কথা ইংরাজগণ কোন্ লজ্জায় এত অল্পদিনেই বিস্মৃত হইবেন ? .... মীর জাফর কর্নেল ক্লাইভের হাত ধরিয়া একবার মাত্র 'তখ্‌ত্ মোবারকে' পদার্পণ করিলেন, কিন্তু তাহাতে আর অধিক দিন উপবেশন করিতে পারিলেন না। সেই সময় হইতে এই পুরাতন রাজসিংহাসন অযত্নে অনাদরে পড়িয়া রহিয়াছে।" (মীর কাসিম, অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, ২০৩/১/১ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা, চতুর্থ সংস্করণ, রাজশাহী, ভাদ্র, ১৩১২ সাল, পৃ. ৩,৬)। সূচীপত্রের পৃষ্ঠার নিচে ফুটনোটে শ্রীঅক্ষয় কুমার মৈত্রেয় লিখেছেন ঃ "এই গ্রন্থ মুদ্রিত হইবার পর, লর্ড কার্জনের কৃপায় 'কলিকাতা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েল ' মন্দিরে' রক্ষিত হইবার উদ্দেশ্যে 'তখ্‌ত্ মোবারক' মুরশিদাবাদ হইতে কলিকাতায় আনীত হইয়াছে।"

পরিশিষ্ট-ঝ

(শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায় রচিত 'বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর' থেকে উদ্ধৃত)

হিজরা	খৃস্টাব্দের কোন তারিখে আরম্ভ	হিজরা	খৃস্টাব্দের কোন্ তারিখে আরম্ভ
৭৩৯	২০/৭/১৩৩৮	৭৬৩	৩১/১০/১৩৬১
৭৪০	৯/৭/১৩৩৯	৭৬৪	২১/১০/১৩৬২
৭৪১	২৭/৬/১৩৪০	৭৬৫	১০/১০/১৩৬৩
৭৪২	১৭/৬/১৩৪১	৭৬৬	২৮/৯/১৩৬৪
৭৪৩	৬/৬/১৩৪২	৭৬৭	১৮/৯/১৩৬৫
৭৪৪	২৬/৫/১৩৪৩	৭৬৮	৭/৯/১৩৬৬
৭৪৫	১৫/৫/১৩৪৪	৭৬৯	২৮/৮/১৩৬৭
৭৪৬	৪/৫/১৩৪৫	৭৭০	১৬/৮/১৩৬৮
৭৪৭	২৪/৪/১৩৪৬	৭৭১	৫/৮/১৩৬৯
৭৪৮	১৩/৪/১৩৪৭	৭৭২	২৬/৭/১৩৭০
৭৪৯	১/৪/১৩৪৮	৭৭৩	১৫/৭/১৩৭১
৭৫০	২২/৩/১৩৪৯	৭৭৪	৩/৭/১৩৭২
৭৫১	১১/৩/১৩৫০	৭৭৫	২৩/৬/১৩৭৩
৭৫২	২৮/২/১৩৫১	৭৭৬	১২/৬/১৩৭৪
৭৫৩	১৮/২/১৩৫২	৭৭৭	২/৬/১৩৭৫
৭৫৪	৬/২/১৩৫৩	৭৭৮	২১/৫/১৩৭৬
৭৫৫	২৬/১/১৩৫৪	৭৭৯	১০/৫/১৩৭৭
৭৫৬	১৬/১/১৩৫৫	৭৮০	৩০/৪/১৩৭৮
৭৫৭	৫/১/১৩৫৬	৭৮১	১৯/৪/১৩৭৯
৭৫৮	২৫/১২/১৩৫৬	৭৮২	৭/৪/১৩৮০
৭৫৯	১৪/১২/১৩৫৭	৭৮৩	২৮/৩/১৩৮১
৭৬০	৩/১২/১৩৫৮	৭৮৪	১৭/৩/১৩৮২
৭৬১	২৩/১১/১৩৫৯	৭৮৫	৬/৩/১৩৮৩
৭৬২	১১/১১/১৩৬০	৭৮৬	২৪/২/১৩৮৪

হিজরা	খৃস্টাব্দের কোন তারিখে আরম্ভ	হিজরা	খৃস্টাব্দের কোন্ তারিখে আরম্ভ
৭৮৭	১২/২/১৩৮৫	৮১৫	১৩/৪/১৪১২
৭৮৮	২/২/১৩৮৬	৮১৬	৩/৪/১৪১৩
৭৮৯	২২/১/১৩৮৭	৮১৭	২৩/৩/১৪১৪
৭৯০	১১/১/১৩৮৮	৮১৮	১৩/৩/১৪১৫
৭৯১	৩১/১২/১৩৮৮	৮১৯	১/৩/১৪১৬
৭৯২	২০/১২/১৩৮৯	৮২০	১৮/২/১৪১৭
৭৯৩	৯/১২/১৩৯০	৮২১	৮/২/১৪১৮
৭৯৪	২৯/১১/১৩৯১	৮২২	২৮/১/১৪১৯
৭৯৫	১৭/১১/১৩৯২	৮২৩	১৭/১/১৪২০
৭৯৬	৬/১১/১৩৯৩	৮২৪	৬/১/১৪২১
৭৯৭	২৭/১০/১৩৯৪	৮২৫	২৬/১২/১৪২১
৭৯৮	১৬/১০/১৩৯৫	৮২৬	১৫/১২/১৪২২
৭৯৯	৫/১০/১৩৯৬	৮২৭	৫/১২/১৪২৩
৮০০	২৪/৯/১৩৯৭	৮২৮	২৩/১১/১৪২৪
৮০১	১৩/৯/১৩৯৮	৮২৯	১৩/১১/১৪২৫
৮০২	৩/৯/১৩৯৯	৮৩০	২/১১/১৪২৬
৮০৩	২৮/৮/১৪০০	৮৩১	২২/১০/১৪২৭
৮০৪	১১/৮/১৪০১	৮৩২	১১/১০/১৪২৮
৮০৫	১/৮/১৪০২	৮৩৩	৩০/৯/১৪২৯
৮০৬	২১/৭/১৪০৩	৮৩৪	১৯/৯/১৪৩০
৮০৭	১০/৭/১৪০৪	৮৩৫	৯/৯/১৪৩১
৮০৮	২৯/৬/১৪০৫	৮৩৬	২৮/৮/১৪৩২
৮০৯	১৮/৬/১৪০৬	৮৩৭	১৮/৮/১৪৩৩
৮১০	৮/৬/১৪০৭	৮৩৮	৭/৮/১৪৩৪
৮১১	২৭/৫/১৪০৮	৮৩৯	২৭/৭/১৪৩৫
৮১২	১৬/৫/১৪০৯	৮৪০	১৬/৭/১৪৩৬
৮১৩	৬/৫/১৪১০	৮৪১	৫/৭/১৪৩৭
৮১৪	২৫/৪/১৪১১	৮৪২	২৪/৬/১৪৩৮

হিজরা	খৃস্টাব্দের কোন তারিখে আরম্ভ	হিজরা	খৃস্টাব্দের কোন্ তারিখে আরম্ভ
৮৪৩	১৪/৬/১৪৩৯	৮৭১	১৩/৮/১৪৬৬
৮৪৪	২/৬/১৪৪০	৮৭২	২/৮/১৪৬৭
৮৪৫	২২/৫/১৪৪১	৮৭৩	২২/৭/১৪৬৮
৮৪৬	১২/৫/১৪৪২	৮৭৪	১১/৭/১৪৬৯
৮৪৭	১/৫/১৪৪৩	৮৭৫	৩০/৬/১৪৭০
৮৪৮	২০/৪/১৪৪৪	৮৭৬	২০/৬/১৪৭১
৮৪৯	৯/৪/১৪৪৫	৮৭৭	৮/৬/১৪৭২
৮৫০	২৯/৩/১৪৪৬	৮৭৮	২৯/৫/১৪৭৩
৮৫১	১৯/৩/১৪৪৭	৮৭৯	১৮/৫/১৪৭৪
৮৫২	৭/৩/১৪৪৮	৮৮০	৭/৫/১৪৭৫
৮৫৩	২৪/২/১৪৪৯	৮৮১	২৬/৪/১৪৭৬
৮৫৪	১৪/২/১৪৫০	৮৮২	১৫/৪/১৪৭৭
৮৫৫	৩/২/১৪৫১	৮৮৩	৪/৪/১৪৭৮
৮৫৬	২৩/১/১৪৫২	৮৮৪	২৫/৩/১৪৭৯
৮৫৭	১২/১/১৪৫৩	৮৮৫	১৩/৩/১৪৮০
৮৫৮	১/১/১৪৫৪	৮৮৬	২/৩/১৪৮১
৮৫৯	২২/১২/১৪৫৪	৮৮৭	২০/২/১৪৮২
৮৬০	১১/১২/১৪৫৫	৮৮৮	৯/২/১৪৮৩
৮৬১	২৯/১১/১৪৫৬	৮৮৯	৩০/১/১৪৮৪
৮৬২	১৯/১১/১৪৫৭	৮৯০	১৮/১/১৪৮৫
৮৬৩	৮/১১/১৪৫৮	৮৯১	৭/১/১৪৮৬
৮৬৪	২৮/১০/১৪৫৯	৮৯২	২৮/১২/১৪৮৬
৮৬৫	১৭/১০/১৪৬০	৮৯৩	১৭/১২/১৪৮৭
৮৬৬	৬/১০/১৪৬১	৮৯৪	৫/১২/১৪৮৮
৮৬৭	২৬/৯/১৪৬২	৮৯৫	২৫/১১/১৪৮৯
৮৬৮	১৫/৯/১৪৬৩	৮৯৬	১৪/১১/১৪৯০
৮৬৯	৩/৯/১৪৬৪	৮৯৭	৪/১১/১৪৯১
৮৭০	২৪/৮/১৪৬৫	৮৯৮	২৩/১০/১৪৯২

হিজরা	খৃষ্টাব্দের কোন তারিখে আরম্ভ	হিজরা	খৃষ্টাব্দের কোন্ তারিখে আরম্ভ
৮৯৯	১২/১০/১৪৯৩	৯২৩	২৪/১/১৫১৭
৯০০	২/১০/১৪৯৪	৯২৪	১৩/১/১৫১৮
৯০১	২১/৯/১৪৯৫	৯২৫	৩/১/১৫১৯
৯০২	৯/৯/১৪৯৬	৯২৬	২৩/১২/১৫১৯
৯০৩	৩০/৮/১৪৯৭	৯২৭	১২/১২/১৫২০
৯০৪	১৯/৮/১৪৯৮	৯২৮	১/১২/১৫২১
৯০৫	৮/৮/১৪৯৯	৯২৯	২০/১১/১৫২২
৯০৬	২৮/৭/১৫০০	৯৩০	১০/১১/১৫২৩
৯০৭	১৭/৭/১৫০১	৯৩১	২৯/১০/১৫২৪
৯০৮	৭/৭/১৫০২	৯৩২	১৮/১০/১৫২৫
৯০৯	২৬/৬/১৫০৩	৯৩৩	৮/১০/১৫২৬
৯১০	১৪/৬/১৫০৪	৯৩৪	২৭/৯/১৫২৭
৯১১	৪/৬/১৫০৫	৯৩৫	১৫/৯/১৫২৮
৯১২	২৪/৫/১৫০৬	৯৩৬	৫/৯/১৫২৯
৯১৩	১৩/৫/১৫০৭	৯৩৭	২৫/৮/১৫৩০
৯১৪	২/৫/১৫০৮	৯৩৮	১৫/৮/১৫৩১
৯১৫	২১/৪/১৫০৯	৯৩৯	৩/৮/১৫৩২
৯১৬	১০/৪/১৫১০	৯৪০	২৩/৭/১৫৩৩
৯১৭	৩১/৩/১৫১১	৯৪১	১৩/৭/১৫৩৪
৯১৮	১৯/৩/১৫১২	৯৪২	২/৭/১৫৩৫
৯১৯	৯/৩/১৫১৩	৯৪৩	২০/৬/১৫৩৬
৯২০	২৬/২/১৫১৪	৯৪৪	১০/৬/১৫৩৭
৯২১	১৫/২/১৫১৫	৯৪৫	৩০/৫/১৫৩৮
৯২২	৫/২/১৫১৬		

পরিশিষ্ট-এঃ

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কীর্তি-কাহিনী

এতোদ্দেশে ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানীর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট বর্ণনা প্রসঙ্গে কার্ল মার্কস বলেন ঃ "মোগল সম্রাটের সামন্ত প্রতিনিধিরাই মোগল সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ ক্ষমতা চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলে। সেই প্রতিনিধিদের ক্ষমতা চূর্ণ হয় মারাঠাদের হাতে, আর মারাঠা-শক্তি চূর্ণ হয় আফগানদের দ্বারা। এইভাবে যখন সকলেই সকলের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ব্যস্ত, তখন বৃটিশ শক্তি দ্রুত রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিয়া সকলকেই পরাভূত করিতে সক্ষম হয়।" (Karl Marx: Future Results of British Rule in India)

এই কাজে বৃটিশ শক্তির 'প্রতিনিধি' ছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী। রানী এলিজাবেথের রাজত্বকালে এই কোম্পানীটির কারবার শুরুর সময় ভারতের সঙ্গে লাভজনকভাবে বাণিজ্য চালাবার জন্য বছরে ৩০,০০০ পাউণ্ড মূল্যের সোনা-রূপা ও বৈদেশিক মুদ্রা রপ্তানি করার অনুমতি পায়। ১৭৭৪ সাল পর্যন্ত কোম্পানী বোম্বাই, মাদ্রাজ ও কলকাতার আশেপাশের কিছু জেলারই অধিকার লাভ করে শুধু। পরে কর্ণাটকে যে যুদ্ধ বাধে তার ফলে নানা সংগ্রামের পর কোম্পানী প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতের ওই অঞ্চলটার সার্বভৌম প্রভু হয়ে দাঁড়ায়। তারপরই পলাশীর সেই ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে কোম্পানীর বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার কর্তৃত্ব লাভ। অতঃপর আঠার শতকের শেষে টিপু সুলতানের পরাজয়ের ফলে মহীশূর অধিকার এবং পরিণামে কোম্পানী-শক্তির বিপুল বৃদ্ধি ও অধীনতামূলক ব্যবস্থার প্রভূত সম্প্রসারণ। উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে মরুভূমি বরাবর ভারতের সীমান্ত এসে যায় তার দখলে। ১৮৩৮ থেকে ১৮৪৯ সালের আগে, শিখ ও আফগান যুদ্ধগুলোর কালে পাঞ্জাব ও সিন্ধুকে বলপূর্বক গ্রাস করে কোম্পানী তথা বৃটিশ শাসন এই উপমহাদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। একটি বৃহৎ ইঙ্গ-ভারতীয় সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব শুরু হয় ১৮৪৯ সাল থেকেই।

কার্ল মার্কসের বিশ্লেষণ অনুসারে ঃ এভাবে কোম্পানী নামের আড়ালে বৃটিশ সরকার দুই শতাব্দী ধরে ষড়যন্ত্র ও যুদ্ধ চালিয়ে পদানত করে ভারতকে। পদানত করার এই প্রক্রিয়ায় ইংল্যাণ্ডের সব রাজনৈতিক পার্টিই একটি বৃহৎ ভারত সাম্রাজের পরিসীমা সম্পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত চোখ ঠেরে চুপ করেই ছিল। তারপর সাম্রাজ্য বিজয় সম্পূর্ণ হলো যখন, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মাধ্যমে তাদের এই স্বপ্ন বাস্তাবায়িত হলো যখন, তখনই ১৭৮৩ সালের পর ভারতীয় প্রশ্নটা সর্বপ্রথম ইংল্যাণ্ডের প্রশ্ন, ইংল্যাণ্ডের মন্ত্রিসভার প্রশ্ন হয়ে উঠল।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর 'লুঠেরা পুঁজিবাদী ঔপনিবেশিক কর্মনীতির' লক্ষ্য অনুসরণ করে কার্ল মার্কস বলেছিলেন ঃ " ভারতবর্ষে এক দ্বিবিধ কর্তব্য পালন করতে হবে ইংলণ্ডকে ঃ একটি ধ্বংসমূলক এবং অন্যটি উজ্জীবনমূলক-- পুরাতন এশীয় সমাজের ধ্বংস এবং এশিয়ায় পাশ্চাত্য সমাজের বৈষয়িক ভিত্তির প্রতিষ্ঠা" কথাগুলো মার্কস লিখেছিলেন ১৮৫৩ সালে, কোম্পানি শাসনের প্রায় একশ' বছর পরে। মার্কসের এ মন্তব্যটি তাঁর ভাবিষ্যদ্বাণী ছিল না, ছিল কোম্পনীর শাসন-নীতির বিশ্লেষণের উপর তাঁর সিদ্ধান্ত। যে প্রবন্ধে তাঁর এ মন্তব্য, তার শিরোনাম হচ্ছে 'ভারতে বৃটিশ শাসনের ভবিষ্যৎ ফলাফল' এবং এটি তাঁর তিনটি প্রবন্ধের অন্যতম। "এগুলো তিনি লিখেছিলেন ১৮৫৩ সালে, যখন পার্লামেন্টে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সনদ পুনর্বিবেচিত হয় সেই প্রসঙ্গে। ভারত ইতিহাসের ওপর বহু প্রামাণ্য লেখকের রচনা খুঁটিয়ে পর্যালোচনার ভিত্তিতে এ প্রবন্ধগুলি লেখা-------"(ভূমিকা, প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা-যুদ্ধ ১৮৫৭---১৮৫৯, পৃ. ৮)। সুতরাং, "ভারতবর্ষে এক দ্বিবিধ কর্তব্য পালন করতে হবে"- এর স্থলে "ভারতবর্ষে এক দ্বিবিধ কর্তব্য পালন করেছে" বলেই মন্তব্যটাকে আমরা গ্রহণ করতে পারি। তদনুসারে বলতে পারি, কার্ল মার্কস এদেশে কোম্পানীর কার্যাবলী পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্তে পৌছেছেন যে, ইংলণ্ড পুরাতন এশীয় সমাজের ধবংস সাধন করে সেখানে পাশ্চাত্য সমাজের বৈষয়িক ভিত্তির প্রতিষ্ঠা করে চলেছে। ভারতবর্ষ ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী প্রসঙ্গে মার্কস যা বলেছেন তা 'প্রলেতারীয় মুক্তি সংগ্রামের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে' এবং তাঁর এ দৃষ্টিভঙ্গিতে হিন্দু বা মুসলমান বলে ভারতবাসীর মধ্যে কোন পার্থক্য বা স্বাতন্ত্র্যের স্থান নেই।

এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মার্কসের এ মন্তব্যকে যথার্থ বলে ধরে নিয়েও বলা চলে, ইংরেজরা ভারতবর্ষে, বিশেষ করে বাংলায়, পুরাতন সমাজ ধ্বংস করে দিয়ে এখানে পাশ্চাত্য সমাজের যে বৈষয়িক ভিত্তির প্রতিষ্ঠা করেছিল তাতে তারা এখানকার সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদকে গ্রহণ করেছিল তাদের উদ্দেশ্য পূরণের সহায়ক হিসাবে এবং সেটা করেছিল তারা সম্পূর্ণ সজ্ঞানে। আর পাশ্চাত্য সমাজের যে বৈষয়িক ভিত্তির প্রতিষ্ঠা, তা সম্পন্ন করতে সহায়তা করেছিল যারা তারা ছিল হিন্দু। মার্কসের কথায়, "কলকাতায় ইংরেজদের তত্ত্বাবধানে অনিচ্ছা সহকারে ও স্বল্প পরিমাণে শিক্ষিত ভারতের দেশীয় অধিবাসীদের মধ্য থেকে নতুন একটি শ্রেণী গড়ে উঠেছে যারা সরকার পরিচালনার যোগ্যতাসম্পন্ন এবং ইউরোপীয় বিজ্ঞানে সুশিক্ষিত।" (কার্ল মার্কস, প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা-যুদ্ধ ১৮৫৭-১৮৫৯ পৃ. ৩৪) এই নতুন শ্রেণীটিই ধর্মগত পরিচয়ে ছিল হিন্দু। উইলিয়াম হান্টারের কথায়, " ভারতীয় মুসলমানেরা হচ্ছে এদেশে ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে চিরন্তন বিপদ। কোন না কোন কারণে তারা আমাদের শাসন প্রণালী থেকে দূরে সরে আছে। শিষ্টভাবাপন্ন হিন্দুরা যেখানে আমাদের প্রবর্তিত পরিবর্তনগুলি

আনন্দের সঙ্গে মেনে নিয়েছে, সেখানে মুসলমানরা সেগুলিকে তাদের প্রতি ভীষণ অবিচার হিসেবেই ধরে নিয়েছে।" (হান্টার, 'দি ইন্ডিয়ান মুসলমান'-এর অনুবাদ–আবদুল মওদুদ, পৃ. ৩) এ প্রবন্ধে হান্টার সাহেবের রচনা থেকেই প্রচুর পরিমাণে উদ্ধৃতি দিচ্ছি, যার থেকে প্রমাণিত হবে যে, ' এশীয় সমাজের' ধ্বংস সাধন বলতে ইংরেজরা ধ্বংস করেছিল প্রধানত পুরাতন মুসলমান সমাজকেই, আর পাশ্চাত্য সমাজের বৈষয়িক ভিত্তির প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছিল ইংরেজের বশংবদ একটি হিন্দু সমাজকেই। মেকলে সাহেবের ভাষ্য অনুযায়ী ঃ " বর্তমানে আমাদের এমন একটি শ্রেণী গড়ে তুলতে হবে, সমাজে যাঁরা শাসক ও শাসিতের মধ্যে দোভাষীর কাজ করবেন। তাঁরা রক্ত- মাংসের গড়নে ও দেহের রঙে ভারতীয় হবেন বটে, কিন্তু রুচি মতামত নীতিবোধ ও বুদ্ধির দিক দিয়ে হবেন খাঁটি ইংরেজ।" (Woodrow-Macaulay's Minutes on Education in India, 1862) এবার আসা যাক হান্টার সাহেবের উদ্ধৃতিতে। বাংলার উপর কোম্পানির আইনগত প্রশ্নে হান্টার সাহেব বলেন ঃ

ইংরেজরা দিল্লীর বাদ্‌শাহের নিকট থেকে বাঙলার দেওয়ানী সনদ লাভ করে কেবল রাজস্ব বিভাগের প্রধান কর্মচারী হিসাবে। অবশ্য আমরা নিয়োগটা লাভ করেছিলাম, মোটা রকম সেলামী দিয়ে নয়, তলোয়ারের জোরে। কিন্তু তাহলেও আইনতঃ আমাদের মর্যাদা বাদশাহের দেওয়ান অর্থাৎ প্রধান রাজস্ব-সচিব ছাড়া আর কিছুই ছিল না। এই অজুহাতে মুসলমানরা দাবী করে যে, আমরা যে দেওয়ানী বিভাগ চালাবার ভার পেয়েছিলাম, সেটা মুসলমানী কায়দা-কানুন মাফিক চালাতে বাধ্য ছিলাম। (ঐ. পৃ.১৫৬)

ইংরেজ শাসনে মুসলমানদের প্রতি অবিচার শীর্ষক অধ্যায়ে হান্টার বলেন ঃ

ভারতের মুসলমানরা তাদের কানুন অনুযায়ীই আমাদের শাসনে শান্তিতে থাকতে বাধ্য; কিন্তু তাদের এ বাধ্যবাধকতা ততক্ষণ থাকবে যতক্ষণ আমরা চুক্তির আমাদের অংশটা পালন করব এবং তাদের অধিকার ও ধর্মীয় মর্যাদাসমূহ মেনে চলব। আমরা যদি একবার তাদের বেসামরিক ও ধর্মীয় মর্যাদা লংঘন করি এবং তার ফলে তাদের ধর্মীয় বিধি-নিষেধ পালন ব্যাহত হয়, তাহলে তাদের কর্তব্যও শেষ হয়ে যায়। আমরা নতি স্বীকারে বাধ্য করতে পারি, কিন্তু অনুগত হওয়ার দাবী করতে পারিনে। (ঐ, পৃ. ১৪০)

অবশ্য হান্টার সাহেব সেই সব মুসলমানের সম্পর্কে ইংরেজদের অবিচারের ফিরিস্তি তুলে ধরেছেন, যারা তাঁর কথায়, কেবল শান্তিতে ইংরেজ শাসন মেনে নিয়েছেন। বিদ্রোহী'দের কথা স্বতন্ত্র। হান্টার সাহেবেরই কথায়, "বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও বিরাগ প্রকাশ স্বাভাবিক নিয়ম এবং যতদিন ইংরেজ ভারতকে কুক্ষিগত রাখতে সক্ষম

থাকবে, ততদিন তারা নিশ্চয়ই গৃহশত্রু ও সীমান্ত প্রদেশের বিদ্রোহীদেরকে সমানভাবে শায়েস্তা রাখবার কৌশলও জানবে।" (ঐ, পৃ. ১৪৩)। তাদের সম্পর্কে আমরা স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করব। শান্তিতে যেসব মুসলমান ইংরেজ শাসন মেনে নিয়েছে, তাদের প্রতি ইংরেজ সরকারের অধিকারের কথা বলতে গিয়ে হান্টার সাহেব বলেন ঃ

> আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায়, ভারত সরকার বহু ক্ষেত্রে এরকম মারাত্মক ভুলের জন্য দায়ী। ..... আমাদের আর এ বিষয়ে উদাসীন থাকা চলে না যে, ভারতীয় মুসলমানরা আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের যে রকম গুরুতর তালিকা খাড়া করেছে, অতীতে আর কোনো আমলে কোনো সরকারের বিরুদ্ধে তা করা হয়নি। তারা আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে যে, আমরা তাদের ধর্মানুসারীদের জীবনের সব রকম সম্মানজনক রুযি-রোযগারের পথ বন্ধ করে দিয়েছি। তারা আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলে যে, আমরা এরকম এক শিক্ষাপ্রণালী আমদানী করেছি, যার দ্বারা তাদের সমগ্র সম্প্রদায় বেকার হয়ে গেছে এবং তারা অপমান ও দারিদ্র্যের মুখে পতিত হয়েছে। তারা আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে যে, আমরা তাদের আইন-উপদেষ্টা বা কাযীর পদ তুলে দিয়ে তাদের হাযার হাযার পরিবারকে দৈন্য দশায় ফেলে দিয়েছি, অথচ এসব কাযী তাদের শাদী পড়াতো এবং স্মরণাতীত কাল ধরে ইসলামের শরীয়ত অনুযায়ী পারিবারিক বিধি-বিধানের তারাই ছিলো একমাত্র অধিকারী ও তত্ত্বাবধায়ক। তারা আমাদের বিরুদ্ধে ফরিয়াদ তোলে যে, আমরা তাদেরকে ধর্ম পালনের উপায়গুলি থেকে বঞ্চিত করে তাদের আত্মাকে বিপন্ন করে তুলেছি। সবার উপরে তাদের ফরিয়াদ হলো এই যে, আমরা তাদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে ইচ্ছাকৃত চাতুরির সঙ্গে চুরি করেছি এবং শিক্ষার জন্য সৃষ্ট তাদের তহবিলগুলি সামগ্রিকভাবে আত্মসাৎ করেছি। এইসব বিশেষ অভিযোগ তারা প্রমাণ যোগ্যমনে করে। এ-সব ছাড়াও তাদের আরও নানাবিধ ভাবাবেগজাত অভিযোগ রয়েছে– সেগুলি হয়তো স্থূল-দৃষ্টি ইংরেজদের নিকট বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ না-ও হতে পারে, কিন্তু সেগুলি আইরীশদের মতোই ভারতীয় গণ-মনে শাসকদের বিরুদ্ধে তিক্ততাকে জিইয়ে রাখে। তারা প্রকাশ্যে বলে যে, আমরা মুসলমান সাম্রাজ্যের সামান্য চাকর-নফর হিসেবে বাঙলা দেশে প্রবেশ করি, কিন্তু আমাদের বিজয়-অভিযানের সময় তাদের প্রতি এতোটুকু করুণা দেখাইনি, ভূঁইফোড়দের মতো অমার্জনীয় রূঢ়তার সংগে আমাদের সাবেক মুনিবদেরকে পদদলিত করেছি। এক কথায়, ভারতীয় মুসলমানরা ব্রিটিশ সরকারকে সহানুভূতিহীনতার জন্য, মহানুভবতার অভাবের জন্য দায়ী করে, অত্যন্ত নীচ পন্থায় তাদের মূলধন আত্মসাৎ করার জন্য এবং একশ্যো বছরেরও উপর তাদের প্রতি নানা গুরুতর সাধারণ অবিচারের জন্য দোষারোপ করে। (ঐ, পৃ. ১৪২-১৪৩)

ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ ই. সি. বেইলী, সি. এস. আই. লিখেছেন, "এতে কি কিছু আশ্চর্য হওয়ার কথা আছে যে, মুসলমানরা সেই শিক্ষাপ্রণালী থেকে বহু দূরে সরে দাঁড়াবে, যার মধ্যে তাদের সংস্কার সম্বন্ধে কোনও সহানুভূতি নেই– সত্যি কথা বলতে গেলে, তাদের অতি দরকারী বিষয়গুলো সম্বন্ধে কোনো কথাই নেই; অন্যদিকে সে প্রণালীর দ্বারা অনিবার্যভাবে এবং সহজেই তাদের স্বার্থের বিরুদ্ধতা করা হয়েছে, আর তা-ও তাদের সামাজিক প্রথার পরিপন্থীভাবে।

নিজের প্রণালীতে শিক্ষিত মুসলমান দেখছে যে, সে শাসন বিভাগের সব ক্ষমতা ও সকল রকম মাহিনা-মুনাফা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, অথচ এগুলির সবই পূর্বে তারই একচেটিয়া অধিকারে ছিল। সে দেখছে যে, জীবন ধারণের একমাত্র সুযোগ-সুবিধা হিন্দুর হাতেই ক্রমে ক্রমে চলে যাচ্ছে। আজ উচ্চ শিক্ষিত মুসলমানদের মন অসন্তোষে ভরে গেছে। তাদের এ মনোবৃত্তির কারণ, তাদের ধর্মের উপর কোনো সক্রিয় জুলুমবাজির জন্য নয়; তাদের ধর্মীয় মতামতের প্রতি পরোক্ষভাবে অবজ্ঞা প্রদর্শনই এজন্য দায়ী।" (ঐ, উদ্ধৃত, পৃ. ১৪৫)

আবারও হান্টার সাহেবের উদ্ধৃতি ঃ "বাস্তবিক, সর্বোচ্চ থেকে নিম্নতম পর্যায় পর্যন্ত সকল সরকারী কর্মচারী একথা স্পষ্টই উপলব্ধি করেছেন যে, আমরা মহারাণীর মুসলমান প্রজাদের প্রতি আমাদের কর্তব্য পালন করতে পারিনি। একথা সত্য যে, হিন্দুদের অধিকার স্বীকার করতে হলে মুসলমানরা আর পূর্বের মতো সরকারী চাকরিগুলি একচেটিয়াভাবে ভোগ করবার হকদার নয়। তাদের সম্পদের সাবেক উৎস শুকিয়ে গেছে, সুতরাং এখন তারা নয়া সরকারের অধীনে নিজেদের ভাগ্যান্বেষণ করতে বাধ্য। ..... বর্তমান ইংরেজ সরকারের চাকরিতে এমন একচেটিয়া অধিকার আশা করা মুসলমানদের পক্ষে অন্যায় হবে। কিন্তু এরূপ তো তাদের আবেদনও নয়, অভিযোগও নয়। .... তাদের দুঃখ এই যে, অন্ততঃ বাঙলাদেশে তাদের ভাগ্যে কোনো সুযোগই মেলে না। সোজা কথায়, মুসলমানরা হয়েছে বিরাট ও গৌরবময় অতীতের অধিকারী, কিন্তু হালফিল একেবারে জীবনোপায়শূন্য।" (ঐ. পৃ. ১৪৫-১৪৭)

বাঙলায় মুসলমানদের অবস্থান প্রসঙ্গে হান্টার সাহেব আরও বলেন ঃ

পূর্ব বাংলার চাষী-বাশিন্দাদের অধিকাংশই হচ্ছে মুসলমান। এই অঞ্চলের জলাভূমি ও নদীবহুল জিলাগুলির আদিম বাশিন্দাদেরকে কখনো ভদ্র হিন্দু সমাজে স্থান দেওয়া হয়নি। দক্ষিণ দিকে আর্যগণ এরকম উপযুক্ত সংখ্যায় উপনিবেশ স্থাপন করেনি, যার দ্বারা সাগর-উপকূলের এবং ব-দ্বীপের বাশিন্দাগণকে, পুরাকালীন ব্রাহ্মণ্যধর্মের গণ্ডিভুক্ত করা যেতে পারতো। এজন্য তারা হিন্দু উচ্চবর্ণের গণ্ডির বাইরেই থেকে যায়। এই চণ্ডালেরা দূরবর্তী সাগরের খাড়িতে মাছ ধরে খেতো। এবং বন্যা উপদ্রুত ক্ষেত্র থেকে অতি কষ্টে ধান জন্মিয়ে ঘরে তুলতো। ......

মুসলমানরা দক্ষিণ অঞ্চলে এরকম বহু পতিত ভূমি আবাদ করে বসতি স্থাপন করেছিল..... আজও শিকারীরা তাদের কত বাঁধ ডিঙিয়ে, পাকা সড়ক বেয়ে, কত মসজিদ, মাযার, দীঘি পার হয়ে জংগলের নিভৃততম অঞ্চলে প্রবেশ করে– কারণ মুসলমানরা যেখানেই গেছে, সেখানেই ধর্ম প্রচার করেছে কতকটা তলোয়ারের জোরে, কিন্তু বেশির ভাগ মানুষেরই হৃদয়ের কোমলতম দুটো তন্ত্রীতে সজোরে আঘাত করে। হিন্দুরা এই ব-দ্বীপের উভচর বাশিন্দাদেরকে কখনো তাদের সমাজে স্থান দেয়নি। মুসলমানরা ব্রাহ্মণ ও নীচ জাত-নির্বিশেষে ইসলামের পূর্ণ অধিকার সবাইকে সমানভাবে দান করেছিল। ......আজও এই ব-দ্বীপের অধিবাসীরা মুসলমান। নিম্নবংগে ইসলাম এমন দৃঢ়ভাবে শিকড় গেড়েছে যে, এখানকার মুসলমানরা নিজেদের ধর্মীয় সাহিত্য ও ভাষা পর্যন্ত গড়ে ফেলেছে। তাদের পুঁথি বা মুসলমানী বাংলা উত্তর ভারতের উর্দূ থেকে ততোটা পৃথক, যতোটা উর্দূ ভাষা হিরাতের ফারসী ভাষা থেকে পৃথক। এ অঞ্চলের দেহাতী বাশিন্দাদের মধ্যে বহু আশরাফ ও বিশিষ্ট ভদ্র এবং অগণিত ভূসম্পত্তির মালিকও আছেন। এ-কথা সত্য যে, আজও এককালে অশেষ ক্ষমতাবান সর্বগ্রাসী মুসলমান উচ্চ সম্প্রদায়ের ছিটে-ফোঁটা সারা বাংলা জুড়ে রয়েছেন। তাঁরাই তাঁদের বিগত দিনের প্রত্যক্ষ সাক্ষী। আজও মুর্শিদাবাদে একটা মুসলমান রাষ্ট্রের অনুকারী দরবারের অভিনয় চলে এবং প্রত্যেক জিলাতেই কোনও না কোনও শাসকের দূরবর্তী বংশধর তার ছাদবিহীন বালাখানায় ও জলদামশোভিত সায়রে অপ্রসন্ন গর্বিত দৃষ্টি মেলে দিন কাটায়। এ-সব পরিবারের অনেকগুলিই আমার ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত। তাদের ভেঙে-পড়া বালাখানাগুলি আজ শুধু বয়স্ক ছেলেমেয়েতে, পৌত্রপৌত্রীতে, ভাইপো-ভাইঝিতে ভরতি–এই অন্নবসনক্লিষ্ট ছেলেমেয়ে দলের কারও আজ জীবনে কিছু করবার মতো সুযোগ-সুবিধা নেই। তারা আজ জোড়াতালি দেওয়া বারান্দায় অথবা ছাদফুটো দহলিজে বসে বসে উদ্দেশ্যবিহীন জীবন যাপন করে, আর দিনে দিনে দারুণ হতাশায় দেনার গভীর গহবরে ডুবে যায়। তারপর একদিন প্রতিবেশী হিন্দু মহাজন ঝগড়া বাধায়, আর কতকগুলি বন্ধকী খতমূলে তাদের ভূসম্পত্তিগুলি আটক করে–ফলে, বহু দিনের বহু প্রাচীন মুসলমান পরিবারটি উৎখাত ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।" (ঐ. পৃ. ১৪৭-৪৯)

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বাংলার মুসলমানরাই ১৭৫৭ সাল থেকে তাদের পতন যুগের শিকার হয়েছে। ইংরেজরা ভারত বিজয় শেষ করে ১৮৪৯ সালে, শিখদের পরাজিত করে মুলতান ও পাঞ্জাব বিজয়ের ফলে। ভারতবর্ষের অন্যান্য অং ইংরেজদের দখলে আসে ১৭৫৭ সালের পর ১৮৪৯ সালের আগেকার সময়টুকুর মধ্যে বিভিন্ন সময়ে। বাংলার মুসলমানরা তাই ইংরেজ ও তাদের অনুগ্রহ-নির্ভর হিন্দুদের হাতে লাঞ্ছিত ও শোষিত হয়েছে অনেক বেশি সময় ধরে। এটুকু উল্লেখ করেই আবার হান্টার সাহেবের কথায় ফিরে যাওয়া যাক ঃ

> আমি এখানে মুসলমান চাষী ও মুসলমান বড়-ঘরানাদের বিষয়ে বিশদ আলোচনা করলাম যাতে ইংরেজরা যেন চোখ খুলে দেখতে পায়, কোন্ শ্রেণীর লোকদের অভিযোগ সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হচ্ছে। আমি এখানে আরও বলে রাখি যে, আমার মন্তব্যগুলি কেবল বাঙলা দেশ সম্বন্ধেই প্রযোজ্য; কারণ আমি এদেশটাই ভালোমত জানি এবং আমার যতদূর জানা আছে, তাতে ধারণা হয় যে, এদেশের মুসলমানরাই বৃটিশ শাসনে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ..... যদি কোন মানুষ কখনো জীবনোপায়ের জন্য তীব্র প্রয়োজনীয়তা বোধ করে থাকে তাহলে সে হচ্ছে বর্তমান কালের বাঙলার খান্দানী মুসলমান। (ঐ. পৃ. ১৫২)

এরপর হান্টার সাহেব দেখিয়েছেন, কি করে মুসলমানরা সেনাবাহিনী, রাজস্ব বিভাগ এবং বিচার বিভাগ ও শাসন বিভাগ প্রভৃতি বেসামরিক চাকরি থেকে একেবারেই বাদ পড়ে গেল। তারপর তিনি প্রশ্ন রেখেছেন ঃ

> এ-সবের কারণ কি ? হিন্দুরাই কি মুসলমানদের চেয়ে বেশী উপযুক্ত এবং পাল্লায় হারিয়ে দেওয়ার জন্য কেবল উপযুক্ত ক্ষেত্রেরই কি অভাব ছিল, কিংবা মুসলমানদের জন্য আরও বহু জীবনোপায় খোলা থাকার দরুন তারা সরকারী চাকরি-জীবন পছন্দ করে না এবং এজন্য হিন্দুদেরকে খোলা ময়দান ছেড়ে দিয়েছে? হিন্দুদের উচ্চ বুদ্ধিমত্তা আছে স্বীকার করি। কিন্তু তাদের সার্বভৌম ও অপরিসীম শ্রেষ্ঠতাই তাদেরকে সরকারী চাকরিতে একচেটিয়া অধিকার দিয়েছে, বর্তমানে তেমন কিছু নযরে পড়ে না এবং এরকম যুক্তিও তাদের অতীত ইতিহাসের সম্পূর্ণ বিপরীত। আসল সত্য এই যে, যখন এ দেশটা আমাদের অধিকারে আসে, তখন মুসলমানরা ছিল শ্রেষ্ঠ জাতি, তারা শুধু দরাজ দিল ও সবল বাহু নিয়েই শ্রেষ্ঠ ছিল না, তারা সরকারী গঠনমূলক কাজে এবং শাসন পরিচালনা সংক্রান্ত হাতে-কলমের বিদ্যায়ও ওস্তাদ ছিল। তবু আজ মুসলমানদেরকে সরকারী চাকরি ও বেসরকারী কাজকর্ম থেকে সমানভাবে দূরে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। (ঐ. পৃ. ১৬৫)

আমরা দেখলাম, এদেশের পুরাতন যে সমাজটা ইংরেজ ঔপনিবেশিকরা ধ্বংস করে দিল, তা হলো মুসলমান সমাজ। পুরাতন হিন্দু সমাজটাও ভেঙে দিয়েছিল ওরা, কিন্তু তার স্থলে একটা 'আধুনিক হিন্দু সমাজ তারা গড়ে তুলতে সর্বরকমে সাহায্য করেছিল। মুসলমানদের বেলায় কোন ' আধুনিক' সমাজ গড়ে তোলার কোন সদিচ্ছাও ইংরেজ ঔপনিবেশিকদের ছিল না। আর ' বিভক্ত করে শাসন কর' নীতিতে সেটা স্বাভাবিকও ছিল না। লক্ষ্য করা যেতে পারে যে, ' বিদ্রোহী' মুসলমানদের তো কথাই নেই, 'শান্তিতে ইংরেজ শাসন মেনে' নিয়েছিল যেসব মুসলমান তাদের প্রতি অবিচারের কথাই বলেছেন হান্টার সাহেব– বৃটিশ সরকারের এক উচ্চপদস্থ কর্মচারী। নতুন গড়ে-ওঠা বর্ণহিন্দুদের ওই আধুনিক হিন্দু সমাজটাই সর্বাংশে সহায়ক হয়েছিল এদেশে

'পাশ্চাত্যের বৈষয়িক ভিত্তির প্রতিষ্ঠায়।' এই যে একের পতন ও অন্যের উত্থানের ভেল্কীবাজি, তার একটা রূপরেখা এখানে দিলে অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

পলাশী-বিপর্যয়ের পর কোম্পানী আধিপত্যের প্রারম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত যে শোষণ-কার্যটি চলেছিল, তাকে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা চলে ঃ (১) সরাসরিভাবে লুণ্ঠন, (২) পাশ্চাত্যের বণিকতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ও দেশীয় শিল্প বাণিজ্যের ধ্বংস সাধন ও (৩) অন্যান্য উপায়ে পরোক্ষভাবে শোষণ। এটা আগেও বলা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ের কিছুটা নমুনা অর্থাৎ মুর্শিদাবাদ থেকে ইংরেজের, বিভিন্ন রকম প্রাপ্তির নমুনাও দেওয়া হয়েছে আগে। আধিপত্যের প্রারম্ভের কিছু পরে সেই লুণ্ঠনের যে জের চলেছিল, তার বাকি সামান্য বর্ণনাও এখানে দেওয়া প্রয়োজন মনে করি। তবে সেটা বাংলায় নয়, দিল্লীতে। ডলারের হিসাবে তাজমহলের নির্মাণকার্যে ব্যয়িত হয়েছিল আনুমানিক ২৩ কোটি ডলার। "সেই তাজমহলটিকে ভেঙে তার মাল-মসলা আত্মসাৎ করার জন্যে ভারতের অন্যতম পরম দয়ালু ও কল্যাণসাধক বড়লাট হিসেবে বন্দিত লর্ড বেনটিংক্ একবার একজন হিন্দু কন্ট্রাকটরকে মাত্র ১,৫০,০০০ ডলারে বিক্রয় করার চুক্তি করেছিলেন।" (The Round the World Traveller-Lorenj. P.379— উদ্ধৃত, আবদুল মওদুদ)। বিদেশীদের বর্ণনা থেকে আবদুল মওদুদ সাহেব আরও উদ্ধৃত করেছেন, "ওয়ারেন হেস্টিংস দেওয়ান-ই-খাসের হাম্মামখানাটি উপড়ে নিয়ে বিলাতে রাজা চতুর্থ জর্জকে উপহার পাঠিয়েছিলেন এবং লর্ড বেনটিংক্ প্রাসাদটির অন্যান্য অংশ বিক্রয় করে ভারতের রাজস্ব বৃদ্ধি করেছিলেন।" (মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ ঃ সংস্কৃতির রূপান্তর, পৃ. ৬৩-৬৪)

> কোম্পানী শোষণের প্রকৃতি বর্ণনা করতে গিয়ে এডমণ্ড বার্ক বলেছিলেন ঃ আমাদের আজ যদি ভারত ছাড়তে হয়, তাহলে ওরাং ওটাং বা বাঘের চেয়ে কোনো ভালো জানোয়ারের অধিকারে যে এদেশ ছিল, তার প্রমাণ করবার কিছুই থাকবে না। (ঐ. উদ্ধৃত, পৃ. ৬৪)

দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের শোষণের কিছুটা ধারণা হান্টার সাহেবের উদ্ধৃত অংশগুলো থেকে পাওয়া যায়। বাদবাকী কিছু কার্যা সেসবের রূপরেখার মারফত তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

"আঠারো শতকের মধ্যভাগে পলাশীর পর ব্যবসায় ক্ষেত্রে যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আবির্ভাব হয়, তাদের আদি পুরুষরা ছিল ইংরেক হৌসে ও ব্যাংকিং কর্মে নিযুক্ত দালাল পর্যায়ের। গোমস্তা, মুনিব, বৈশ্য, বেনিয়ান নামে তারা খ্যাত; মাদ্রাজে তাদের নাম ছিল দোভাষী; ইংরেজরা তাদের বেনিয়ান বলেই উল্লেখ করতো। কারবারে, কুঠিতে তারা মূল্য আদান-প্রদানের জন্য দায়ী থাকতো। টাকা দাদন দেওয়া, পণ্য সংগ্রহ করা, শিল্পীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা তাদের কর্তব্য ছিল। গাড়ী, বলদ, উট প্রভৃতি সংগ্রহ

করে পণ্য চলাচলের ব্যবস্থার জন্যেও পৃথক বেনিয়ান থাকতো।.... আরও এক শ্রেণীর লোক ছিল যারা ' শরফ' এবং বিদেশী বণিকদের পোদ্দারী কর্ম করতো। টাকা আদান-প্রদান, ঋণের ব্যবস্থা প্রভৃতি তাদের কাজ ছিল। .... পাইকারদের কাজ ছিল টাকা দাদন দিয়ে কুটীরে কুটীরে পণ্য সংগ্রহ করা।...এই পাইকার, দালাল, গোমস্তা, মুৎসুদ্দি, শরফ বা পোদ্দাররাই ছিল ইংরেজদের এদেশে বার্নিজ্যিক যোগসূত্র। চীন দেশের Compradore-দের সংগেই তাদের তুলনা করা যায়। এরাই কোম্পানির বেনামীতে পৃথক বাণিজ্য করে প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করতো। এদেরই পুরোধায় ছিল জগৎশেঠ, উমিচাঁদ এবং এরাই পলাশীর যুদ্ধে ক্লাইভকে সক্রিয় সাহায্য দিয়েছিল।" (ঐ. পৃ. ৬৫)

ব্যবসায়ী মধ্যবিত্ত শ্রেণীটি কোম্পানীর সঙ্গে বিভিন্ন রকম যোগসাজশে প্রভূত অর্থের অধিকারী হতে থাকে। কোম্পানীর কর্মচারীদের সঙ্গে ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের অংশীদারী লাভ, কোম্পানীর কর্মচারীদের সঙ্গে আঁতাত করে স্বনামে-বেনামে ভূমির মালিকানা লাভ ইত্যাদি এসব যোগসাজশের দৃষ্টান্ত। ১৮৪৫ সালের ক্যালকাটা রিভিউ পত্রিকা থেকে জানা যায়, গোবিন্দরাম নামক জনৈক ব্যক্তি কোম্পানীর কলিকাতা জমিদারীর তত্ত্বাবধায়ক থাকাকালে প্রায় দেড় লক্ষ টাকা তসরূফ করে বসে। তার মাসিক বেতন ছিল ৫০ টাকা। তসরূফের এই টাকা খাটিয়ে সে অনেক ভূ-সম্পত্তির মালিক হয়ে বসে। কিন্তু তসরূফের বা তছরূপের টাকা খাটিয়ে ভূসম্পত্তি অর্জন কোনটারই জন্য সে দোষী সাব্যস্ত না হয়ে কোম্পানীর কাউন্সিল কর্তৃক সে নিষ্কৃতি লাভ করে। এমন কি, পলাশী বিপর্যয়ের পর তাকে কলিকাতার নায়েব-জমিদার পদে উন্নীত করা হয়। রামচন্দ্র ও নবকৃষ্ণ ছিল ক্লাইভের খাস অনুচর। ক্লাইভকেও ভাঁওতা দিয়ে তাঁরা মুর্শিদাবাদের মালখানা থেকে আত্মসাৎ করে কোটি কোটি টাকা। রামচন্দ্র হয় কোটিপতি, আর অন্য কোটিপতি নবকৃষ্ণ লাভ করে রাজা উপাধি। অতঃপর রাজা নবকৃষ্ণ মাতৃশ্রাদ্ধে খরচ করেন কয়েক লক্ষ টাকা। "হাটখোলার মদন মোহন দত্ত কোম্পানীর সামান্য বেনিয়ান থেকে কয়েকটি জাহাজের মালিক ও প্রসিদ্ধ ব্যাংকার হয়েছিলেন। রামদুলাল দে ছিলেন ফেয়ার্লী কোম্পানীর এক চার পাঁচ টাকার মাস মাহিনার গোমস্তা। কিন্তু দালালি করে তিনি ষাট লক্ষ টাকার সম্পত্তি রেখে যান। তাঁর পুত্র আশুতোষ দে পামার এন্ড কোম্পানীর বিখ্যাত হৌস ১৮৩০ সালে ক্রয় করেন। তখন কলিকাতার আবহাওয়া ছিল এসব বেনিয়ান মুৎসুদ্দি গোষ্ঠীর অনুকূলে এবং ব্যবসায় ক্ষেত্র ছিল তাদের, -স্বর্গরাজ্য। সামান্য নগণ্য লোকেরা রাতারাতি লক্ষপতি, কোটিপতি হয়ে গেছে রহস্যময় নীতি অনুসরণ করে।"(ঐ, পৃ. ৬৭) ' ঊনবিংশ শতাব্দীর পথিক'-এ অরবিন্দ পোদ্দারের বর্ণনায়, ১৮৩৩ সালের আগে এদেশের কৃষি ও বাণিজ্যিক কারবারগুলোর তদারকি করত অশিক্ষিত সাধারণ ঘরের ইংরেজরা, শিক্ষিত ভদ্রবংশের ছেলেরা এসব কাজে আসত না। প্রশ্নটি যখন ১৮৩১-৩২ সালে বিবেচিত হয়, তখন রাজা রামমোহন রায় বিলেতে।

যে রাজার কণ্ঠ থেকে বিশ্বজনগণের স্বাধীনতার নির্ঘোষ ধ্বনিত হয়েছিল, তিনিই আবার নীলকর সাহেবদের পক্ষে ওকালতি করেছিলেন (ঐ. পৃ. ১৩৩-১৩৫)। তিনি এদেশে নীল, পাট, চা, চিনি প্রভৃতি কৃষিশিল্পে ইংরেজ-নন্দনদের আরও বেশী সংখ্যায় অংশগ্রহণের নীতি সমর্থন করেছিলেন (Report Sel. Com. H.C. 1831-32 দ্রষ্টব্য)। তার ফলে এদেশের কৃষি ও বাণিজ্যের উন্নতির তুলনায় অনেক বেশী উন্নতি হয়েছে এ দেশীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীটির; কারণ তার ফলে এদেশ সম্পর্কে 'অনভিজ্ঞ' সাহেবরা কাজ চালিয়ে নিত এদেশীয়দের সাহায্যেই। এবং তার জন্য তো মধ্যবিত্ত শ্রেণীটি আছেই! অবশ্য, এর থেকে মুনাফার মোটা অংশটা যেত সাগর-পারে, কিন্তু সরু অংশটা অন্তত থেকে যেত সাহায্যকারী' মধ্যবিত্ত নেটিভ'দের ভাগে। এই অংশটার ষোল আনাই গ্রাস করত বাঙ্গালী হিন্দুরা। "তারা প্রথমে নগণ্য সেবকদের মতো বেনিয়ান, মুৎসুদ্দি, দালাল, গোমস্তা, দোভাষী প্রভৃতি নামাঙ্কিত হয়ে ইউরোপীয় হৌসে প্রবেশ করতো, ব্যবসার ফন্দি-কৌশলগুলো আয়ত্ত করতো, তারপর নিজেরা সামান্যাকারে ব্যবসা ফেঁদে বসতো। এ ভাবেই রামদুলাল দে'র পুত্র আশুতোষ দে চার্লস কান্টর কোম্পানীর রেলি ব্রাদার্সের বেনিয়ান হিসেবে প্রবেশ করেছিলেন। এভাবেই বিখ্যাত ঠাকুর বংশের আদি পুরুষ জয়রাম আমিনগিরি করে প্রথমে অন্নসংস্থান করতেন; তাঁর পৌত্র দ্বারিকানাথ প্রথমে নিমকী সাহেবের শেরেস্তাদারী করেছিলেন, কিন্তু পরে প্রিন্স দ্বারিকানাথ ঠাকুর হিসেবে ব্যবসায় ও জমিদারীতে জ্যোতিষ্করূপে গর্ন্য হতেন। ১৮৩৫ সালের বেঙ্গল ডাইরেক্টরীতে দেখা যায়, কলিকাতা চেম্বার অব কমার্সের শাসন-পরিষদে তিনিই একমাত্র ভারতীয় সভ্য।" (আবদুল মওদুদ, মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ, পৃ. ৭১-৭২)। অরবিন্দ পোদ্দারের মতে, বাণিজ্যিক মধ্যবিত্ত শ্রেণীটিই ছিল ইংরেজদের এদেশ দর্শন-শ্রবণের চক্ষু-কর্ণ; ইংরেজদের নিকট এদেশের গণ ও সমাজ জীবনের সেতুবন্ধ স্বরূপ। ভারতীয় সমাজ, সমাজ-জীবন, রীতি-নীতি, বিধি-বিধান সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞানের পাঠ এরাই ইংরেজদের সরবরাহ করতো; আর বৈষয়িক এবং শাসন-কার্যাদির ব্যাপারে ইংরেজকে এদের উপরেই নির্ভর করতে হতো। (উনবিংশ শতাব্দীর পথিক, পৃ. ১০) ভারতীয় সমাজতত্ত্ববিদ বি. বি. মিশ্রের মতে, এই স্বার্থ-সংরক্ষণের গরজটা ইংরেজ ও এই শ্রেণীর হিন্দু মধ্যবিত্তদের এতোখানি ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ করে তুলেছিল যে, ১৮৮৮ সালে হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিষ্ঠিত ' ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের' বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করতে বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের তদানীন্তন চেয়ারম্যান ডেভিড ইয়ুলকে আহ্বান করতে চক্ষু লজ্জায় বাধেনি (The Indian Middle Class; Their Growth, P. 105)। আবদুল মওদুদের কথায়, "কোম্পানী আমলের একশো বছরের বাণিজ্যিক গতি-প্রগতির ইতিহাস অনুধাবন করলে সহজেই প্রতীয়মান হয়, কি স্বার্থের ডোরে ইংরেজরা এবং এদেশের একশ্রেণীর বর্ণহিন্দু

সন্তানেরা বাঁধা পড়েছিল এবং অনুগ্রাহক সাহেববৃন্দ অনুগৃহীত 'নেটিভদের' মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে রূপায়িত করেছিল। সাম্রাজ্য স্থাপনের সুচতুর ব্যবস্থাপনায় ইংরেজরা বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা দান করে বাংলার বর্ণহিন্দু সম্প্রদায়ের সন্তানদের নিয়েই মধ্যবিত্ত শ্রেণীরূপ সুদৃঢ় স্তম্ভ নির্মাণ করেছিলেন। এমনকি এই লৌহ খুঁটির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে রাজা রামমোহনের নামও স্মরণীয়। কৌতুককর এই যে, তখন ব্যবসায়ে যাঁরা এতোখানি ভাগ্য নির্মাণ করেছিলেন, সেই রামমোহন রায়, রামদুলাল দে, দ্বারিকানাথ ঠাকুর, আশুতোষ দে, রামগোপাল ঘোষ, কারও বংশগত পেশা ব্যবসায় ছিল না। কিন্তু একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, এ যুগের বর্ণ হিন্দুরা ইংরেজের শাসন মনেপ্রাণে গ্রহণ করে ইংরেজের পরম খায়ের খাঁ হয়ে উঠেছিল।" (মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ, পৃ .৭৩-৭৪) একই কথার ধ্বনি শুনি অরবিন্দ পোদ্দারের বক্তব্যেও ঃ "এটা একটা ঐতিহাসিক সত্য যে, বর্ণ হিন্দু সম্প্রদায়ের একটা বৃহদাংশ ইংরেজ শক্তির আবির্ভাবকে বিধাতার আশীর্বাদ হিসেবে অভিনন্দন জানিয়েছিল।" (ঊনবিংশ শতাব্দীর পথিক, পৃ. ১০-১১)

লুণ্ঠনের পর ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইংরেজের কীর্তি সম্পর্কে কিছুটা অবহিত হওয়া গেল। এবার ভূমি-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে দৃষ্টি ফেরানো যাক। 'মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ' গ্রন্থে আবদুল মওদুদ সাহেব বলেন ঃ

> মুঘল যুগে ভূম্যাধিকারীদের ক্রম স্তর ছিল এরূপ-জমিদার, তালুকদার, মকররীদার, ইজারাদার প্রভৃতি। তালুকদারের সংখ্যা ছিল বেশি, এবং বাংলা, বিহার, গুজরাট, মাদ্রাজ সর্বত্র তাঁদের অস্তিত্ব ছিল। .... যেখানে জমিদার, তালুকদার ছিল না, সেখানে ইজারাদার নিযুক্ত হতো রাজস্ব কর্মে।

ইংরেজদের প্রথম কাজ ছিল, জমিদারের বিচার ও শাসন সংক্রান্ত সমস্ত ক্ষমতা হরণ করে নিজেদের হস্তে গ্রহণ করা। প্রথমে ইজারাদারীই প্রশস্ত বিবেচিত হওয়ায় প্রথমত ইজারা প্রথায় রাজস্ব আদায় করা হতো। .... ১৭৭২ সালে হেস্টিংস ইজারাদারী পাঁচসালা বন্দোবস্ত দিতেন। তালুকদার ও ক্ষুদ্র জমিদারদের সংগে সরাসরি রাজস্ব-ব্যবস্থা হয়। কিন্তু জমিদার ফৌৎ হলেই তাঁর জমিদারি ভেঙে কয়েকজন ইজারাদার নিযুক্ত হতো।..... ইজারা প্রথায় জমিদারদের শক্তি খর্ব হয়ে যায় এবং ঘরানা জমিদারগুলো ভেঙে পড়তে থাকে।

ইজারা বিলি নিলাম ডাকে আরম্ভ হওয়ায়, ভূমি ক্ষেত্রে বাজার গরম হয়ে উঠে এবং ফটকাবাজি চলতে থাকে। যতো বেনিয়ান, মুৎসুদ্দি, সরকার, গোমস্তা ব্যবসায়ে উপার্জিত অঢেল অর্থ ভূস্বত্বে খাটাতে থাকে এবং এভাবে ভূম্যাধিকারী মধ্যবিত্তদের উদ্ভব হয়। ইজারাদারীর মুনাফা এতো আকর্ষণীয় হয়ে উঠে যে, কোম্পানীর কর্মচারীরা বেনিয়ানদের সহযোগে ভূমি রাজস্বের মুনাফা লুটতে থাকে। ..... ১৮৭৬ সালে .... কোর্ট অব ডিরেক্টরস্ স্বীকার করেন, ভূমির বন্দোবস্তে ব্যবসায়ীরা প্রবেশ করেছে এবং

বেআইনীভাবে কোন কোন জিলা প্রশাসক বেনিয়ানদের বেনামীতে ভূমিস্বত্ব অর্জন করেছেন। এমন কি গভর্নর-জেনারেল হেস্টিংসের স্বার্থে তাঁর বেনিয়ান কৃষ্ণকান্ত নন্দী আপন পুত্র লোকনাথ নন্দীর নামে বহরবন্দ পরগণায় বহু ভূ-সম্পত্তি ইজারা গ্রহণ করেছেন। বস্তুত নতুন ইজারা নীতির ফলে পুরাতন অভিজাত শ্রেণীর জমিদার গোষ্ঠীত ভাঙন ধরে গেলো এবং নব্য বেনিয়ানরা তাঁদের স্থলাভিষিক্ত হতে লাগলো।

১৭৭০ সালের ভীষণ দুর্ভিক্ষ বা ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে বাংলা ও বিহারের এক-তৃতীয়াংশ লোক প্রাণত্যাগ করে এবং বহু গ্রাম জনহীন হয়ে যায়। এর অভিঘাত পড়ে কৃষিকার্যে তথা রাজস্ব আদায়ে; কৃষকের অভাবে জমি অনাবাদী থেকে যায় এবং খাজনাদিও আদায়ওয়াশীল শক্ত হয়ে পড়ে। অথচ হেস্টিংস কড়া চাপে কোম্পানীর প্রাপ্যটা নির্ধারিত অংকেরও বেশি আদায় করেছেন। তার ফলেও বহু প্রাচীন জমিদার হয় ফৌৎ হয়ে যান অথবা দারিদ্র্যের কবলে পড়েন। অনেকেরই জমিদারী নিলামে উঠে ও নামেমাত্র মূল্যে বিক্রয় হয়ে যায়। .... এই সময়ই পায়কশ্‌ত্‌ কৃষক শ্রেণীর আবির্ভাব হয়, তারা অস্থায়ী কৃষক হিসেবে গণ্য হলেও প্রকৃতপক্ষে হলকর্ষক ছিল না; যেমন একজন ইংরেজ ভদ্রলোক সুবিধায় বহু জমির বন্দোবস্ত গ্রহণ করেন।

বাংলায় প্রাচীন অভিজাত শ্রেণীর স্থান গ্রহণ করে কোম্পানীর রাজস্ব ও বাণিজ্য বিভাগের বহু নিম্নশ্রেণীর কর্মচারীর দল। তারা কৌশলে বহু জমির নামমাত্র খাজনায় বন্দোবস্ত হাসিল করতো। নদীয়া জিলার একজন আমীন স্বনামে বহু জমির জমাবন্দী নিজ নামে প্রস্তুত করে ও সেসব বিনা সেলামী ও বিনা বন্দোবস্তে আত্মসাৎ করে। অথচ সেগুলো স্বীকৃতিও লাভ করে। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ জয়রাম। তিনি বাংলার বিখ্যাত ঠাকুর বংশের আদি পুরুষ। আমীন হিসাবে তিনি কোম্পানীর চব্বিশ পরগনা জিলার বন্দোবস্ত কার্যে নিযুক্ত থাকাকালে প্রভূত ভূমির মালিক হন।......

যাহোক, হেস্টিংসের পাঁচসালা ইজারা বন্দোবস্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো। .... কর্নওয়ালিশ এলেন ১৭৮৬ সালে। স্যার জন শোয়ের সুপারিশক্রমে প্রথমে তিনি ১৭৯০ সালে জমিদারগণের (নতুন) সংগে বন্দোবস্ত করলেন দশসালা নীতিতে। জমিদারদের স্বত্ব ওয়ারিসী হিসেবে স্বীকৃত হলো। কোর্ট অব ডিরেক্টর্সের অনুমোদন লাভ করে এই বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী হিসেবে ঘোষিত হলো ১৭৯৩ সালে। বাৎসরিক নির্দিষ্ট খাজনা দেওয়ার চুক্তিতে জমিদারদের স্ব স্ব চিরস্থায়ী উত্তরাধিকারযোগ্য ও হস্তান্তরযোগ্য স্বীকৃত হলো। সহসা (নতুন) জমিদারগোষ্ঠী ভূমির মালিক হয়ে গেলেন, হতভাগ্য কৃষক শ্রেণী তাঁদের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ল।

এভাবে পুরাতন জমিদার শ্রেণীর বদলে ইংরেজের আশীর্বাদপুষ্ট নয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণী জমিদার তালুকদার হিসেবে প্রতিষ্ঠাবান ও প্রভাবশালী হয়ে উঠেন। তাঁরা প্রায় ক্ষেত্রে কলিকাতা বা অন্য শহর এলাকাবাসী; এজন্যে অনুপস্থিত অন্যত্রবাসী জমিদার শ্রেণীতে

বাংলা ভরে গেল। (পৃ. ৮৫–৯০)। উইলিয়াম হান্টারের মতে, "এই বন্দোবস্তের ফলে যে সব হিন্দুরা নগণ্য পদে নিয়োজিত ছিল, তারা জমিতে মালিকানা স্বত্ব লাভ করলো, এবং পূর্বে যে ধন মুসলমানের ঘরে যেতো সেসব হিন্দুরা আত্মসাৎ করতে লাগলো।" (ঐ. উদ্ধৃত, পৃ. ৯১)। তিনি আরও বলেন, "...আবার ত্রিশ বছর পরে বাজেয়াফ্‌তী আইন তাদের ভাগ্য একেবারে ওলটপালট করে দিল। ...এই আইনের জোরে মালিকানা স্বত্বের দলীল দস্তাবেজগুলির বড়ো কঠোর ব্যাখ্যায় কেবল রাষ্ট্রেরই মুনাফা বাড়ানো হয়েছিল; অথচ মুসলমানরা নিজেদের আমলদারীতে এ-সবের কোনো ধার ধারতো না। গত পঁচাত্তর বছরের বাঙলার মুসলমান পরিবারগুলি হয় উৎখাত হয়ে গেছে, না হয় আমাদের শাসন আমলের নয়া সমাজের নিম্নস্তরে চাপা পড়ে যাচ্ছে।" (ঐ, পৃ. ১৬০)। বাজেয়াফ্‌তী আইন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করতে গিয়ে হান্টার সাহেব বলেন ঃ

> আমরা বাঙলা দেশের শাসনভার গ্রহণ করলে পর সমকালীন সুযোগ্য রাজস্ব কর্মচারী হিসাব কষে দেখলেন যে, সমগ্র দেশের সিকি ভাগই রাষ্ট্র থেকে দানের খাতে চলে গেছে। ১৭৭২ সালেই ওয়ারেন হেস্টিংস এই সাংঘাতিক ফাঁকিটা ধরে ফেলেন; কিন্তু সে-সব জোত বায়েজয়াফ্‌ত করার বিরুদ্ধে জনমত তখন এতোই প্রবল ছিল যে, কোনও সক্রিয় কর্মপন্থা অবলম্বন করা সম্ভব হয়নি। ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিস পুনরায় সরল ও পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করলেন যে, যে-সব নিষ্কর জোত-স্বত্বের পক্ষে শাসন শক্তির মঞ্জুরি নেই সেগুলিকে বাজেয়াফ্‌ত করার সরকারের নিরংকুশ ক্ষমতা রয়েছে; কিন্তু তখনকার শক্তিশালী সরকারও এই নীতি কার্যকরী করতে সাহসী হয়নি।----- ১৮১৯ সালে এই দাবীটা আরও একবার ঘোষিত হলো, কিন্তু তখনও কার্যকরী করতে সংকোচবোধ করা হলো। শেষে ১৮২৮ সালে শাসন বিভাগ ও ব্যবস্থা-পরিষদ একযোগে একটা জোরালো পন্থা অবলম্বন করতে অগ্রসর হলো। এজন্য বিশেষ আদালত বসানো হলো, আর তারপর পুরো আঠারো বছর ধরে সারা প্রদেশটা সংবাদদাতা, মিথ্যুক সাক্ষী এবং নির্দয় ও কঠোর বাজেয়াফ্‌তী কর্মচারীতে ভরে গেলো।বাজেয়াফ্‌তী মামলাসমূহে এক কোটি টাকারও বেশি মূলধন খরচ করে সরকারের স্থায়ী অতিরিক্ত রাজস্বের পরিমাণ দাঁড়ালো মোটামুটি চল্লিশ লক্ষ টাকার উপর; অর্থাৎ প্রায় আট কোটি টাকার উপর সালিয়ানা শতকরা পাঁচ টাকা মুনাফা লাভ হলো। আর এর মোটা অংশ এসেছিল সেইসব লাখেরাজ জমিজমা থেকে যেগুলির মালিক ছিল মুসলমানরা অথবা তাদের দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলি। তার ফলে যে আতঙ্ক ও ঘৃণা জমে উঠেছিল, সে-সব আজও জমা হয়ে আছে পাড়াগায়ের দলিল-দস্তাবেজে। শত শত মুসলমান পরিবার ধ্বংস হয়ে গেল এবং তাদের শিক্ষা-প্রণালী, যা এতোদিন লাখেরাজ ওয়াক্‌ফের জমিজমার উপর নির্ভরশীল ছিল, মারাত্মক আঘাত পেল। মুসলমান

আলীম-সমাজ প্রায় আঠারো বছরের হয়রানির পর একেবারে ধ্বংস হয়ে গেল। যে-কোন নিরপেক্ষ গবেষক এই সিদ্ধান্তে আসতে বাধ্য যে, বাজেয়াফ্‌তী আইনগুলির দ্বারা আমাদের বারে বারে বিশেষভাবে রক্ষিত অধিকারসমূহ সুপ্রতিষ্ঠিত হলেও এ-সব মামলা ছিল অত্যন্ত কঠোর ও ভারতীয় জনগণের বিশ্বাসের বিপরীত। বহুকালের ভোগজনিত অধিকার পরিষ্কার আইনের বিরুদ্ধে কোনো স্বত্ব সৃষ্টি করতে পারে না সত্য, কিন্তু পঁচাত্তর বছরের অবিচ্ছিন্ন ভোগ দখলের অধিকার (পঁচাত্তর বছর হয় ১৭৫৭ সাল থেকে ধরলে অর্থাৎ কোম্পানী আমল থেকে ধরলে; প্রকৃতপক্ষে এইসব ভোগ-দখলের অধিকার মুঘল আমল থেকেই অর্থাৎ আরও অনেক কাল আগে থেকেই দখলকারীদের ছিল–লেখক) সরকারের অনুগ্রহের উপরেও সবল দাবি জানাতে পারে। কিন্তু আমাদের বাজেয়াফ্‌তী কর্মচারীরা (হিন্দু) দয়ামায়ার ধার ধারতো না। তারা অবিচলিতভাবে আইনই প্রয়োগ করেছে। সে সময়ের আতঙ্ক আজও জেগে আছে, আর আমাদের ভাগ্যে রেখে গেছে সুতীব্র ঘৃণার উত্তরাধিকার। তারপর থেকেই শিক্ষকতার পেশা, যা দেশীয় শাসকদের আমলে বেশ সম্মানার্হ ও মোটা আয়ের জীবনোপায় ছিল, বাঙলা দেশে একবারে বন্ধ হয়ে গেছে। মুসলমানদের ওয়াকফ্‌গুলিই মার খেয়েছে সবচেয়ে বেশি; কারণ, অন্যান্য বিষয়ের মতো স্বত্বের দলীল দস্তাবেজ সম্বন্ধে ভারতের পূর্বতন বিজেতাগণ এ রকম উদ্ধত উপেক্ষা দেখাতো, যা হিসেবী ও সুচতুর হিন্দুর নিকট অজ্ঞাত। লাখেরাজ জোতস্বত্ব সম্বন্ধে আমরা এমন ধরনের উপযুক্ত প্রমাণ দাবি করেছিলাম, যা তখনকার স্থাবর সম্পত্তির অনির্দিষ্ট অবস্থার মধ্যে নিজ নিজ সম্পত্তির প্রমাণের জন্য উপস্থিত করতে তারা একেবারেই অসমর্থ ছিল। ... যে-সব স্বত্বের দলীল ও সনদ এ-সব দাবির প্রমাণ ছিল, ইতিমধ্যে সেগুলিকে দেশের আবহাওয়ায়ও উইপোকায় ধ্বংস করে ফেলেছিল। ...এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না যে, বাজেয়াফ্‌তীকরণের সময় থেকেই মুসলমান শিক্ষা-প্রণালীর অবসানও সূচিত হলো। ... বাজেয়াফ্‌তী মামলাগুলিকে ন্যায়সংগতভাবে হয়তো সমর্থন করা যেতে পারে, কিন্তু মুসলমানদের শিক্ষা-বিষয়ক মূলধনগুলি আমরা আত্মসাৎ করেছি বলে তারা যে অভিযোগ তোলে, তার বিরুদ্ধে কোনো সমর্থন খাড়া করতে পারিনে। কারণ, এই সত্যটা স্বীকার না করার কোনো মানে হয় না যে, মুসলমানরা বিশ্বাস করে, আমরা যদি এই উদ্দেশ্য আমাদের উপর ভারার্পিত সম্পত্তিগুলিকে সাধুতার সংগে কাজে লাগাতাম, তাহলে এই সময়ে বাঙলা দেশে মুসলমানরা সবচেয়ে মহৎ ও সবচেয়ে কার্যকরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধিকারী থাকতো (ঐ, পৃ. ১৭৯–১৮১)।

এমনি আত্মসাতের দৃষ্টান্তস্বরূপ হান্টার সাহেব হুগলীর হাজী মুহম্মদ মুহসীনের ওয়াকফ সম্পত্তির উল্লেখ করে বলেন ঃ এই আত্মসাতের অভিযোগ সম্বন্ধে বেশী কিছু

বলা বেদনাদায়ক; কারণ, এর কোনও জওয়াব নেই। মুসলমানরা প্রকাশ্যেই বলে যে, প্রথম মোতওয়াল্লীর বিশৃঙ্খলার সুযোগ নিয়ে ইংরেজরা একটা বিধর্মী কর্তৃপক্ষকে তাদের বৃহত্তম ওয়াকর্ফের ভারার্নণ করেছে এবং তারপর মুসলমানদের কোনও উপকারে না-লাগা একটা কলেজ খুলে এবং এভাবে একজন ধার্মিক মুসলমান ওয়াকীফের ধর্মীয় কর্তব্য পালনের আসল উদ্দেশ্যটাকে নস্যাৎ করে দিয়ে এই প্রাথমিক অবিচারটা আরও জোরদার করে তুলেছে। এরকম শোনা যায় যে, কয়েক বছর আগে ইংরেজী কলেজের তিনশো ছাত্রের মধ্যে শতকরা একজনও মুসলমান ছিল না। (ঐ. পৃ. ১৮৩)। এ-প্রসঙ্গে আমাদের জানা দরকার, মুঘল আমলে বাংলায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থাটা কেমন ছিল, কারণ বাজেয়াফ্‌তী আইনের ফলে ওই শিক্ষা-ব্যবস্থার মূলে যে কুঠারাঘাত পড়ে, তার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। 'মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ ঃ সংস্কৃতির রূপান্তর' গ্রন্থে আবদুল মওদুদ সাহেব বলেছেন ঃ

> প্রাক-ব্রিটিশ যুগে এদেশে টোল-পাঠশালায় শিক্ষা দেওয়া হতো সংস্কৃত ভাষায় এবং মাদ্রাসা-মকতবে আরবী ও ফারসী ভাষায়। উর্দু ও বাংলা ভাষা শেখানোরও ব্যবস্থা ছিল। এসব শিক্ষায়তনের পাঠ্যসূচী ছিল যথাক্রমে হিন্দু ও মুসলমানের ধর্মীয় ইতিহাস, ধর্মীয় বিধি-বিধান, উত্তরাধিকার নীতি, ভাষাতত্ত্ব, ব্যাকরণ ও সাহিত্য। আধুনিক পাশ্চাত্যানুসারী জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চ্চা ছিল না। কিন্তু স্মরণ রাকা উচিত, এসব শিক্ষায়তনে শিক্ষা দলই সেকালীন বৃহৎ বাদশাহী চালাতো, দফতর চালাতো, বিদেশী কূটনৈতিক সম্বন্ধ ও বৈদেশিক নীতি চালাতো, দেশের স্থাপত্য বিষয়ক ও কারিগরি বিষয়ক সকল কর্মই নির্বাহ করতো; শিক্ষা-সংস্কৃতির কোনও বিষয়ে কোনও বিদেশী বিশেষজ্ঞের দ্বারস্থ হতো না।
>
> ইংরেজরা এদেশ অধিকার করে প্রথম পঞ্চাশ-ষাট বছর শিক্ষাবিষয়ে মোটেই মাথা ঘামায়নি। কেবল শাসন চালাবার জন্যে কর্মচারীর চাহিদা মেটাবার উদ্দেশ্যে ১৭৮১ সালে কলিকাতা মাদ্রাসা ও ১৭৯২ সালে বেনারসে সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হয়, ইংরেজ সরকারের মৌলভী ও পণ্ডিতের চাহিদা পূরণের জন্যে। অবশ্য বিলেতী হৌসের ভাণ্ডাবুলি সর্বস্ব ইংরেজী শিক্ষিত বেনিয়ান, সরকার প্রভৃতির চাহিদা মেটানো হতো বেসরকারীভাবে ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা করে। দ্বারিকানাথ এ ধরনের শিক্ষায়তন সেরবোর্ন স্কুলে ইংরেজী শিক্ষা করেছিলেন।
>
> এদেশে ইংরেজী স্কুল স্থাপন করে ব্যাপকভাবে ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনের ওকালতি করেন সর্বপ্রথমে ব্রিটিশ সিভিলিয়ান চার্লস গ্রান্ট। তাঁর মতে, 'এদেশের সর্বব্যাপী ঘন জ্ঞানান্ধকার শিক্ষা বিস্তারে এবং একমাত্র ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারেই দূর করা সম্ভব।' কিন্তু তাঁর আবেদনে বিলেতী কর্তৃপক্ষ কর্ণপাত করেনি। তাঁর আবেদন

নিষ্ফল হলেও খৃস্টান মিশনারীদের তৎপরতায় বাংলা ও মাদ্রাজে ইংরেজী শিক্ষার পথ প্রশস্ত হয়। উইলিয়াম কেরী ১৭৯৩ সালে কলিকাতায় উপস্থিত হন এবং কয়েকজন উৎসাহী মিশনারীর সহায়তায় শ্রীরামপুরে স্থায়ীভাবে মিশন স্থাপন করে একাধারে খৃস্টধর্ম প্রচার ও বাংলা ভাষায় চর্চা আরম্ভ করেন। তাঁদের দৃষ্টান্ত অনুসরণে অন্যান্য ইংরেজ উদারমনা ব্যক্তি, যেমন ডেভিড হেয়ার, ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় ইংরেজী স্কুল স্থাপন ও ইংরেজী শিক্ষার প্রচার করতে থাকেন। কিন্তু সরকারীভাবে প্রচেষ্টা আরম্ভ হয় আরও অনেক পরে, ১৮২৩ খৃস্টাব্দে। তখন জনশিক্ষার একটা কমিটি স্থাপিত হয় ও সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।" (পৃ. ৯৪–৯৫)।

আবার বাজেয়াফ্‌তী আইনের ফলাফলে ফিরে যাওয়া যাক।'The Discovery of India'-তে পণ্ডিত জওয়াহের লাল নেহেরু লিখেছেন ঃ

ইংরেজরা যখন বাংলায় শক্তি প্রকাশ করে, তখন সেখানে বহু 'মুয়াফী' অর্থাৎ লাখেরাজ ভূদানের অস্তিত্ব ছিল। তাদের অনেক ছিল ব্যক্তিগত, কিন্তু অধিকাংশই ছিল শিক্ষায়তনগুলির ব্যয় নির্বাহের উদ্দেশ্যে ওয়াক্‌ফ্‌কৃত। প্রায় সমস্তই প্রাইমারী স্কুল (মকতব) এবং বহু উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠান এসব ' মুয়াফীর' আয়-নির্ভর ছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বিলাতে অংশীদারদের মুনাফা দেওয়ার জন্যে তাড়াতাড়ি টাকা তোলার দরকার অনুভব করে, কারণ কোম্পানীর ডিরেকটাররা এ বিষয়ে খুবই চাপ দিচ্ছিলেন। তখন এক সুপরিকল্পিত উপায়ে 'মুয়াফী'র জমি বাজেয়াফত করার নীতি গ্রহণ করা হলো। এসব ভূদানের সপক্ষে কঠিন সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত করার নিয়ম প্রস্তুত করা হয়। কিন্তু পুরনো সনদগুলি ও সংশ্লিষ্ট দলিলপত্র ইতিমধ্যেই হারিয়ে গেছে, নয় পোকায় খেয়ে ফেলেছে। অতএব প্রায় সমস্তই ' মুয়াফী' সরকারে বাজেয়াফত করে ফেলা হলো। বহু বনেদী ভূম্যাধিকারী স্বত্বচ্যুত হলেন এবং স্কুল ও কলেজের আয়ের উৎস বন্ধ হয়ে গেল। এভাবে প্রভূত জমি সরকারের খাস দখলে আসে এবং বহু বনেদী বংশ উৎখাত হয়ে যায়। এ পর্যন্ত দেশের যেসব শিক্ষায়তন 'মুয়াফী'র আয়-নির্ভর ছিল, সেগুলি বন্ধ হয়ে গেল এবং বিপুল সংখ্যক শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষাবিভাগীয় কর্মচারী বেকার হয়ে পড়লেন। (পৃ. ৩৭৬–৭৭) এবার হান্টার সাহেবের উদ্ধৃতি ঃ

এ দেশটা আমাদের হুকুমতে আসার আগে মুসলমানরা শুধু শাসন ব্যাপারেই নয়, শিক্ষাক্ষেত্রেও ভারতের শ্রেষ্ঠ জাতি ছিল। ভারতের যে প্রসিদ্ধ প্রশাসক তাদেরকে ভালোভাবে জানেন, তাঁর কথায় ' ভারতীয় মুসলমানদের এমন একটা শিক্ষা-প্রণালী ছিল, যেটা আমাদের আমদানী করা প্রণালীর চেয়ে নিম্নস্তরের হলেও কোনও ক্রমেই ঘৃণার যোগ্য ছিল না। তার দ্বারা উচ্চস্তরের জ্ঞান বিকাশ ও বুদ্ধিবৃত্তি পরিচ্ছন্ন হত।

সেটা পুরাতন ছাঁচের হলেও তার ভিত্তিমূল সুদৃঢ় ছিল এবং সেকালের অন্যসব প্রণালীর চেয়ে নিঃসন্দেহে উৎকৃষ্ট ছিল। এই শিক্ষা-ব্যবস্থাতেই তারা মানসিক ও আর্থিক প্রাধান্য সহজেই অধিকার করেছিল এবং তার মধ্য দিয়েই হিন্দুরা স্বদেশের শাসন ব্যাপারে ছোটখাট অংশ পাওয়ার হকদারও হয়েছিল।' আমাদের আমলদারীর প্রথম পঁচাত্তর বছর ধরে এই ব্যবস্থাকেই আমরা আমাদের শাসনকাজ চালাবার উপযোগী কর্মচারী গড়ে তোলবার জন্য কাজে লাগিয়েছি। কিন্তু ইতিমধ্যেই আমরা নয়া ব্যবস্থায় শিক্ষা বিস্তার শুরু করে দিয়েছি এবং আমাদের প্রবর্তিত ব্যবস্থায় যেমনি এক নয়া দল শিক্ষিত হয়ে উঠেছে, অমনি আমরা মুসলমানদের পুরাতন ব্যবস্থা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি। তার ফলে মুসলমান যুবকদের সামনে সরকারী জীবনোপায়ের সব দরওয়াজাই বন্ধ হয়ে গেছে। (পৃ. ১৭২) '

লুঠেরা ঔপনিবেশিক' ইংরেজ শাসকদের পাশাপাশি কিন্তু এর মধ্যেই আমরা খৃস্টান মিশনারীদের সাক্ষাত পেয়ে গেছি। তাঁরা নিশ্চয়ই 'পাশ্চাত্যের বৈষয়িক ভিত্তি প্রতিষ্ঠা'য় সহায়তা করতে আসেন নি, এসেছিলেন এদেশীয়' হিদেনদের' 'আলোকপ্রাপ্ত' করতে। মেকলে সাহেবের কথায়, "আমার বিশ্বাস, যদি, আমাদের শিক্ষানীতি কার্যকর হয়, তাহলে আজ থেকে ত্রিশ বছরের মধ্যে শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত বাঙালী সমাজে কোন মূর্তি পূজকের অস্তিত্ব থাকবে না এবং আমাদের তরফ থেকে কোন রকমের ধর্মান্তরের চেষ্টা না করেও এই ধরনের সামাজিক রূপান্তর ঘটানো সম্ভব নয়। ধর্মের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করারও প্রয়োজন হবে না। কেবল নতুন শিক্ষালব্ধ জ্ঞান ও চিন্তার ক্রিয়াতেই এই অসাধ্য সাধন হবে।" (Trevelyan-Life and Letters of Lord Macaulay- Vol.1 P.455)। এই ট্রিভেলিয়ন সাহেব নিজের মন্তব্যে বলেছিলেন ঃ

কমিটির বিবেচনায় দরিদ্রের কথাও চিন্তা করা হবেই, তবে আমাদের সামর্থ্য সীমিত, অথচ লক্ষ লক্ষ লোককে শিক্ষা দিতে হবে। এজন্যেই নির্বাচনের প্রয়োজন, এবং প্রথমে উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের দিকেই লক্ষ্য দেওয়া হয়েছে, কারণ তারা শিক্ষিত হলে জনসাধারণের মধ্যেও সুযোগ ছড়িয়ে পড়বে। (পৃ. ৪৯৮) পরে চার্লস উড সাহেবও যে ' শিক্ষা বিষয়ক বিবরণী' বিলাতে পাঠান তাতে বলেছিলেন, "সরকার উচ্চ শিক্ষাদানের ক্ষেত্র একেবারে সীমিত রাখবেন উচ্চশ্রেণীর দেশীয় সন্তানদের মধ্যেই।" (Parliamentary Papers,1854) তার 'পাশ্চাত্যের বৈষয়িক ভিত্তি প্রতিষ্ঠার' জন্য প্রয়োজনীয় হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার সঙ্গে সঙ্গে আমরা মিশনারীদের উদ্দেশ্যটাও বুঝতে পারছি। হোরেস উইলসন সাহেব বলেছিলেন ঃ "শিক্ষা বিষয়ক সব মূলধন কেবলমাত্র ইংরেজী শিক্ষার জন্যই ব্যয়িত করার নীতি গৃহীত হয়, তখন কলিকাতা শহরের মৌলবী ও সম্ভ্রান্ত প্রায় ৮০০০ মুসলমান বড়লাটের নিকট একটি প্রতিবাদ

লিপি প্রেরণ করেন। তাঁরা এ নীতির সাধারণভাবে প্রতিবাদ করে বলেছিলেন, সরকারের এ উদ্দেশ্যটি সুপরিস্ফুট যে, তাঁরা দেশীয় লোকদের ধর্মান্তরিত করতে চান; সরকার মুসলমানী ও হিন্দুয়ানী শিক্ষা একেবারে বন্ধ করে দিয়ে কেবলমাত্র ইংরেজী শিক্ষায় উৎসাহ দিতে চান এদেশী লোকদের খৃষ্টান করার লোভ দেখানো উদ্দেশ্যেই।" (Indian Muslims : A Political History, Ram Gopal P. 18-19 উদ্ধৃত)।

এভাবে আমরা দেখলাম, এদেশে ইংরেজী ভাষায় পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তন করা হয়েছিল ইংরেজের সাম্রাজ্যিক প্রয়োজনে এবং তা সীমিত রাখা হয়েছিল নব্য উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হিন্দুর মধ্যেই। কারণ, এরাই ছিলেন নূতন শাসকদের একান্ত বশংবদ। ১৮৩৫ সাল থেকে কয়েকটি আইনের মাধ্যমে ইংরেজী ফারসীর বদলে সরকারী ভাষা হিসাবে নির্দিষ্ট হয় এবং ১৮৩৭ সালের ১লা এপ্রিল থেকে সরকারী ভাষা হিসাবে এদেশে ইংরেজীর প্রবর্তন হয়। শুধু তা-ই নয়, মিশনারীদের কূটচালে আরবী-ফারসী শব্দবহুল উর্দুর পরিবর্তে সংস্কৃত শব্দবহুল হিন্দুস্তানী ভাষার সৃষ্টি হয় এবং সরকার সে ভাষাকে চাকরী প্রাপ্তির সনদরূপে একমাত্র দেশীয় ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেয়।

পরিশেষে আবার স্মরণ করা যেতে পারে মার্কসের সেই মন্তব্যকে ঃ "ভারতবর্ষে এক দ্বিবিধ কর্তব্য পালন করতে হবে ইংলণ্ডকে ঃ একটি ধ্বংসমূলক এবং অন্যটি উজ্জীবনমূলক ... পুরাতন এশীয় সমাজের ধ্বংস এবং এশিয়ায় পাশ্চাত্য সমাজের বৈষয়িক ভিত্তির প্রতিষ্ঠা।" আমরাও দেখলাম, এই দ্বিবিধ কর্তব্য অন্তত বাংলায় পালন করেছে ইংলণ্ড। তবে কথাটার সামান্য হেরফের হয়েছে এভাবে যে, পুরাতন সমাজ যেটা ধ্বংস হয়েছে সেটা প্রধানত ঃ মুসলমান সমাজ এবং পাশ্চাত্যের বৈষয়িক ভিত্তির প্রতিষ্ঠার জন্য যেটাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সেটা একটা 'আধুনিক মধ্যবিত্ত হিন্দু সমাজ'। এ সমাজটাকে উজ্জীবিত বলা যায় না, কারণ এ সমাজটা, বি. বি. মিশ্রের মতে, 'স্বভাবিক বিবর্তন ধারায় পুরাতন সমাজ দেহের মধ্য থেকে জন্ম নেয়নি, নব্য ভাগ্যান্বেষী নূতন ভূ-স্বামী, নূতন বণিক শ্রেণী ও নূতন বুদ্ধিজীবীদের সমন্বয়ে সৃষ্টি করে এদেশের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।' হেরফের প্রসঙ্গে আরও বলা যায়, ঔপনিবেশিক পাশ্চাত্যের বৈষয়িক ভিত্তির প্রতিষ্ঠাকারীদের সঙ্গে সঙ্গে খৃষ্টান মিশনারীরাও এদেশে এই পরিবর্তন সাধানে শরীক হয়েছে এবং তারা ঔপনিবেশিক পাশ্চাত্যের সাংস্কৃতিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হয়েছে। এটাকে আমরা তৃতীয় কর্তব্য হিসাবেও চিহ্নিত করতে পারি।

বাংলা-বিহার-উড়িষ্যায় তথা ভারতে বিদেশী বেনিয়া শক্তির এই যে দ্বিবিধ ত্রিবিধ কর্তব্য পালন, তারই পরিণামে সমগ্র দেশের অত্যাচারিত-লাঞ্ছিত জনসাধারণ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। সংঘটিত হতে থাকে একের পর এক 'বিদ্রোহ'– ফকীর বিদ্রোহ

(১৭৬৩-১৮০০), মেদিনীপুরের বিদ্রোহ (১৭৬৬-৮৩), শমশের গাজীর বিদ্রোহ (১৭৬৭-৬৮), সন্দ্বীপের আবু তোরাপের বিদ্রোহ (১৭৬৯), কৃষক-তাঁতীর সংগ্রাম (১৭৭০-৮০) প্রভৃতি অন্তত চল্লিশটি বিদ্রোহ। এসবের মধ্যে রয়েছে মজনু শাহ-তিতুমীর-হাজী শরীয়তুল্লার সংগ্রাম-কথা, রয়েছে ১৮৫৭-৫৮ সালের সিপাহী-জনতার মহা-অভ্যুত্থানের কথা।

সুপ্রকাশ রায়-এর কথায় ঃ "১৭৫৭ হইতে ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দ–এই একশত বৎসরকার মুসলমান জনসাধারণ বৃটিশ শাসকশক্তির সহিত বিরোধিতা ও সংগ্রামের পথ অবলম্বন করিয়াছিল: 'ওয়াহাবী বিদ্রোহ' প্রভৃতি বহু গণবিদ্রোহে মুসলমান জনসাধারণই বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদ ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে প্রধান শক্তিরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিল। অপরদিকে, বৃটিশ শাসনের আরম্ভকাল হইতেই হিন্দু-সম্প্রদায় ছিল বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী প্রধান সহযোগী এবং ভারতে বৃটিশ শক্তিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার অবলম্বন।"

তারপরই ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার আয়োজন। এ প্রসঙ্গে সুপ্রকাশ রায় আর. পি. দত্তের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন ঃ "প্রকৃতপক্ষে বড়লাটের সাহায্যে সংগোপনে রচিত পূর্ব-পরিকল্পনা অনুসারে এবং বৃটিশ সরকারের প্রত্যক্ষ উদ্যোগে ও পরিচালনায় জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম হইয়াছিল।"

(সুপ্রকাশ রায়, ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৭২, পৃ. ৩৭১; এবং সুপ্রকাশ রায়, ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস, প্রথম প্রকাশ ১৯৭০, পৃ. ৩২)।

বাংলা সাহিত্যের ধারায় একুশে ফেব্রুয়ারী

পৃথিবীর যে কোন ভাষা ও সে ভাষায় রচিত সাহিত্যের পরম মর্যাদার স্বীকৃতি হচ্ছে কোন দেশের রাষ্ট্রভাষা হিসাবে তার প্রতিষ্ঠা। ১৯৫৬ সালে গৃহীত পাকিস্তানের সংবিধানে উর্দুভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হল; তারপরও সেই মর্যাদাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য চলেছে দীর্ঘকালের প্রচেষ্টা। কিন্তু এই ১৯৫৬ সালে উপনীত হতে আমাদের পেরিয়ে আসতে হয়েছে কয়েক বছরের রক্তঝরা এক সংগ্রামী পথ। পথচলা আরম্ভ হয়েছিল সেই ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অল্প কিছুদিন পর থেকেই। আমাদের পথে পড়েছিল কারবালা; ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারী, শহীদানের রক্তলাল সেই অমর মহান একুশে ফেব্রুয়ারী।

মুসলিম শাসনামলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্মেষকাল থেকে আরম্ভ করে স্বাধীন সুলতানী আমল ও মুঘল আমল হয়ে ইংরেজ আমলে তার ক্রম পরিণতি ও গতি-প্রকৃতির

একটা পরিসংখ্যানমূলক রূপরেখা যদি তুলে ধরা যায় তাহলে সেই রূপরেখায় পরিস্ফুট বৈশিষ্ট্যগুলো হবে ঃ

(এক) বাংলাদেশে তের শতকে মুসলিম শাসনামল আরম্ভ হওয়ার প্রাক্কালে ব্রাহ্মণরাই ছিলেন শিল্প-সাহিত্যের সর্বেসর্বা; সরকারী ও সাহিত্যের ভাষা ছিল সংস্কৃত। সেই দেব-ভাষা সংস্কৃতে রচিত দেবগ্রন্থে শূদ্র বা অব্রাহ্মণ জনসাধারণের কোন অধিকার ছিল না। সংস্কৃত ছাড়া অন্য ভাষায় দেব-দেবীর মাহাত্ম্য কীর্তনের বিরুদ্ধেও ব্রাহ্মণেরা ছিলেন সদা-সতর্ক। এমতাবস্থায় অদেব-ভাষা বাংলার উৎকর্ষ হওয়া সম্ভবপর ছিল না। কিন্তু দেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন হয়। ফারসী ভাষা সরকারী ভাষায় পরিণত হয়। গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয় শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সামাজিক ব্যবস্থায়।

(দুই) সমগ্র বাংলা একই সময়ে মুসলিম শাসনের আওতাভুক্ত হয়নি; সমগ্র বাংলা বিজয়ের প্রক্রিয়ায় সময় লেগেছিল প্রায় দু' শ' বছর। এই দু' শ' বছরকে আমরা বাংলায় মুসলিম শাসনের প্রতিষ্ঠাকাল বলতে পারি; আর এই কালটা ছিল এখানে-ওখানে যুদ্ধ-বিগ্রহের কাল। অন্যদিকে এই কালটাকে বাংলায় বহিরাগত ও স্থানীয় ধর্মান্তরিত মুসলমানদের সমন্বয়ে একটি মুসলিম সমাজ ও ইসলামী পরিবেশ গড়ে ওঠার কাল বলেও অভিহিত করা যায়। এই কালের প্রথম থেকেই ইসলামী শিক্ষা বিস্তার ও বাংলায় মুসলিম সংস্কৃতি গড়ে তোলার প্রচেষ্টা উল্লেখের দাবীদার। সে-যুগে মুসলমানদের মধ্যে অন্য দেশের ভাষা বা বিভিন্ন দেশের জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষা সম্পর্কে হীনমন্যতা ছিল না। উত্তরাধিকার হিসাবে আরবী ও ফারসী ভাষায় শিক্ষিত বহিরাগত মুসলমানগণ এ দেশে বসবাসকালে বাংলা ভাষাকেও আয়ত্ত করে নিজেদের ভাষা করে নেয়।

তের শতকের প্রথম দিকে, ১২১০-১২১২ সালের মধ্যেই, আরবী ও ফারসী ভাষায় যে বইটি প্রথম লিখিত হয়, তা ছিল সংস্কৃত ভাষায় রচিত হিন্দু যোগ-শাস্ত্রীয় গ্রন্থ 'অমৃতকুণ্ড'-এর অনুবাদ। আরবী-ফারসীতে রচিত হয় আরও অনেক গ্রন্থ, দেশের নানা স্থানে স্থাপিত শিক্ষালয়ে এবং সুফী-সাধকের প্রতিষ্ঠিত খানকায় চলতে থাকে ধর্মীয় ও পার্থিব জ্ঞানের চর্চা। ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশ ও বিস্তার ঘটতে থাকে এবং দেশে গড় ওঠে একটা ইসলামী পরিবেশ।

(তিন) পনের শতক থেকে দেশের শান্তিপূর্ণ অবস্থায় আরম্ভ হয় বাংলা সাহিত্যের বিকাশ প্রক্রিয়া। ডক্টর আবদুল করিমের কথায়, বাংলা সাহিত্যের উৎপত্তি মুসলমান শাসনের অবদান। অতিরঞ্জন মনে হইলেও কথাটি সত্য। (বাংলার ইতিহাস, পৃঃ ৫২৫)। বাংলার স্বাধীন সুলতান বা তাঁদের হিন্দু-মুসলিম অমাত্যগণ হিন্দু কবিদেরকে কাব্য রচনায় উৎসাহিত করেছেন, লিখিত হচ্ছে হিন্দু ধর্মীয় কাব্য। কিছুদিন পর মুসলিম কবিরাও এগিয়ে এসেছেন বাংলা সাহিত্যের চর্চায়। এই সুলতানী আমলের স্মরণীয়

কবিদের মধ্যে রয়েছেন একদিকে কৃত্তিবাস, বিজয়গুপ্ত, কবীন্দ্র পরমেশ্বর, ধ্রুবানন্দ মিশ্র, বৃন্দাবন দাস প্রভৃতি আর অন্যদিকে শাহ্ মুহম্মদ সগীর, শেখ কবীর, জৈনুদ্দিন, সাবিরিদ খান, শেখ ফয়জুল্লাহ্ প্রমুখ। এঁদের কাব্য-কৃতিতে পার্থক্য ছিল বিষয়বস্তুগত। হিন্দু কবিরা যখন রচনা করছেন তাঁদের নিজেদের ধর্মীয় কাব্য, মুসলিম কবিরা তখন রচনা করে চলেছেন মুসলিম ধর্মীয় কাব্যের সঙ্গে হিন্দু ধর্মীয় কাব্য, প্রেমমূলক কাহিনী-কাব্য, বীরগাঁথা, রম্যকথা এবং নীতিমালার কাব্যসুষমা। মুসলিম কবিরা কাব্যকে নিয়ে এসেছেন মানুষের ভুবনে। বিষয়-বৈচিত্র্যের সমৃদ্ধিতে মুসলিম কবিরা ছাড়িয়ে গেছেন হিন্দু কবিদের।

(চার) মুঘল আমলে বাংলার সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বিরাজমান বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছেঃ (১) রাজানুগ্রহ ছাড়াই বাংলা সাহিত্যের ততদিনে অর্জিত অভ্যন্তরীণ শক্তিতেই এগিয়ে যাওয়ার সক্ষমতা লাভ, (২) শিয়া প্রভাবে বাংলায় মর্সীয়া সাহিত্যের সৃষ্টি, (৩) সম্রাট আকবর কর্তৃক বিভিন্ন ধর্মের সমন্বয় প্রয়াস এবং যথেচ্ছা ব্যাখ্যায়িত ও অসংগঠিত 'সুফীবাদে'র প্রভাব সম্বলিত সাংস্কৃতিক পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়াস সত্ত্বেও হিন্দু ও মুসলিম কাব্যচর্চায় নিজ নিজ পরিচয়-স্বাতন্ত্র্যের প্রকাশ, এবং (৪) বাংলার সাহিত্য-সাংস্কৃতিক ধারায় ইউরোপীয়, বিশেষ করে পর্তুগীজ-সংস্কৃতির মিশ্রণ। এই আমলে মুসলিম কাব্যাঙ্গন হয়ে ওঠে কর্মমুখর। হিন্দু-মুসলিম কবিদের কাব্যচর্চা ততদিনে হয়ে উঠেছে সম্প্রদায়গত, কিন্তু আধুনিক অর্থানুযায়ী সাম্প্রদায়িক নয়।

(পাঁচ) অতঃপর ইংরেজ আমল। এই আমলে সরকারী ভাষা হিসবে ফারসীর স্থলাভিষিক্ত হয় ইংরেজী। নিজেদের ধর্মীয় প্রচারণার উদ্দেশ্যে ইংরেজ মিশনারীরা এসে শামিল হয় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের 'সেবায়'। প্রচলিত হয় গদ্যরীতি, চালু হয় ছাপাখানা। রাজশক্তির হাতবদলে খুশী হিন্দু কবি-সাহিত্যিকগণ মিশনারীদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে এগিয়ে আসেন, নতুন দিনে শুরু হয় তাঁদের নতুন পথ-পরিক্রমা। রাজানুগ্রহে তাঁদের এই পথ-পরিক্রমা হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত। অন্যদিকে রাজশক্তির পরিবর্তনে ক্ষুব্ধ ও বিপর্যস্ত মুসলিম সম্প্রদায়ের মত মুসলিম কবি-সাহিত্যিকগণও তাঁদের নিজস্ব কাব্যালোকের পরিমণ্ডলে চালিয়ে যেতে চেষ্টা করেন পুরনো ধারার অসহায় কাব্য-কথা 'বটতলা'র পুঁথি। ফলে, হিন্দুদের তুলনায় এবার অনেক পিছিয়ে পড়লেন তাঁরা। অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবন-বিধ্বস্ত তখন সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায়। কিন্তু এক সময়ে সেই মৃতপ্রায় দেহেও হল নব-প্রাণের সঞ্চার। পিছিয়ে থেকেও নতুন পথে চলতে আরম্ভ করলেন মুসলিম কবি-সাহিত্যিকগণ। মীর মশাররফ হোসেন থেকে যে নতুন ধারার শুরু, তার প্রাণচঞ্চল বেগবান রূপের প্রকাশ কাজী নজরুল ইসলামে। কিন্তু এর পূর্বেই বাংলা সাহিত্য পুরোপুরি স্বাতন্ত্র্যমুখী হয়ে দাঁড়িয়েছিল। নিজেদের অসামান্য প্রতিভা দিয়ে 'ঋষি' বঙ্কিমচন্দ্র ও অন্যান্য প্রতিভাধর হিন্দু সাহিত্যিক বাংলা

সাহিত্যকে যে রূপ-রস-ভাবধারায় সুপ্রতিষ্ঠিত করেন তাতে তা হয়ে দাঁড়ায় ব্রাহ্মণ্যবাদের ঐতিহ্যবাহী পুরোপুরি হিন্দু জাতীয়তাবাদী বাংলা সাহিত্য। তাঁদের এ সাহিত্য-প্রয়াসে মুসলিম কবি-সাহিত্যিকের কোন অবদান ছিল না, তাতে মুসলিম জীবনও ছিল অনুপস্থিত। বঙ্কিম-সাহিত্য ও তাঁর অনুসারীদের রচনায় যেসব মুসলিম রাজপুরুষের চরিত্র আনা হয়েছে, তা যেন প্রায় ছ'শ' বছর আগে মুসলিম শক্তির কাছে ব্রাহ্মণ্য-শক্তির পরাজয়-গ্লানির প্রতিশোধ গ্রহণ মানসে ইতিহাসের চরম বিকৃতি সাধনের মাধ্যমে এক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার উদ্দেশেই চিত্রিত। মুসলিম আমলে বাংলা সাহিত্যের সেই উন্মেষকাল থেকেই হিন্দু কবিদের অনুসরিত স্বাতন্ত্র্যবাদী ধারা পরবর্তীতে সম্প্রদায়গত বিশেষণে বিভূষিত হয়ে ইংরেজ আমলে একেবারেই মারমুখো সাম্প্রদায়িক হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের পরম অবদানের পেলবতায় তা উদার রূপ-লাবণ্যে আবৃত হলেও মুসলিম জীবন তাতে অনুপস্থিতই থেকে যায়। বাংলা সাহিত্যে এ ভাবধারার পরিবর্তন লোক দেখানোভাবে আসে শুধুমাত্র তখন, যখন রাজনীতির অঙ্গনে হিন্দুদের ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনে সহযোগী হিসাবে মুসলিম সহযোগিতা খুবই প্রয়োজনীয় হয়ে দেখা দেয়। ১৯০৫ সালে 'বঙ্গভঙ্গ'কে কেন্দ্র করে তার শুরু এবং তা চলতে থাকে চল্লিশ দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত। 'একই মায়ের সন্তান হিন্দু-মুসলমান' শব্দমালার উচ্চারিতকালের শেষার্ধে, ১৯২০ থেকে ১৯৪১-৪২ সাল পর্যন্ত সময়টাতে, কাজী নজরুল ইসলামের বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে প্রাণচঞ্চল উপস্থিতি।

কাজী নজরুল ইসলাম কি স্বাতন্ত্র্যপন্থী ছিলেন অথবা সমন্বয়পন্থী? এ তো জানা কথা যে, যথার্থ অর্থেই তিনি ছিলেন সমন্বয়পন্থী। তাঁর রচিত সাহিত্যে জাতির নামে বজ্জাতি ছিল না। স্বাতন্ত্র্যবাদী অধিকাংশ হিন্দু সাহিত্যিক যেমন করে শুধু বাহ্যতঃ ও প্রয়োজনের বেলায় সমন্বয় পন্থা অবলম্বন করেছিলেন, তেমন সমন্বয় পন্থার পথিক ছিলেন না কাজী নজরুল। বজ্জাতিমুক্ত ছিল তাঁর সমন্বয়-স্বপ্ন। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের কথায়, "তাঁহার মতো এমন করিয়া মনে-প্রাণে, কাজে-কর্মে কোন বাঙ্গালী কবি নিজের দেশকে এবং দেশের জনগণকে ভালবাসিতে পারেন নাই, দেশের জনগণের ভালবাসাও এমন করিয়া আর কেহ পান নাই।.....মানুষকে মানুষ হিসাবে মানুষেরই মর্যাদা দিতে হইবে, এই সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য নজরুল একদিন বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিলেন।.....ইহাই নবজাগ্রত ইসলামের সনাতন বাণী।.....ইসলাম দুর্বলের ধর্ম নহে, শৌর্যবীর্য ও পৌরুষই ইহার প্রাণ; সাম্য মৈত্রী ভ্রাতৃত্ব ও প্রেমই ইহার সৌন্দর্য; অধিদেশীয়, অধিবর্ণীয় এবং অধিকালীন প্রকৃতিই ইহার পরম বৈশিষ্ট্য, এই সত্য অতি প্রাচীন হইলেও নজরুল-সাধনায় নতুন রূপ ও অভিনব মূর্তি ধারণ করিয়াছে। এতদিন বাংলার মুসলিম সাহিত্যিকেরা যে ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছিলেন, তাহাতে ধর্ম ছিল, সমাজ ছিল, ইতিহাস ছিল, সংস্কৃতি ছিল; কিন্তু পূর্ণাঙ্গ, প্রকৃত 'সাহিত্য' ছিল না। তাঁহারা যে

পরশমণির সন্ধানে যুগ-যুগান্তর কাটাইয়াছিলেন, হঠাৎ কিংবা শতাব্দীর গোড়ায় আসিয়াই যেন নজরুলের মধ্যে তাহা আবিষ্কার করিলেন।" (মুসলিম বাংলা সাহিত্য, পৃঃ ৩৩৬-৩৩৮)। কিন্তু ১৯৪২ সালে চিরদিনের মত নির্বাক হয়ে গেলেন নজরুল।

ইতোমধ্যে ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্য-শাসিত ও ইংরেজ-উৎসাহিত স্বাতন্ত্র্যবাদের বৃক্ষ বিরাট মহীরুহে পরিণত হয়েছে; হিন্দু-মুসলমানের স্বার্থ-সংঘাত চরম অবস্থায় উপনীত হয়েছে। অতঃপর ১৯৪৭ সালে দেশ-বিভক্তির মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন ও পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা।

নজরুলের 'সমন্বয়' ধারণার বিজয় হলেই বাংলার রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাটা হত আদর্শস্থানীয় সন্দেহ নেই। কিন্তু আদর্শস্থানীয় সে ব্যবস্থাটা কি রূপ নিতে পারত এই বাংলায়? এখানে স্মরণযোগ্য যে, বাংলায় মুসলিম শাসনের অন্যতম অবদানই ছিল একাধারে ব্রাহ্মণ্য কঠোর শাসনের নিগড় থেকে বাংলার অব্রাহ্মণ হিন্দু-বৌদ্ধ মেধার মুক্তি দান এবং পরবর্তীতে বাংলা সাহিত্য সৃষ্টিতে উৎসাহ দান। তারপর সেই সাহিত্য বিকাশের ধারাকে আরও বেগবান করে তুললেন মুসলিম কবিবৃন্দ। মুসলিম কবিদের কাব্য-কৃতিত্বে সমন্বয়-ধারণার পরিচয় পাওয়া গেলেও 'মুসলিমদের বাংলা বিজয়' জনিত সেন্টিমেন্টাল কারণেই সম্ভবত হিন্দু কবিদের কাব্য-কৃতিতে প্রতিফলিত হয়ে এসেছে স্বাতন্ত্র্যের ধারণা, সেই প্রথম থেকেই। এই 'মুসলিমদের' বাংলা বিজয়'জনিত বিদ্বেষটা স্বাভাবিকভাবেই হিন্দু-সমাজের সচেতন অংশে বিদ্যমান ছিল। একথারই প্রমাণ পাওয়া যায় 'ঋষি' বঙ্কিম রচিত 'ধর্মতত্ত্ব' গ্রন্থে যেখানে তিনি বলেন, "মুসলমানের পর ইংরেজ রাজা হইল, হিন্দু প্রজা তাহাতে কথা কহিল না। বরং হিন্দুরাই ইংরেজকে ডাকিয়া রাজ্যে বসাইল।" ১৩৯৪ সনের ১৩ অগ্রহায়ণ "আনন্দবাজার" পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে শ্রীগৌতম রায়ও বলেন, "মুসলিম রাজশক্তির উচ্ছেদ করে নিজেদের উপনিবেশ স্থাপনের প্রেক্ষাপট হিসেবে ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদ ও হিতবাদী দার্শনিকরা অষ্টাদশ শতকে যে ভাবাদর্শগত জমি তৈরী করেছিলেন, স্বভাবতই সেখানে সংস্কৃতি সাম্প্রদায়িক সংহতির মুসলিম ঐতিহ্যকে সম্পূর্ণ উহ্য রাখা হল। আর সেই জমিতেই উনিশ শতকের ভারতীয় ঐতিহাসিকরা আবাদ করলেন বিষবৃক্ষ।" সুতরাং বাস্তবতার নিরিখেই জন্ম নিল পাকিস্তান।

হিন্দুদের 'রেনেসাঁ' এসেছিল 'ইংরেজের বাংলা বিজয়ের' পরেই। বাস্তবতা- ভিত্তিক ধারণা থেকে বাংলার মুসলিম কবি-সাহিত্যিকগণও সেদিন পাকিস্তান সৃষ্টিকে স্বাগত জানালেন বাংলার মুসলিমদের জন্য এক 'রেনেসাঁ'র প্রতিশ্রুতি হিসাবে। তাই তো সেদিন সর্বজনাব আবুল কালাম শামসুদ্দীন, মুহম্মদ হাবীবুল্লাহ্ বাহার, মুজীবুর রহমান খাঁ, মোহাম্মদ মোদাব্বের ও অন্যান্য কবি-সাহিত্যিক কলকাতায় গড়ে তোলেন 'পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি।'

একই চিন্তাধারায় কিছুদিন পর সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন, মাযহারুল হক প্রমুখ সুধী দ্বারা ঢাকায় গড়ে উঠেছিল 'পূর্ব-পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ'। একই চিন্তাধারা, একই স্বপ্ন। সেই স্বপ্নে সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনে ও সাহিত্যে যে রেনেসাঁ আসবে তার মূলনীতি হবে ইসলামভিত্তিক আর ভাষা হবে বাংলা। শাহ্ মুহম্মদ সগীর থেকে কাজী নজরুল ইসলাম—এতদিনকার মুসলিম কবি-সাহিত্যিকদেরই স্বপ্নের রূপায়ণ যেন।

কিন্তু নতুন মুঘল শাসকরূপে আবির্ভূত হলেন যেন পাকিস্তানী শাসকবৃন্দ। ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্টের আগেই জুলাই মাসে আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ডক্টর জিয়াউদ্দিন অভিমত প্রকাশ করলেন, উর্দুরই হওয়া উচিত পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। তার উত্তরে আজাদ পত্রিকায় ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সে-বক্তব্যের যুক্তি খণ্ডন করে লিখলেন প্রবন্ধ। প্রায় একই সময়ে 'সওগাতে' বাংলার সপক্ষে এক কড়া প্রবন্ধ লিখলেন ফররুখ আহমদ।

তদুপরি, ১৩৫২ সালে (১৯৪৬ সালের দিকে) 'মাসিক মোহাম্মদী'তে এই ফররুখই লিখলেন এক ব্যঙ্গ কবিতা (সনেট)ঃ

দুইশো পঁচিশ মুদ্রা যে অবধি হয়েছে বেতন
বাংলাকে তালাক দিয়া উর্দুকেই করিয়াছি নিকা,
বাপান্ত শ্রমের ফলে উড়েছে আশার চামচিকা
উর্দু নীল আভিজাত্যে (জানে তা নিকট বন্ধুগণ)।
আতরাফ রক্তের গন্ধে দেখি আজ কে করে বমন?
খাঁটি মারাফতি নিতে ধরিয়াছি যে অজানা বুলি
তার দাপে চমকাবে একসাথে বেয়ারা ও কুলি
সঠিক পশ্চিমী ধাঁচে যে মুহূর্তে করিব তর্জন।
পূর্ণ মোগলাই ভাব তার সাথে দু'পুরুষ পরে
বাবরের বংশ দাবী— জানি তা অবশ্য সুকঠিন
কিন্তু কোন্ লাভ বল হাল ছেড়ে দিলে এ প্রহরে
আমার আ'বাদী গন্ধ নাকে পায় আজো অর্বাচীন।
পূর্বোক্ত তালাক সূত্রে মারফতি করিব অর্জন;
নবাবী রক্তের ঝাঁজ আশা করি পাবে পুত্রগণ।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কয়েকদিনের মধ্যেই দেখা গেল পোস্ট কার্ড মানি-অর্ডার ফর্ম প্রভৃতিতে ইংরেজী শব্দের পাশে শুধু উর্দু শব্দ মুদ্রিত। বাংলাভাষীদের সচেতন অংশে দেখা দিল সন্দেহ। বাংলা ভাষার মর্যাদার প্রশ্নে তাঁদের মনে প্রশ্ন জাগল। ১৯৪৭ সালের ১লা সেপ্টেম্বর গঠিত হল সাংস্কৃতিক সংগঠন 'তমদ্দুন মজলিস'। এর সেক্রেটারী ছিলেন

সেদিনের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ অধ্যাপক আবুল কাসেম। সদস্য ছিলেন সর্বজনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম, শামসুল আলম, ফজলুর রহমান ভূঁইয়া প্রমুখ তরুণ।

বাংলা ভাষার মর্যাদা নিয়ে তখন কানাঘুষা আরম্ভ হয়েছে, সন্দেহ দানা বাঁধছে। এমনি অবস্থায় বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার সপক্ষীয়গণকে সংগঠিত করার উদ্যোগ নিল তমদ্দুন মজলিস। '৪৭ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর অধ্যাপক আবুল কাসেম তমদ্দুন মজলিসের পক্ষে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। তার শিরোনাম ছিলঃ 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা—বাংলা না উর্দু?' তাতে প্রবন্ধ লেখেন সর্বজনাব আবুল মনসুর আহমদ, অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন ও অধ্যাপক আবুল কাসেম। তাঁরা জোরালো যুক্তিসহ বাংলা ও উর্দু দু'টি ভাষাকেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করা উচিত বলে মত প্রকাশ করেন। তার আগের আরও কিছু কথা।

মজলিসের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আবুল কাসেম বিভিন্ন লোকের সঙ্গে যোগাযোগ ছাড়াও মজলিসের রশীদ বিল্ডিংস্থ অফিস, ফজলুল হক মুসলিম হল প্রভৃতি স্থানে আলোচনা সভার অনুষ্ঠান করে ভাষার দাবি এগিয়ে নেয়ার প্রচেষ্টা চালান। ১৯৪৭ সালেই ভাষা আন্দোলন জোরদার করার লক্ষ্যে তমদ্দুন মজলিসের অন্যতম সদস্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের লেকচারার অধ্যাপক নূরুল হক ভুঁইয়াকে কনভেনর করে প্রথম রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। ১৯৪৭ সালের নভেম্বর মাসে তমদ্দুন মজলিসের উদ্যোগে ফজলুল হক হলে রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। জনাব হাবিবুল্লাহ্ বাহারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় আলোচনায় অংশ নেন অধ্যাপক আবুল কাসেম, কবি জসিমউদ্‌দীন, কাজী মোতাহার হোসেন প্রমুখ। এ ছাড়াও তমদ্দুন মজলিসের উদ্যোগে ১৯৪৭ সালে ১৭ নভেম্বর রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে কয়েক শ' কবি-সাহিত্যিক, শিল্পী, বুদ্ধিজীবী, উলামা, রাজনীতিক ও ছাত্রনেতার স্বাক্ষরসহ একটি স্মারকলিপি প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রীর কাছে পেশ করা হয়।

এর মধ্যে ভারতের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হয়েছে হিন্দী। পাকিস্তান কর্তৃপক্ষের চিন্তাভাবনাও তার রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে প্রকাশ পেতে লাগল—পাকিস্তানেরও একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত উর্দু।

বাংলা ভাষার সপক্ষীয়রা আরও চিন্তিত হয়ে উঠলেন। এমনি অবস্থায় জনমত সংগঠন করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে বাংলা ভাষার দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য গঠন করা হল এক সংগ্রাম পরিষদ; তার কনভেনর হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নুরুল হক ভূঁইয়া। বাংলার দাবীতে সভা-সেমিনার হতে লাগল ঢাকায় এবং অন্যান্য স্থানে। ১৯৪৭ সালের নভেম্বরের দিকে পাকিস্তান সুপিরিয়র সার্ভিস পরীক্ষার ব্যাপারে একটা সার্কুলার জারি হল; তাতে পরীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন বিষয়সূচীতে, ইংরেজী-উর্দু-হিন্দী-সংস্কৃত-ফরাসী-জার্মানী-ল্যাটিন ইত্যাদি অনেক ভাষার উল্লেখ থাকলেও বাংলা ভাষার কোন উল্লেখ ছিল না।

এর বিরুদ্ধে তমদ্দুন মজলিসের অধ্যাপক আবুল কাসেম পত্রিকায় বিবৃতি দিলেন। কিন্তু সে বিবৃতি ছাপা হলো শুধু জনাব আবুল মনসুর সম্পাদিত পত্রিকা কলকাতাস্থ 'ইত্তেহাদে'। সম্পাদকীয়তেও এই প্রতিবাদের সপক্ষে মত প্রকাশ করা হল। ইত্তেহাদের এই সংখ্যা ঢাকায় এসে পৌঁছল যখন তখন বাংলাভাষার সপক্ষীয়দের ক্ষোভ চরমে উপনীত হল। এর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হল পূর্ব-পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ। তমদ্দুন মজলিসের সদস্য জনাব শামসুল আলম সেই ছাত্রলীগেরও অন্যতম সদস্য।

পুরাতন ঢাকা শহরের অধিবাসীদের মধ্যে তখন উর্দু বহুল প্রচলিত ছিল। পাকিস্তান সৃষ্টির প্রথম দিকে ১৯৪৭-'৪৮ সালে পুরাতন ঢাকার অনেকেই বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রচেষ্টাকে সুনজরে দেখতে পারেননি। বাংলা রাষ্ট্রভাষার কথা প্রচার করতে যাওয়াতে তমদ্দুন মজলিস কর্মী সিদ্দিকুল্লাহ্ কসাইটুলীতে বাংলাবিরোধীদের কবলে পড়ে বহু কষ্টে রক্ষা পান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন রশীদ বিল্ডিংস্থ মজলিস অফিস আক্রান্ত হয়। পুরাতন ঢাকাবাসীর মধ্যে বাংলা ভাষার পক্ষে জনমত গঠনের লক্ষ্যে মজলিস সম্পাদক অধ্যাপক আবুল কাসেম ইতিহাসবিদ সৈয়দ মুহাম্মদ তৈফুরকে সভাপতি, নবকুমার ইনষ্টিটিউশনের হেডমাস্টার জনাব আবদুল মান্নানকে কনভেনর করে 'ঢাকা মজলিস' নামে একটি সংস্থা গড়ে তোলেন। বলার অপেক্ষা রাখে না এই সংস্থা গড়ে তোলার উদ্দেশ্য ছিল ঢাকাবাসীদের মনোভাব বাংলাভাষার সপক্ষে আনা।

১৯৪৮ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারী পাকিস্তান গণপরিষদের অধিবেশনে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ইংরেজি ও উর্দুর সঙ্গে বাংলাতেও বক্তৃতা দানের সুযোগ দাবি করে প্রস্তাব উত্থাপন করলে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয়। এর প্রতিবাদে ২৬ ফেব্রুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে তমদ্দুন মজলিসের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আবুল কাসেমের সভাপতিত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর ২৭ ফেব্রুয়ারী তমদ্দুন মজলিসের রশীদ বিল্ডিংস্থ অফিসে বাংলা ভাষা সমর্থকদের এক সভায় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ পুনর্গঠিত হয়। এ সভায় নতুন সংগ্রাম পরিষদের কনভেনর নির্বাচিত হন তমদ্দুন মজলিসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য জনাব শামসুল আলম। এই সভায়ই ১১ মার্চ সারাদেশে হরতাল মিটিং-মিছিলের মাধ্যমে প্রতিবাদ দিবস পালন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ এই পুনর্গঠিত সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে ধর্মঘট, প্রতিবাদ সভা ও বিক্ষোভ মিছিলের মধ্য দিয়ে পালিত হয় রাষ্ট্রভাষা দিবস। ঘেরাও করা হয় সেক্রেটারিয়েট; চালিত হয় পুলিশের হামলা, আহত এবং গ্রেফতার হন অনেকেই। বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতা প্রাদেশিক শিক্ষামন্ত্রী জনাব আবদুল হামিদ ও খাদ্যমন্ত্রী সৈয়দ মোহাম্মদ আফজালকে ভাষার দাবীর জন্য পদত্যাগপত্রে স্বাক্ষরদানে বাধ্য করে।

কায়েদে আযম মুহম্মদ আলী জিন্নাহ্ ঢাকায় আসবেন বলে এসব প্রতিবাদ-বিক্ষোভ শান্ত করতে ব্যস্ত হন তখনকার প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন। ১৫ই মার্চ তিনি সংগ্রাম পরিষদের ৮ দফা দাবী মেনে নিয়ে তা কার্যকর করার প্রতিশ্রুতি দেন। জিন্না সাহেব ঢাকায় এলেন, বক্তৃতা দিলেন ২১ মার্চ ঘোড়দৌড় মাঠে এবং ২৪শে মার্চ কার্জন হলে। সেসব বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন, পাকিস্তানের নিরাপত্তা ও সংহতির জন্যই তার রাষ্ট্রভাষা হবে একমাত্র উর্দু। বক্তৃতার সময় শ্রোতাদের মধ্য থেকে 'না না' ধ্বনিতে তা প্রত্যাখ্যাত হয়। নেতা হিসাবে জিন্নাহ্ সাহেব তখনও বেশ জনপ্রিয়। ফলে আন্দোলন কিছুটা বাধাগ্রস্ত হলেও ছাইচাপা আগুন হয়ে জ্বলতে থাকল।

আটচল্লিশের অভিজ্ঞতা থেকে নিজস্ব পত্রিকার প্রয়োজন অনুভব করে ১৯৪৮ সালের ১৪ই নভেম্বর অধ্যাপক আবুল কাসেমের উদ্যোগে এবং কথাশিল্পী শাহেদ আলী ও মুহম্মদ এনামুল হকের সম্পাদনায় ১৯, আজিমপুর রোড থেকে প্রকাশিত হল ভাষা সংগ্রামের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক 'সৈনিক'। ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন গঠিত হয় পূর্ব-পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ। তার সভাপতি ছিলেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, সহসভাপতি জনাব আতাউর রহমান খান, সাধারণ সম্পাদক ছিলেন টাঙ্গাইল নিবাসী জনাব শামসুল হক এবং যুগ্ম সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান ও খোন্দকার মুশতাক আহমদ। ১৯৫২ সালের জানুয়ারীতে ঢাকায় খাজা নাজিমুদ্দীন তাঁর বক্তৃতায় বলেন, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। নবোদ্যমে আরম্ভ হল রাষ্ট্রভাষার সংগ্রাম। তৃতীয়বারের মত পুনর্গঠিত হল সংগ্রাম পরিষদ; এবার তার কনভেনর হলেন কাজী গোলাম মাহবুব। বাংলা ভাষার দাবীতে একুশে ফেব্রুয়ারী প্রতিবাদ দিবস পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হল।

সম্প্রতি ভাষা সৈনিক আবদুল মতিনের এক প্রবন্ধের ওপর লিখিত রিপোর্ট (দৈনিক দিনকাল, ৫ ফেব্রুয়ারী, ২০০৪) পড়ে বায়ান্ন'র সেই অগ্নিঝরা দিনগুলো আমার চোখেও নতুন করে জীবন্ত হয়ে ধরা দিল। তাঁর স্মৃতি-কথার অনেকাংশই আমার স্মৃতির আলোকে সত্য বলে প্রত্যায়ন করে এখানে তুলে ধরছি; তার সঙ্গে এ মন্তব্যও করছি যে, বায়ান্ন'র একুশে ফেব্রুয়ারির ঘটনাবলী ছিল যে ভবিতব্য নির্ধারিত। অর্থাৎ ঘটনাবলী এমনিতে হয়তো ঘটত না, কিন্তু কর্তৃপক্ষের ভুল নির্দেশে (আন্দোলনকারীকে তখনকার ঢাকার ডিসি মিঃ কোরায়শীর গুলি করার নির্দেশ) ঘটে গেল! এখানে উল্লেখ্য যে, অনেক বড় ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এমনি করেও ঘটে যায়। যাক, এক্ষণে জনাব মতিনের ভাষ্যঃ '১৯৪৮ সাল থেকে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার আন্দোলন দেশব্যাপী প্রসারিত হতে থাকলো। আন্দোলনকারীদের দাবির মুখে যারা মুসলিম লীগ সরকারের সঙ্গে ছিল না বা সক্রিয়ভাবে শাসক মুসলিম লীগের সঙ্গে ছিল, তারাও ক্রমান্বয়ে দল গঠন করে দলবদ্ধ হতে থাকে। তবে এদের প্রায় সকলেই ৬৷৭ মাস

আগেও পাকিস্তান অর্জনের লক্ষ্যে সাধ্যমত কমবেশি সক্রিয় ছিলেন। এদের মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য শেখ মুজিবুর রহমান।

যারা মুসলিম লীগের প্রাক্তন ছাত্র সংগঠনভুক্ত ছিলেন এবং যারা পাকিস্তান অর্জনের সংগ্রামে প্রথম সারিতে ছিলেন, পাকিস্তান অর্জনের পর অনেক মুসলিম লীগ সরকারের সমর্থক হয়ে গেলেও অধিকাংশ হয় নিষ্ক্রিয় অথবা জীবিকা অর্জনের জন্য বিভিন্ন কাজে লিপ্ত হয়ে গেলেন। এসব ছাত্রকে নিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাসে পূর্ব-পাকিস্তান ছাত্রলীগ নামে একটি ছাত্র সংগঠন গঠন করেছিলেন। এই সময়কার ভাষা আন্দোলনেও তিনি কমবেশি সামিল থাকতেন। '৪৮ সালে আন্দোলনের বিকাশ ও বিস্তৃতির সঙ্গে তাল রেখে অংশগ্রহণকারীদের পরবর্তী কর্মসূচির দাবির প্রেক্ষিতে আন্দোলনের স্বতঃস্ফূর্ত নেতৃত্ব বাধ্য হতে থাকে আন্দোলনকে সংগঠিত রূপ দিতে। এরই একটি পর্যায়ে ফেব্রুয়ারি মাসে একটি দলীয় কমিটি বাতিল করে মার্চ মাসে শামসুল আলমকে আহ্বায়ক করে নতুন সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়েছিল। এই কমিটিতেও বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠরা ছিলেন পাকিস্তান আন্দোলনের কর্মী ও নেতৃবৃন্দ।

এদের দাবির প্রেক্ষিতেই ১১ মার্চ দেশব্যাপী হরতালের মাধ্যমে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি উঠেছিল এবং তা মার্চের প্রথম দিকে গৃহীত হয়েছিল। ১১ মার্চ ঢাকাসহ সরাদেশে হরতালকালে মিছিলকারীসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা-কর্মী ও বহু ছাত্র-জনতা গ্রেফতার হয়। অথচ সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের তরফ থেকে পরের দিন কোনো কর্মসূচি পর্যন্ত দেয়া হয়নি। ফলে সফলতার বিরাট সম্ভাবনা সত্ত্বেও '৪৮ সালের ১১ মার্চের ভাষা আন্দোলন মুখ থুবড়ে পড়েছিল। নেতাদের সরকারের সঙ্গে ৮ দফা ভিত্তিক আপসে আন্দোলনের সকল গ্রেফতারকৃত বিনাশর্তে মুক্তিলাভ করেছিল, বিনিময়ে শোচনীয় পরাজয় ঘটেছিল আন্দোলনের। পাবনা থেকে গ্রেফতার এড়িয়ে ৩ দিন পর ঢাকায় গিয়ে দেখছিলাম আন্দোলনের করুণ বিয়োগান্তক পরিণতি। ১৫ মার্চ মুখ্যমন্ত্রী নাজিমউদ্দিনের সঙ্গে কারারুদ্ধ শেখ মুজিবুর রহমান, শামসুল হক, অলি আহাদ, কাজী গোলাম মাহবুব এবং কারাগারের বাইরের কামরুদ্দীন আহমেদ, প্রফেসর কামরুদ্দীন আহমেদ (?) স্বাক্ষরিত ৮ দফা চুক্তিনামার মাধ্যমে আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটে গেছে। এই চুক্তির পরই পাকিস্তানের স্রষ্টা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ ১৯ মার্চ '৪৮ সালে ঢাকায় আসেন। ১৯ মার্চ ঢাকায় রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) এবং ২৪ মার্চ কার্জন হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন সভায় জিন্নাহ্ বলেন, 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।' রেসকোর্স ময়দানে প্রতিবাদ না হলেও কার্জন হলে তাঁর বক্তব্যের প্রতিবাদ হয়েছিল। ১৯৪৮ সালে ভাষা আন্দোলনের নেতৃত্বে যারা ছিলেন, তাঁরা ছিলেন পরে ১৯৪৯ সালে গঠিত আওয়ামী লীগের নেতা। (এখানে উল্লেখ্য যে, সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটি গঠনের মাধ্যমে ভাষা

আন্দোলনে সূচনাকারী তমদ্দুন মজলিস স্বনামে তার নেতৃত্বে থাকেনি। মজলিসের নেতা-কর্মীরা তখন কর্মরত (প্রকৃত অর্থেই) ছিলেন সর্বদলীয় কমিটির কর্মসূচি সফল করার কাজে। (আর আবদুল মতিন সাহেব সেসব দিনে একজন অকৃত্রিম ও নিরলস কমিউনিস্ট কর্মী হিসাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সুপরিচিত ছিলেন— লেখক)। তারা এরপর অবতীর্ণ হয়েছিলেন '৫২ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম কমিটির নেতৃত্বে ভাষা আন্দোলন অগ্রগতি সাধন করার পর। এই সময় ৩১ জানুয়ারি তারা সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে আন্দোলনে সামিল হন। কিন্তু '৪৮ সালে ভাষা আন্দোলনের শোচনীয় ব্যর্থতার পর ছাত্ররা ভাষা আন্দোলনের পতাকা তুলে ধরে '৫০ সালের ১১ মার্চ বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এক ছাত্র সভায় আবদুল মতিনকে আহ্বায়ক করে নতুনভাবে কমিটি গঠন করে নবোদ্যমে যাত্রা শুরু করে। তখন থেকেই ভাষা আন্দোলনের মূল নেতৃত্ব হয়ে ওঠে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি। এই কমিটি সর্বপ্রথম '৫১ সালের ১১ এপ্রিল পকিস্তান গণপরিষদ সদস্যদের কাছে কেন বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করতে হবে তার জোরালো যুক্তি দিয়ে স্মারকলিপি পাঠিয়েছিল এবং পাকিস্তানকে কাঁপিয়ে তুলেছিল। লিয়াকত আলী হত্যার পর নাজিমউদ্দিনকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী করা হয়। তিনি প্রধানমন্ত্রী হয়েই ঢাকায় আগমন করেন। তিনিও বললেন পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু। কিন্তু নির্বোধ শাসক গোষ্ঠীর স্মরণ ছিল না, '৪৮ সালে ঐ একই কথা বলে জিন্নাহ্ সাহেবের কি অবস্থা হয়েছিল। তবে সেদিন জিন্নাহ্ সাহেব যে পার পেয়েছিলেন তার কারণ ভাষা আন্দোলনে পাকিস্তানের মতাদর্শে অনুপ্রাণিত, প্রভাবিত এবং কলুষিত তৎকালীন নেতৃত্বকে বিভ্রান্ত করতে খাজা নাজিমুদ্দিনের সফল তৎপরতা। খাজা নাজিমউদ্দিন তৎকালে পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠির তল্পিবাহক হিসাবে পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। ভাষা আন্দোলনেক মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়ে তিনি কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌কে ঢাকায় আগমনের আমন্ত্রণ জনান। তাঁর আমন্ত্রণ জিন্নাহ্ সাহেব গ্রহণ করার পর তিনি ভাষা আন্দোলনের কারাবহির্ভূত এবং কারারুদ্ধ নেতাদের কাছে করজোড়ে মাফ চান এবং তাদের সকলের নেতা জিন্নাহ্ সাহেবের ঢাকা আগমনের কথা বলে ৮ দফা চুক্তি করে সকল আটক নেতাকে মুক্তি প্রদান করেন। জিন্নাহ্ সাহেবের আগমন ও অবস্থানকালে যারা কোন বিঘ্ন সৃষ্টি না করার এবং তাঁর প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শনের অলিখিত প্রতিশ্রুতি প্রদানের মাধ্যমে ভাষা আন্দোলনের মুখে কালিমা লেপন করেছিল, তারা '৫২ সালে সেই খাজা নাজিমউদ্দিন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে কেবল উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার হুমকি দিলেও এই সময়ে ভাষা আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির উদ্ভব ঘটে এবং তারাই ছাত্রদের নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত হন। '৪৮ সালের ভাষা আন্দোলনের হতোদ্যম নেতারা '৫২ সালের ৩০ জানুয়ারি বার লাইব্রেরিতে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি গঠন করেছিলেন এবং

এতে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশীদার ছিল '৪৯ সালে গঠিত আওয়ামী লীগ। আওয়ামী লীগের নেতা কাজী গোলাম মাহবুবই হয়েছিলেন সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক। কমিটির সদস্য ছিলেন আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, পরবর্তীকালে মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান, তৎকালীন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক অলি আহাদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির আহ্বায়ক আবদুল মতিন, মুসলিম লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশিম, কামরুদ্দীন আহমেদ। ফজলুল হক হলের ভিপি শাসসুল আলম (?), সলিমুল্লাহ্ হলের ভিপি মুজিবুল হক, মেডিক্যালের ভিপি গোলাম মওলা, পূর্ব-পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির নেতা মোঃ তোয়াহা প্রমুখ।

এদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম কমিটি ১৯৫২ সালের ৪ ফেব্রুয়ারিতে এক সভা করে ঘোষণা দেয়– পূর্ববাংলা (তখনও এর পূর্ব-পাকিস্তান নামকরণ হয়নি–লেখক) আইন পরিষদের শীতকালীন অধিবেশনের উদ্বোধনী তারিখে অর্থাৎ ২১ ফেব্রুয়ারিতে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ভাষা দিবস পালন করা হবে। এই অগ্রিম ঘোষণার কারণ ছিল যেন সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা পরিষদ ভাষার দাবিতে দিবস নির্ধারণের ব্যাপারে আর গড়িমসি করতে ও সেই তারিখে তাদের নেতৃত্ব কায়েম করে '৪৮ সালের ভাষা আন্দোলনের ব্যর্থতার পুনরাবৃত্তি করতে না পারে।'

দৈনিক দিনকালে প্রকাশিত রিপোর্ট এখানেই শেষ হয়েছে। বাকি কিছু কথা আমি বলছি আমার প্রত্যক্ষ স্মৃতি থেকে। ২১ ফেব্রুয়ারিতে যাতে কোন বিক্ষোভ মিছিল না হতে পারে সেজন্য ওই দিন বর্তমান জগন্নাথ হলের দক্ষিণাংশে অবস্থিত প্রাদেশিক আইন পরিষদ ভবনকে কেন্দ্র করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় (মেডিক্যাল কলেজ ভবনাদিসহ) কারফিউ জারি করা হল এবং বলার অপেক্ষা রাখে না যে পুরো এলাকাটি ছিল তখন আর্মড পুলিশ-নিয়ন্ত্রিত।

২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২ সাল। প্রাদেশিক আইন পরিষদের সেসন আরম্ভ হয়েছে। রশীদ বিল্ডিং-এর পাশে ঢাকা মেডিক্যালের লাগোয়াঁ ভার্সিটি কলাভবনের প্রাঙ্গণ-মাঠে আরম্ভ হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম কমিটি (জনাব আবদুল মতিন যার আহ্বায়ক) সভা আরম্ভ করেছে। জানতাম– মতিন সাহেবরা ওই 'ভাষা দিবসে' সরকারের দেয়া কারফিউ ভঙ্গ করবেই। অস্ত্রধারী পুলিশের নিয়ন্ত্রণে বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরো এলাকা। কার্জন হলের পশ্চিম দিককার দোতলায় অবস্থিত পরিসংখ্যান বিভাগের নতুন লেকচারার আমি উদ্বেগোত্তেজনায় বারবার বারান্দায় যাচ্ছি– কলাভবনে কি ঘটছে তা দেখার জন্যে। আমার প্রফেসর কাজী মোতাহার হোসেন সাহেব আমার ভাবসাব বুঝে রুমে বসে থাকতে নির্দেশ দিলেন। কিন্তু আমি দেখলাম, দশজন-দশজন করে ভার্সিটির

ভাষা-কর্মীরা কলাভবন থেকে বেরিয়ে আসছেন, আর পুলিশ তাদেরকে এ্যারেস্ট করে ট্রাকযোগে দূরে কোথাও পাঠিয়ে দিচ্ছে। গুলি-গোলার কোন শব্দ নেই। উদ্বেগোত্তেজনা অনেকটাই কমে এসেছে। ... হঠাৎ হ্যাঁ, হঠাৎই শোনা গেল গুলির শব্দ। মেডিক্যালের প্রধান গেট থেকে আরম্ভ করে অস্থায়ী হাফ-বিল্ডিং ছাত্রাবাসের সামনে জনতার ভীড় .... গুলি হয়েছে, গুলি.... তেমন কোন ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডের ব্যাকগ্রাউণ্ড ছাড়াই.... মানুষ মরেছে, মানুষ .... ব্যস,, রক্তরাঙা হল একুশে ফেব্রুয়ারী। তারপরের দিন, ২২ ফেব্রুয়ারি। মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে বিরাট-বিশাল জনতার মিছিল, ... মিলিটারি এ্যাকশ্যন .... আরও মৃত্যু, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপকণ্ঠ এলাকাতেও।

সেই মিছিলে সামিল হয়ে প্রত্যক্ষ করেছি- ভাষা-সংগ্রাম আরম্ভ করে দিয়ে 'বিপ্লবীরা' গা ঢাকা দিলেও ছাত্র-অছাত্র-শিক্ষক নির্বিশেষে বাংলাভাষী সব মানুষের কী অসাধারণ প্রতিবাদ! মাতৃভাষার মর্যাদার জন্য অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে কী সংগ্রামী অভিব্যক্তি!

বাকি কথা সবারই জানা। ঢাকার ডিসি মিস্টার কোরায়শী গুলি চালানোর অহেতুক নির্দেশ না দিলে হয়তো 'ভাষা দিবস' ৪৮ সালের ভাষা-আন্দোলনের মতই সফলতার মুখ না-ও দেখতে পারত! কিন্তু ওই যে শব্দগুচ্ছ– ভবিতব্য নির্ধারিত, তাতে করে এমনটি ঘটবেই; যা ঘটা অতি-প্রয়োজন, ভুল-ভালের মধ্য দিয়ে তা ঘটবেই! যুগে-যুগে গড়ে-ওঠা বাংলা ভাষা ও তারই শিল্প-রূপ বাংলা সাহিত্য কালের কপোল-তলে রক্ত-কমল হয়ে ফুটে উঠবেই!

ভাষা-আন্দোলনে মতিন সাহেবের রাজনৈতিক অবজারভেশন মেনে নিয়েই বলছি—সেদিন আওয়ামী নেতৃত্বের প্রাধান্যে আন্দোলন চলে গিয়ে বেপথুমানতার বেড়াজালে আটকা পড়লেও সে-আন্দোলনের সূচনাকারী তমদ্দুন মজলিসের আদর্শবাদী কর্মীরা তাদের লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়নি। আওয়ামী লীগ নেতৃবর্গের সঙ্গে মিতালীর সম্পর্কে আবদ্ধ হলেও তারা ছিলেন ইসলামের বিপ্লবী ভাবাদর্শে বিশ্বাসী, এবং সেদিন থেকে এদিনেও তারা তাদের আদর্শ-লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়নি। তারা জানত এবং জানে যে বাঙালী মুসলমানের বাংলা ভাষা প্রীতির ইতিহাস ব্রাহ্মণ্যবাদী পণ্ডিতদের বাংলা ভাষা বিদ্বেষের মতই সুপ্রাচীন।

বাংলায় ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর প্রায় শতবর্ষ পর্যন্ত বাঙালী মুসলমান বাংলা সাহিত্য চর্চা থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখার ফলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে হিন্দু ভাবধারা ও সংস্কৃত ভাষার প্রভাব প্রাধান্য পায়। উনিশ শতকের শেষ দিক থেকে তারা এ ভুল বুঝতে পেরে পুনরায় বাংলা সাহিত্য চর্চার মূল ধারায় ফিরে আসে। বিশের শতকে কাজী

নজরুলের আবির্ভাব মুসলমানদের বাংলা সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে নতুন করে প্রেরণা যোগায়। নজরুল সূচিত মুসলিম রেনেসাঁর ধারায়ই বাংলায় পাকিস্তান সংগ্রামের সাংস্কৃতিক প্রবাহ পুষ্টি লাভ করে। পাকিস্তান সৃষ্টির পর উর্দুভাষী আমলাদের বদৌলতে পুনরায় বাঙালী মুসলমানদের বাংলা সাহিত্য চর্চা নিরুৎসাহিত করার যে প্রবণতা শুরু হয়, তা তমদ্দুন মজলিস সেদিন বলিষ্ঠভাবে প্রতিহত করতে এগিয়ে না এলে বাঙালী মুসলমানরা শুধু সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেই নয়, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও অবাঙালী মুসলমানদের বহু পিছনে পড়ে থাকত। এ অবস্থা থেকে তমদ্দুন মজলিসই বাঙালী মুসলমানদের রক্ষায় এগিয়ে আসে।

এসব ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে না গিয়ে আদর্শিক দিক বিবেচনা করলেও দেখা যায়, ইসলাম মাতৃভাষাকে অত্যধিক গুরুত্ব দিয়েছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন, "আমি প্রত্যেক রসুলকেই তাহার স্বজাতির ভাষাভাষী করিয়া পাঠাইয়াছি তাহাদের নিকট পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করিবার জন্য...." (সূরা ইবরাহীম, আয়াতাংশ ৪)। মাতৃভাষা ব্যতীত আদর্শের প্রচার-প্রসার ও সম্যক উপলব্ধি সম্ভব নয়। বাঙালী মুসলমানের আদর্শিক অগ্রগতি সাধনের পথকে বাংলা ভাষা চর্চার মধ্যেই নিহিত রয়েছে, এ ব্যাপারে তমদ্দুন মজলিস সেদিন সঠিক ঐতিহাসিক নির্দেশনা না দিলে আজ যে অনেকে বলতে পারছেন, ঢাকাই এখন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের রাজধানী'–এমনটা উচ্চারণ করা আদৌ সম্ভব হত কি? হত না। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ওপর বাঙালী মুসলমানদের এই স্বাভাবিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তমদ্দুন মজলিসের অবদান এ কারণেই অনন্য।

অতঃপর ১৯৫২ সালের সেই একুশে ফেব্রুয়ারী, সেই মহান দিবসে শোকাবহ স্মৃতি ও মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে দুর্জয় সঙ্কল্পের প্রকাশ। সে প্রকাশে মেশানো ছিল শাহ সগীর-সৈয়দ সুলতান-দৌলত কাজী-আলাওল-নজরুল প্রমুখ কত না কবির কণ্ঠস্বর! স্বাধীন সুলতানী আমলে মর্যাদা পেয়েছিল আমাদের মাতৃভাষা, এ ভাষার কবিরা পেয়েছিল রাজোৎসাহ; মুঘলরা সে উৎসাহদানে ছিল উদাসীন। কিন্তু ইংরেজ আমলে পর্যুদস্ত মুসলিম কবি-সাহিত্যিকরা আবার নবজীবনের পথে বাংলার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার যে স্বপ্নে বিভোর হয়েছিলেন তাকে নস্যাৎ করতে চেয়েছিল সাতচল্লিশোত্তর নতুন মুঘলেরা। কিন্তু নজরুলের উত্তরসূরী আমরা তার মোকাবেলা করেছি সফলভাবে। শহীদী প্রাণের নজরানা দিয়ে আমাদের তরুণেরা প্রতিষ্ঠিত করেছে বাংলা ভাষার মর্যাদা। বাংলা ভাষা আজ পৃথিবীর একটি মাত্র স্বাধীন দেশের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা, সে-দেশ আমাদের বাংলাদেশ। মহান একুশের শহীদানের প্রতি আজ আমাদের সশ্রদ্ধ সালাম, হাজারো সালাম।

আমাদের সাহিত্য চর্চা মহান একুশের তাৎপর্য

বাংলা সাহিত্যচর্চা প্রসঙ্গে এই আলোচনার প্রারম্ভেই দু'টি শব্দ সম্পর্কে আমাদের ধারণা ব্যক্ত করে নিতে চাই। সমন্বয় শব্দটার আভিধানিক অর্থ হচ্ছে সংগতি, অবিরোধ, মিলন; আর সমাহার শব্দটার অর্থ সংগ্রহ, সমষ্টি ইত্যাদি। যেখানে একাধিক মত ও জীবন-বিশ্বাস বিদ্যমান, সেখানে সে সবের সমন্বয় সাধনের অর্থ হবেঃ সকল মত ও জীবন-বিশ্বাস মিলিয়ে এমন একটি কিছু দাঁড় করানো যা নিয়ে কারও বিরোধের কোন অবকাশ থাকবে না। সমাহারের বেলাতেও তা-ই। সেই 'একটা কিছু'র সন্ধানে সমন্বয়ের পথে অগ্রসর হলে যা পাওয়া যাবে তা হবে প্রতিটি মত-বিশ্বাস থেকে আহরিত অভিন্ন উপাদান-বিশিষ্ট 'একটা কিছু' যা থেকে প্রতিটি মত-বিশ্বাসের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যগুলো বাদ যাবে; আর সমাহারের পথে অগ্রসর হলে পাওয়া যাবে এমন 'একটা কিছু' যা থেকে প্রতিটি মত-বিশ্বাসকে তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যগুলোসহ চিহ্নিত করা যাবে।

দীর্ঘকালের কোন একটা বিশেষ মত-বিশ্বাস যদি কোন সাহিত্যে তার নিরঙ্কুশ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করে ফেলে থাকে, তাহলে তাতে অন্য মত-বিশ্বাসের সমন্বয় করতে গেলে তা বাস্তবে মার খেয়ে যেতে পারে, এমন কি বিলীনও হয়ে যেতে পারে। মানুষ তো সুযোগ পেলেই স্বার্থবাদী হয়! কিন্তু সমাহারে সে সম্ভাবনা যথেষ্ট কম। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি আর বৌদ্ধ সংস্কৃতির সমন্বিত রূপ থেকে আজ বৌদ্ধ সংস্কৃতিকে প্রায় চেনাই যায় না। এই দুই সংস্কৃতির সমাহারে এমনটি হত না।

ইংরেজ আমলে বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে দেখা যায়, মুসলিম সাহিত্যিকরা রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনজনিত কারণে সৃষ্ট চরম বিপর্যয়ের মধ্যে অনেক বিলম্বে আধুনিক সাহিত্য চর্চায় এগিয়ে এসেছেন। ততদিনে আধুনিক বাংলা সাহিত্য হিন্দু জাতীয়তাবাদী সাহিত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। বাংলা ভাষাতেও ততদিনে সাহিত্যে ব্যবহৃত শব্দসম্ভারে আরবী-ফারসী-তুর্কী ভাষা থেকে আহরিত শব্দমালার স্থান দখল করে নিয়েছে সংস্কৃত ও সংস্কৃতায়িত শব্দমালা। তখন আর সাহিত্যে প্রচলিত সেই শব্দসম্ভারকে অগ্রাহ্য করা সম্ভব হল না মুসলিম সাহিত্যিকদের পক্ষে। কখনও মুসলিম মানসের উপযোগী রূপকল্প নির্মাণে বাধ্য হয়ে তাদের জীবন-ধারার সঙ্গে জড়িত আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহার করলেও তার পাশে বন্ধনীভুক্ত করে দিতে হত সেসবের সংস্কৃতায়িত প্রতিশব্দ। ফলে, মীর মশাররফ হোসেন থেকে আরম্ভ করে মওলানা ইসলামাবাদী পর্যন্ত চলল এই শাব্দিক ভারবাহিতার কাল, বলা চলে মানসিক আড়ষ্টতার কাল।

অতঃপর দেখা দিল মুসলিম কবি-সাহিত্যিকদের আত্মবিশ্লেষণের প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে 'মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য' গ্রন্থে ডকটর মুহম্মদ এনামুল হক বলেন, "আত্মবিশ্লেষণের ফলেই আমাদের আত্মোপলব্ধি ও আত্মপরিচিতি ঘটে। এইখানে আসিয়াই বাংলার হিন্দু ও মুসলমান ভিন্ন পথ ধরিল। তাঁহারা বুঝিলেন, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে হিন্দু হিন্দুই এবং মুসলমান মুসলমানই, তাঁহারা পরস্পরের সহিত মিশিয়া এক জাতি হইতে পারে নাই ও পারিবে না। তাঁহারা আরও উপলব্ধি করিলেন মধ্যযুগের বিশেষ করে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধ ও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ সময়ের হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতি-সমন্বয়ের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে।" (পৃ. ৩১৭)।

আরম্ভ হল নতুন অধ্যায়। এই অধ্যায়ের শুরুতে ছিলেন সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী, শেষে কাজী নজরুল। উপরোক্ত গ্রন্থে ডক্টর হক বলেন, "অতঃপর, বাংলা সাহিত্যে যে মুসলমান সাহিত্যিকের আবির্ভাব হইল, তিনি বাংলার খ্যাতনামা কবি নজরুল ইসলাম। তাঁহার আবির্ভাবে শুধু সাহিত্যের নহে, সমগ্র বাংলা সাহিত্যের মোড় ফিরিয়া গেল। তিনি বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রযুগের অবসান ও নতুন যুগের আগমনবার্তা ঘোষণা করিলেন। .....বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে 'যুগপ্রবর্তক কবি' নজরুল ইসলামের আবির্ভাবে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে যে, প্রবল রবীন্দ্র-প্রভাবের বাহিরে থাকিয়া মুসলমানদের সাহিত্য-সৃষ্টির সাধনা সফল হইয়াছে।" (পৃ. ৩৩৩-৩৩৪)

এই নতুন যুগ নির্যাতিত মানবতার বন্ধন-মুক্তির যুগ, মানুষকে মানুষেরই মর্যাদা দানের যুগ, তার অধিকার প্রতিষ্ঠার ও শান্তিময় বিশ্ব রচনার মহান লক্ষ্যে সংগ্রাম পরিচালনার যুগ। নজরুলের কথায়, এ যুগের সংগ্রামীকে দূর করতে হয় মৃত্যু-ভয় এবং ছিন্ন করতে হয় ক্ষুদ্রতার বন্ধন আর মিথ্যার মায়াজাল। বজ্র-নির্ঘোষে নবযুগের যৌবনদৃপ্ত কবি এ বাণীই ঘোষণা করলেন। এই ঘোষণা বিপ্লবী ইসলামের মর্মবাণীরই ঘোষণা। এমনি ঘোষণার অপেক্ষাতেই ছিলেন যেন এতদিনকার মুসলিম সমাজ-সেবক আর কবি সাহিত্যিকবৃন্দ। কবির এই ঘোষণায় ইসলামের সেই মর্মবাণীকেই যেন খুঁজে পেলেন তাঁরা! হঠাৎ করেই জীবন-কাঠির ছোঁয়ায় যেন প্রাণ-চঞ্চল হয়ে উঠল মুসলিম বাংলা সাহিত্যের অঙ্গন! দেশ-দেশান্তর ও ভাষা-ভাষান্তরের মনীষা-সঞ্চয় থেকে আহরিত রূপকল্প আর শব্দ-সম্ভারে নজরুল সাহিত্য যেন শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মুসলমানদের বহু-প্রত্যাশিত এক অনুপম স্বপ্ন-বর্ণালী। অস্পষ্টতা আর বিভ্রান্তিকর পরিবেশে এমনি এক বর্ণালীর সন্ধানেই ছিল যেন এতদিনকার মুসলিম সাহিত্যচর্চার পথ-পরিক্রমা! এখন আর রইল না কোন অস্পষ্টতা ও বিভ্রান্তি। ইংরেজ আমলে পিছিয়ে-পড়া অর্ধ-চেতন জাতি সহসাই পেল পথ-প্রদর্শকদের!

হালে একটা ধারণা চালু করার চেষ্টা করা হচ্ছে খুব জোরেশোরে। ধারণাটা হচ্ছেঃ ১৯৪৭ সালের আগে পর্যন্ত বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি ছিল হিন্দু ও মুসলিম মত-

বিশ্বাসের সমন্বয়ধর্মী, সাতচল্লিশের পর পূর্ব-পাকিস্তানে তাকে সাম্প্রদায়িক করে তোলা হয়েছিল; একাত্তরে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর সকল সাহিত্য-সংস্কৃতসেবীর উচিত হবে সেই 'সাম্প্রদায়িক পথভ্রষ্টতা' থেকে ফিরে এসে প্রাক-সাতচল্লিশের সমন্বয়ের পথকে অনুসরণ করা। অর্থাৎ, মনে করতে হবে যে পাকিস্তান সৃষ্টির ধারণাটা ছিল কলঙ্কজনক ও দুঃস্বপ্ন তাড়িত একটা ধারণা এবং চব্বিশ বছরের পাকিস্তান আমলে রচিত সকল সাহিত্য-কর্ম ও সাংস্কৃতিক জীবন-ধারাকে মুছে ফেলে প্রাক-সাতচল্লিশের 'সমন্বয়ধর্মিতা'কে আঁকড়ে ধরতে হবে।

কলকাতা থেকে সম্প্রতি প্রকাশিত 'জিজ্ঞাসা' নামক এক সাহিত্য-সাময়িকীতে বাংলাদেশীয় এক প্রবন্ধকার একথা স্পষ্টই বলেছেন। অথচ সত্যটা সকলেরই জানা যে, প্রাক-সাতচল্লিশের 'সমন্বয়ধর্মিতা' বলতে যদি কিছু থেকে থাকে তাহলে তা ছিল আলোচনার প্রারম্ভেই বলে নেওয়া সেই সমন্বয়ধর্মিতা যাতে হিন্দু জীবন-বিশ্বাসের নিরঙ্কুশ প্রাধান্যে বিলীন হয়ে গিয়েছিল মুসলিম জীবন-বিশ্বাস। প্রসঙ্গত ১৯৭৩ সালে প্রকাশিত বসন্ত চ্যাটার্জি রচিত 'ইনসাইড বাংলাদেশ টুডে' গ্রন্থের একটি উদ্ধৃতি এখানে তুলে ধরা যেতে পারে। শ্রী চ্যাটার্জি লিখেছেন, "এখানকার (অর্থাৎ বাংলাদেশের— লেখক) শিক্ষিত মহল কর্তৃক আমরা এবং ভারত কি পরিমাণে শ্রদ্ধা ও সম্মান পেয়ে থাকি, তা বিচার করা যেতে পারে এই ঘটনা থেকে যে অনেক উচ্চাসীন আইনজীবী ব্যারিস্টার, প্রফেসর ও অন্যান্য বিদ্বজ্জন আমাদের কাছে প্রাইভেট কথাবার্তায় অকপটভাবে গোপনে বলেছেন যে, 'তাঁরা আরও অনেক বেশী নিরাপত্তা বোধ করতেন ও সন্তুষ্ট হতেন, যদি ভারত তার সংবিধানে স্রেফ ৩৭১ নম্বর একটা উপচ্ছেদ সংযুক্ত করে সরাসরি এই প্রদেশটাকে তার একটা স্পেশ্যাল স্টেট হিসেবে পরিণত করে নিত।' ...." (পৃ. ১৪২) হালে সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ে যে-ধারণাটা চালু করার চেষ্টা করা হচ্ছে, তার উৎস-মূল কোথায় এবং উদ্দেশ্যটা যে কি তা সহজেই অনুমেয়।

প্রাক-সাতচল্লিশের কলকাতা-কেন্দ্রিক সুপ্রতিষ্ঠিত বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে সেদিন হিন্দু জাতীয়তাবাদ অনুপ্রাণিত ও প্রচারিত সমন্বয়ধর্মিতার কলরবে কাজী নজরুলই ছিলেন একমাত্র বিদ্রোহী ব্যতিক্রম। তাঁর রচিত সাহিত্যে তথাকথিত সমন্বয়ধর্মিতা ছিল না, ছিল সমাহারধর্মিতা। (কেউ কেউ তাঁকে 'সহাবস্থানপন্থী' বলতে চান। এ শব্দটা যথার্থ অর্থ বহন করলেও তা রাজনীতি ক্ষেত্রেই বহুল ব্যবহৃত বলে সাহিত্য-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে আমরা 'সমাহারপন্থী' শব্দটা গ্রহণেরই পক্ষপাতী।) কাজী নজরুলই প্রথম এই সমাহারের পথটি অনুসরণ করেছিলেন, এমনটি মনে করা সঠিক হবে না। বাংলা সাহিত্যের সেই উন্মেষকাল থেকে আরম্ভ করে তার বিকাশ ও পরিণতিকালের মুসলিম সাহিত্যিচর্চার স্বরূপ সন্ধানের চেষ্টা করলেই দেখা যাবে, এই সমাহারের

পথটিই প্রধানত অনুসরণ করে এসেছেন মুসলিম কবি-সাহিত্যিকরা; হিন্দু কবি-সাহিত্যিকরা অনুসরণ করেছেন, সমন্বয় সমাহার কোনটাই নয়, একবারেই হিন্দু সাহিত্যের পথ। ফলে, বাংলা সাহিত্যচর্চায় সৃষ্ট হয়েছে হিন্দু ও মুসলিমদের নিজস্ব ঐতিহ্য-ধারা।

মুসলিম শাসনামলে বিভিন্ন কবির কাব্য-কৃতির পরিসংখ্যান দেখা যায় ঃ

১. স্বাধীন সুলতানী আমলে জানামতে ৯ জন মুসলিম কবির মধ্যে অন্তত চারজন হিন্দু বিষয়াদি নিয়ে কাব্য রচনা করেছেন। তাঁরা হলেন–'পদাবলী' রচয়িতা চাঁদ কাজী ও শেখ কবীর, 'বিদ্যাসুন্দর' রচয়িতা সাবিরিদ খান এবং 'গোরক্ষবিজয়' রচয়িতা শেখ ফয়জুল্লাহ্; অন্যান্য মুসলিম কবিরা রচনা করেছেন মুসলিম বিষয়-ভিত্তিক কাব্য। এই আমলে জানামতে ২৪ জন হিন্দু কবি সবাই হিন্দু ধর্মীয় কাব্য এবং একটি হিন্দু কাহিনী-কাব্য, 'বিদ্যাসুন্দর' রচনা করেছেন।

২. মুঘল আমলে আমাদের জানামতে ২৯ জন মুসলিম কবির মধ্যে অন্তত পাঁচজন হিন্দু-বিষয় নিয়ে কাব্য রচনা করেছেন। তাঁরা হলেন–'মধুমালতী' রচয়িতা মুহম্মদ কবীর, 'সতী ময়না' রচয়িতা মহাকবি আলাওল, 'ময়নামতীর গান' রচয়িতা শুকুর মাহমুদ এবং 'পদাবলী' রচয়িতা সৈয়দ মর্তুজা। এই আমলে ১৩ জন হিন্দু কবির সবাই রচনা করেছেন হিন্দু-বিষয়ক কাব্য। এই আমল সম্পর্কে আরও উল্লেখ্য যে, মুসলিম সুলতানদের অনেকেই হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে কবিবৃন্দকে বাংলা কাব্য-রচনার উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতা দান করেছেন।

ইংরেজ আমলে মুসলিম আমলের এই দু'টি ঐতিহ্য-ধারা আরও স্পষ্টরূপ পরিগ্রহ করেছে। রাজানুগ্রহ যতটুকু পাওয়ার, পেয়েছেন হিন্দু কবি-সাহিত্যিকগণ। অনেক অনেক হিন্দু কবি-সাহিত্যিক তাঁদের অমূল্য অবদানে ভরে তুলেছেন বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডার; কিন্তু মুসলিম জীবন-কথা তাতে অনুপস্থিত। একমাত্র ব্যতিক্রম ভাই গিরিশচন্দ্রের পবিত্র কুরআনের বঙ্গানুবাদ। অথচ এই আমলের বিপর্যয়কালেও সৈয়দ হামজা রচনা করেছেন 'মধুমালতী', কবি চুহর রচনা করেছেন 'মনোহর-মধুমতী' এবং মীর মশাররফ হোসেন রচনা করেছেন 'রত্নাবতী' উপন্যাস, 'বসন্ত কুমারী' নাটক এবং 'বেহুলা-গীতাভিনয়'।

সুতরাং কাজী নজরুল সাহিত্যচর্চায় সমাহারধর্মিতার মুসলিম ঐতিহ্যকেই অনুসরণ করেছিলেন। আর তখনকার প্রতিভাধর হিন্দু কবি-সাহিত্যিকরাও অনুসরণ করেছিলেন তাঁদের পূর্বসূরীদের ঐতিহ্যকেই; সে-ঐতিহ্য হিন্দু জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যাভিসারী ঐতিহ্য। অথচ এই ঐতিহ্যবাহীরাই হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি ও সাহিত্য-সংস্কৃতির তথাকথিত সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন তখন, যখন ইংরেজ-বিরোধী আন্দোলনে মুসলমানদের সহযোগিতা অপরিহার্য বলে বিবেচিত হল। শুধু

তখনই শোনা গেল 'একই মায়ের সন্তান আমরা হিন্দু-মুসলমান'! বিজয়ী মুসলিম শামনামলে কিন্তু এ ব্যাপারে কোন উচ্চবাচ্য শোনা যায়নি।

১৯৪২ সালে চিরদিনের মত নির্বাক হয়ে গেলেন কাজী নজরুল। দীর্ঘ অতীতের বাস্তবতা থেকে আত্মবিশ্লেষণ-লব্ধ সিদ্ধান্তে বাংলার মুসলমান তখন এক নতুন পথের পথিক। ইংরেজ আমলের শেষের দিনটি ক্রমাসন্ন; বাংলার বুকে হিন্দু মুসলমানদের স্বতন্ত্র লক্ষ্যানুসারী রাজনীতির উত্তাল তরঙ্গ। যে বিদেশী শাসনের প্রাক্কালে নবোত্থিত হিন্দু সমাজ 'কলোনিয়্যাল রেনেসাঁ'য় স্নাত হয়েছিল, সে-শাসনেরই অবসান-লগ্নে সুপ্তোত্থিত মুসলিম সমাজ মুক্ত জীবনের এক রেনেসাঁর আশায় হল অধীর আগ্রহী! নির্বাক কাজী নজরুলের উত্তরসূরীরা ১৯৪০ সালের পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গৃহীত লাহোর প্রস্তাবের আলোকে কলকাতায় এবং পরে ঢাকায় গড়ে তুললেন সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। ১৯৪২ সালের ৩০ আগস্ট সর্বজনাব আবুল কালাম শামসুদ্দীন, মুহম্মদ হাবীবুল্লাহ বাহার, মুজিবুর রহমান খাঁ (কনভেনর), মোহাম্মদ মোদাব্বের, জহুর হোসেন চৌধুরী প্রমুখ সাহিত্যিক-সাংবাদিক কলকাতায় বসে গড়ে তুললেন 'পূর্ব-পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি' এবং কিছুদিন পরেই সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন, অধ্যাপক মায্‌হারুল হক, সৈয়দ আলী আহসান প্রমুখ সাহিত্যিক-সুধী ঢাকায় গড়ে তুললেন 'পূর্ব-পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ'। মুক্ত দিনের সূর্যালোকে বাংলাভাষা ও সাহিত্যকে তাঁরা মনের মত করে সাজাবেন, তার আসনকে দুনিয়ার বুকে শ্রেষ্ঠ মর্যাদায় ভূষিত করবেন; সকলের আশাভরা কল্পনা তখন নীলাকাশে মুক্ত শাহীন। তিরিশের দশকে চলমান রাজনীতির প্রেক্ষাপটে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষারূপে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে বাংলার সুধী-সমাজ যে সব চিন্তা-ভাবনা ও আলোচনা সভার আয়োজন করেন এবং তাতে যে সব মতামত প্রকাশিত হয় তার বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ তাঁর রচিত 'বাঙালী মুসলমানের মাতৃভাষা প্রীতি' গ্রন্থের 'ইতিহাসের দর্পণেঃ রাষ্ট্রভাষার প্রশ্ন' প্রবন্ধে (প্রকাশিত ১৯৮০)। অতঃপর বিভক্তির মাধ্যমে স্বাধীনতা পেল ভারতবর্ষ। এল সেই ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট; প্রতিষ্ঠিত হল নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তান। ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব ১৯৪৬ সালে সংশোধিত হয়ে 'স্টেটস'-এর স্থলে সন্নিবেশিত হল 'স্টেট'। সর্বজনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশিম, শরৎ বসু প্রমুখের স্বাধীন সার্বভৌম তৃতীয় রাষ্ট্র 'বৃহত্তর বাংলা'র স্বপ্নও ব্যর্থ হল কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের একগুয়েমীতে। তবুও খন্ডিত বাংলাতেই এ-জনপদবাসী জ্বালাল আশার প্রদীপ! প্রাণে প্রাণে তখন নব-জাগরণ, পুষ্পে-পল্লবে মৃদু শিহরণ, বনে বনে পাখীদের কল-গুঞ্জরণ। স্বাধীনতা!.....কিন্তু.....পুনরাবৃত্তি ঘটলেও সেই 'কিন্তু'-সংক্রান্ত প্রধান ঘটনাবলীর রূপরেখা এখানে আবার তুলে ধরছি।

- পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কয়েকদিন পরেই নতুন চালু পোস্ট কার্ড, মানি-অর্ডার ফর্ম ইত্যাদিতে দেখা গেল তাতে পরিচিতিমূলক ইংরেজী শব্দের সাথে শুধুমাত্র উর্দু শব্দ রয়েছে। তাতে পূর্ব-বাংলার (পরে পূর্ব-পাকিস্তান) সচেতন নাগরিকদের মনে বাংলা ভাষার মর্যাদা নিয়ে প্রশ্ন জাগে।
- এর কিছুদিন আগে, ১৪ আগস্টের আগে, আলীগড় মুসলিম বিশববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর ডক্টর জিয়াউদ্দীন এক প্রবন্ধে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠা শুধুমাত্র উর্দুর সপক্ষে মত প্রকাশ করেন। তার প্রতিবাদে ডক্‌টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ও একটি প্রবন্ধে সেই মত খণ্ডন করেন।
- ১৯৪৭ সালের ১ সেপ্টেম্বরে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান 'তমদ্দুন মজলিস'। এর কনভেনর বা সেক্রেটারী ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের তরুণ অধ্যাপক আবুল কাসেম। সদস্য ছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম, জনাব শামসুল আলম, জনাব ফজলুর রহমান ভূইয়া প্রমুখ তরুণ। এই তমদ্দুন মজলিসের একটা প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে জোরদার আন্দোলন গড়ে তোলা।
- ১৯৪৭ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর অধ্যাপক আবুল কাসেম তমদ্দুন মজলিসের পক্ষে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন যার শিরোনাম ছিল-'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা-বাংলা না উর্দু?' তাতে তিনটি প্রবন্ধ লেখেন জনাব আবুল মনসুর আহমদ, অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন এবং অধ্যাপক আবুল কাসেম। তাঁরা জোরালো যুক্তিসহ বাংলা ও উর্দু দু'টি ভাষাকেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হওয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করেন।
এর মধ্যে ভারতের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হয়েছে হিন্দী। পাকিস্তান কর্তৃপক্ষের চিন্তা-ভাবনাও তার রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে প্রকাশ পেতে লাগলঃ পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু।
- পূর্ব-বাংলার সচেতন নাগরিকরা আরও ক্ষুব্ধ ও চিন্তিত হয়ে উঠলেন। কবি ফররুখ আহমদ সওগাতে প্রকাশিত প্রবন্ধে তার প্রতিবাদ জানালেন। এমনি অবস্থায় পূর্ব-বাংলার জনমত সংগঠন করার লক্ষ্যে এবং বাংলা ভাষার দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে গঠন করা হল সংগ্রাম পরিষদ-যার কনভেনর হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নূরুল হক ভূঁইয়া।
- ১৯৪৭ সালের নভেম্বরের দিকে পাকস্তান সুপিরিয়র সার্ভিস পরীক্ষার জন্য জারীকৃত সার্কুলারে পরীক্ষার অন্তর্ভুক্ত ভাষাসমূহের তালিকা দেওয়া হলো। তাতে ইংরেজী, উর্দু, হিন্দী, সংস্কৃত, ফরাসী, জার্মান, ল্যাটিন প্রভৃতি অনেক ভাষারই উল্লেখ ছিল, ছিল না শুধু বাংলা ভাষার উল্লেখ।

এর প্রতিবাদে সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে বিক্ষোভ প্রদর্শিত হল ঢাকায়। অধ্যাপক আবুল কাসেম বিবৃতি দিলেন পত্রিকায়। পাকিস্তানের কোন পত্রিকায় তা ছাপা হলো না, ছাপা হলো কলকাতাস্থ ইত্তেহাদ পত্রিকায় যার সম্পাদক ছিলেন জনাব আবুল মনসুর আহমদ। তিনি সেদিনের সম্পাদকীয়তেও এই প্রতিবাদের সপক্ষে মত প্রকাশ করলেন। এটা ডিসেম্বরের কথা। ইত্তেহাদের এই সংখ্যা ঢাকায় এসে পৌঁছল যখন, তখন বাংলা ভাষার সপক্ষীয়দের ক্ষোভ আরও চরমে পৌঁছল।

❑ এর মধ্যে ১৯৪৮ সালের প্রথম দিকে পূর্ব-পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জনাব শামসুল আলম তারও সদস্য, তমদ্দুন মজলিসের সদস্য তো আগে থেকেই ছিলেন। নতুন করে সংগ্রাম পরিষদ পুনর্গঠিত হলো; জনাব শামসুল আলম হলেন তার কনভেনর।

❑ ১৯৪৮ সালের ২৪-২৫ ফেব্রুয়ারী ও ২ মার্চে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান গণপরিষদের আইনবিধি সংক্রান্ত কমিটির দ্বিতীয় বৈঠকে বাংলা ভাষার দাবী উত্থাপিত হলেও তা অগ্রাহ্য হয়। তার প্রতিবাদে ১১ মার্চ সংগ্রাম পরিষদের উদ্যাগে ধর্মঘট, প্রতিবাদ সভা ও বিক্ষোভ মিছিলের মাধ্যমে ঢাকায় পালিত হয় রাষ্ট্রভাষা দিবস। বিক্ষোভের অংশ হিসেবে ঘেরাও করা হয় সেক্রেটারিয়েট; বিক্ষোভকারীদের উপর চলে প্রচণ্ড পুলিশ-হামলা; বহুজন আহত হন, গ্রেফতার করা হয় অনেককেই। বিক্ষোভকারীরা তদানীন্তন প্রাদেশিক শিক্ষামন্ত্রী জনাব আবদুল হামিদ ও খাদ্যমন্ত্রী সৈয়দ মোহাম্মদ আফজলকে পদত্যাগ পত্রে স্বাক্ষরদানে বাধ্য করেন। বিক্ষোভ দানের জন্য সেনাবাহিনীর ইউনিটও তলব করা হয়। শেষ পর্যন্ত পূর্ব-বাংলার প্রধানমন্ত্রী (তখনও মুখ্যমন্ত্রী শব্দটা চালু হয়নি) খাজা নাজিমুদ্দীন সংগ্রাম পরিষদের ৮ দফা দাবীবিশিষ্ট এক চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করে বিক্ষোভের অবসান ঘটান।

❑ এই মার্চেই পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর-জেনারেল কায়েদে আযম মুহম্মদ আলী জিন্নাহ্ আসেন ঢাকায়; ২১ মার্চ তিনি বক্তৃতা দেন রমনা ঘোড়-দৌড় মাঠে এবং ২৪ মার্চ কার্জন হলে। দু'টি ভাষণেই তিনি বলেন যে, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু, অন্য কোন ভাষা নয়। কার্জন হলের সভায় এই মত প্রকাশের সময় উপস্থিত ছাত্রনেতাদের 'না না' ধ্বনিতে তার প্রতিবাদ উত্থিত হয়।

❑ এই ২৪ মার্চে সর্বজনাব আবুল কাসেম, শামসুল হক, কামরুদ্দীন আহমদ, নঈমুদ্দীন আহমদ, অলি আহাদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ ও শামসুল আলম সমন্বয়ে গঠিত রাষ্ট্রভাষা কর্ম-পরিষদের একটি প্রতিনিধি দল জিন্নাহ্ সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবী সম্বলিত স্মারকলিপি পেশ করেন।

- ১৯৪৮ সালের ৮ এপ্রিল পূর্ব-বাংলা ব্যবস্থাপক সভায় বাংলাকে প্রাদেশিক ভাষারূপে ঘোষণা করে প্রস্তাব গৃহীত হয়।
- ১৯৪৮ সালের ১৪ নভেম্বর ১৯ আজিমপুর রোড (অধ্যাপক আবুল কাসেমের বাসস্থান) থেকে প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে 'সাপ্তাহিক সৈনিক' যার সম্পাদনায় ছিলেন কথাশিল্পী শাহেদ আলী ও জনাব এনামুল হক এবং যার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল বাংলা ভাষা আন্দোলনের মুখপাত্র হিসাবে কাজ করা।
- ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন গঠিত হয় আওয়ামী মুসলিম লীগ যার সভাপতি ছিলেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী; সহ-সভাপতি সর্বজনাব আতাউর রহমান খান, আবদুস সালাম খান ও আবুল মনসুর আহমদ; সম্পাদক শামসুল হক এবং যুগ্ম-সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান ও খোন্দকার মুশতাক আহমদ।
- ১৯৪৯ সালের শেষ দিকে পূর্ব-পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ অস্থায়ী অর্গানাইজিং কমিটির অন্যতম সদস্য আবদুল মতিনকে আহ্বায়ক করে গঠিত হয় বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি।
- পাকিস্তান গণপরিষদের শাসনতান্ত্রিক মূলনীতি নির্ধারণ কমিটি ১৯৫০ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর তার রিপোর্টে উর্দুকেই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার সুপারিশ করে।
- ১৯৫০ সালের ৪-৫ নভেম্বরে ঢাকায় অনুষ্ঠিত জাতীয় মহাসম্মেলনে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রের জন্য যে সুপারিশমালা পেশ করা হয় তাতে বাংলা ও উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার সুপারিশ ছিল অন্যতম।
- ১৯৫২ সালের ২৬শে জানুয়ারী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন নিখিল পাকিস্তান মুসলিম লীগের ঢাকা অধিবেশনে প্রদত্ত সভাপতির ভাষণে বলেন, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হল বাংলা ভাষার সপক্ষে মরণপণ সংগ্রাম। আবার পুনর্গঠিত হল সংগ্রাম পরিষদ, নাম হল 'সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ'। বিভিন্ন দলের মধ্যে তমদ্দুন মজলিস ছাড়াও ছিল পূর্ব-পাকিস্তান আওয়ামী লীগ, পূর্ব-পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ, ইসলামী ভ্রাতৃসংঘ, যুবলীগ এবং অন্যরা। কাজী গোলাম মাহবুব হলেন তার আহ্বায়ক।
- ৩০ জানুয়ারী, ১৯৫২ঃ খাজা নাজিমুদ্দীনের উপরোক্ত বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় ঢাকায় পালিত হয় প্রতিবাদ দিবস; বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা কমিটির উদ্যোগে পুরনো কলাভবন প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় প্রতিবাদ সভা, তার সঙ্গে ছাত্র ধর্মঘট।
- ৩১শে জানুয়ারী ১৯৫২ঃ পুরনো বার লাইব্রেরী হলে 'সর্বদলীয় কর্মীসভা'। পরের দিন থেকে বায়ান্ন সালের ফেব্রুয়ারী মাস; ধর্মঘট, বিক্ষোভ, প্রতিবাদ ও প্রস্তুতি সভার মাধমে ফেব্রুয়ারীর বিশটি দিনরাত পেরিয়ে আসে একুশে ফেব্রুয়ারী। ছাত্র-সমাজের হাতে তখন ভাষা-সংগ্রামের পতাকা। ঘটনাপঞ্জীর রূপেরেখায় আমি আর এগুতে চাই না; কারণ বাকি ইতিহাস সকলের জানা।

বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে বাংলাভাষা স্বীকৃতি পেয়েছিল ১৯৫৬ সালে। সে স্বীকৃতি ছিল অনেক রক্তঝরা এক সংগ্রামের সাফল্য। সংগ্রামের এক রক্তলাল মাইল-ফলক একুশে ফেব্রুয়ারী। একুশে তাই আমাদের জীবনে এক মহান দিবসের স্মৃতি, অশ্রু-শোকাতুর অন্য এক কারবালার স্মৃতি, তারই সঙ্গে অনুপ্রেরণার অনন্য এক স্মারক উৎস!

আবার বাংলা সাহিত্যের প্রসঙ্গে প্রশ্ন উঠতে পারে শহীদী প্রাণের নজরানা দিয়ে কারা প্রতিষ্ঠিত করে গেল মায়ের মুখে শেখা ভাষা আমাদের মাতৃভাষার মর্যাদা? আমাদের ভা'য়েরা, আমাদের ছেলেরাই তো! শাহ্ সগীর, সৈয়দ সুলতান, দৌলত কাজী, আলাওল আর কাজী নজরুল ইসলামের ঐতিহ্যবাহী তরুণেরাই তো! নির্বাক নজরুলের সেদিনকার উত্তরসূরী কবি-সাহিত্যিকদের শাহীন স্বপ্নকে নস্যাৎ করে দিতে চেয়েছিল পাকিস্তানের ইয়াজিদী শক্তি। পারেনি। বুকের রক্ত ঢেলে বিজয় ছিনিয়ে এনেছিল আমাদের এই মাতৃভূমির মায়ের ছেলেরা, 'অন্য কারো' ছেলেরা নয়! মাতৃভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আমরাই তো লড়েছি একই ধর্মের পরিচয়ধারী কংস রাজার বিরুদ্ধে টু-শব্দটিও করেনি। তাহলে? তাহলে মহল বিশেষের পক্ষ থেকে এই স্পর্ধিত উচ্চারণ কেন যে সাতচল্লিশ থেকে একাত্তর পর্যন্ত এই দীর্ঘকালের সকল সাহিত্য-কৃতির প্রয়াস ছিল এক কলঙ্কজনক দুঃস্বপ্ন-তাড়িত প্রয়াস? তাহলে কি মাতৃভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার এই অনন্য সংগ্রামও সেই কলঙ্কজনক দুঃস্বপ্ন-তাড়িত প্রয়াসেরই অন্তর্ভুক্ত? জানি, ভাষা আন্দোলনের যে রূপরেখা এখানে তুলে ধরা হয়েছে, মহল বিশেষের নিগূঢ় কোন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যেই তার প্রথমাংশটুকু বাদ দেওয়া হয়। ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারীতে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান গণপরিষদের আইন-বিধি সংক্রান্ত কমিটির বৈঠকে পূর্ব-বাংলার অন্যতম সদস্য শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দত্ত কর্তৃক উথাপিত দাবী থেকেই যেন ভাষা আন্দোলনের শুরু! তার আগে যেন এই আন্দোলনের কোন সূচনা ছিল না, কোন সংগঠন ছিল না! জানি, ভাষা আন্দোলনের প্রকৃত ঘটনাপঞ্জীতে বিশেষ কোন এক 'চেতনা' প্রক্ষিপ্ত করে তাকে এক চিহ্নিত ধারার সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়ার প্রয়াস সেই কবে থেকেই চলে আসছে। সে প্রয়াসের প্রয়োজনেই ঘটনাপঞ্জীর প্রথমাংশের সঙ্গে আরও কিছু সত্যকে আড়ালে রাখতে হয়।

হালে অবিশ্যি কোথাও কখনও এই আন্দোলনের সূচনাকারী হিসাবে তমদ্দুন মজলিসের নাম উচ্চারিত হয়ে থাকে, উচ্চারিত হয়ে থাকে অধ্যাপক আবুল কাসেমের নাম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ মন্তব্যও করা হয় যে, পরে এই আন্দোলনে তমদ্দুন মজলিসের কোন ভূমিকা ছিল না। অথচ আজ অনেকেই ভেবে দেখতে চান না যে, তমদ্দুন মজলিস ছিল একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান মাত্র। কোন রাজনৈতিক দল নয়। ইসলামের মূলনীতি ও মূল্যবোধের উপর ভিত্তিশীল পাঁচ শতাধিক বছরের ঐতিহ্যবাহী

মুসলিম সাহিত্যে সমাহারপন্থী ধারাকে আত্মস্থ করে আধুনিক দুনিয়ার সাহিত্যাঙ্গনের উপযোগী বাংলা সাহিত্য সৃষ্টিই ছিল তমদ্দুন মজলিসের অন্যতম লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য অর্জনের পূর্ব-শর্ত হয়ে দেখা দিয়েছিল নতুন দেশে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজন। আর সে প্রয়োজনে সাড়া দিতে গিয়েই অধ্যাপক আবুল কাসেমের নেতৃত্বে আরম্ভ হয়েছিল ভাষা আন্দোলনের সূচনা ও তাকে সংগঠিত করার কাজ। আমরা ছিলাম অধ্যাপক কাসেমের স্বপ্ন-সাথী, বিভিন্ন সময়ে যোগ দেওয়া তমদ্দুন মজলিসের কর্মী। সূচনাকালে আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায়ের কাজ গুছিয়ে আনা হল যখন, যখন পূর্ব-পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ ও পূর্ব-পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের মত আরও নব-গঠিত সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক সংগঠন ও দল এগিয়ে এসে আন্দোলনকে সংগ্রামমুখী করার নেতৃত্ব গ্রহণ করল, তখন তমদ্দুন মজলিসে কর্মীদের দায়িত্ব হল নিজেদের মেধা ও সাধ্য অনুসারে সেই আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত থাকা। আমরা জানি, সে দায়িত্ব আমরা পালন করেছি। এ বক্তব্যের প্রমাণ রয়েছে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংগ্রাম পরিষদের গঠন রূপে।

ভাষা আন্দোলনের সংগ্রামী পথ পরিক্রমায় এসেছিল মহান একুশে ফেব্রুয়ারী। একুশের শহীদান আমাদের সকলকে আবদ্ধ করে গেছেন এক দৃঢ় প্রতিশ্রুতির বন্ধনে। সে প্রতিশ্রুতি রাষ্ট্রভাষা বাংলাকে আধুনিক দুনিয়ার সাহিত্যাঙ্গনে স্বকীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার প্রতিশ্রুতি। আমাদের সাহিত্য চর্চায় এই-ই হচ্ছে মহান একুশের তাৎপর্য।

রাষ্ট্রীয়ভাবে সাতচল্লিশে আমরা যখন পাকিস্তানবাসী হলাম, তখনও আমাদের চেতনায় লালিত ছিল মূল লাহোর প্রস্তাবে স্বীকৃত এ জনপদের স্বতন্ত্র পরিচয়ের কথা। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপরই তার প্রকাশ ঘটতে আরম্ভ করেছিল মাতৃভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে। আর একুশে ফেব্রুয়ারীকে বুকে নিয়েই সেই চেতনার অভিষেক সম্পন্ন হয়েছিল একাত্তরের ষোলই ডিসেম্বর। এই চেতনাকে মুখর করে তোলার স্বপ্ন নিয়েই সাতচল্লিশের পহেলা সেপ্টেম্বর আত্মপ্রকাশ করেছিল তমদ্দুন মজলিস। সেই চেতনার চরম উন্মেষ ঘটে বায়ান্ন'র ২১ ফেব্রুয়ারী। আর সেই পথ ধরেই একাত্তরের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে ফিরে পেয়েছি আমাদের স্বাধীন সত্তা, পেয়েছি স্বদেশ ভূমি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

বায়ান্ন–তেপ্পান্ন–চুয়ান্ন'র দ্যুতি

আমাদের ভাষা আন্দোলনের পথিকৃত অধ্যাপক আবুল কাসেমের নেতৃত্বে তমদ্দুন মজলিসের মাসিক সাহিত্য-পত্র 'দ্যুতি' ১৯৫২ সালের সেই অগ্নিঝরা দিনগুলোর স্বাক্ষর বুকে নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। উল্লেখ্য, তমদ্দুন মজলিসের মুখপাত্র আন্দোলন সংগঠনে যে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখে, সাহিত্য ক্ষেত্রে 'দ্যুতি'র ভূমিকা ছিল তারই

পরিপূরক। আজ সে কথা আমাদের নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা অত্যন্ত জরুরী। সে লক্ষ্যেই এখানে আমরা দু'বছরের 'দ্যুতি'র খতিয়ানমূলক একটি প্রবন্ধ তুলে ধরলাম।

উনিশ শ' বায়ান্ন সালের জানুয়ারী মাস। এগিয়ে আসছে ফেব্রুয়ারী। বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার আন্দোলন তখন চরম পর্যায়ে উপনীত, ওই সময়টায় তমদ্দুন মজলিসের পক্ষ থেকে প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে মাসিক সাহিত্যপত্র 'দ্যুতি'। এর মুদ্রাকর ও প্রকাশক ছিলেন কাজী শামসুজ্জামান। তমদ্দুন মজলিসের তখনকার 'সাহিত্য ও লোককলা সম্পাদক' হিসাবে এই নবপর্যায়ের 'দ্যুতি'র সম্পাদক ছিলাম আমি, আসকার ইবনে শাইখ (অবিশ্যি নবতর ছদ্মনাম 'ওবায়েদ আসকার'— এই নামে)। সহ-সম্পাদক ছিলেন আবুল খায়ের মুসলেহউদ্দিন, চৌধুরী লুৎফর রহমান, মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ ও সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। 'নবপর্যায়' প্রসঙ্গে বলতে হয়, তমদ্দুন মজলিশ থেকে 'দ্যুতি' প্রকাশিত হওয়ার আগে অন্যের দ্বারা 'দ্যুতি' কিছুদিন প্রকাশিত হয়ে বন্ধ হয়ে যায়। তখনও এর মুদ্রাকর ও প্রকাশক ছিলেন জনাব কাজী শামসুজ্জামানই। নব পর্যায়ের 'দ্যুতি'র প্রথম বর্ষ ষষ্ঠ সংখ্যা পর্যন্ত সহ-সম্পাদনায় কারও নাম ছাপা হত না। সপ্তম সংখ্যায় (আশ্বিন, ১৩৫৯ সন) সহ-সম্পাদনায় ছিলেন সর্বজনাব আবুল খায়ের মুসলেহউদ্দিন, চৌধুরী লুৎফুর রহমান ও মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ্, এবং ব্যবস্থাপনায় জনাব হাসান ইকবাল। অষ্টম সংখ্যায় সহ-সম্পাদনায় ছিলেন চৌধুরী লুৎফুর রহমান ও মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ্। অতঃপর প্রথম বর্ষ নবম সংখ্যা থেকে দ্বিতীয় বর্ষের শেষ সংখ্যা পর্যন্ত নিয়মিতভাবে 'দ্যুতি'র সহ-সম্পাদনায় ছিলেন সর্বজনাব চৌধুরী লুৎফুর রহমান, মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ্ ও সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী এবং উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না যে সব কিছুর পেছনে সদা-কার্যকর ছিলেন আমাদের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক আবুল কাসেম ও তাঁর নীরব সাহায্যকারিণী বেগম রাহেলা কাসেম।

অর্থাভাবে 'দ্যুতি'র প্রকাশ তেমন নিয়মিত ছিল না; প্রথম বর্ষের ১২শ' সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়নি এবং দ্বিতীয় বর্ষের ১২শ' সংখ্যা থেকে দ্যুতির প্রকাশনা তমদ্দুন মজলিসের কাছ থেকে চলে যায় অন্যের দায়িত্বে এবং সে-দায়িত্ব গ্রহণ করেন জনাব এ, এইচ, এম, মোহীয়্যুদ-দীন; তিনিই হন 'দ্যুতি'র সম্পাদক। তৃতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যা পর্যন্ত সংখ্যাগুলো আমার কাছে আজও রয়েছে। সেগুলো থেকেই 'দ্যুতি'র লেখক, লেখা এবং অন্যান্য বিষয়ের একটা রূপরেখা এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। আর আমাদের কোন মন্তব্য ছাড়াই। এই রূপরেখায় লেখা ও লেখকের নাম ছাড়াও মাঝে মধ্যে আছে সম্পাদকীয়ের বিশেষ বিশেষ অংশ, আছে অন্যান্য বিষয়ের উপর

কিছু প্রতিবেদন ও আলোচনা। এসব বিশেষ বিশেষ অংশ তুলে দিলাম এজন্য যে, তাতে করে পাঠক-পাঠিকাদের কাছে আমাদের তখনকার চিন্তা-ভাবনার পরিচয় কিছুটা স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে।

ওই দুই বছরেরও কিছু বেশি সময়ে যাঁরা যাঁরা 'দ্যুতি'তে লিখেছেন, তাঁদের সবার কাছে আমরা চিরকৃতজ্ঞতা ও প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ। তখন লিখে কেউ সম্মানী পেতেন না, আমরাও কাজ করে কেউ সম্মানীর কল্পনাও করতাম না। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে তিনজন সহ-সম্পাদকের কথা। জানি না, শক্তিমান কবি চৌধুরী লুৎফর রহমান সাহেব আজ কোথায় আছেন। ভাঙা স্বাস্থ্য নিয়েও তিনি 'দ্যুতি'র জন্য যা করেছেন, তাতে তাঁকে কখনও ভুলবার নয়। আর জনাব মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ্ ও জনাব সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী তাঁদের অক্লান্ত উৎসাহ ও পরিশ্রম দিয়ে এবং বিভিন্ন নামে সাংস্কৃতিক প্রসঙ্গ-সম্পাদকীয়-সাহিত্য সমালোচনা প্রভৃতি লিখে ও অন্যান্য লেখা সংগ্রহ করে 'দ্যুতি'র প্রতিটি সংখ্যাকে সাজিয়েছেন। বলতে গেলে তাঁরাই ছিলেন 'দ্যুতি' সম্পাদনার প্রধান কর্মী। সর্বোপরি, 'দ্যুতি' প্রকাশনার সঙ্গে জড়িয়ে আছে সর্বজনাব শাহেদ আলী, আবদুল গফুর ও অন্যান্য বন্ধু-বান্ধবদের কর্ম-প্রেরণা ও উৎসাহ-উপদেশ দানের স্মৃতি।

লেখা দিয়ে যাঁরা 'দ্যুতি'কে উজ্জ্বল করেছিলেন, লেখার ক্রম-অনুসারে তাঁরা হলেনঃ সর্বজনাব ফররুখ আহমদ, অধ্যাপক মোতাহের হোসেন চৌধুরী, সৈয়দ মোকসুদ আলী, অধ্যাপক আবুল কাসেম, শাহেদ আলী, সানাউল্লাহ নূরী, আবদুর রশীদ খান, আবুল খায়ের মুসলেহ উদ্দিন, আবদুর রশীদ ওয়াসেকপুরী, চৌধুরী লুৎফুর রহমান, তরীকুল আলম, কবীর উদ্দিন আহমদ, কাজী ফজলুর রহমান, অন্নদা শঙ্কর রায়, ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন, অধ্যাপক হাসান জামান, আবদুল হাই মাশরেকী, প্রজেশ কুমার রায়, আজীজুল হক, আবদুল গফুর, বদরুদ্দীন উমর, মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ, আনোয়ারা বেগম, মোস্তাফা কামাল, আতোয়ার রহমান, মাহফুজুল হক, নূরুল আফছার, অধ্যাপক মুনশী রইসউদ্দিন, মাহবুব-উল-আলম, আজিজুর রহমান, মোহাম্মদ আজিজুল হক, গোলাম আহমদ, মীর আবুল হোসেন, আশরাফ সিদ্দিকী, আহমদ ফরিদ উদ্দিন, সৈয়দ আতাউর রহিম, এরশাদ হোসেন, বদরুল মুনির, অধ্যাপক মোহাম্মদ আজরফ, আসকার ইব্‌নে শাইখ, আবদুর রহমান, হায়াত দারাজ খান পাকিস্তানী, রওশন ইজদানী, প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁ, সৈয়দ বদরুদ্দিন হুসেন, ভবেশ মুখোপাধ্যায়, মায্‌হারুল ইসলাম, এ. এস. এম. আবদুল জলীল, মোজাম্মেল সিদ্দিক, মফিজউদ্দিন আহমদ, রাবেয়া খাতুন, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, মির্জা আ. মু. আবদুল হাই, মোহাম্মদ মামুন, আবু হেনা মোস্তফা কামাল, আবদুল গাফফার চৌধুরী, নূরুল আলম, আতাউল হক, মুহম্মদ আবু তালিব, নূরুন নাহার বেগম, হাবীবুর

রহমান, শেখ লুৎফুর রহমান, খোন্দকার আবদুর রহীম, আব্দুল কুদ্দুছ, আহমদ সিরাজ, অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা, ম. আ. ম. জহুরুল আলম, মোহাম্মদ সানাউল্লাহ্, আবু মোহাম্মদ হেদায়েতুল ইসলাম খান, শফিকা হুসেন, সোলায়মান খান, মীজানুর রহমান, অনির্বাণ, সৈয়দ আলী আশরাফ, মীর শামসুল হুদা, চৌধুরী ওসমান, মুফাখ্খারুল ইসলাম, জাহাঙ্গীর খালেদ, মিন্নাত আলী, মোহাম্মদ ফারুক, আবদুল হাই সরকার, সেলিম চৌধুরী, মোহাম্মদ রিয়াছত আলী, মোজাফ্ফর আহমদ, নাজমুল হক, কবি শাহাদাৎ হোসেন, আল মাহমুদ, লুতফুল হায়দার চৌধুরী, আহমাদুর রহমান ও মোয়াজ্জম হোসেন।

উপরোক্ত নামগুলোর মধ্যে চার-পাঁচটি নাম ছিল সম্পাদনার দায়িত্বে নিয়োজিত আমাদেরই ছদ্মনাম। নিজেদের লেখা ছাড়াও সহ-সম্পাদকবৃন্দ, বিশেষ করে মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ্ ও সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, এভাবেই 'দ্যুতি'কে উপযোগী করে বের করতে সাহায্য করেছেন। ওই ছদ্মনামগুলো বাদ দিলে পঁচাশিরও বেশী খ্যাতিমান কবি-সাহিত্যিক 'দ্যুতি'তে লিখেছেন। তখনকার প্রেক্ষিতে সংখ্যাটা মোটেই কম নয়। উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না যে, এতসব কবি-সাহিত্যিক ও আমাদের মধ্যে প্রীতি ও সৌহার্দের বন্ধন না থাকলে একই মাসিক পত্রে নিজেদের মানস ফসলের এই সমারোহ ঘটানো সম্ভব হত না। বলা যায়, 'দ্যুতি'র মাধ্যমে আমাদের মধ্যে গড়ে উঠেছিল একটা মধুর আত্মীয়তার পরিবেশ। সেদিনের এই আত্মীয়তার জন্য আমরা 'দ্যুতি'-কর্মীরা আজও গর্বিত, স্মৃতিসিক্ত। এবং আজও তাঁদের প্রতি ঋণ স্বীকার করতে মন চাইছে না এই আত্মীয়তার জন্যই। শুধু শ্রদ্ধার সঙ্গে বলবঃ আমাদের স্মৃতির আকাশে তাঁরা সবাই একান্ত আপন হয়েই অস্তিত্ববান।

এবার তুলে ধরা হচ্ছে 'দ্যুতি'র সংখ্যাওয়ারী পরিসংখ্যানী বিবরণ।

নবপর্যায়ে 'দ্যুতি'র প্রথম সংখ্যার সূচনা পৃষ্ঠায় কালো বর্ডারে পরিবৃত করে লেখা হয় ঃ

> সাড়ে চার কোটি মানুষের দাবীকে প্রতিষ্ঠা
> করতে যেয়ে যেসব বীর শহীদ বুকের
> তপ্ত লোহু ঢেলে রাজপথ রঞ্জিত করে
> দিয়ে রাষ্ট্রভাষা বাংলা করার সংগ্রামকে
> এগিয়ে দিয়ে গেলেন, তাঁদের মহান
> সংগ্রামী ইতিহাস আগামী দিনে
> চলার পথের দিশারী হোক

দ্যুতি

[মাসিক সাহিত্য পত্র]

১ম বর্ষঃ ১ম সংখ্যাঃ ফাল্‌গুন, ১৩৫৮; ফেব্রুয়ারী, ১৯৫২

লেখার শিরোনাম	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা সংখ্যা
জাগৃতি (কবিতা)	ফররুখ আহমদ	–৩
অসুয়া (গল্প)	অধ্যাপক মোতাহের হোসেন চৌধুরী	৪–১৩
সেতার (গল্প)	সৈয়দ মোকসুদ আলী	১৪–১৮
আধুনিক বিজ্ঞানের গতি (প্রবন্ধ)	অধ্যাপক আবুল কাসেম	১৯–২৫
পাগল (গল্প)	শাহেদ আলী	২৬–৩৩
বুদ্ধিজীবীদের প্রতি (প্রবন্ধ)	আলবার্ট আইনস্টাইন অনুবাদঃ সানাউল্লাহ নূরী	৩৪-৩৮
ভবিষ্যতের কবি-কে (কবিতা)	আবদুর রশীদ খান	৩৯–৪১
জাগৃতি (কবিতা)	আবুল খায়ের মুসলেহ উদ্দিন	৪১–৪২
প্রেতের ছায়ারা কাঁপে (কবিতা)	আবদুর রশীদ ওয়াসেকপুরী	৪২
ভেনাস (কবিতা)	চৌধুরী লুৎফুর রহমান	৪৩–৪৬
কোনো এক নারীর মৃত্যুতে (কবিতা)	তরীকুল আলম	৪৭–৪৮
ফাল্গুনী (কবিতা)	কবীরউদ্দিন আহমদ	৪৮–৫০
কান্না (গল্প)	কাজী ফজলুর রহমান	৫১–৫৪
বিতর্কিকা		
নতুন অধ্যায়	অন্নদাশঙ্কর রায়	৫৫–৫৯
সম্পাদকের দৃষ্টিতে		
আমাদের রাষ্ট্র ভাষা		৬০–৬১

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকেই পাকিস্তানে রাষ্ট্রভাষা নিয়ে বিরাট সমস্যা দেখা দিয়েছে। সরকার উর্দুকেই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা বলে ঘোষণা করেছেন। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনমত অনুযায়ীই সরকার পরিচালিত হয়। পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশের জনসাধারণের প্রাদেশিক ভাষা হলেও তারা উর্দুকেই রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষপাতী। কাজেই পশ্চিম পাকিস্তানে উর্দুই যে সরকারী ভাষা হবে এবং উর্দুই যে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হবে তাতে দ্বিধা প্রকাশ করার কিছুই নেই।

ঠিক একই নীতিতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের শতকরা ৫৬ জন বাংলা ভাষাভাষীর মতামতকেও অস্বীকার করার কোন ক্ষমতা কোন গণতান্ত্রিক সরকারের থাকতে পারে না।

বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে বিগত ১৯৪৮ সনে সারা পূর্ব পাকিস্তানে প্রবল আন্দোলন হয়ে গেছে। জনমতের চাপে পড়ে তদানীন্তন প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রী জনাব খাজা নাজিমুদ্দিন বাংলা ভাষার দাবীকে মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু সরকারীভাবে সে প্রতিশ্রুতি ও প্রস্তাব কার্যকরী করা হয়নি। শুধু তাই নয়, জনাব খাজা নাজিমুদ্দিন সাহেব পাক প্রধানমন্ত্রী হিসাবে পূর্ব-বঙ্গ সফরে এসে উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার অভিমত প্রকাশ করে গেছেন। তার প্রতিবাদ স্বরূপ গোটা প্রদেশেই তুমুল উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। প্রদেশের ছাত্ররা শোভাযাত্রা, ধর্মঘট ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করে বাংলা ভাষার ন্যায্য অধিকার দাবী করছেন।

আমরা আশা করি সরকার গণদাবীকে উপেক্ষা করে সমস্যা-প্রপীড়িত পাকিস্তানকে আরো সমস্যা-সংকুল করে তুলবেন না।

ইসলামী সাংস্কৃতিক সম্মেলন

আগামী মার্চ মাসের ১২, ১৩ ও ১৪ তারিখে ঢাকায় 'ইসলামী সাংস্কৃতিক সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। সম্মেলনে সাহিত্য, লোককলা, সমাজবিজ্ঞান, ইসলামী আন্দোলন ও মহিলা নামে পাঁচটি অধিবেশনের আয়োজন করা হয়েছে। সম্মেলনের প্রত্যেকটি অধিবেশনের জন্যে ভিন্ন ভিন্ন সভাপতিও মনোনীত করা হয়েছে। সম্মেলনে পূর্ব পাকিস্তান, পশ্চিম পাকিস্তান, পশ্চিম বঙ্গ ও ভারতের অন্যান্য জায়গার চিন্তাশীল বুদ্ধিজীবীগণ যোগদান করবেন। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানব্যাপী সম্মেলনের জোর প্রস্তুতি চলছে।

পাকিস্তানের চার বছরের ইতিহাসে এ ধরনের প্রচেষ্টা এই প্রথম। সম্মেলনের প্রচারপত্র থেকে যতদূর জনা যায়, বর্তমান দুনিয়ার আদর্শিক দ্বন্দ্বের মধ্যখানে ইসলামী আদর্শের বাস্তবায়নের প্রচেষ্টাই সম্মেলনের প্রধান উদ্দেশ্য। ইসলামী আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করতে হলে ইসলামের জীবন-পদ্ধতি ও সমাজ ব্যবস্থার যুগোপযোগী কার্যকরী রূপ সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। অন্যদিকে ইসলামী আন্দোলনকে এগিয়ে নেয়ার জন্যে ইসলামপন্থীদের সংগঠিত ও সংঘবন্ধ হওয়াও অপরিহার্য। এই দ্বিবিধ মৌলিক প্রয়োজনের তাগিদেই তমদ্দুন মজলিসের কর্মকর্তারা এগিয়ে এসেছেন। তাঁদের প্রচেষ্টা অত্যন্ত শুভ ও প্রশংসনীয়।

বর্তমান দুনিয়ার বুদ্ধিজীবী মহলে চিন্তার নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। মনীষীদের চিন্তারাজ্য থেকে মানব-জীবনের সামগ্রিক দৃষ্টিভংগি নির্বাসিত হয়েছে। ফলে সারা দুনিয়ায় মানুষের জীবনে শান্তি, সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তার পরিবর্তে হানাহানি,

রক্তারক্তি ও বিশৃঙ্খলাই স্থায়ী আসন গেড়ে বসেছে। এ বিপর্যয় অনিবার্য ধ্বংসের কবল থেকে মুক্তি পেতে হলে বলিষ্ঠ ও বৃহত্তর জীবনাদর্শের প্রয়োজন। এ সম্মেলন এমনি সামগ্রিক ও বলিষ্ঠ জীবনাদর্শের সন্ধান দেবে। এ জন্যেই সম্মেলনের উদ্যোক্তারা পূর্ববঙ্গের সংস্কৃতিবান বুদ্ধিজীবী, শিল্পী, সাহিত্যিক, ছাত্র-যুবক ও সমাজকর্মীদের সক্রিয় সহযোগিতা ও সমর্থন দাবী করেন।

সাংস্কৃতিক আন্দোলন অগ্রগতির জন্য অপরিহার্য। এই সম্মেলন পাকিস্তানে একটা সুস্থ ও সবল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের জন্ম দেবে বলেই আমরা বাসনা রাখি।

বিতর্কিকা

নতুন অধ্যায়

অন্নদাশঙ্কর রায়

দ্যুতির "বিতর্কিকা" শীর্ষক ফোরামে বিভিন্ন মতের আলোচনা-সমালোচনা পত্রস্থ করা হবে। সেই অনুসারে এবার শ্রীযুক্ত অন্নদাশংকর রায়ের "নতুন অধ্যায়" প্রকাশ করা যাচ্ছে। বলা বাহুল্য, আমরা এ নিবন্ধে প্রকাশিত অনেক মন্তব্যের সহিত একমত নই। আমরা বিশ্বাস করি, এতে প্রকাশিত অনেক মন্তব্যই ইসলাম ও মুসলিম-মন সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণাপ্রসূত। শ্রীযুক্ত রায় কর্তৃক উত্থাপিত প্রশ্নগুলো সম্বন্ধে ধারাবাহিক প্রবন্ধ মারফৎ 'দ্যুতি'তে শীঘ্রই বিস্তারিত আলোচনা শুরু হবে। –সঃ দ্যুঃ

পনেরো বছর আগে 'ভারতীয় মুসলমান' নামে আমি একটি প্রবন্ধ লিখেছিলুম। তার শেষ ভাগে ছিল–

"মুসলমানের কাছে তার সংহতি তার দেশের চেয়ে বড়। সব দেশের সব মুসলমান এক সূত্রে গ্রথিত, দেশ সে সূত্রের ছেদ নয়। সেইজন্যে একজন মুসলমান নেতা বলেছিলেন, ন্যাশনালিস্ট ও মুসলিম দু'টি স্বতোবিরুদ্ধ শব্দ। রোমান ক্যাথলিক চার্চেরও ঠিক এমনি সংহতির আদর্শ। সে আদর্শ প্রতি দেশের প্রতি রোমান ক্যাথলিক চার্চকে পোপের এক একটি ডিপার্টমেন্ট ও প্রতি রোমান ক্যাথলিককে পোপের প্রজা বানিয়েছে। এত বানানো সত্ত্বেও তাদের বৈদেশিক বানাতে পারেনি। সকলের ল্যাটিন নামকরণপূর্বক সে চেষ্টা যে হয়নি তা নয়, ল্যাটিনেই উপাসনা চলত ও তাতে আপত্তি থেকেই প্রোটেস্টান্ট মতবাদ। প্রোটেস্টান্টদের উত্থান প্রকৃতপক্ষে ন্যাশনালিজমের উত্থান। এখন ক্যাথলিকরাও সমান ন্যাশনালিস্ট। মুসলমানদের বেলায় এর ব্যতিক্রম ঘটবার হেতু নেই। তা' যে নেই তার প্রমাণ দিয়েছেন কামাল ও রিজা শাহ্। আমরা অপেক্ষা করব।"

দশ বছর আগে লিখি আর একটি প্রবন্ধ। নাম "আদিম পাপ"। তার এক জায়গায় ছিল–

"বরাবরই ভারতের মুসলমানদের মধ্যে দুটি চিন্তাধারা পাশাপাশি বয়ে আসছে। একটি আরবাভিমুখ, অপরটি ভারতাভিমুখ। আজকের দিনে একটির নাম পাকিস্তান,

অপরটির নাম নিখিল ভারত। হঠাৎ ইংরাজ বিদায় নিলে যে এ দু'টি চিন্তাধারা অভিন্ন হয়ে ভারতাভিমুখ হবে, এ ভরসা আমার নেই। আমি যতদূর দেখতে পাচ্ছি মুসলমানের দোটানা কোনদিনই ঘুচবে না। আরব ও ভারত তাকে ডান হাত ও বাম হাত ধরে টানতেই থাকবে চিরটা কাল। আরবাভিমুখ মুসলমানদের সংখ্যা কম নয়, বোধ হয় বেশীই। সংখ্যা কম হলেও প্রতিপত্তি যে বেশী সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই। সে প্রতিপত্তি যে কেবল তৃতীয় পক্ষের পৃষ্ঠপোষকতার উপর নির্ভর করে তা' নয়। সে প্রতিপত্তি নির্ভর করে ইসলামের কেন্দ্র মক্কার উপর, নামকরণের ও প্রার্থনার ভাষা আরবীর উপর, খেলাফৎ নামক সার্বভৌম আইডিয়ার উপর।"

সেই বছরই "জন্মস্বত্ব" নামে আর একটি প্রবন্ধ লিখি। তাতে ছিল–

"আজকের দিনে যারা নেশনের মেলায় নেশন নয় তাদের দাবী কেউ কানে তোলে না। এটা বুঝতে পেরে আমাদের মুসলমান নেতারা তাঁদের সাম্প্রদায়িক পরিচয় ত্যাগ করে নৈশনিক পরিচয় গ্রহণ করছেন। ছিলেন মুসলিম হতে চান পাকিস্তানী। একদিক থেকে এটা একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন। কেননা মুসলমানের মন ন্যাশনালিজমে সাড়া দেয় না সহজে। পাকিস্তানের খিড়কি দিয়ে এই যে ন্যাশনালিজম ঢুকল এর ধাককায় একদিন সাম্প্রদায়িকতা হটে যাবে। এই রকমই হয়েছে মিশরে, তুর্কীতে, ইরানে, আফগানিস্তানে। পাকিস্তান মুসলমানকে ন্যাশনালিস্ট করবে। তাতে অবশ্য ভারতের অঙ্গচ্ছেদ। ভারতীয় বলে যারা পরিচয় দেয় তারা বিনা দ্বন্দ্বে সূচ্যগ্র ভূমি ছাড়বে না। তবু স্বীকার না করে উপায় নেই যে ন্যাশনালিজমের কুইনিন খাওয়াতে গেলে পাকিস্তানের চিনি দরকার। আর ন্যাশনালিজমের চিনি না খেলে সাম্প্রদায়িকতার জ্বর সারবে না।"

এসব কথা লিখবার পর দশ বছর কেটে গেছে। কোন পক্ষই বিনা দ্বন্দ্বে সূচ্যগ্র পরিমাণ ভূমি ছাড়েনি। এখনো কাশ্মীরের ভূস্বত্ব নিয়ে বিবাদ চলছে। কেউ বলতে পারে না কবে এর নিষ্পত্তি হবে। এর দরুন যুদ্ধ বাধবে কি না বিধাতা জানেন। তবে একটা কথা ক্রমে পরিষ্কার হয়ে আসছে। এই উপমহাদেশের দুই বিচ্ছিন্ন খণ্ডে দুটি স্বতন্ত্র নেশন গড়ে উঠছে। দুই অংশেই ন্যাশনালিজমের জয়জয়কার। যে রাষ্ট্রের নাম ইন্ডিয়া তথা ভারত সে রাষ্ট্র ন্যাশনালিজমের উপর প্রতিষ্ঠিত। ত্রিশ বছর ধরে ইংরাজের সঙ্গে সংগ্রাম করা হয়েছে ন্যাশনাল কংগ্রেসের পতাকাতলে। ষাট বছর ধরে সংঘবদ্ধ হয়েছে ন্যাশনাল কংগ্রেস। প্রথম দিন থেকেই কংগ্রেসের নেতার আসনে বসেছেন মুসলমান, পার্শী, খৃস্টান। সুতরাং এই রাষ্ট্রের মূলনীতি ধর্মনিরপেক্ষ নেশনবাদ। এই রাষ্ট্র হিন্দু রাষ্ট্র নয়। হিন্দু রাষ্ট্রের আদর্শের সঙ্গে এই রাষ্ট্রের আদর্শ মেলে না বলেই হিন্দু রাষ্ট্রবাদীরা মহাত্মা গান্ধীকে হত্যা করে। এদের প্রভাব এখনো সম্পূর্ণ দূর হয়নি। কিন্তু

এবারকার নির্বাচনে এদের পরাজয় ঘটেছে। সুতরাং এ কথা বললে সত্যের অপলাপ হবে না যে ভারত রাষ্ট্রে সাম্প্রদায়িকতা পরাস্ত হচ্ছে, ধর্মনিরপেক্ষতা জয়ী হচ্ছে।

কিন্তু পাকিস্তানেও কি তাই হচ্ছে? হ্যাঁ, পাকিস্তানেও তাই হতে যাচ্ছে। পাকিস্তান থেকে যাঁরা আন্তর্জাতিক সভা-সমিতিতে যোগ দিচ্ছেন, যাঁরা রাষ্ট্রদূত হয়েছেন, যাঁরা বাণিজ্য উপলক্ষে দেশ-বিদেশ ঘুরছেন, তাঁরা পরিচয় দিতে অভ্যস্ত হচ্ছেন পাকিস্তানী ন্যাশনাল বলে। ইরানে, ইরাকে, তুর্কীতে, মিশরে, তাঁরা মুসলমান বলে পরিচয় দিলে কেউ তাঁদের দিকে ফিরে তাকাবে না, কারণ কোটি কোটি মুসলমানের মধ্যে তাঁরা এমন কিছু বিশিষ্ট নন। কিন্তু যেই তাঁরা পরিচয় দেন যে তাঁরা পাকিস্তানী অমনি তাঁরা বিশিষ্ট আসন পান। তাঁদের মর্যাদা তাঁদের নেশনের মর্যাদার উপর নির্ভর, তাঁদের ধর্মের মর্যাদার উপর নয়। তাই যদি হলো তবে প্যান ইসলামের তাৎপর্য রইল কোথায়। প্যান ইসলাম থেকেই পাকিস্তানের জন্ম, কিন্তু পাকিস্তান দিনে দিনে সাবালক হয়ে উঠছে, জননীর কোলে চিরকাল সে থাকবে না, থাকতে পারে না।

ভারতীয় মুসলমানের দোটানা এই ভাবেই মিটল। অখণ্ড মুসলমান সমাজ দু'ভাগ হয়ে গেল। এক ভাগ ভারতীয় মহাসমাজের অঙ্গ। আরেক ভাগ পাকিস্তানী মহাসমাজের অঙ্গ। মহাসমাজ হচ্ছে বহু সমাজের সমষ্টি। একটি মাত্র সমাজের সংকীর্ণ দুর্গ নয়। পাকিস্তান তার জাতীয় পতাকায় অমুসলমানদের জন্যে স্থান রেখেছে। অমুসলমানরাও পাকিস্তানী ন্যাশনাল। কেন যে তাঁদের "জিম্মী" বলা হচ্ছে তার অর্থ আমার কাছে দুর্বোধ্য। প্রত্যেক দেশেই কত লোক আছে যাদের সংখ্যা বেশী নয়, যারা মাইনরিটি। ইংলণ্ডের ক্যাথলিকরা সংখ্যায় কম, ফ্রান্সের প্রোটেস্টান্টরা সংখ্যায় কম। তা বলে কি কেউ তাদের বলে "জিম্মী"? ভারতের খৃস্টান, পার্শী, শিখদের যদি "জিম্মী" বা সেই রকম কোনো একটা শব্দে অভিহিত করা হয় তা হলে কি তাঁরা আপত্তি করবেন না? ভারতের মুসলমানরা যে আপত্তি করবেন এ বিষয়ে কি কোনো সন্দেহ থাকতে পারে? মাইনরিটি হলেই যদি মানুষ "জিম্মী" হয় তা হলে দেশের বনিয়াদে ফাটল ধরে, দেশ কোনো দিন দৃঢ় হয় না। সিরিয়াতে, মিশরে চিরকাল বহু খ্রীস্টানের বাস। যখন মুসলমান ছিল না তখনো খ্রীস্টান ছিল। এরা সেই খ্রীস্টানের বংশধর। কেউ কি তা বলে এদের "জিম্মী" মনে করে? পাকিস্তানে যে দিন মুসলমান ছিল না সেদিন হিন্দু ছিল। আজ তাদের দেশ পাকিস্তান হয়েছে বলে কি তারা "জিম্মী" হবে?

আর একটু তলিয়ে ভাবা যাক। রাষ্ট্র চলে সর্বসাধারণের ট্যাক্সে। কোনো একটি সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁর কোনো বিশেষ দায়িত্ব নেই। পুলিশ রক্ষা করতে বাধ্য প্রত্যেকটি করদাতাকে। ম্যাজিস্ট্রেট অভয় দিতে বাধ্য প্রত্যেকটি অধিবাসীকে। তাই যদি হয় তবে একদল মানুষ আরেক দল মানুষের "জিম্মী" হতে যাবে কোন দুঃখে! রাষ্ট্রই বা কেন

মাইনরিটিকে জিম্মায় রাখবে, মেজরিটিকে জিম্মায় রাখবে না? আমার মনে হয় এসব পুরাতন শব্দ অভিধানের পৃষ্ঠা থেকে আহরণ করে ব্যবহার করা হচ্ছে নতুন অধ্যায়ের মর্ম না বুঝে। এ যুগে কেউ কারো "জিম্মী" নয়। প্রত্যেকের ট্যাক্‌সে রাজ্য চলে, প্রত্যেকেরই প্রাপ্য যা কিছু অপরের প্রাপ্য। ইংলণ্ডে আজকাল নিষ্কর্মা বলে কেউ নেই। যার কাজ নেই রাষ্ট্র তাকে কাজ জোগায়। আধুনিক রাষ্ট্রের দায়িত্ব কেবল খুন জখম থেকে বাঁচানো নয়, খাইয়ে পরিয়ে লিখিয়ে পড়িয়ে কাজ জুগিয়ে সুখে-স্বচ্ছন্দে রাখা। তেমনি আধুনিক নাগরিকের দায়িত্ব রাষ্ট্রের জন্যে সর্বস্ব দিতে প্রস্তুত থাকা। "জিম্মী"র কাছ থেকে এত বড় ত্যাগ কেউ প্রত্যাশা করে কি? "জিম্মী"র জন্যেই বা কোন রাষ্ট্র কবে এসব করেছে?

পাকিস্তানের প্রধান সমস্যা এই "জিম্মী" সমস্যা। মাইনরিটিকে "জিম্মী" করে রাখলে কনস্টিটিউশনে সমান অধিকার দেয়া বৃথা। সমান অধিকার না দিলে বা এক হাতে দিয়ে আরেক হাতে কেড়ে নিলে এ যুগের মাইনরিটি চুপ করে থাকবে না, দুনিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করে জগতের জনমত মাইনরিটি সমস্যার এ জাতীয় সমাধান আদৌ সমর্থন করবে না। পাকিস্তানে যেসব হিন্দু স্মরণাতীতকাল থেকে বসবাস করে আসছেন, যাঁরা মোগলের কাছে মান সম্মান পেয়েছেন, যাঁরা ইংরাজের সঙ্গে সংগ্রাম করেছেন তাঁরা যদি সেখানে ভারতীয় ন্যাশনালিস্ট হিসাবে থাকতে চান তা হলে তাঁদের সমস্যা কেউ মেটাতে পারবে না। কিন্তু তাঁরা যদি সেখানে পাকিস্তানী ন্যাশনালিস্টরূপে নিজেদের স্থান করে নিতে রাজী হন তা হলে বিশ্ব তঁদের সহায়। ইতিহাস তাঁদের সহায়। পাকিস্তানেরই চিন্তাশীল মুসলমান তাঁদের সহায়। একদিন পাকিস্তানের কনস্টিটিউশনও তাঁদের সহায় হবে। "জিম্মী" হয়ে থাকতে হবে না তাঁদের।

ন্যাশনালিজম মুসলমানের মনে সহজে ঢোকে না। সেইজন্যে পাকিস্তানের প্রয়োজন ছিল। পাকিস্তান হওয়ার ফলে চার কোটি মুসলমান এক দিনেই ভারতীয় ন্যাশনালিস্ট হয়ে গেছেন। নয়তো এঁদের ভারতীয় ন্যাশনালিস্ট করে তুলতে আমাদের দশ বিশ বছর লাগত। বাকী ছয় কোটি মুসলমান হয়েছেন পাকিস্তানী ন্যশনালিস্ট। এটাও ইসলামের ইতিহাসে যুগ পরিবর্তনের সূচনা। এই অনুরূপ ঘটনার জন্যে যেতে হয় ইউরোপের ইতিহাসে, যেদিন প্রোটেস্টান্ট রিফরমেশন শুরু হয়। এত বড় একটা ব্যাপারের জন্যে কিছু দাম না দিলে কি চলে? দেশ বিভাগ হচ্ছে সেই দাম। এর জন্যে আমাদের মনে ক্ষোভ আছে, এ ব্যথা আমরা এ জীবনে ভুলব না। কিন্তু ব্যথা কি মুসলমানেরা কম পেলেন? এই যে তাঁদের অখণ্ড সমাজ দ্বিখণ্ড হয়ে গেল এ ব্যথা পাকিস্তানী মুসলমানদের মনে লাগছে না, কিন্তু এখানকার মুসলমানদের মনে লাগছে বৈকি! আমরা স্বভাবত অসংহত। কিন্তু তাঁরা স্বভাবত সুসংহত। তাঁদের সংহতি ভেঙ্গে

গেল তাঁদেরই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তে। অনুশোচনার জন্যে তখন সময় পাননি। এবার তার সময় আসবে।

তবে পাকিস্তান হচ্ছে সেট্‌ল্‌ড ফ্যাক্‌ট্‌। তাকে আন্‌সেটেল্‌ড্‌ করা চলবে না। একবার আমরা সেট্‌ল্‌ড্‌ ফ্যাক্টকে আনসেটেল করতে গিয়ে বোকা বনে গেছি। আরেক বার সে ভুল করব না। ভারতের ইতিহাস ও ইসলামের ইতিহাস দুই ইতিহাস পাশাপাশি কাজ করছে। এটা আমাদের মালুম ছিল না। ইসলামের ইতিহাসকে তার যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে হবে। তা যদি করি তা হলে দেখব পাকিস্তানের মাটিতে একদিন কামাল পাশার আবির্ভাব হয়েছে, তাঁর তলোয়ারের খোঁচায় এমন সব সামাজিক পরিবর্তন ঘটেছে যা আমাদের সাহসে কুলোতো না। বহু বিবাহ রদ হয়েছে, এক বিবাহ কায়েম হয়েছে, বোরখার বালাই নেই, আরবীতে নামাজ পড়া হয় না, কোরান পড়া হয় বাংলায়, মোল্লারা শোলার হ্যাট পরে, ফেজ মাথায় দিলে পুলিশে ধরে নিয়ে যায়, পীর সাহেবরা নিরুদ্দেশ। "এ নহে কাহিনী এ নহে স্বপন আসিবে সেদিন আসিবে।"

১ম বর্ষঃ ২য় সংখ্যা–চৈত্র–বৈশাখঃ ১৩৫৮

লেখার শিরোনাম	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা সংখ্যা
বিজ্ঞান (প্রবন্ধ)	ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন	৬৬–৭১
ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র ও ইসলাম (প্রবন্ধ)	অধ্যাপক হাসান জামান	৭২–৮১
আন্‌ধার মানিকের রাজকন্যা (ছোট উপন্যাস)	সানাউল্লাহ নূরী	৮৪–১২১
কান্দে কন্যা (কবিতা)	আবদুল হাই মাশরেকী	১২২–১২৩
হে কলম (কবিতা)	প্রজেশ কুমার রায়	১২৪–১২৫
পথহারা পাখী (কবিতা)	আজীজুল হক	১২৫–১২৬
বিতর্কিকা		
'নতুন অধ্যায়'–প্রসংগ	আবদুল গফুর	১২৭–১৩১
সম্পাদকের দৃষ্টিতে		

নববর্ষ

ফাল্গুনের নব কিশলয়, আমের মুকুল আমাদের চোখে আনে স্বপ্ন, মনে আনে সম্ভাবনা। সেই স্বপ্ন, সম্ভাবনা চৈত্র দিনের ঝরাপাতার পথে পথ হারায় যেন। স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথে যেন একটা বাধা ....কালের রথচক্র কিন্তু থামে না।

বৈশাখ

প্রকৃতির নবরূপ। এ রূপ সংগ্রামের, পথের বাধাকে গুঁড়িয়ে মাড়িয়ে জীবন-পথে এগিয়ে যাবার। কাল-বৈশাখী শুধুই ধ্বংসের দানবশক্তির প্রকাশ নয়, যৌবনের প্রাণশক্তির উচ্ছ্বাসও। পুরাতনের জীর্ণ নিরাশার উপর দিয়ে এ শক্তির জয়যাত্রা। ভবিষ্যৎকে সুন্দর করে গড়ে তোলার সুমহান ব্রত নিয়ে এ যৌবন অন্যায়ের বিরুদ্ধে ক্ষমাহীন সংগ্রাম করে। ভীরু নীচতার প্রশ্রয় দেয় না, দিতে জানে না। এ বৈশাখ শুধু মহাকালের একটা অংশই নয়, তার পরিচয় শুধু দিন আর মাসেই শেষ নয়। বাংলাদেশের প্রকৃতির যে স্বভাব, যে ধর্মকে দিন ও মাস নির্দেশিত করেছে– সেই ধর্মকে, সেই বিশেষ প্রকৃতিকে আমরা উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন জানাই। শ্রদ্ধা জানাই তার সুমহান ব্রতকে। অভিনন্দন জানাই এই শক্তিসংহত বাংলার যৌবনকে। তার জয়যাত্রা সফল হোক, সার্থক হোক।

প্রকৃতির শিক্ষা আমরা ভুলব না। পুরাতন আমাদের অভিজ্ঞতা দিক, ভুল-নির্দেশ করে দিক ভবিষ্যতের পৃথিবী গড়ে তোলায় বর্তমানের কর্মপ্রেরণা। যে বর্ষ গেল, তার জন্য দুঃখ নেই, যে বর্ষ এসেছে তা যেন হয় আরও সুন্দর, আরও মাধুর্যময়। শ্রদ্ধাভরে বাংলার বৈশাখ তথা নববর্ষকে স্বাগত জানাই।

রাষ্ট্রভাষার দাবী

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে এতগুলো ছাত্র ও নিরীহ জনসাধারণের রক্তদানের পরও জাতীয় পার্লামেন্ট এ প্রশ্ন সম্বন্ধে কোনো সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে আসতে পারলেন না কেন, আমাদের কাছে তা এক মহা দুর্বোধ্য ব্যাপার। বলা হচ্ছে, পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ এ ব্যাপারে একমত থাকলেও পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ এখনো এ বিষয়ে একমত হতে পারেননি যে, উর্দুর সংগে বাংলাও রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত। কিন্তু আমাদের কথা হলো, রাষ্ট্রের সাড়ে চার কোটি সংখ্যাগুরু জনসাধারণ যে এ দাবী উত্থাপন করেছে, তাই-ই কি এ দাবীর যৌক্তিকতার যথেষ্ট প্রমাণ নয়? কিন্তু আসলে কি ব্যাপার তাই? পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণও যে ক্রমেই এ দাবীর যৌক্তিকতা মেনে নিচ্ছেন তা কি একটি বাস্তব সত্য নয়? আমাদের বিশ্বাস, আদর্শ ও জাতীয় ঐক্যকে পেছনে ঠেলে দিয়ে প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক অহমিকাকে যারা একমাত্র আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছেন তারা ছাড়া আর সব মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন পশ্চিম পাকিস্তানী বাংলাকে সমর্থন করবেন। কিন্তু আমরা মনে করি–এ দাবী রাষ্ট্রের সংখ্যাগুরু অংশের, এ দাবীর যৌক্তিকতার এই বড় প্রমাণ। সংখ্যাগুরুর দাবী ততক্ষণ পর্যন্ত লঙ্ঘন করে না যতক্ষণ পর্যন্ত তা সংখ্যালঘুর আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারে আঘাত না হানে। বাংলার সাথে উর্দুর স্বীকৃতি দিয়ে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকারীরা সেদিক দিয়েও নিজেদের বিচক্ষণ সংখ্যাগুরু বলে প্রমাণ করেছেন।

সমঝোতার প্রয়োজন

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে সমঝোতার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আজকাল অনেকেই অনেক কথা বলেছেন। সরকারের এ ব্যাপারে যে বিরাট কর্তব্য ছিল তা খুব সুষ্ঠুভাবে পালিত হচ্ছে বলে আমরা বিশ্বাস করতে পারছি না। সকলেই জানেন, সাময়িক পত্র-পত্রিকা ভাবের আদান-প্রদানের অর্থাৎ সমঝোতার সেতু নির্মাণের অন্যতম প্রধান উপায়। কিন্তু পূর্বেকার এক পয়সার স্থলে সরকার বর্তমানে আট পয়সার ডাক টিকেট ব্যবহারের নির্দেশ দিয়ে পূর্ব ও পশ্চিমের সমঝোতার এ সম্ভাবনাকে চিরতরে রুদ্ধ করে দিয়েছেন। আমরা সরকারের এ আত্মধ্বংসী নীতির যৌক্তিকতা বুঝতে সত্যিই অক্ষম। সমঝোতার কথা উঠাতে আরেকটি প্রশ্নও আমাদের মনে জাগছে। সমঝোতা তো হবে, কিসের ভিত্তিতে? অর্থাৎ কোন্ পথে সত্যিকার সমঝোতা সম্ভব? শুধু উর্দু ও বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করে নিলেই অথবা কিছুদিন পরপর এ অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে 'শুভেচ্ছা মিশন' পাঠালেই কি এ সম্ভব? তা নয়। সমঝোতা আসতে পারে শুধু একটি পথে। সে হলোঃ উভয় অংশের জনসাধারণের জীবন বোধের ঐক্য প্রতিষ্ঠা। আমাদের উভয়েরই জীবনাদর্শ, চরম লক্ষ্য যে এক,আমরা যে একই জীবন-কামনায় লড়ছি, মরছি, বাঁচছি— এ কথাটা বুঝিয়ে দেওয়া আজকের দিনে বড় কথা। পাকিস্তান আন্দোলনের ইতিহাস থেকে আমরা এ ব্যাপারে দৃষ্টান্ত টানতে পারি। সেদিন পাঞ্জাবী-বাংগালী-সিন্ধী কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়তে পেরেছে। তার কারণ সেদিন সামনে আদর্শ ও লক্ষ্যের ঐক্য ছিলঃ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা। সেদিন যা সম্ভব হয়েছে আজ তা অসম্ভব মনে করবার কোনো কারণ নেই। প্রয়োজন শুধু প্রকৃত পথে অগ্রসর হওয়া। আর সকলেই জানেন, সে পথ হলো শোষণহীন ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য উভয় অংশের জনসাধারণের জীবনাদর্শের ঐক্য প্রতিষ্ঠা, জীবন-কামনার ঐক্য প্রতিষ্ঠা।

১ম বর্ষঃ ৩য় সংখ্যা-জ্যৈষ্ঠঃ ১৩৫৯

লেখার শিরোনাম	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা সংখ্যা
ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র (প্রবন্ধ)	বদরুদ্দীন উমর	১৩৩–১৩৪
ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র ও ইসলাম (প্রবন্ধ)	অধ্যাপক হাসান জামান	১৪৪–১৪৯
ইকবালের কবিতা (অনুবাদ)	ফররুখ আহমদ	১৫০–১৫৩
জাহাঙ্গীরনগরী (কবিতা)	চৌধুরী লুৎফুর রহমান	১৫৩–১৫৫
কোনো বিনিদ্রিতার প্রতি (কবিতা)	মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ	১৫৫–১৫৬
নোঙর (কবিতা)	আনোয়ারা বেগম	১৫৭-১৫৮
ইকবাল-কাব্যে কাব্য-সৌন্দর্য (প্রবন্ধ)	মোস্তফা কামাল	১৫৯-১৬৩

চাবুক (গল্প)	সৈয়দ মোকসুদ আলী	১৬৪-১৬৭
নুন খাই যার (গল্প)	আতোয়ার রহমান	১৬৮-১৭৮
রবীন্দ্রনাথ ও মানুষ (প্রবন্ধ)	মাহফুজুল হক	১৭৯-১৮৪
বিতর্কিকা		
নতুন অধ্যায়	নূরুল আফসার	১৮৫-১৮৭
মহাকবি ইকবাল ও রবীন্দ্রনাথ	গীতকারঃ ফররুখ আহমদ	১৮৮
তোমাদের স্মরণে শ্রদ্ধা জানাই	সুরঃ শেখ লুৎফুর রহমান	১৮৯-১৯১
নয়া জামাত (গান)	স্বরলিপিকারঃ অধ্যাপক এম, রইসউদ্দিন	

১ম বর্ষঃ ৪র্থ সংখ্যা–ঈদ সংখ্যা, আষাঢ়ঃ ১৩৫৯

লেখার শিরোনাম	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা সংখ্যা
নজরুল জয়ন্তী (প্রবন্ধ)	মাহবুব-উল-আলম	১৯৩–১৯৪
স্তব্ধ আগ্নেয়গিরিকে (কবিতা)	আজীজুল হক	১৯৫
সদরঘাট (কবিতা)	আজিজুর রহমান	১৯৬–১৯৭
আমার পৃথিবী জাগে (কবিতা)	আবুল খায়ের মুসলেহ উদ্দীন	১৯৮–১৯৯
যাত্রা শুরু (কবিতা)	চৌধুরী লুৎফুর রহমান	১৯৯–২০০
প্রতিকৃতি (গল্প)	মূলঃ মোপাসাঁ অনুবাদঃ মোহাম্মদ আজিজুল হক	২০১–২০৫
ঝরা ধানের কান্না (গল্প)	গোলাম আহমদ	২০৬–২১৫
ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র ও ইসলাম (প্রবন্ধ)	অধ্যাপক হাসান জামান	২১৬–২২৪
বিতর্কিকা		
'নতুন অধ্যায়" প্রসঙ্গ	মীর আবুল হোসেন	২২৫–২২৬
নজরুল ইসলাম ও রিনেসাঁস (প্রবন্ধ)	অধ্যাপক মোতাহের হোসেন চৌধুরী	২২৭–২৩৩

সম্পাদকের দৃষ্টিতে

ঈদ

বছর ঘুরে আবার ঈদ আসছে–ঈদুল ফিতর। ঈদ খুশীর পর্ব। কিন্তু এ খুশী জীবনের বল্গাহীন বিলাস-কামনা নয়— এ খুশী ভাইয়ের প্রতি ভাইয়ের জাগ্রত দায়িত্ববোধেরই মূর্ত প্রকাশ। আজকের এই ঘূণেধরা, বঞ্চনাসর্বস্ব সমাজ ব্যবস্থায় বাস করে তাই বারবার প্রশ্ন জাগছেঃ ঈদ আমাদের কতটুকু সার্থক হলো? ঈদ যে আমাদের সার্থক হয়নি তার প্রমাণঃ ঈদ হলো ভ্রাতৃত্বমূলক সমাজ পরিবেশের মূর্ত প্রতীক, আর

আমাদের সমাজে সে পরিবেশের একান্তই অভাব। তাই আজকের ঈদ আমাদের খুশীর বাণী বয়ে আনেনি– এনেছে অনাগত এক খুশীর দিনের জন্য নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের বাণী। ঈদের এ বাণী সার্থক হোক।

নজরুল ও সরকার

সারা পাকিস্তানে এবং পশ্চিম বাংলায় নজরুলের 'জন্মদিবস' প্রতিপালিত হয়ে গেলো। বিভিন্ন বেসরকারী প্রচেষ্টার সংগে সংগে সরকারের মন্ত্রী প্রভৃতিও অনেক স্থানে নজরুলের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এগিয়ে এসেছিলেন। এটা আনন্দের কথা। কিন্তু তিলে তিলে মৃত্যুপথযাত্রী কবির রোগমুক্তির দায়িত্ব যাঁরা বেমালুম ভুলে গেছে, ঘটা করে তাঁদের কবির জন্মোৎসব পালনের সত্যি কি সার্থকতা আছে– আমরা বুঝতে অক্ষম। প্রকাশ, পূর্ব-পাক সরকার কবিকে পূর্বে যে ভাতা দিতেন তা সম্প্রতি বন্ধ করে দিয়েছেন। এটা সত্য হলে আমাদের পক্ষে চরম লজ্জার কথা। তমদ্দুন মজলিস ও পরিচয় পরিষদের পক্ষ হতে কিছুদিন পূর্বে এক প্রতিনির্ধি দল প্রধানমন্ত্রীর সংগে সাক্ষাৎ করে কবির আশু সুচিকিৎসার দাবী জানিয়েছিলেন। প্রকাশ, প্রধানমন্ত্রী এ সম্পর্কে 'আশু বিবেচনার' প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রতিশ্রুতি পালনে তিনি কতদূর অগ্রসর হয়েছেন তা আমরা জানি না।

দুঃস্থ কবি-সাহিত্যিকদের প্রতি স্বাধীন সরকারের দায়িত্ব অত্যধিক। নজরুল তো বটেই— তাছাড়া মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী প্রমুখ অন্যান্য দুঃস্থ সাহিত্যিকবৃন্দ পূর্ব-পাকিস্তানের সংস্কৃতি নির্মাণে যাঁদের দান মোটেই কম নয়— সরকার তাঁদেরও উপযুক্ত সাহায্যের বন্দোবস্ত করবেন, এই-ই আমরা আশা করি।

১ম বর্ষঃ ৫ম সংখ্যা-শ্রাবণঃ ১৩৫৯

লেখার শিরোনাম	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা সংখ্যা
সমালোচনা সাহিত্য		
আধুনিক শিক্ষক	আশরাফ সিদ্দিকী	২৩৫
(রচনাঃ আবদুল হাকিম এম, এ, (ক্যান্টাব)		
আধুনিক মন (প্রবন্ধ)	আহমদ ফরিদউদ্দীন	২৩৭–২৪৪
তৌহিদবাদঃ		
বাংলা কাব্য ও নজরুল (প্রবন্ধ)	আতোয়ার রহমান	২৪৫–২৪৯
ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র ও ইসলাম (প্রবন্ধ)	অধ্যাপক হাসান জামান	২৫০–২৫৭

বিতর্কিকা

নতুন অধ্যায়	সম্পাদক কর্তৃক আলোচনার সমাপ্তি	২৫৮–২৬২
আতংক (গল্প)	সৈয়দ আতাউর রহিম	২৬৩–২৭১
ত্রিকাল (খুব ছোট গল্প)	এরশাদ হোসেন	২৭২
সবচেয়ে বড়ো কথা (কবিতা)	আবদুর রশীদ খান	২৭৩–২৭৪
কথা (কবিতা)	মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ	২৭৫–২৭৬

সমালোচনা সাহিত্য

নক্ষত্রঃ মানুষঃ মন	বদরুল মুনির	২৭৭
(আবদুর রশিদ খানের কবিতা সংকলন)		২৭৮
সম্পাদকের দৃষ্টিতে		

সাহিত্য আলোচনার ভূমিকা

সাহিত্য ব্যক্তি, সমাজদেহ ও সমাজমনের ইতিহাস। সাহিত্য পারে সমাজের নতুন মন গড়ে তুলতে, নতুন ভবিষ্যতের দ্বারোদ্‌ঘাটন করতে। সমাজের দেহও তাতে বদলায়।

সত্য ও সুন্দরের সাধনাই সাহিত্যের সাধনা। বাস্তব সমাজকে জেনে, তার ভুলত্রুটি সম্বন্ধে অবহিত হয়ে সাহিত্যিক সত্য ও সুন্দরের স্বপ্ন দেখে; সমাজকে তা জানিয়ে সত্য-সুন্দরের স্বপ্ন দেখায়।

কোন দেশের বাস্তব চিত্র যদি সে দেশের সাহিত্যে না ফোটে, যদি সেসব চিত্র হয় অনভিজ্ঞ কল্পনাশ্রিত, তাহলে সে সব চিত্র-চরিত্র মানুষের মন ছোঁয় না, সাহিত্যিকেরও মন ছোঁয় না। কারণ মিথ্যার উপর ভিত্তি করেই সেগুলো রচিত যার জন্য মানুষের কোন দরদ নেই তার শুভাশুভের কোন বালাইও তাদের থাকতে পারে না। তাই কাল্পনিক সাহিত্য মরে যেতে বাধ্য।

সাহিত্যের জন্য এই যে বাস্তবতা, যার ওপর ভিত্তি করে রচিত হবে মানুষের কান্নাহাসির ইতিহাস, তাকে বস্তুর মত ধরা-ছোঁয়া যায় না, তাকে উপলব্ধি করা যায়, বোঝা যায়। এই জন্য চাই গভীর ও খাঁটি অন্তর্দৃষ্টি। এই অন্তর্দৃষ্টি যার যত গভীর ও সত্য, তিনিই তত বড় সমাজহিতৈষী সাহিত্যিক। তাঁর সাহিত্যকে মানুষ আপন করে নেবে, তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের কান্নাহাসির সঙ্গে তারাও কাঁদবে, হাসবে, বুঝতে পারবে কোথায় তারা রয়েছে, কি অবস্থায়, কোন্ ব্যবস্থায়। আর তখনই তারা প্রয়োজনে সত্য ও সুন্দরের সন্ধান করবে। সাহিত্যিকই তাদের দেবেন সে সন্ধান। বাস্তবের

পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর নতুনের ইংগিত-মধুর সাহিত্য মানুষের চোখে আনবে স্বপ্ন, মনে দেবে অদম্য আকাংক্ষা। মিলিত পদক্ষেপে দেশবাসী এগিয়ে যাবে। পাকিস্তান অর্জনের পর সমাজের সকল দিকে পরিবর্তন এসেছে— তা যে রকম পরিবর্তনই হোক। পাকিস্তানের সাহিত্যিক দেশবাসীর কান্নাহাসির ইতিহাস রচনা করে চলেছেন। সে সাহিত্য, সে ইতিহাস কতটুকু সত্য, কতটুকু বাস্তব, কতটুকু সার্থক, তা জানবার সময় এসেছে। দেশের সুধীবৃন্দ এ সম্বন্ধে অবহিত হোন, তাঁরা বুঝে দেখুন বর্তমান সাহিত্যের গতিধারা কোন্‌দিকে, তাঁদের শুভাশুভ তাঁরা স্থির করুন। 'দ্যুতি'তে আমরা এ আলোচনারই ব্যবস্থা করছি। কিন্তু এর জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজন খাঁটি নিরপেক্ষ বিচার ক্ষমতা, সুষ্ঠু সমালোচনা। এ আলোচনায় সকল পথের, সকল মতের দরদী ভাই-বোনদের সমান অধিকার।

নতুন অধ্যায়

['নতুন অধ্যায়' শীর্ষক বিতর্কিকা শ্রদ্ধেয় অন্নদা শংকর রায় দ্যুতির প্রথম সংখ্যায় আরম্ভ করিয়াছিলেন– তাহা লইয়া গত তিন সংখ্যায় আলোচনা হইয়া গিয়াছে। এই সংখ্যায় ইহার সমাপ্তি হইল। আমরা নিম্নে ইহার পর্যালোচনা পত্রস্থ করিলাম।

আগামী সংখ্যা হইতে নতুন বিতর্কিকা আরম্ভ হইবে। বিষয় নির্ধারিত হইয়াছে– "আধুনিক বাংলা সাহিত্যের রূপ"। আধুনিক বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে নানা জনের নানা মত ব্যক্ত হইতেছে। একদল বলিতেছেন–ইহা 'শ্রেষ্ঠ রূপ' গ্রহণ করিয়াছে, ইহার পূর্বে যাহা ছিল তাহা প্রায়ই বাজে। আবার অন্যদল বলিতেছেন–সাহিত্যকে যখন-তখন প্রচারের বাহন করিয়া ইহাকে অতি নিম্নস্তরে আনা হইয়াছে। গল্প ও কবিতা বস্তুবাদী প্রচার-ধর্মীভাব এইগুলিকে দুর্বোধ্য, অপাঠ্য ও অত্যন্ত অস্থায়ী করিয়া তুলিয়াছে। এ সম্বন্ধে আমরা সাহিত্যিক ও সাহিত্যামোদীদের সুচিন্তিত অভিমত আহ্বান করিতেছি। –সম্পাদক]

অন্নদা বাবুর লেখার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হইল-পাকিস্তান হওয়ার পর মুসলমানেরা ক্রমশ জাতীয়তাবাদী হইয়া উঠিবেন। তিনি তাঁর আলোচনায় তুরস্ক প্রভৃতি দেশের দৃষ্টান্ত দিয়া ইহা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

প্রসংগত তিনি পাকিস্তানের 'জিম্মী' সমস্যার কথা উল্লেখ করিয়াছেন— এবং উহাকে 'পাকিস্তানের প্রধান সমস্যা' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধে তিনি কয়েকটি সুন্দর কথা বলিয়াছেন "পাকিস্তান হচ্ছে সেট্‌ল্‌ড্ ফ্যাক্ট, তাকে আনসেট্‌ল্‌ড্ করা চলবে না"।

"ভারতের ইতিহাস ও ইসলামের ইতিহাস পাশাপাশি কাজ করছ। এটা আমাদের মালুম ছিল না। ইসলামের ইতিহাসকে তার যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে হবে।"

* * * * *

জনাব আবদুল গফুর সাহেব অন্নদা বাবুর প্রবন্ধের সমালোচনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন–ভৌগোলিক সীমাকে কেন্দ্র করিয়া যে জাতীয়তাবাদ তাহা মানব সমাজকে সংকীর্ণতা শিক্ষা দিয়াছে। ফল হইয়াছে এক জাতি কর্তৃক অন্য জাতির স্বাধীনতা হরণ ও শোষণ। তাঁহার মতে একটি মহান আদর্শের ভিত্তিতে মানব সমাজের একত্র হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই। ফ্রান্সের কমিউনিস্ট ও ভারতের কমিউনিস্টদের মধ্যে যে আদর্শগত ঐক্যবোধ রহিয়াছে তাহাই ভৌগোলিক জাতীয়তার মূলে কুঠার হানিয়াছে।

তিনি আরো বলিয়াছেন— প্রকৃত ধর্ম সে ইসলাম হউক আর হিন্দু ধর্মই হউক তাহা তথাকথিত সাম্প্রদায়িকতা— বিরোধী। ভারতের সাম্প্রদায়িকতাকে একজন প্রকৃত হিন্দু-নেতা গান্ধিজীই বাধা দিতে গিয়া প্রাণ হারাইয়াছেন।

তৃতীয় আলোচনাকারী জনাব নুরুল আফছার সাহেব গফুর সাহেবের বক্তব্যের সমালোচনায় বলিয়াছেন-বিশ্বাসের উপর জাতীয়তা গড়িয়া উঠিতে পারে না, সাধারণ স্বার্থবোধের দ্বারাই তাহা সম্ভব। তিনি বলেন–"সহজ কথায় ইন্দোনেশীয়রা ইন্দোনেশিয়ার মসজিদে বসে, মিশরীয়রা মিশরে বসে, পাকিস্তানীরা পাকিস্তানের কোন মসজিদে বসে আল্লার ধ্যান ধারণা করবেন, এর জন্য সবাইকে মিলে এক রাষ্ট্র তৈরী করতে হবে–এমন একটি বিশ্বাস সৃষ্টি কি একান্তই প্রয়োজন বা সম্ভব?"

চতুর্থ আলোচনাকারী মীর আবুল হোসেন সাহেব তাঁহার সংক্ষিপ্ত আলোচনায় অধিকতর অনিরপেক্ষতার সহিত তাঁহার বক্তব্য পেশ করিয়াছেন।

পঞ্চম আলোচনাকারী ওমর কোরায়শীর লেখা মাত্র সেদিন আমাদের হস্তগত হইয়াছে। স্থানাভাবে তাহা ছাপানো সম্ভব হয় নাই।

আলোচনা

অন্নদাবাবু বলিয়াছেন–পাকিস্তান হওয়ার পর মুসলমানরা জাতীয়তাবাদী হইয়া পড়িবেন। এ কথায় সত্য আছে।

পৃথিবীতে আজ জাতীয়তাবাদের জয়-জয়কার চলিয়াছে– স্ব স্ব দেশকে বিপদমুক্ত করার বা অপর দেশের ক্ষতি করিয়া হইলেও নিজের দেশকে সমৃদ্ধ করার একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা অবাধ গতিতে চলিয়া আসিতেছে। এই অবস্থায় পাকিস্তানের মুসলমানরাও যে অধিকতর পাকিস্তানী হইয়া পড়িবেন তাহাতে আশ্চর্যের বিষয় কিছুই নাই।

কিন্তু একথার অর্থ এই নয় যে— পাকিস্তানের (এমনকি ভারতেরও বলি না কেন) মুসলমানরা আদর্শগতভাবে অন্য দেশের মুসলমানদের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করিবে না (পাকিস্তানের হিন্দুদের প্রতিও একথা প্রযোজ্য)। তিউনিসিয়া, মরক্কো, ইরান, মিশর প্রভৃতি দেশে যে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও অত্যাচার চলিতেছে— তজ্জন্য ভারত, চীন

প্রভৃতি দেশের চাইতে যে পাকিস্তানের জনসাধারণ বেশী আন্দোলন করিয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অন্নদাবাবুর ভাষায় "ভারতের ইতিহাস ও ইসলামের ইতিহাস পাশাপাশি কাজ করছে"–এখানেও পাকিস্তানের ইতিহাস ও ইসলামের ইতিহাস পাশাপাশি কাজ করিবে।

জাতীয়তাবাদ পৃথিবীর বহু সংঘর্ষ ও শোষণের জন্য দায়ী বলিয়া গফুর সাহেব যে মন্তব্য করিয়াছেন– তাহার যৌক্তিকতা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু তিনি "পাকিস্তানেও ইসলামের দিন ফুরিয়ে আসল" একথা অন্নদাবাবু বলিয়াছেন বলিয়া যে মন্তব্য করিয়াছেন— তাহা ঠিক নয়। অন্নদাবাবু তাঁহার প্রবন্ধের কোথাও ইহা বলেন নাই। গফুর সাহেব এখানে মারাত্মক ভুল করিয়াছেন বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

অন্নদাবাবু তুরস্কের দৃষ্টান্ত দিয়া শুধু বলিতে চাহিয়াছেন— পাকিস্তান হইতে ধর্মীয় কুসংস্কার ও তথাকথিত গোঁড়ামীই বিলুপ্ত হইবে। এই বিলুপ্তি তো প্রত্যেক খাঁটী মুসলমানই মনে প্রাণে কামনা করে। কারণ ইসলামই কুসংস্কারের ঘোর বিরোধী।

নূরুল আফছার সাহেব যে বলিয়াছেন "জাতীয়তার প্রধান ভিত্তি সাধারণ স্বার্থবোধ আর তা বেশীর ভাগই ভৌগোলিক সীমারেখার উপর নির্ভরশীল"–একথা অস্বীকার করিবে কে? কিন্তু এই জাতীয়তাই আমাদের আদর্শ হওয়া কেন উচিত তাহা তিনি বলেন নাই। তিনি আর একটি ভুল করিয়াছেন– ইসলামকে শুধু 'আল্লার ধ্যান ধারণা' বলিয়া ধরিয়া নিয়াছেন। ইসলাম কিন্তু তা নয়। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক প্রভৃতি মানুষের সব সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান পদ্ধতিই ইসলাম। কোরাণকে যাঁহারা নিরপেক্ষ দৃষ্টিভংগীতে পড়িয়াছেন তাঁহারা প্রত্যেকেই ইহা স্বীকার করিবেন।

জিম্মী সমস্যাকে যে পাকিস্তানের বড় সমস্যা বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে আমাদের মতে তাহা ঠিক হয় নাই। পাকিস্তানের আইনে মুসলমানদের মতই সংখ্যালঘুরা সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেন। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ দূর করার জন্য এখানের সরকার ভারত সরকার হইতে কম আগ্রহশীল একথা নিশ্চয়ই বলা যায় না। তবু অন্নদা বাবু জিম্মী সমস্যাই পাকিস্তানের প্রধান সমস্যা বলিয়া ইহাকে এতো গুরুত্বপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছেন কেন তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না।

জিম্মী ঐতিহাসিক শব্দ। সেই সুদূর অতীতকালে যে সমস্ত লোক মুসলমানদের সংগে সব সময় শত্রুতা করিয়া কিংবা যুদ্ধ করিয়া পরাজিত হইত তাহারা যাহাতে কোনও মতে বিজয়ীদের হাতে অত্যাচারিত না হয় তজ্জন্য এই শব্দের প্রচলন হইয়াছিল। ইহা তখন অত্যন্ত সম্মানজনক শব্দ হিসাবেই ব্যবহৃত হইত এবং যাহারা জিম্মীরূপে পরিগণিত হইতেন তাহারা তজ্জন্য নিজেদের খুবই নিরাপদ ও সৌভাগ্যশালী মনে করিতেন। এই বিংশ শতাব্দীতেও বিভিন্ন রাষ্ট্রে সংখ্যাগুরু জাতির

মত বিজেতাদের হাতে কনসেনট্রেশন ক্যাম্প, Forced labour সম্প্রদায়িক দাংগা প্রভৃতি মারফত যে অমানুষিক ব্যবহার পায়-তাহার সঙ্গে তুলনা করিলে জিম্মী ব্যবস্থা যে কত মানবীয় ও উন্নত ব্যবস্থা ছিল তাহার ইংগিতই যথেষ্ট।

মানুষের মনোবৃত্তির সংগে আমরা সম্যক পরিচিত নই বলিয়াই আমরা জিম্মী শব্দ লইয়া ভুল ধারণা পোষণ করিতেছি। মনে রাখিতে হইবে— রাষ্ট্র সব সময় পুলিশী শক্তি দ্বারা দুর্বলদের রক্ষা করিতে পারে না। আর পারে না বলিয়াই ভারত-পাকিস্তান এবং অন্যান্য দেশের সংখ্যালঘুরা (সে রাজনৈতিক সংখ্যালঘুই হউন কিংবা ধর্মীয়ই হউন) সরকারের শত সদিচ্ছা ও প্রচেষ্টা সত্ত্বেও দাংগা ও মৃত্যু হইতে রক্ষা পায় নাই। অন্নদা বাবু বলিয়াছেন, সংখ্যালঘুরাও রাষ্ট্রের নাগরিক। সুতরাং তাহাদের রক্ষা করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। কথাটা সত্য, কিন্তু আংশিক। নাগরিকদের সহযোগিতা যদি রাষ্ট্র না পায়-তাহা হইলে রাষ্ট্র সংখ্যালঘুদের সব সময় রক্ষা করিতে পারে না। এ অবস্থায় নিরাপত্তার বড় উপায় হইল সংখ্যালঘুদের প্রতি কর্তব্য বোধ জাগানো। পুলিশী শক্তি দ্বারা রাষ্ট্র যাহা পারে নাই গান্ধিজী সংখ্যাগুরুদের মনে সংখ্যালঘুদের প্রতি কর্তব্য বোধ জাগাইয়া তাহা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; পাকিস্তানে আলতাফ হোসেন আর ভারতে গান্ধিজী যে প্রাণ হারাইলেন তাহা এই কর্তব্য বোধে উদ্‌বুদ্ধ হইয়াই। এই কর্তব্য বোধই জিম্মী বোধের মূল কথা। রাজনৈতিক বা ধর্মীয় বিপ্লবের সময়ে যখন এমন একটা ভাবপ্রবণতার (Emotion) সৃষ্টি হয় যে সংখ্যালঘুরা রাষ্ট্রশক্তির সাহায্য সত্ত্বেও নিরাপদ মনে করেন না। তখন মানবতাবোধ বা কর্তব্যবোধই প্রধান রক্ষাকবচ। জার্মানীতে নাৎসীদের যদি কম্যুনিস্টদের প্রতি, আমেরিকায় সাদা আদমীদের যদি নিগ্রোদের প্রতি এবং রাশিয়াতে কম্যুনিস্টদের যদি ট্রটস্কাইটস বা অন্যান্যদের প্রতি কর্তব্যবোধ থাকিত, আর বর্মা সিংহলের ভারতীয়দের প্রতি বার্মিজ বা সিংহলীদের এবং ভারত-পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের প্রতি যদি সংখ্যাগুরুদের দায়িত্ববোধ ভালোভাবে উজ্জীবিত থাকিত, তাহা হইল এইসব দেশে সংখ্যালঘুদের মৃত্যু-বিভীষিকা কিছুতেই নারকীয় রূপ ধারণ করিতে পারিত না। অতএব জিম্মী-ধারণা অত্যন্ত প্রগতিশীল, এবং মানবতাবোধের জন্য একান্ত অপরিহার্য।

এখানে একথাও বলা দরকার যে জিম্মী-ধারণা সব সময়ের ধারণা নয়, ইহা নিতান্তই সাময়িক (Emergency)। নিরাপদ সময়ে জিম্মী-কথাটাই অবান্তর। যখনই গণ-ভাবপ্রবণতা (Mass sentiment) রাষ্ট্রনৈতিক বা অন্য কারণে মানুষকে পশুর স্তরে লইয়া যায়, তখন কর্তব্যবোধ জাগানোর একান্ত অপরিহার্যতা দেখা দেয়। পাক-ভারতে লক্ষ লক্ষ হিন্দু-মুসলমান যাহারা সংখ্যাগুরুদের হাতে মানবীয় আশ্রয় পাইয়াছে তাহা এই বোধ হইতেই, সরকারী পুলিশী শক্তির দ্বারা নয়। ইহার শুভ উন্মেষ যদি

সর্বত্র সম্ভব হইত তাহা হইলে পৃথিবীতে অত্যাচার-অবিচার বলিয়া কিছুই থাকিত না। এমন কি দিল্লীতে সেদিন (জুন, ৫২) মুসলমান তরুণ ও হিন্দু তরুণীর বিবাহকে কেন্দ্র করিয়া যে হাংগামা ও রক্তারক্তি হইয়া গেল কর্তব্যবোধ জাগ্রত থাকিলে তাহাও সম্ভবপর হইত না।

'নতুন' অধ্যায়ে প্রধানত জাতীয়তাবাদের প্রশ্নই আলোচিত হইয়াছে। জাতীয়তাবাদই যে আমাদের আদর্শ হওয়া উচিত একথা জোর করিয়া বলা চলে না। ইংলণ্ডের কিংবা ভারতের কম্যুনিস্টরা ইংলণ্ডের গভর্নমেণ্ট বা ভারতীয় গভর্নমেন্টের চাইতে রাশিয়ান গভর্নমেন্টকে বেশী পছন্দ করে। ইহা জাতীয়তার পরিপন্থী।

মুসলমানদের প্রতিও একথা প্রযোজ্য, আদর্শ দ্বারা যে ভৌগোলিক সীমা ভাঙিয়া বিভিন্ন দেশের লোকের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা যায় তাহাও অস্বীকার করা যায় না। সমস্ত মানুষ ভাই ভাই, মানব সমাজ এক জাতি'—এই মহান নীতির দিকেই আজ মানব সমাজ আগাইয়া চলিয়াছে। শোষণ, অত্যাচার ও সংঘর্ষ হইতে মানব সমাজকে মুক্ত করিতে চাহিলে ইহা ছাড়া গত্যন্তর নাই। পৃথিবীতে এক গভর্নমেন্ট স্থাপন আজ আর বিলাস-স্বপ্ন নয়। হিংসা-দ্বেষহীন মানবতার মহান আদর্শকে কেন্দ্র করিয়াই আমরা সেই লক্ষ্যে পৌঁছাইতে পারি। পাকিস্তানের নতুন অধ্যায়ে যেন এই লক্ষ্যে পৌঁছার প্রচেষ্টা হয় ইহাই আমাদের কামনা।

১ম বর্ষঃ ৬ষ্ঠ সংখ্যা-ভাদ্রঃ ১৩৫৯

লেখার শিরোনাম	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা সংখ্যা
ইতিহাসের ধারা (প্রবন্ধ)	অধ্যাপক মোহাম্মদ আজরফ	২৮১–৩০১
দুরন্ত ঢেউ (নাটিকা)	আসকার ইবনে শাইখ	৩০৩–৩১৭
দৃষ্টি (গল্প)	আবদুর রহমান	৩১৮–৩২৪
ওই আকাশে ঃ তেপান্তরে (কবিতা)	আশরাফ সিদ্দিকী	৩২৫–৩২৬
পদাবলী ঃ সংস্কৃতি বিষয়ক (ব্যঙ্গ কবিতা)	হায়াত দারাজ খান পাকিস্তানী	৩২৭–৩২৮
পল্লী-গীতি	রওশন ইজদানী	৩২৯
সম্পাদকের দৃষ্টিতে		৩৩০–৩৩১

আজাদীর দিনে

আজাদীর ষষ্ঠ বার্ষিকীর আনন্দোৎসবে যোগ দিতে গিয়ে আজ মনে পড়ছে পাঁচ বছর আগের সেই সাতচল্লিশের আনন্দোৎসবের কথা। সেদিন আর এদিন–অনেক তফাৎ। সাতচল্লিশের ১৪ই আগস্ট রাত বারোটায় ওপারে ছিল গোলামী, এপারে

আজাদী; ওপারের আকাশ দুর্ভাগ্যের কালোমেঘে ঢাকা, এপারের আকাশ নির্মেঘ, সুনীল, অসীম। নতুনের স্বপ্নে জীবনের গানে মন ছিল মুখর। মহানন্দে উল্লসিত কণ্ঠে সেদিন ধ্বনিত হয়েছিল ঃ পাকিস্তান জিন্দাবাদ। '৫২-এর সেই রাতে বারোটায় ওপারেও আজাদী এপারেও আজাদী। কিন্তু কই, আজাদ মানুষের দৃপ্ত জয়োল্লাসে দেশের আকাশ বাতাস ভরে উঠছে না তো!

এ শুভ মুহূর্ত শুধু স্মরণ করিয়ে দেয়, এমনি সময়ে আমরা আজাদ হয়েছিলাম, স্বপ্ন দেখেছিলাম নতুন দেশের, নতুন জগতের।

সে দেশ পেয়েছি?

উত্তর দিতে মন মুষড়ে পড়ে।

দেশবাসীর প্রায় কোন সমস্যাই তো মিটল না। স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠল না আজাদীর আনন্দ প্রতি ঘরে ঘরে। গাঁয়ের চাষী আজও তেমনি রোগ জর্জর-অনাবৃত দেহে, পেটের ক্ষুধা পেটে নিয়ে প্রধানীর ক্ষেতে দিনমান কাজ করে; খড়ের ফুটো চালের নীচে বসে রুগ্ন শিশুকে বুকে চেপে তেমনিভাবে রাত কাটায় কিষাণ বৌ! কেরানীর ঘরে চাল ডালের অভিযোগ আজও শেষ হল না, শেষ হল না দরিদ্র শিক্ষকের আকুল ফরিয়াদ।

স্বপ্নমাখা সুখের দিন!

সুখের সেদিন কি আসবে না?

বীর তরুণ বুকের তাজা খুনে সেদিন লিখে গেছেঃ আসবে। যে নির্ঝরের স্বপ্ন ভেঙ্গেছে, সেকি আর আঁধার গুহায় আটকে থাকতে পারে? কোন বাধা কি তাকে আটকে রাখতে পারে? পারে না।

যৌবন আজ জাগ্রত, পথের বাধাকে সে জয় করবেই, পৌঁছবেই তার স্থির লক্ষ্যে, সেই স্বপ্নের দেশে।

আজও অভিযাত্রীর সম্মুখে 'দুর্গম গিরি, কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার।' দেশের সাহিত্যিক নতুন পথের দিশারী। পথ দেখানোর সুমহান কর্তব্য তাঁদের উপর ন্যস্ত। রাত্রির কালো বুকে আলোর জোয়ার এনে তাঁরা পারেন জাতির ভাগ্যাকাশকে আলোকোদ্ভাসিত করতে।

বাংলার সাহিত্যিক বহুদিন সাধনা করে আসছেন, সে সাধনা বন্ধনমুক্তির। সর্বদিকের বন্ধন থেকে জাতিকে মুক্ত করবার জন্য এই যে সাধনা, আজাদী লাভের পরও এর শেষ হয়নি। এ সাধনা চলছে, চলবে। যতদিন 'উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে' ধ্বনিত হতে থাকবে, 'অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণভূমে' রণিত হবে, ততদিন পাকিস্তানের দরদী সাহিত্যিকবৃন্দ তাঁদের সাধনা পালন করে যাবেন। আঁধার ঘেরা, স্বপ্নভাঙ্গা আজাদীর ষষ্ঠ বার্ষিকীর পবিত্র মুহূর্তে এই আমাদের স্থির ও দৃঢ় সংকল্প।

তাঁদের কথা আজ মনে পড়ছে, যাঁরা বিদেশীর কবল মুক্তির সংগ্রামে প্রাণ দিয়েছেন, যাঁরা সত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে শহীদ হয়েছেন, যাঁরা জাতির দাবী জানাতে গিয়ে হাসিমুখে মরণকে বরণ করছেন। তাঁদের সকলের পবিত্র স্মরণে আজ সসম্ভ্রমে শ্রদ্ধা জানাই। এই শুভক্ষণে কামনা করিঃ তাঁদের আশা যেন সফল হয়, তাঁদের আদর্শ যেন সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়।

লেখার শিরোনাম	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা সংখ্যা
আপনার চিঠি থেকে	অন্নদাশঙ্কর রায়	৩৩২

সবিনয় নিবেদন,

সম্পাদক সাহেব, ‘দ্যুতি’ নিয়মিত পাচ্ছি। গল্পগুলির তারিফ করছি। প্রবন্ধগুলিও উচ্চাঙ্গের হচ্ছে। আপনারা আমার অভিনন্দন গ্রহণ করুন। হিন্দু-মুসলমানদের কথা, ভারত-পাকিস্তানের কথা আমার দিবা-রাত্রির ভাবনা। কিন্তু ভাবনাকে আর দশজনের কাছে হাজির করা খুব কঠিন কাজ। পূজার পরে আমি আবার এ বিষয়ে লিখতে বসব। আপাততঃ অন্য কয়েকটি লেখা শেষ করতে হবে। আমার আদাব জানবেন।

বিনীত–

অন্নদাশঙ্কর রায়

১ম বর্ষঃ ৭ম সংখ্যা, আশ্বিনঃ ১৩৫৯

লেখার শিরোনাম	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা সংখ্যা
বিদ্রোহী পদ্মা (নাটক)	আসকার ইবনে শাইখ	৩৩৩–৩৪৮
তৌহিদবাদ ঃ বাংলা কাব্য ও নজরুল (প্রবন্ধ)	আতোয়ার রহমান	৩৪৯–৩৫৯
মানুষ (গল্প)	প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁ	৩৬০–৩৬৭
সাহিত্যের নবজন্ম (প্রবন্ধ)	অধ্যাঃ সৈয়দ বদরুল হুসেন	৩৬৮–৩৭১
বিতর্কিকা		
আধুনিক সাহিত্য	কাজী ফজলুর রহমান	৩৭২–৩৭৬
তাদের ভুলে যেয়ো না (কবিতা)	প্রজেশ কুমার রায়	৩৭৭
শহরে সন্ধ্যা (কবিতা)	মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ	৩৭৮–৩৭৯
সম্পাদকের দৃষ্টিতে		৩৮০

১ম বর্ষঃ ৮ম সংখ্যা-কার্তিকঃ ১৩৫৯

লেখার শিরোনাম	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা সংখ্যা
বার্নাড শ' (প্রবন্ধ)	ভবেশ মুখোপাধ্যায়	৩৮১-৩৮৫
একটি জীবন (গল্প)	মুযহারুল ইসলাম	৩৮৬-৩৯১
স্বগত (কবিতা)	চৌধুরী লুৎফর রহমান	৩৯২-৩৯৪
সৈনিকের গান (কবিতা)	এ, এস, এম, আবদুল জলীল	৩৯৫
ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র ও ইসলাম (প্রবন্ধ)	অধ্যাপক হাসান জামান	৩৯৬-৪০৩
অনুরণন (গল্প)	মোজাম্মেল সিদ্দিক	৪০৪-৪০৮
বিদ্রোহী পদ্মা (নাটক)	আসকার ইবনে শাইখ	৪০৯-৪২০
দ্যুতি (কবিতা)	প্রজেশ কুমার রায়	৪২১
সম্পাদকের দৃষ্টিতে		৪২২

ইসলামী সাংস্কৃতিক সম্মেলন

গত ১৭, ১৮, ১৯ ও ২০ অক্টোবর ঢাকার কার্জন হলে অভূতপূর্ব সাফল্যের মধ্য দিয়ে পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিস কর্তৃক আয়োজিত 'ইসলামী সাংস্কৃতিক সম্মেলন' হয়ে গেল। এই সাংস্কৃতিক সম্মেলনে বিদেশ থেকে যে সব প্রতিনিধি ও মনীষীবৃন্দ যোগদান করেছিলেন তাঁদের মধ্যে সিরিয়ার আহমদ বিন আহমদ লাহোরের 'তামীম' পত্রিকার সম্পাদক জনাব নসরুল্লাহ খান আজিজ, পাকিস্তানের বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ জনাব মজহার উদ্দিন সিদ্দিকী ও লন্ডনের ওকিং মসজিদের প্রাক্তন ইমাম জনাব আফতাবুদ্দিনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দূর-দূরান্ত থেকে যাঁরা পূর্ব পাকিস্তানের মাটিতে পদার্পণ করেছিলেন তাঁদের ছাড়াও এ দেশের আনাচ-কানাচ থেকে ইসলামী সাংস্কৃতিক সম্মেলনের আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন অসংখ্য শিল্পী, সাহিত্যিক, কর্মী ও চিন্তাবিদ। এই সম্মেলনের চার দিবসব্যাপী অধিবেশন শুধু পাকিস্তানের নয়, প্রাচ্যের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় ও অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ।

ইসলামিক সাংস্কৃতিক সম্মেলন সত্যই সাংস্কৃতিক জগতে একটি সুদূরপ্রসারী আলোড়নের সৃষ্টি করেছে। যে আদর্শকে কেন্দ্র করে পাকিস্তান আন্দোলনের সৃষ্টি, যার জন্য লক্ষ লক্ষ পাক-ভারতের আদম সন্তান মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছে-তাঁর সম্বন্ধে এমন বিজ্ঞান-নির্ভর সুষ্ঠু ধারণা আর কোন অনুষ্ঠান দিতে পারেনি। অজ্ঞতা, স্বার্থান্ধতা এবং পাশ্চাত্যের অন্ধানুকরণপ্রিয়তা যেভাবে আমাদের পংগু করে রেখেছে-যেভাবে মানবের স্বভাব-ধর্ম ইসলামকে বিকৃতভাবে পরিবেশন করে সন্দেহ ও অবিশ্বাসের ধূম্রজালের সৃষ্টি হয়েছে- তার বিদূরণের জন্য এমন একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছিল।

অতীতে অনেক সাংস্কৃতিক সম্মেলনে যোগদান করার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে। প্রায় সবটাতেই দেখেছি সাংস্কৃতিক পরিবেশ সৃষ্টির চাইতে ধনীদের ও পদ-প্রার্থীদের প্রদর্শনীর মহড়া, অর্থব্যয়ের আড়ম্বর-চাঞ্চল্য এবং হৃদয়ের চাইতে মস্তিষ্কের বাড়াবাড়ি। আর এই সম্মেলন আমাদের শিক্ষা দিয়েছে কিভাবে একদল দরিদ্র নিঃস্বার্থ কর্মী দিনরাত পদ-আরাম-আয়াস হারাম করে সর্বনিম্ন ব্যয়ে একটা বিরাট সাফল্যের অধিকারী হতে পারে।

চারদিনব্যাপী এতগুলি শাখা, এতগুলি অধিবেশন অন্য কোন সাংস্কৃতিক সম্মেলনে অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। সাহিত্য, লোকসংস্কৃতি, সমাজবিজ্ঞান, ইসলামী আন্দোলন, মহিলা অধিবেশন, প্রকাশ্য সম্মেলন, প্রতিনিধি সম্মেলন, কর্মী সম্মেলন, মফস্বলের কবি-জারী-বাউল-গাজী প্রভৃতি লোক-সংস্কৃতির অপূর্ব অনুষ্ঠান প্রায় প্রতিদিন সকাল আটটা থেকে রাত্রি বারটা পর্যন্ত একই সময়ে একাধিক অধিবেশন-সত্যি অপূর্ব। এর অভিভাষণগুলিও অপূর্ব এবং অসাধারণ। প্রায় চল্লিশটি অভিভাষণের মধ্যে যে ২০টি অভিভাষণ ছাপা হয়েছে দু'একটি বাদ দিলে তার সব কয়টিই মননশীলতায়, যুক্তিবিজ্ঞানে ও সমস্যা-সমাধানের ইংগিতে সম্পদশালী।

'যেন তেন প্রকারেণ' অভিভাষণ দিয়ে নাম জাহির করার প্রচলিত রেওয়াজ-এর একটিতেও নেই। সর্বপ্রকারের মিথ্যা আবর্জনা দূরীভূত করে আমাদের বর্তমান বিভ্রান্তিকর পরিবেশ থেকে মুক্ত করে একটি সুষ্ঠু ও সুন্দর মহৎ পথ প্রদর্শনের মহান ব্রতই অনুষ্ঠান ও অভিভাষণগুলির প্রতিটি ধাপে ও ছত্রে প্রকাশ পেয়েছে।

আমরা এই মহান সম্মেলনের কর্মীদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। রাজনৈতিক স্বার্থোদ্ধারের জন্য অজস্র অর্থ ব্যয়ে বিষাক্ত পরিবেশ সৃষ্টি না করে এ রকম সুষ্ঠু সুন্দর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান যত বেশী হয় ততই আমাদের জন্য মঙ্গল।

১ম বর্ষঃ ৯ম সংখ্যা-অগ্রহায়ণঃ ১৩৫৯

লেখার শিরোনাম	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা সংখ্যা
পূর্ব-পাকিস্তানের আধুনিক কাব্য সাহিত্য (প্রবন্ধ)	আবদুর রশীদ খান	৪২৫–৪৩১
সমসাময়িক ইসলামী চিন্তাধারা (প্রবন্ধ)	আহমদ ফরিদ উদ্দিন	৪৩২–৪৩৬
মোনালিসা (গল্প)	সৈয়দ মোকসুদ আলী	৪৩৭–৪৪১
নয়া খিলাফত (গান)	ফররুখ আহমদ	৪৪২–৪৪৩
এলো ঐ ইসলামী বিপ্লব (গান)	মফিজ উদ্দিন আহমদ	৪৪৩–৪৪৪
সূর্য-সারথি (কবিতা)	আবুল খায়ের মুসলেহ্ উদ্দিন	৪৪৫–৪৪৭
সংহতি (কবিতা)	মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ	৪৪৮

কাছাকাছি (গল্প)	আতোয়ার রহমান	৪৪৯–৪৫১
বিদ্রোহী পদ্মা (নাটক)	আসকার ইবনে শাইখ	৪৫২–৪৫৯
লেখক (গল্প)	রাবেয়া খাতুন	৪৬০–৪৬৫
সমালোচনা সাহিত্য		
বোবামাটি (গল্পগ্রন্থ, রচনা ঃ নূরুন নাহার)	সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী	৪৬৬–৭৬৭

১ম বর্ষঃ ১০ম সংখ্যা-পৌষঃ ১৩৫৯

<u>লেখার শিরোনাম</u>	<u>লেখকের নাম</u>	<u>পৃষ্ঠা সংখ্যা</u>
আমাদের কথা সাহিত্য (প্রবন্ধ)	শাহেদ আলী	৪৬৯–৪৮০
মেহের জা'নের মা (বড় গল্প)	মির্জা আ. মু. আব্দুল হাই	৪৮১–৪৯৬
অন্যথায় (কবিতা)	মোহাম্মদ মামুন	৪৯৭–৪৯৮
তবুও (কবিতা)	আজীজুল হক	৪৯৮–৪৯৯
ইতিহাস (কবিতা)	আবু হেনা মোস্তফা কামাল	৫০০
অমর্ত (গল্প)	আবদুল গাফফার চৌধুরী	৫০১–৫০৬
ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র ও ইসলাম (প্রবন্ধ)	অধ্যাপক হাসান জামান	৫০৭–৫১০
সমালোচনা সাহিত্য		
'পাকিস্তানের পাঁচ বছর'	নুরুল আলম	৫১১–৫১৩

পাকিস্তান সরকারের তরফ হইতে 'পাকিস্তানের পাঁচ বছর' শীর্ষক একটি স্থূলকায় প্রচার পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। সরকারের সাহায্যে ও নেতৃত্বে প্রচুর টাকা খরচ করিয়া ইহাতে যেসব হাস্যকর বিষয়বস্তু প্রকাশিত হইয়াছে তাহা সত্যিই অভাবিতপূর্ণ। বিশেষ করিয়া ইহার 'শিল্প-সাহিত্য' নিবন্ধে পূর্ব বাংলার সাহিত্য সম্বন্ধে যে আলোচনার অবতারণা করা হইয়াছে তাহা হাস্যকর প্রমাদ ও যথেচ্ছাচারে পরিপূর্ণ। কোনো দেশের সরকারের তরফ হইতে সেই দেশের সাহিত্যের এইরূপ বিকৃত প্রচারণা হইতে পারে তাহা আমাদের ধারণারও অতীত। কাজেই আমরা 'পাকিস্তানের পাঁচ বছর' পুস্তকের অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা না করিয়া কেবল ইহার 'শিল্প সাহিত্য' শীর্ষক অধ্যায়টির কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

'শিল্প সাহিত্য' নিবন্ধটিতে ১৫ পৃষ্ঠাব্যাপী যে সাহিত্য আলোচনা করা হইয়াছে তন্মধ্যে উর্দু সাহিত্যে ১২ পৃষ্ঠা স্থান অধিকার করিয়াছে, আর বাকী তিন পৃষ্ঠায় স্থান পাইয়াছে 'বাংলা সাহিত্য'। স্থান নিয়া না হয় সমালোচনা বাদই দিলাম-কিন্তু বিষয়বস্তুতে যেভাবে বাংলা সাহিত্যের বিকৃত প্রচারণা করা হইয়াছে তাহা সত্যই পূর্ব

পাকিস্তানীদের জন্য লজ্জা ও কলংকের বিষয়। আমাদের আলোচ্য পুস্তকটি উর্দু, ইরেজী প্রভৃতি ভাষায় প্রকাশিত হইয়া পাকিস্তানের বাহিরেও বিলি করা হইয়াছে। পূর্ব বাংলার সাহিত্যের এরূপ বিকৃত প্রচারণা যে সরকারের মারফতই করা হইবে তা কে জানিত!

বাংলা ভাষার উপর আলোচনাটির লেখক হইলেন 'ইউসুফ জামাল হোসাইন'। এই নামের কোন সাহিত্যিক বা সাহিত্যমোদী পূর্ব বাংলায় আছেন বলিয়া আমাদের জানা নাই। যে পুস্তকটির Original ও Translation দেশ-বিদেশের সর্বত্র প্রচারিত হইতেছে সেইরূপ একটি প্রামাণ্য পুস্তকের সাহিত্য বিভাগের রচয়িতা যে একজন সুপরিচিত সাহিত্যিক হওয়া প্রয়োজন তাহা বলাই বাহুল্য। লেখকের অবাংগালীসুলভ নাম ইঙ্গিত করে যে, তা লেখকের আসল নাম নয়। যথেচ্ছ লিখিয়া টাকা আদায় ও বিশেষ একটা উদ্দেশ্য সাধনই লেখকের লক্ষ্য বলিয়া মনে হয়।

প্রবন্ধের প্রথমে দুর্বোধ্য ও প্রমাদপূর্ণ একটি প্রস্তাবনার অবতারণা করিয়া বর্তমান পূর্ববাংলার ভাষার রূপ বর্ণনা করিতে গিয়া লেখক বলিয়াছেন– ''চতুর্দশকের গোড়ার দিকে অধিকাংশ মুসলিম কবি একটি নূতন পথের সন্ধান শুরু করেন। টেকনিকের দিক থেকে তাঁরা তাঁদের ঐতিহ্যকে অতিক্রম করে অগ্রসর হতে শুরু করেন। কাব্যছন্দের নূতনত্ব তখন সচ্ছন্দভাবে বিকাশ লাভ করেছে। গদ্য কবিতা ফ্যাশান হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং কবিত্বময় ভাষা সাধারণের ভাষা হয়ে দাঁড়িয়েছে"–লেখকের সেই প্রলাপোক্তির সম্যক অর্থ আমরা অনেক গবেষণা করিয়াও বুঝিতে পারিলাম না। 'চতুর্দশক' বলিতে তিনি কি বুঝাইতে চান-'গদ্য কবিতা কখন ফ্যাশান' হইয়া দাঁড়াইয়াছে–সেই অতীতে না বর্তমানে আর 'কবিত্বময় ভাষা' কখন সর্বসাধারণের ভাষা হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা আমরা সত্যই জানি না। আর এই রকম বহু 'চিজ'ই তিনি 'পাকিস্তানের পাঁচ বছরে' পরিবেশন করিয়াছেন।

এরপর দুই প্যারায় নজরুল ইসলাম সম্বন্ধে স্রেফ আবোল-তাবোল বলিয়া তিনি আমাদের সামনে পূর্ব-পাকিস্তানের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি হিসাবে পেশ করিয়াছেন আবুল হোসেন– এই 'তরুণ কবি'কে। এখানে জসীমুদ্দীন, ফররুখ আহমদ, আহসান হাবীব এঁরা সবাই তলাইয়া গিয়াছেন। পুরাতন কালের রাজা-বাদশাদের প্রতি ভক্ত কবির বন্দনার মতো একটানা প্রশংসার ঝড় যে দুই পাতায় রহিয়া গিয়াছে তাহার পর

আইয়ুবী আমলের শেষ দিকে ঘটনাচক্রে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল ঢাকায়। তিনি একজন মহিলা। পাকিস্তান সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ে তখন তিনি উচ্চপদে সমাসীন। –আসকার ইব্‌নে শাইখ

রহিয়াছে আবুল হোসেনের কবিতায় আছে 'লুরেন্সের ভাব বিপ্লব'-'হাকসলীর বস্তুবাদ'। তার লেখায় পুরানো শব্দের বড় একটা ব্যবহার দেখা যায় না"–ভদ্রলোককে নিয়া এইভাবে ক্যারিকেচার বা ব্যঙ্গ করার কি প্রয়োজন ছিলো বুঝা গেল না। এরপর লেখকের লেখনীর চোটে কবি ফররুখ আহমদ একজন শ্রেষ্ঠ গীতি কবি এবং গদ্য কবিতার লেখক বনিয়া গিয়াছেন। গল্পে শাহেদ আলী, মাহবুব-উল-আলম, আলাউদ্দিন আল-আজাদ, আবদুল গাফফার চৌধুরী, আতোয়ার রহমান, মির্জা আ. মু. আবদুল হাই প্রভৃতি খ্যাতনামা ও প্রতিশ্রুতিশীল গাল্পিকদের নাম একদম গুম হইয়া গিয়াছে। তৎস্থলে যে সমস্ত লেখক-লেখিকার নাম উল্লেখ করা হইয়াছে তাঁহাদের অধিকাংশের নাম এখনও সাহিত্যালোচনায় স্থান পাইবার যোগ্য নয়। এই প্রসঙ্গে 'মাহে নও'-এ প্রকাশিত কয়েকটি গল্পকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গল্পের সঙ্গে তুলনীয় বলিয়া মন্তব্য করা হইয়াছে অথচ আমাদের মতে, উল্লেখিত গল্পগুলির অধিকাংশ এতোই নিকৃষ্ট ধরনের যে, পৃথিবীর যে কোন প্রথম শ্রেণীর গল্প লেখকের তৃতীয় শ্রেণীর গল্পের সঙ্গেও তুলনীয় হইতে পারে না। লেখকের কলমের ও জ্ঞানের মহিমায় আশরাফ সিদ্দিকীর কবিত্ব কাটিয়া গিয়া তিনি একজন শ্রেষ্ঠ গাল্পিক বনিয়া গিয়াছেন। নাট্যে—ইব্রাহিম খাঁ, আসকার ইবনে শাইখ, নূরুল মোমেন প্রমুখ যাঁহাদের বই প্রকাশিত হইয়া রীতিমতো মঞ্চস্থ হইতেছে তাঁহাদের নাম নিশানাও নাই, অথচ নাট্য সাহিত্যে এমন একজনের নাম করা হইয়াছে যাঁহার কোন বই নাই।

অর্বাচীনসুলভ মন্তব্য আর উদ্দেশ্যমূলক আলোচনায় সমস্ত প্রবন্ধটি ভরপুর। অথচ আশ্চর্যের বিষয়, পূর্ববঙ্গের সাহিত্য সম্পর্কে এরূপ একটি বিকৃত আলোচনা সরকারী প্রচার পুস্তকে প্রকাশ করিতে পাকিস্তান সরকারের হাজারী বড় কর্তাদের এতটুকু দ্বিধা হয় নাই। আমরা দেখিয়া আশ্চর্য হইলাম যে, সরকার কেবল 'মাহে-নও' পত্রিকাকেই পূর্ববঙ্গের সাহিত্যের মাপকাঠি হিসাবেই ধরিয়া নিয়াছেন। কিন্তু সরকারের একথা বুঝা উচিত ছিল যে, 'মাহে-নও' পত্রিকা অপেক্ষা অধিক উঁচু Standard-এর পত্রিকা পূর্ব পাকিস্তানে যথেষ্ট রহিয়াছে। এবং এমন অনেক লেখক রহিয়াছেন যাঁহারা 'মাহে-নও' পত্রিকার লেখক গোষ্ঠীর অপেক্ষাও অধিক শক্তিশালী। আমরা আশা করিয়াছিলাম যে, পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যের আলোচনা কেবলমাত্র 'মাহে-নও' পত্রিকাতেই সীমাবদ্ধ থাকিবে না এবং আলোচনাকারীও একজন খ্যাতনামা সাহিত্যিক হবেনই। কিন্তু আমরা সেইদিক হইতে নিরাশ হইয়াছি। সরকারী প্রচার কর্তাদিগকে আমরা বলিয়া দিতে চাই, যে বিষয় সম্পর্কে আপনাদের কোন জ্ঞান নাই-তাহা নিয়া ছিনিমিনি খেলিলে দেশের সংস্কৃতিকামীরা তাহা কোন দিনই ক্ষমার চক্ষে দেখিবে না।

১ম বর্ষঃ ১১শ সংখ্যা-মাঘঃ ১৩৫৯

লেখার শিরোনাম	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা সংখ্যা
শ'য়েব চিঠি (প্রবন্ধ)	আতাউল হক	৫১৫-৫২১
ইঁদুর (গল্প)	চৌধুরী লুৎফর রহমান	৫২২-৫২৮
মানুষের গান (কবিতা)	মফিজউদ্দিন আহমদ	৫২৯-৫৩০
রুবাইয়্যাত (কবিতা)	মুহম্মদ আবু তালিব	৫৩১
হেমন্ত কামনা (কবিতা)	মোহাম্মদ আজিজুল হক	৫৩২-৫৩৩
সেথায় দেখেছি (কবিতা)	নূরুন নাহার বেগম	৫৩৩-৫৩৪
হেজাজী হাওয়া (গল্প)	অধ্যাপক মোহাম্মদ আজরফ	৫৩৪-৫৪১
গণ সাহিত্যের ভিত্তি (প্রবন্ধ)	রওশন ইজদানী	৫৪২-৫৪৬
সাহিত্যের শ্রেণী বিভাগ (প্রবন্ধ)	অধ্যাপক আবুল কাসেম	৫৪৭-

দ্যুতি

[মাসিক সাহিত্য পত্র]

২য় বর্ষঃ ১ম সংখ্যা-ফাল্গুনঃ ১৩৫৯; ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৩

সম্পাদকঃ আসকার ইবনে শাইখ

সহ-সম্পাদকঃ চৌধুরী লুৎফর রহমান, মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

লেখার শিরোনাম	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা সংখ্যা
প্রগতিঃ মত ও পথ (প্রবন্ধ)	আহমদ ফরিদউদ্দিন	১-৮
ব্যাহত বন্যা (গল্প)	আতোয়ার রহমান	৯-১৯
বিজ্ঞান ও মূল্যবোধ (প্রবন্ধ)	মূলঃ বার্টরাণ্ড রাসেল অনুবাদঃ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী	২০-২৭
একটি মাত্র প্রাণ (গল্প)	সৈয়দ আতাউর রহিম	২৮-৩৪
মন ও সমুদ্র (কবিতা)	হাবীবুর রহমান	৩৫
তুমি কি কেবলই ছবি (কবিতা)	আবদুর রশীদ খান	৩৬-৩৭
স্বগত (কবিতা)	আবুল খায়ের মুসলেহউদ্দিন	৩৮
পূর্ববাংলার সাম্প্রতিক প্রবন্ধ–সাহিত্য (প্রবন্ধ)	অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন	৩৯-৪৬
নাবিক (গীতি-গাঁথা)	গীতিকার ঃ ফররুখ আহমদ সুর ঃ শেখ লুৎফর রহমান স্বরলিপিকার ঃ অধ্যাপক মুনসী রইসউদ্দিন	৪৭-৫২

সংস্কৃতি সংবাদ

আর্ট স্কুলের চিত্র-প্রদর্শনী পূর্ববঙ্গ	বদরুল মুনীর	৫৩–৫৫
পূর্ববঙ্গ সাহিত্য সমিতি	নূরুল আলম	৫৫–৫৬
সম্পাদকের দৃষ্টিতে		৫৭–৫৮

ভাষা আন্দোলনের শহীদ ভা'য়েরা
তোমাদের ভুলিনি
আল্লাহ্ তোমাদের শান্তি দিন
তোমাদের আশাকে যেন
সফল করতে পারি!

২য় সংখ্যাঃ চৈত্র, ১৩৫৯ মার্চ, ১৯৫৩

লেখার নাম	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা সংখ্যা
কাঁটা (গল্প)	শাহেদ আলী	৬৫–৬৯
এক টুকরো ভ্রমণ (ব্যক্তিগত প্রবন্ধ)	আতোয়ার রহমান	৭০–৭৭
চাচী আম্মা (গল্প)	সৈয়দ মোকসুদ আলী	৭৮–৮৩
জয়নুল আবেদীন (প্রবন্ধ)	মূলঃ কামরুল ইসলাম অনুবাদঃ নূরুল আলম	৮৪–৮৮
পরিণাম (গল্প)	মূলঃ দোদেঁ (ফ্রান্স) অনুবাদঃ মোহাম্মদ আজিজুল হক	৮৯–৯৫
গান গেয়ে যাই (কবিতা)	আশরাফ সিদ্দিকী	৯৬–৯৭
নাবিকঃ সমুদ্র (কবিতা)	মোঃ মাহফুজউল্লাহ	৯৮–১০১
মাটির প্রেম (কবিতা)	খোন্দকার আবদুর রহীম	১০১

আমার দেশ

ঢাকা নগরী	আবদুল কুদ্দুছ	১০২–১০৫

সংস্কৃতি সংবাদ

বিচিত্রানুষ্ঠান ও বাংলা ভাষা সম্বন্ধে আলোচনা সভা	আহমদ সিরাজ	১০৬–১১০

বিচিত্রানুষ্ঠান ঃ গত কিছুদিনের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের চারটি হলের নবনির্বাচিত ইউনিয়নের অভিষেকোৎসব হয়ে গেল। অভিষেকের সঙ্গে সঙ্গে হয়েছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। দেশের সুশিক্ষিত তরুণ-তরুণীদের সংস্কৃতি চেতনার রূপ ও গতিধারার প্রকাশ এগুলোতে রয়েছে।

কিছুদিন আগেকার কথা। ঢাকায় ইসলামী সংস্কৃতি সম্মেলন হয়ে গেল অক্টোবর মাসে। এ সম্মেলনের বিচিত্রানুষ্ঠান সম্বন্ধে একজন ভিন্ন মতাবলম্বী কোন এক কাগজে লিখেছিলেন ঃ ইসলামী সম্মেলনের সলিল চৌধুরীর শান্তির গান শুনে ....ইত্যাদি। এই 'একজন' সলিল বাবুদেরই মতের ধারক। কথাটা তিনি ঠিক বলেননি। ভাল কথা– যেই বলুক-সব সময়, সব জায়গায়ই ভাল। সলিল বাবুর গান বলেই ইসলামপন্থীরা তা গাইতে পারবে না, এটা কোন কাজের কথা নয়। কথাটা মনে পড়ল সলিমুল্লাহ হলের 'শান্তি' নামক গীতি-বিচিত্রা প্রসঙ্গে। গানগুলো যাদের লেখাই হোক না কেন, আবেদন ছিল তার দলমত নির্বিশেষে। তারপর ফজলুল হক হলের অনুষ্ঠান। সেখানেও গীতি-বিচিত্রা হয়েছে। 'আমার দেশ" পরিবেশন করেছেন ওঁরা। কিন্তু এই গানের জীবন্তিকায় কোথাও এবং কোন সময়ই আমার দেশকে খুঁজে পেলাম না। গীতি-বিচিত্রাটি একঘেঁয়ে প্রাণহীন হয়েছে। অনেককেই বিরক্ত হতে দেখেছি। গানগুলোতেও প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়নি। এরপর আসে ঢাকা ও জগন্নাথ হলের মিলিত অনুষ্ঠানের কথা। তাঁরা বসন্তোৎসব করে আসছে প্রতি বছরই। সফলতার দিক দিয়ে তাদের এটা Tradition-এ পরিণত হয়েছে। এবারে খুব ভাল না হলেও আলোচ্য অনুষ্ঠানগুলোর মধ্যে এ উৎসব সবচেয়ে ভাল লেগেছে। ছাত্রীদের বিচিত্রানুষ্ঠানও একঘেঁয়ে প্রাণহীনতার দোষ থেকে মুক্ত নয়।

এসব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থেকে একটা জিনিস বেশ বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। তা নিজেদের সংস্কৃতি সম্বন্ধে তরুণ-তরুণীদের অজ্ঞাত বা অবহেলা। যেমন 'আমার দেশ'। পাকিস্তান হওয়ার পর 'আমার বাংলা' মানে পূর্ব বাংলা। গানের মধ্য দিয়ে আমার দেশের পরিচিতি পূর্ব বাংলারই পরিচিতি। রবীন্দ্র সংগীতের আবেদন বিশ্বজনীন। মানুষ হিসাবে প্রত্যেকেই রবীন্দ্র রচনা থেকে হৃদয়ের অনুভূতি পাবে, এ কথা সত্য। কিন্তু মানুষের তো আরও একটি পরিচয় রয়েছে। তা আঞ্চলিক। এই হিসাবে রবীন্দ্র সংগীত 'সম্পূর্ণ আমার' নয়। আমি মানুষ, তাই আমার মানবতায় দোলা দেবে রবীন্দ্র সংগীত। কিন্তু আমি তো অস্বীকার করতে পারি না যে, আমি পূর্ব বাংলার অধিবাসী! যখন রবীন্দ্র সংগীতের আসরে বা রবীন্দ্র-নাটকের অনুষ্ঠানে যাব, তখন আমি আশাই করব না আমার অঞ্চলকে সেখানে পুরোপুরি দেখতে পাব। কিন্তু যখন আমার দেশের পরিচয় পেতে যাব তখন আশা করবঃ আমার অঞ্চলকে, যে অঞ্চলের সুখে, দুঃখে আমি মানুষ, তাকে দেখতে। এদিক দিয়ে, কই, 'আমার দেশ'–এ তো তা দেখতে পেলাম না? পেলাম পশ্চিম বাংলার একটি অস্পষ্ট পরিচয়-যা পশ্চিম বাংলার ভাইদের কাছে পাওয়ার আশাই আমরা করি।

আঞ্চলিক গানের সুরগুলো তথাকার মানুষের চরিত্র, রীতিনীতির বাহক। আমাদের দেশে আছে ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, মুর্শিদী, লোক-সংগীত ইত্যাদি। এ সবের সুরে দেশের সামগ্রিক ছবি প্রতিফলিত। অর্থনৈতিক চাপ যখন ছিল না, তখন এ সবের কথা যা' ছিল, বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে তা বেমানান হতে পারে। কিন্তু গানের কথাও যদি পরিবর্তিত হয়, যদি বর্তমানের অবস্থা কথায় প্রকাশিত হয়ে এসব সুরে গীত হয় তবেই আমাদের বর্তমান দেশ প্রতিফলিত হবে। 'আমার দেশ'-এ তা হয়নি। আমাদের পূর্ব বাংলায় রয়েছে পৃথক সুর, পৃথক কথা, পৃথক সংস্কৃতি। এ সংস্কৃতিতে হিন্দু-মুসলিম জড়িত থাকলেও এটা পৃথক। গণিতের অনুপাতেও এরই মিশ্র সংস্কৃতির বেশী অংশ মুসলমানের; অন্তত এই পূর্ব-পাকিস্তানে। এ কথা ভুলে গেলে সত্যেরই অপলাপ হবে। আমাদের গীতিকার লিখবেন গান। তাঁর কথায় থাকবে আমাদের বর্তমান মানসিকতা, আমাদের সংস্কৃতির সাজ থাকবে এ সমস্ত গানে। এই গানের কথা যখন আমাদের সুরে গীত হবে, তখনই শুধু মনে করতে পারবঃ এইতো 'আমার দেশ'।

সংস্কৃতি বা আদর্শের ওপর প্রবন্ধ লেখার উদ্দেশ্য আমার নয়। কিন্তু এই সংস্কৃতি আদর্শের জন্য আমরা যে অনেক কিছু করেছি, তা তো স্বীকার্য! কাজেই পূর্ব-পাকিস্তানের উচ্চশিক্ষিত তরুণ-তরুণীদের কাছ থেকে আমরা যে সংস্কৃতির পরিচয় পেলাম, তাকে আশাপ্রদ বলি কি করে?

বাংলাভাষা সম্বন্ধে আলোচনা–সভা

পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে বাংলার দাবীর যৌক্তিকতা সম্বন্ধে গত ১১ই মার্চ ঢাকা বার লাইব্রেরী হলে সাংস্কৃতিক পর্যায়ে একটি মনোজ্ঞ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন মনীষী এবং রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ বাংলা ভাষার বিভিন্ন দিক নিয়ে এই সভায় আলোচনা করেন।

রাষ্ট্রভাষার সংগ্রাম আজ বহুদূর এগিয়ে গেছে–গত বছর তরুণ সংগ্রামীদের তাজা রক্ত এ দাবীকে গণমানুষের মধ্যে বিস্তার লাভে অনেকখানি সহায়তা করেছে। আজ পূর্ব-পাকিস্তানের শিক্ষিত সমাজের মধ্যে শতকরা এমন একজন লোক খুঁজে পাওয়া ভার যিনি এ দাবীর বিপক্ষে। কিন্তু আমাদের বৃহত্তর জনসাধারণ যাদের অধিকাংশই অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত–তাদের কিছু অংশের মধ্যে বাংলার দাবীর যৌক্তিকতা সম্বন্ধে এখনো কিছুটা অস্পষ্টতা ও ভুল বোঝাবুঝি রয়ে গেছে। বাংলা-বিরোধী মহল প্রচার করেছেন ঃ

১. বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে ইসলামী ভাবধারা অবর্তমান। ইসলামী জীবন-চেতনার সুষ্ঠু বিকাশের দিক দিয়ে উর্দুই আমাদের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হতে পারে। ২. উর্দুর

সংগে বাংলাকেও যদি অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা হয় তবে পশতু, সিন্ধী, বেলুচ, গুরুমুখী, গুজরাটী, প্রভৃতি ভাষাকেও রাষ্ট্রভাষা করার দাবী উঠবে। এতে করে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় জীবনে বিশৃংখলাই সৃষ্টি করা হবে। অতএব বাংলাকে পূর্ব-বঙ্গের সরকারী ভাষার চেয়ে বেশী কিছু দাবী করা উচিত নয়।

ইসলাম ও পাকিস্তানের সত্যিকার দরদী আমাদের সরলপ্রাণ জনসাধারণের কারো কারো পক্ষে এই সব চতুর অপপ্রচারের ফাঁদে পতিত হওয়া অস্বাভাবিক নয়। এই পটভূমিকায় বিচার করলে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত বার লাইব্রেরীর আলোচনা সভার যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে।

উপরোল্লিখিত প্রথম অপপ্রচারটির দাঁতভাংগা জবাব দেন আলোচনা সভায় প্রথম ও প্রধান বক্তা অধ্যাপক আবুল কাসেম। 'ইসলামের দৃষ্টিতে মাতৃভাষা' এই পর্যায়ে তাঁর দীর্ঘ আলোচনায় অধ্যাপক কাসেম বলেন, 'কোন ভাষাই যে পূর্ণ ইসলামী অনৈসলামী হতে পারে না তার প্রধান প্রমাণ আরবী ভাষা। এক কালের নাস্তিকতা ভাবধারাপূর্ণ আরবী ভাষা আজ অনেকটা ইসলামী ভাবধারার বাহন হয়েছে। কোন ব্যক্তিগোষ্ঠির সুষ্ঠু সাংস্কৃতিক ঠিকানা একমাত্র মাতৃভাষার মাধ্যমেই সম্ভব। কুরআনে এই প্রাকৃতিক নীতির সমর্থনে একাধিক আয়াত রয়েছে। এসব সত্ত্বেও যারা উর্দুকে বাংলা ভাষাভাষীদের ওপর চাপিয়ে দিতে চায়, হয় তারা নির্বোধ-ইসলামকে জানে না–নতুবা তাদের মনেই রয়েছে শোষণের অভিসন্ধি।

উপরোল্লিখিত দ্বিতীয় অপপ্রচারের পুংখানুপুংখ আলোচনা করে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন তমদ্দুন মজলিস-সম্পাদক জনাব আবদুল গফুর। তাঁর প্রবন্ধে এবং পরবর্তী কয়েকজন বক্তা– অধ্যাপক কাজী কামরুজ্জামান, জনাব আবদুল ওদুদ, জনাব সৈয়দ আবদুর রহীম, জনাব নূরুল আলম, জনাব আবদুল মোমেন তালুকদার, জনাব শেখ মুজিবুর রহমান প্রভৃতির আলোচনায় একথা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে যে উর্দু ও বাংলার সংগে এবং বিশেষতঃ বাংলার সংগে-পাকিস্তানের পশতু, গুজরাটী, গুরুমুখী, বেলুচ প্রভৃতি ভাষার তুলনা চলে না। অতএব উর্দুর সংগে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার দাবী করলেই যে অন্যসব ভাষার দাবী উঠবে একথা ভাওতা বই কিছু নয়। তাছাড়া গত পাঁচ বছর ধরে বাংলার দাবীতে আন্দোলন হওয়া সত্ত্বেও পশ্চিম পাকিস্তানে কেউ যখন উর্দু ছাড়া অন্য কোন ভাষার দাবী উত্থাপন করেনি– তখন ওখানে অন্যান্য ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবীর জুজু দেখানো শুধু বিভেদের উস্কানি দেওয়া ছাড়া কিছু নয়।

রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের নেতৃত্বে ভাষার লড়াই আজ অনেক দূর এগিয়ে গেছে। কিন্তু সে লড়াই অনেকটা রাজনৈতিক লড়াই। আজ তাঁরা ভাষার দাবীর প্রয়োজনে সাংস্কৃতিক লড়াইয়ের দিকেও নজর দিয়েছেন। এজন্য আমরা তাঁদের মুবারকবাদ

জানাই। আমাদের মতেঃ এ ধরনের আলোচনা সভা যত বেশী অনুষ্ঠিত হয় ততই মঙ্গল। কারণ এসব আলোচনা সভা বা পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশের দ্বারাই আমাদের মধ্যের যাবতীয় ভুল বোঝাবুঝি আমরা দূর করতে পারি।

সর্বশেষে আমরা আরেকটি কথা বলবো। ১৯৪৮ সালে ভাষা আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে তমদ্দুন মজলিসের প্রকাশিত 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা–বাংলা না উর্দু', গত বছর ২১শে ফেব্রুয়ারীর প্রাক্কালে কর্মপরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত জনাব আবদুল হাকিম রচিত 'আমাদের ভাষার লড়াই' এবং অধ্যাপক ফেরদাউস খান, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ প্রভৃতি শিক্ষাবিদদের লিখিত এ বিষয়ে কয়েকখানা বই বাংলায় প্রকাশিত হয়েছে। বিশেষ করে প্রথম দু'খানা পুস্তিকাতে ইসলামের দৃষ্টিতে বাংলাভাষা সম্বন্ধেও যথেষ্ট আলোচনা করা হয়েছিল। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণের মধ্যে আমাদের দাবীর যৌক্তিকতা প্রচারের উপযোগী একখানি পুস্তকও এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি। রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ বা কোনো ভাষা-দরদী সুধী যদি এ সম্বন্ধে একখানি ইংরেজী পুস্তক রচনা করেন তবে ভাষার সপক্ষে একটি সত্যিকার কাজ করা হবে।

সমালোচনা সাহিত্য

আযীমউদ্দীন আহমদ রচিত নাটক 'মহুয়া'র সমালোচনা লিখেছেন কাজী ফজলুর রহমান, পৃঃ ১১১-১১৪

মাটির সুর

কিষাণ কুমারী লিখেছেন মফিজউদ্দিন আহমদ পৃ. ১১৫

২য় বর্ষঃ ৩য় সংখ্যাঃ বৈশাখ, ১৩৬০; এপ্রিলঃ ১৯৫৩

লেখার শিরোনাম	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা সংখ্যা
বাংলা কাব্যে	মোহাম্মদ আজরফ	১২১–১৩২
কবি ফররুখ আহমদ (প্রবন্ধ)		
দোটানা (প্রবন্ধ)	অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা	১৩৩–১৩৬
বুড়োবট অশ্বত্থের ছায়াতে (কবিতা)	চৌধুরী লুৎফর রহমান	১৩৭–১৪০
আজি হতে শতবর্ষ পরে (কবিতা)	আজীজুল হক	১৪১–১৪২
ইবনে বতুতার চশমা (নাটিকা)	মা-আ-ম্	১৪৩–১৪৬
ছায়া-মিছিল (গল্প)	জহুরুল আলম	১৪৭–১৫৪
চোর (গল্প)	মোহাম্মদ সানাউল্লাহ্	১৫৫–১৬৩
রানু ও রহমত আলী (কবিতা)	আসকার ইবনে শাইখ	১৬৪

মাটির সুর		
পাটের ‘পোড়া’	রওশন ইজদানী	১৬৫–১৬৭
সংস্কৃতি সংবাদ		
সুসাহিত্যিক মনোজ বসুর সম্বর্ধনা	আবু মোহাম্মদ	১৬৯–১৭২
আমার দেশ		
বিক্রমপুর	হেদায়েতুল ইসলাম খান	১৭৩–১৭৫
সম্পাদকের দৃষ্টিতে		১৭৬
নতুন বই		
অগ্নিফজল অগ্নিফসল (কাব্যগ্রন্থঃ নূরুন নাহার)	নূরুল আলম	১৭৭

২য় বর্ষঃ ৪র্থ সংখ্যাঃ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬০; মে ১৯৫৩

লেখার শিরোনাম	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা সংখ্যা
সন্ধ্যারাতের রূপ কথা (গল্প)	শফিকা হুসেন	১৮৩–১৮৮
ইকবাল থেকে (কবিতা)	অনুবাদঃ ফররুখ আহমদ,	১৮৯–১৯০
ইসলামী আইন ও প্রযুক্তি প্রয়োগ (প্রবন্ধ)	মূলঃ আল্লামা ইকবাল অনুবাদঃ সোলায়মান খান	১৯১–১৯৪
ওয়েসিস (ব্যক্তিগত প্রবন্ধ)	সৈয়দ বদরুদ্দিন হুসেন	১৯৫–১৯৯
লাল শিখা (গল্প)	মিজানুর রহমান	২০০–২০৮
ঝড় (কবিতা)	মোহাম্মদ আজিজুল হক	২০৯–২১০
নব জন্ম (কবিতা)	মুয্হারুল ইসলাম	২১১–২১২
রবীন্দ্রনাথ (প্রবন্ধ)	অনির্বাণ	২১৩–২১৮
মাটির সুর		
ডাহুক	মফিজউদ্দিন আহমদ	২১৯–২২২
আমার দেশ		
পাবনা জেলা	মীর আবুল হোসেন	২২৩–২২৭
সম্পাদকের দৃষ্টিতে		

২য় বর্ষঃ ৫ম সংখ্যাঃ আষাঢ়, ১৩৬০; জুন ১৯৫৩

লেখার শিরোনাম	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা সংখ্যা
মুসলিম পরিবেশ ও পূর্ব বাংলার সাহিত্য (প্রবন্ধ)	সৈয়দ আলী আশরাফ	২৩১–২৩৭
ধর্মীয় সমাজবাদের ভিত্তিতে (প্রবন্ধ)	মীর শামসুল হুদা	২৩৮–২৪৬
ফাঁকি (কবিতা)	চৌধুরী ওসমান	২৪৭–২৪৮

বিক্ষয় (কবিতা)	মুফাখ্‌খারুল ইসলাম	২৪৯–২৫১
হে সৈনিক (কবিতা)	নূরুন নাহার	২৫১–২৫২
খেলনা (গল্প)	জাহাঙ্গীর খালেদ	২৫৩–২৫৮
মফস্বল সংবাদ (গল্প)	মিন্নাত আলী	২৫৯–২৬৬
ওয়েসিস (রম্য রচনা)	সৈয়দ বদরুদ্দিন হুসেন	২৬৭–২৬৯
সংস্কৃতি সংবাদ	মোহাম্মদ ফারুক	২৭০–২৭২

২য় বর্ষঃ ৬ষ্ঠ সংখ্যাঃ শ্রাবণ, ১৩৬০; জুলাই ১৯৫৩

লেখার শিরোনাম	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা সংখ্যা
শ্রেণী সংগ্রাম ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগী (প্রবন্ধ)	অধ্যাপক আবুল কাসেম	২৭৫–২৯৪
সমীকরণ (গল্প)	মির্জা আ. মু. আবদুল হাই	২৯৫–২৯৬
কান্না (গল্প)	সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী	২৯৭-৩০২
ওয়েসিস (রম্য রচনা)	সৈয়দ বদরুদ্দিন হুসেন	৩০৩–৩০৭
দু'টি বর্ষার কবিতা (কবিতা)	মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ্‌	৩০৮–৩০৯
গান	আসকার ইবনে শাইখ	৩০৯
আমার দেশ		
চট্টগ্রাম	মাহবুব-উল-আলম	৩১০–৩১৪
মাটির সুর		
রাখাল	আবদুল হাই সরকার	৩১৪–৩১৬
সমালোচনা সাহিত্য		
চারটি সাময়িকী সংবাদ	সেলিম চৌধুরী	৩১৭–৩১৮
সম্পাদকের দৃষ্টিতে		৩১৯–৩২০

২য় বর্ষঃ ৭ম–৮ম সংখ্যাঃ ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩৬০; আগস্ট-অক্টোবর, ১৯৫৩

লেখার শিরোনাম	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা সংখ্যা
এ যুগের দৃষ্টিতে মার্কসবাদ (প্রবন্ধ)	মোহাম্মদ আজরফ	৩১৯–৩২৩
ওরা (গল্প)	শাহেদ আলী	৩২৪–৩৩২
আধুনিক বাংলা কবিতার সমস্যা (প্রবন্ধ)	মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ	৩৩৩–৩৪৫
আলমে বরজাখ (কবিতা)	মূলঃ আল্লামা ইকবাল অনুবাদঃ ফররুখ আহমদ	৩৪৬–৩৪৭
চলমান ইতিহাস (কবিতা)	আবদুর রশীদ খান	৩৪৮–৩৪৯
এখানে-এই পৃথিবীতে (কবিতা)	আবদুর রশীদ ওয়াসেকপুরী	৩৫০–৩৫১
যথাসময় (গল্প)	আতোয়ার রহমান	৩৫২–৩৬২

আমার দেশ

সিলেট জেলা	মোহাম্মদ রিয়াছত আলী	৩৬৩–৩৬৯
সংস্কৃতি সংবাদ		
নাট্যাভিনয়	সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী	৩৭০–৩৭৩
নতুন বই		
নয়া দুনিয়া (সিরাজুল ইসলাম) ও গাড়োয়ান (এরশাদ হোসেন)-এর আলোচনা	আতোয়ার রহমান	৩৭৪–৩৭৬
শারদীয় সবুজপত্র (কলিকাতা)-এর আলোচনা	আহমদ ফারুক	৩৭৭–৩৭৮
সম্পাদকের দৃষ্টিতে		৩৭৯–৩৮০

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ

মৃত্যুর শীতল হস্তস্পর্শে আমাদের ভেতর থেকে সর্বাপেক্ষা প্রবীণ সাহিত্যরথীকে আমরা হারিয়েছি। গত ৩০ সেপ্টেম্বর আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সাহেব এ জগতের দেনা-পাওনা চুকিয়ে রহস্যলোকের অভিসারী হয়েছেন (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাযেউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিলো ৮৪ বছর। এত দীর্ঘকালের জন্য তাঁকে আমরা পেয়েছিলাম। তবু মনে হয় এই অল্প সময়ের ভেতরে তাঁর কাছ থেকে আমরা অনেক কিছু পাইনি যা তিনি আরো কিছুদিন বেঁচে থাকলে পেতাম। সাহিত্যবিশারদ সাহেব আমাদের ভেতরে এসেছিলেন একজন বর্তিকাবাহী হিসেবে। তিনি ছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর ধ্বংসস্তূপের ওপর গড়ে ওঠা বিংশ শতাব্দীর জনপদে এক ঐতিহাসিক প্রতিনিধি। তাঁর মাধ্যমে আমরা কবি আলাওল, দৌলত কাজী প্রভৃতির শিল্পকলার রসাস্বাদ করতে সক্ষম হয়েছি। যথেষ্ট কায়িক শ্রম ও আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করেও তিনি আমাদের লুপ্ত ঐতিহ্য উদ্ধারের জন্যে যে সমস্ত পুঁথি সংগ্রহ করেছেন তার পরিমণ বড় কম নয়। এ ব্যাপারে তাঁকে যে সাধ্য-সাধনা ও কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে, তা চিন্তা করলে আমাদের আজ স্বভাবতঃই মনে হয় এ সমস্তর প্রতিদানে তাঁকে আমরা কতটুকু সাহায্য করতে সক্ষম হয়েছি? আর্থিক অবস্থা তাঁর খুব উন্নত ছিলো না। সামান্য কেরানীর চাকরী করে জীবন অতিবাহিত করেও কেউ সাহিত্যের উন্নতির জন্যে প্রাণপাত পর্যন্ত করেছেন, এ রকম উদাহরণ কেবলমাত্র সাহিত্যবিশারদ সাহেবের জীবনেই সীমাবদ্ধ। ঊনবিংশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেও আধুনিক কালের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভংগী ছিলো উদার, বিমুক্ত। মৃত্যুর সামান্য কিছুদিন আগেও তিনি সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন এবং সে সমস্ত লেখা তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত

হয়েছে। তাঁকে আমরা একজন যোদ্ধা বলতে পারি। সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াসে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি পারিপার্শ্বিকের সংগে সংগ্রাম চালিয়েছেন। সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবর থেকে জানা যায় যে, মৃত্যুর কিছুক্ষণ আগেও তিনি লিখেছিলেন। লিখতে লিখতে একসময় মূর্ছিত হয়ে পড়ে যান এবং মৃত্যুবরণ করেন। সাহিত্যবিশারদ সাহেবের মৃত্যুতে আমাদের সাহিত্যাকাশ থেকে ঝরে গেলো একটি নক্ষত্র যার শাশ্বত আলোকে আমরা ঐতিহাসিক পৃথিবীর সংগে স্থাপন করেছিলাম নিবিড় যোগসূত্র। জীবিত অবস্থায় প্রতিভার সম্মান আমরা কোনদিনই দেই না। এটা আমাদের স্বভাবধর্ম। সাহিত্যবিশারদ সাহেবকে আমরা তাঁর সাধনার প্রতিদানে এমন কিছু দেইনি, যা দিলে তাঁকে উপযুক্ত সম্মান দেওয়া হতো। অবশ্য, এ সম্বন্ধে এখন কোনরূপ অনুশোচনা করা বৃথা। এখন আমাদের চিন্তা করতে হবে ভবিষ্যতের কথা। সাহিত্যবিশারদ সাহেবের আপ্রাণ সাধনার ফল তাঁর সংগৃহীত পুঁথিগুলো যাতে করে সংরক্ষিত করা যায় আজ সেই ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। বলাবাহুল্য এ ব্যাপারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গভীর দায়িত্ব রয়েছে। আমাদের আকাঙক্ষা এই যে মরহুম সাহিত্যবিশারদ কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত পুঁথিগুলো যাতে সুসংরক্ষিত হয় সেদিকে কর্তৃপক্ষ নজর দেবেন। তাছাড়া সাহিত্যবিশারদ সাহেবের রচিত প্রবন্ধ যেসব ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে সেগুলোকে সংকলিত করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রকাশ করলে, আমাদের মনে হয়, তাঁর প্রতি সর্বাপেক্ষা সম্মান দেখানো হতো। এ প্রস্তাবটা আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগীয় কর্তৃপক্ষকে বিবেচনা করতে আবেদন জানাচ্ছি।

২য় বর্ষঃ ৯ম–৮ম সংখ্যাঃ কার্তিক, ১৩৬০; নভেম্বর-ডিসেম্বর, ১৯৫৩

লেখার শিরোনাম	**লেখকের নাম**	**পৃষ্ঠা সংখ্যা**
আদর্শ ও আদর্শবাদী (প্রবন্ধ)	আহমদ ফরিদউদ্দিন	৩৮১–৩৮৬
ছাই-চাপা (গল্প)	আবদুর রহমান	৩৮৭–৩৯৪
সভ্যতা (প্রবন্ধ)	মোজাফ্‌ফর আহমদ	৩৯৫–৪০৩
ছাতাওয়ালা (গল্প)	লুৎফর রহমান	৪০৪–৪০৭
মাটিঃ আকাশ (কবিতা)	আবু হেনা মোস্তফা কামাল	৪০৮–৪০৯
জাগৃতি (কবিতা)	জহুরুল হক	৪১০–৪১১
শিল্পীকে (কবিতা)	নাজমুল হক	৪১১–৪১২
নতুন বই		
জিবরাইলের ডানা (শাহেদ আলীর ছোটগল্পের বই-এর আলোচনা)	সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী	৪১৩–৪১৬

কাদা মাটি (খোন্দকার নূরুল ইসলামের সম্পাদিত গল্প-সংকলন-এর আলোচনা)	নাজমুল হক	৪১৬-৪১৭
মাটির সুর		
মীর আবুল হোসেন		৪১৯-৪২০
সংস্কৃতি-সংবাদ		
আজিমপুর এস্টেট চিত্র প্রদর্শনী	সেলিম চৌধুরী	৪২১-৪২৩
নোবেল প্রাইজ	নুরুল আলম	৪২৪
ইউজিন ও'নিল	আহমদ ফারুক	৪২৫
ইসলামী সাংস্কৃতিক সম্মেলন (১৯৫২ সালের অক্টোবরে ঢাকায় অনুষ্ঠিত সাহিত্য শাখার উদ্বোধনী ভাষণ)	কবি শাহাদাৎ হোসেন	৪২৬

২য় বর্ষঃ ১০-১১শ সংখ্যাঃ পৌষ-মাঘ, ১৩৬০; জানুয়ারী-মার্চ, ১৯৫৪

লেখার শিরোনাম	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা সংখ্যা
ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য (প্রবন্ধ)	বদরুদ্দীন উমর	৪২৭-৪৩২
প্রশ্ন (গল্প)	জাহাঙ্গীর খালেদ	৪৩৩-৪৪২
পুঁথি পড়া-মোহাররম মাসে (কবিতা)	ফররুখ আহমদ	৪৪৩-৪৪৪
অঘ্রাণের কবিতা (কবিতা)	আবদুর রশীদ ওয়াসেপুরী	৪৪৫-৪৪৭
সোনার হরিণ (কবিতা)	আল মাহমুদ	৪৪৮
ওয়েসিস (রম্য রচন)	সৈয়দ বদরুদ্দীন হুসেন	৪৪৯-৪৫২
কর্ডোভার আগে (নাটক)	আসকার ইবনে শাইখ	৪৫৩-৪৬৬
নতুন বই		
সঙ্গীত লহরী, গুলবাগ ও অশ্রুধারা (শেখ সাইফুল্লাহ্‌র কবিতার বই)-এর আলোচনা	সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী	৪৬৫-৪৬৬
নকশা (তৈয়ব উদ্দীনের বই-এর আলোচনা	লুতফুল হায়দার চৌধুর	৪৬৭-৪৬৮
সংস্কৃতি সংবাদ		
শাহাদাৎ হোসেন (মৃত্যু)	আহমদুর রহমান	৪৬৯-৪৭৫
মানবেন্দ্রনাথ রায় (মৃত্যু)	আহমদ ফারুক	৪৭১
পূর্ববঙ্গ লেখক সংঘ আসন্ন প্রাদেশিক সাহিত্য সম্মেলন	নূরুল আলম	৪৭১-৪৭২

২য় বর্ষঃ ১২শ সংখ্যাঃ ফাল্গুন–জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬০-৬১; এপ্রিল-জুন, ১৯৫৪

লেখার শিরোনাম	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা সংখ্যা
চিরন্তন বিপ্লব (প্রবন্ধ)	মোহাম্মদ আজরফ	৪৭৩–৪৮৪
ওয়েসিস (রম্য রচনা)	সৈয়দ বদরুদ্দীন হুসেন	৪৮৫–৪৯১
কর্ডোভার আগে (নাটক)	আসকার ইবনে শাইখ	৪৮৫–৪৯১
সাপিনী (গল্প)	মোয়াজ্জেম হোসেন	৫০৩–৫১৩
ইনকিলাব (কবিতা)	মূলঃ আল্লামা ইকবাল অনুবাদঃ ফররুখ আহমদ	৫১৩–৫১৪
সংস্কৃতি সংবাদ		
সাংস্কৃতিক নবজাগরণ, ইকবাল মৃত্যুবার্ষিকী, সাহিত্য সম্মেলন ও নজরুল দিবস		৫৪–৫১৭
সম্পাদকের দৃষ্টিতে		
আমাদের কৈফিয়ত (দ্যুতির বিলম্বিত প্রকাশের জন্য		৫১৮

৩য় বর্ষঃ ১ম সংখ্যাঃ ভাদ্র, ১৩৬০ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৪

লেখার শিরোনাম	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা সংখ্যা
ট্রেনে (কবিতা)	ফররুখ আহমদ	১–৩
শরসন্দান (কবিতা)	চৌধুরী লুৎফর রহমান	৩–৫
চির বৈরাগী (কবিতা)	বদরুদ্দীন উমর	৬–৮
দুটি কবিতা (কবিতা)	মূলঃ ডেভিড গ্রে, রবার্ট লুই স্টিভেনসন অনুবাদঃ মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ্	৯
শান্তিনগরে সকাল (কবিতা)	আবু হেনা মোস্তফা কামাল	১০
চিরন্তন বিপ্লব (প্রবন্ধ)	মোহাম্মদ আজরফ	১১–২৩
রূপান্তরের পথে (প্রবন্ধ) (অরডাস হাক্সলীর অনুসরণে)	আহমদ ফরিদ	২৪–৩২
কর্ডোভার আগে (নাটক)	আসকার ইবনে শাইখ	৩৩–৪২
বোবা কান্না (গল্প)	জাহাঙ্গীর খালেদ	৪৩–৫১
ভয় (গল্প)	মূলঃ পিয়েরী মিলে অনুবাদঃ মোহাম্মদ আজিজুল হক	৫২–৫৭

সমালোচনা সাহিত্য

'আর এক ঢাকায়'

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬১ সংখ্যা 'নতুন সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত দীপ্তেন্দ্রনথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ 'আর একে ঢাকায়' আমরা বিশেষ আগ্রহ ও উৎসাহ নিয়েই পড়েছিলাম। বিগত 'প্রাদেশিক সাহিত্য সম্মেলনে" কলকাতা হতে এসে ঢাকাকে, যে ঢাকা সম্পর্কে তাঁর ইতিপূর্বে ছিল "উৎকট ভীতি নয় অবাস্তব কল্পনার আতিশয্য, ভয়টাই বেশী"-তিনি দেখেছেন আর তারই চিত্র উপস্থাপিত করেছেন রচিত প্রবন্ধে। প্রবন্ধটি সম্পর্কে তাই আগ্রহ ও উৎসাহ দুইই ছিল। কিন্তু প্রবন্ধটি আগাগোড়া পড়ার পর এ সম্পর্কে কিছু লেখা আমি নৈতিক কর্তব্য বলে মনে করছি।

প্রবন্ধের দু'টি মূল্যবান অংশ আলোচনার শুরুতেই তুলে দিচ্ছিঃ 'গোঁড়ামির প্রভাবে পূর্ব বাংলার জনসাধারণ বিশ শতকেও এক আধা-সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় আধা-সভ্য মানুষ।" "মনের মধ্যে উচ্চমন্যতা ছিল, ইংরাজীতে যাকে বলে সুপিরিয়রিটি কমপ্লেক্স। বেশ একটু অভিভাবকের ঢঙে দূরে বসে দেখার জন্যে সংস্কৃতি সম্মেলনে (সাহিত্য সম্মেলনে) গিয়েছিলাম।"

দীপ্তেন বাবুর 'চোখে' পূর্ব বাংলার মানুষ এখনো 'আধা-সভ্য।' কিন্তু তাঁর এই বিশেষ 'চোখ' ও তাঁর সাথে 'সুপিরিয়রিটি কমপ্লেক্সটির জন্ম নিশ্চয়ই পরিবেশগত কারণ থেকে, অর্থাৎ সভ্য দেশের মানুষ তিনি, কাজেই এখানকার মানুষদের আচার-আচরণ তাঁর কাছে আধা-সভ্যদের মত মনে হবেই। সাদা আদমী ইউরোপীয়রা যেমন কালা আদমীদের দেশ আফ্রিকাতে যেত তাদের সভ্য করবার মহান মিশন নিয়ে দীপ্তেন বাবুর আগমনও কী তেমন মিশন নিয়েই হয়েছিল নাকি, অন্ততঃ লেখাটি পড়ে যদি তাঁর তেমন মানসিকতার নিদর্শন কেউ খুঁজে পান তাহলে তার জবাবে তাঁর বক্তব্যটা কী হবে-আমরা জানতে উৎসুক রইলাম।

সমস্ত দেশের জনগোষ্ঠি সম্পর্কে এ ধরনের ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তির প্রতিবাদ আমরা জোর গলাতেই করতাম, কিন্তু এমন অনেক লোক আছে যাদের আচরণ সুস্থ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের হাসির উদ্রেক করে এবং তাদের প্রগলভ উক্তির প্রতিবাদ করতে গেলেও তাদের প্রতি অযথা গুরুত্বই দেওয়া হয়। এ ছাড়াও তাঁর অনেক হাস্যকর উক্তি প্রবন্ধটির মূল্য বৃদ্ধি করেছে, সে সমস্ত উক্তির প্রতিবাদও তাই আমরা করবো না-শুধু পাঠক সাধারণের কাছে তাদের উপস্থাপিত করেই ক্ষান্ত হব।

ঢাকারই এক রিকসাওয়ালা দীপ্তেন বাবুকে বলছে-"আপনে শহীদগো 'ফুল' দিবার গেছিলেন......"

'পুষ্প' শব্দটি একজন রিক্সাওয়ালার মুখে শুনলে বিস্ময়ের উদ্রেক হয় বইকি, কিন্তু রিক্সাওয়ালাটি সাধারণ রিক্সাওয়ালা নয়-সে "এট্টু এট্টু পদ্য লেখার চেষ্টা চরিত্র" করে। রিক্সাওয়ালাদের জীবনের সীমাহীন অজ্ঞতা, দুঃসহ অর্থনৈতিক নিপীড়নের খবর যারা রাখেন তাদের কাছে একজন রিক্সাওয়ালার পক্ষে কবিতা লেখাটা সাধারণ ঘটনা মনে না হওয়াই স্বাভাবিক। ধরে নিচ্ছি সে একজন অসাধারণ রিক্সাওয়ালা। কিন্তু তার মুখে আরো শুনুনঃ

"আপনাগো মধ্যে একজন পদ্য লেখক আছেন না কর্তা, কংগ্রেস যেনারে ধরবার চায়? যিনি নাকি লালঝাণ্ডা হইসেন।" অর্থাৎ দীপ্তেন বাবু আমাদের বিশ্বাস করতে বলছেন যে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা মেহনতী মজুরদের জীবনের গভীরে প্রবেশ করেছে। এই সাথে ভেবে দেখুন ব্যাপারটাঃ

সুভাষ বাবু কলকাতার কবি, যার লেখা পড়বার সুযোগ ঢাকায় স্বভাবতঃই অত্যন্ত সংকীর্ণ। সেই ঢাকার একজন রিক্সাওয়ালা যে নাকি নাম পর্যন্ত বলতে পারল না সুভাস বাবুর (তার বদলে বলল 'একজন') সে ইতি-উতি সব খবর রাখছে তাঁর। তার চেয়েও অবাক কথা তিনি যে 'লালঝাণ্ডা' আর তিন-রঙা ঝাণ্ডার মানুষেরা যে তাঁকে ধরতে চান সে খবরও জানা আছে রিক্সাওয়ালার। কী সুগভীর তার রাজনৈতিক সজ্ঞানতা যে ঢাকার বস্তিতে থেকে বুঝতে পারছে 'একজন' আছেন যিনি কবিতা লেখেন, যিনি লালঝাণ্ডা, যিনি গ্রেপ্তার হবেন।

'আধা-সভ্যদের' দেশের বস্তির অধিবাসী রিক্সাওয়ালার পক্ষে এ ধরনের রাজনৈতিক সজ্ঞানতা থাকাটা অস্বাভাবিকই বটে। প্রবন্ধের প্রথম পাতাতেই এক জায়গায় রয়েছে–"এক মুসলমান ভদ্রলোক তাঁর বিছানা গুটিয়ে (স্টিমারের ডেকের ওপর) একটি থুত্থুড়ে 'মোল্লাকে' 'ওজু' করার জন্য বিছানা গুটিয়ে জায়গা করে দেওয়া-ব্যাপারটা দুর্বোধ্য ঠেকবারই কথা আপনাদের। কিন্তু আসলে ও-শব্দটি হবে 'নামাজ' তাহলে ভেবে দেখুন সুপিরিয়রিটি কমপ্লেক্সসম্পন্ন প্রবন্ধকারের পাণ্ডিত্য কত সুগভীর। কিন্তু সুগভীর পাণ্ডিত্যের ছাপ আরও আছে।

সেই কবিতা-লেখা রিক্সাওয়ালার স্ত্রীর সাথে দীপ্তেন বাবুর কী সম্পর্ক পাতিয়ে নিয়েছেন জানেন? –'ফুফা'। অর্থাৎ মহিলা হয়েছেন দীপ্তেন বাবুর ফুফা। দীপ্তেন বাবু নিজেই আবার বুঝিয়ে দিয়েছেন 'ফুফা' শব্দটির অর্থ কী– অর্থটা নাকি 'পিসি'। ভাবছি, এই পণ্ডিতি আবিষ্কারটি রিক্সাওয়ালাও সংশোধন করে দেয়নি বা দিতে পারেনি। 'আর এক ঢাকার' অপর একটি মূল্যবান অংশ হচ্ছে এইঃ "ধুতি যে দু'একজন পরেন তাঁরা প্রায়ই মুসলমান। আর সবাই পরেন লুঙ্গি এবং পায়জামা কিংবা প্যান্ট। তাতে কি? পায়জামা প্যান্ট তো আমরাও পরি এখানে। আর লুঙ্গি? সে বস্তুটাও দেশে অপেক্ষাকৃত সস্তা, তাই।"

আর এক জায়গায়-'আজ এখানে (পূর্ববঙ্গে) নতুন করে মানুষ ধুতি পরতে আরম্ভ করেছে। জাতীয় পোষাক, আঞ্চলিক সংস্কৃতি, মাতৃভাষা...এর সম্মান রক্ষা না করা কী মানুষের কাজ?"

বিশ্লেষণ করলে দাঁড়াচ্ছে এইঃ পূর্ববঙ্গের মানুষরা এ পর্যন্ত 'আধা-সভ্য' ছিল, এখন তারা 'জাতীয় পোষাক' ধুতি পরে মানুষ হতে চলেছে। অবশ্য এখনো অনেকে লুঙ্গি পরে কারণ পুরো মানুষ হতে তো এখনো দেরী আছে। আর লুঙ্গি পরার পেছনে অর্থনৈতিক কারণ-বর্তমান লুঙ্গির দাম কম। লুঙ্গি তৈরী করতে যে অল্প খরচ পড়ে তা দীপ্তেন বাবুর দেশের লোকদেরও তো অজানা থাকবার কথা নয়। তাহলে, আমরা কী ধরে নেব যে, ভারতের মানুষ এখন দলে দলে মানুষের পোষাক 'ধুতি' ছেড়ে আধা-সভ্যদের লেবাস লুঙ্গি পরা শুরু করেছে!

প্রথম উদ্ধৃতিটার 'তাতে কি?' শব্দ দু'টোর অবস্থিতির কারণটা আমরা অনুধাবন করতে পারলাম না। কলকাতার পাঠকদের কাছে এখানকার মানুষদের লুঙ্গি পরার জন্যে কী দীপ্তেন বাবুকে কৈফিয়ৎ দিতে হচ্ছে নাকি? ধুতি পরে এখানকার অধিবাসীরা মানুষ হচ্ছে-ভালো কথা, তা তাদের হতেই হবে কারণ সুসভ্য দেশে মানুষরা যে ওই পরে, আর 'মহাজ্ঞানী মহাজন' তো রয়েছেই; কাজেই দীপ্তেন বাবুর মত মহাজনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আরো দু'চারজন 'আধা-সভ্য' হয়তো ধুতি পরে 'সভ্য' হওয়ার সুযোগ পাবে-এদিক দিয়ে বলতে গেলে অন্ধদের এই দেশে তিনি অন্ততঃ কয়েকজনকে হলেও দৃষ্টিদান করে গেলেন। তাঁকে ধন্যবাদ।

এখানে লুঙ্গির দাম কম বুঝলাম, কিন্তু আশ্চর্যের কথা পরেই আর এক জায়গায় তিনি বলেছেন, "ঢাকা শহরে একটা লুঙ্গির দাম আট টাকার বেশী।" আর, লুঙ্গির দাম "অপেক্ষাকৃত সস্তা"। তাহলে পায়জামার দাম কী এখানে বিশের কোঠায় উঠেছে নাকি? এও তো আমাদের জানা ছিল না।

এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, "মার্কিনী চক্রান্তে হলিউডের ফিলম জার্নালে দেশ (আমাদের) ছেয়ে গেছে।" আবার-"অথচ নেই হলিউড বা টলিউডের নাচা-নাচি"! এর এক লাইন পরে-"রাজনীতির চক্রান্তে মার্কিনী ফিলমের আনাগোনাই বেশী।" আছে অথচ নেই-ব্যাপারটা একবার ভেবে দেখুন।

বলেছিলাম, প্রতিবাদ, করবো না, কিন্তু ঢাকার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে প্রথম দিকেই লেখক যা বলেছেন, তার প্রতিবাদ আমাকে করতেই হচ্ছে। আমার নেহাৎ দুর্ভাগ্য সেখানে তিনি টেনে এনেছেন আমাকে।

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে দীপ্তেন বাবু বলছেনঃ "মনে পড়ছে ওয়াসেকপুরীর কথা। ঢাকা শহরে কোন একটি পত্রিকা অফিসে বসে আড্ডা দিচ্ছিলাম আমরা। ওয়াসেকপুরী

তরুণ কবি এবং সেই পত্রিকাটির সহযোগী সম্পাদক। কথায় কথায় জল এল কবির চোখে। তিনি বললেনঃ আসুন, আমরা কাঁদি। আপনার এবং আমার পূর্বপুরুষ এতদিন যে পাপ করেছেন, আসুন আমরা কেঁদে তার প্রায়শ্চিত্ত করি। তবে যদি আবার দুই দেশের প্রাণ এক হয়ে মিলতে পারে। তারপর একটু থেমে বললেনঃ কিন্তু কেঁদেই বা কি হবে? কাজ চাই। আপনি কলকাতায় গিয়ে বলবেন দীপ্তেন বাবু, কাজ আমরা শুরু করে দিয়েছি।"

দীপ্তেন বাবু 'কাফেলা অফিসে' স্বশরীরে এসেছিলেন। সেখানে তার সাথে আলাপও হয়েছিল।

গত সাত বছর ধরে পূর্ব-পাকিস্তানের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় আমি যেসব লেখা লিখেছি, তাতে এই কথাটাই স্পষ্ট করে বলতে চেয়েছি যে বিভাগের পরে আমরা গঙ্গা, ভাগীরথী ছেড়ে পদ্মা, মেঘনার দেশকে নিয়ে আছি, সেই দেশই আমাদের অন্তরের অন্তরতম লীলাভূমি, তারি রস-নিষিক্ত মর্মাসনই আমাদের একমাত্র বিহারকেন্দ্র, মিলন ক্ষেত্র, চারণভূমি, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য-সব কিছুর পবিত্র উৎসমূল।

–এই কথাটাই 'কাফেলা অফিসে' বসে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেছিলাম দীপ্তেন বাবুকে এক ঘন্টার সংক্ষিপ্ত পরিসরে।

"ঢাকার প্রাণের ঢাকনি" দীপ্তেন বাবুর কাছে খুলে গেছে–সে ভাল কথা। কিন্তু যে সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি, যে সুতীক্ষ্ণ বিশ্লেষণী শক্তি ও অনুধাবন ক্ষমতার সাথে তিনি গোটা পূর্ববঙ্গকে দেখে গেলেন তা নিঃসন্দেহে মৌলিক। দু'চারদিনের জন্যে কোন বিদেশ ঘুরে এসে মাসিক পত্রে সে দেশ সম্পর্কে লম্বা প্রবন্ধ ফাঁদতে আমরা দেখেছি, কিন্তু সে প্রবন্ধে যে এমন হাস্যকর বস্তু থাকতে পারে তা আমাদের ধারণা ছিল না। দীপ্তেন বাবু সে অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ আমাদের দিলেন, এ জন্যে উপসংহারে আবার তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সংস্কৃতি সংবাদ

অশ্লীল পত্র-পত্রিকা

আজাদী লাভের পর প্রায় সাত বৎসর গড়িয়ে চলল। কিন্তু স্বাধীন দেশের নাগরিকদের চেতনা ও মননশীলতার বিকাশের একটি সুষ্ঠু পরিবেশ এখনও আমাদের দেশে গড়ে উঠতে পারেনি। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীরা আমাদের জন্য শুধু রাজনৈতিক গোলামী ও অর্থনৈতিক দারিদ্র্যই বয়ে আনেনি, আমাদের সংস্কৃতিকেও তারা বিপর্যস্ত করে দিয়েছিল। পাকিস্তানকে সুখী ও সমৃদ্ধশালী হিসেবে গড়ে তুলতে হলে প্রয়োজন সুষ্ঠু সাংস্কৃতিক চেতনার পরিচ্ছন্ন বিকাশের। কিন্তু আজ আমাদের দেশে সুষ্ঠু সাংস্কৃতিক পরিবেশ সৃষ্টি করবার পথে বহু দেশী-বিদেশী অশ্লীল পত্র-পত্রিকা মারাত্মক অন্তরায়

সৃষ্টি করে আসছে। পাক-বাংলার রাজধানী ঢাকা ও অন্যান্য শহরের বুকস্টল (book stall) গুলিতে ছায়া-ছবি ও যৌন পত্রিকার প্রাচুর্য্য দেখে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারে আচ্ছন্ন। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি বিদেশী পত্রিকার-ন্যূড ও ট্রু-রোমান্স প্রভৃতি নামে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই ধরনের রুচিবিহীন যৌন আবেদনমূলক উলঙ্গ চিত্র সম্বলিত পত্র-পত্রিকার বহুল আমদানী ও অবাধ বিতরণের ফলে আমাদের দেশের অগণিত অপরিণত বয়স্ক ছাত্র ও যুবক সম্প্রদায়ের বিপথগামী হওয়ার আশংকা আজ বিশেষভাবে দেখা দিয়েছে। ইহাই সবচাইতে মারাত্মক সমস্যা। উপরন্তু বছরের পর বছর এই জাতীয় পত্র-পত্রিকা বিদেশ হতে আনার ফলে দেশের কষ্টলভ্য হাজার হাজার বিদেশী মুদ্রার অপচয় হচ্ছে। এই ধরনের পত্র-পত্রিকা যে আমাদের জাতীয় সাংস্কৃতিক পরিবেশে গড়ে তোলার পথে ভয়ানক প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে চলেছে–ইহা অত্যন্ত মর্মন্তুদ। এই জাতীয় পত্র-পত্রিকা আমদানী ও বিতরণের ব্যাপারে লাইসেন্স অনুমোদন করার সময় সরকারীভাবে ইহার উপর বাধা-নিষেধ আরোপ করা আশু প্রয়োজন। আমরা এদিকে আমাদের সরকারের আশু দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আশা করি সরকার অনতিবিলম্বে এই জাতীয় পত্র-পত্রিকা বিদেশ হতে আমদানী করার লাইসেন্স দেওয়া বন্ধ করে দিয়ে আয়াসলব্ধ বিদেশী মুদ্রার অপচয় বন্ধ করে দেবেন। ফলে আমাদের দেশে আকাঙ্ক্ষিত সুষ্ঠু সাংস্কৃতিক পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারবে। পশ্চিম পাকিস্তান হতেও এ ধরনের দু'একটি নগ্ন পত্রিকা ইংরেজী ও উরদু ভাষায় ছায়া-চিত্রতারকাগণের নগ্ন ছবি সম্বলিত হয়ে পূর্ব-পাকিস্তানে আসছে। পূর্ব-পাকিস্তানেও চিত্রতারকাগণের নগ্ন ছবি দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক পত্রিকা ছাড়াও শহরের বিভিন্ন প্রচারপত্রে ও প্রাচীরে স্থান লাভ করছে। এই ধরনের প্রচার যে অজ্ঞাতসারে জাতির নৈতিক চরিত্রহীনতা ঘটানোর ব্যাপারে ব্যাপকভাবে ক্রমাগত সাহায্য করছে–ইহা অনস্বীকার্য। এ জাতীয় পত্র-পত্রিকাগুলির মালিকগণ তাদের রুচিবিহীন প্রচারকার্যের মারফতে নিজ নিজ আয়ের পথ প্রশস্ত করছেন, কিন্তু এর বিনিময়ে মানুষের সুপ্ত যৌন চেতনাকে জাগ্রত করার ব্যাপারে এরা যে ভূমিকা গ্রহণ করছেন তাও রীতিমত শঙ্কাপ্রদ। পত্র-পত্রিকা ব্যতীত ছায়াচিত্র সম্বন্ধেও আমাদের জোর আপত্তি রয়েছে। বিকৃত রুচির ছায়াচিত্র আমাদের ভবিষ্যত নাগরিকগণের কোমল মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে সাংস্কৃতিক জীবনে তাদেরকে পরের অনুকরণপ্রিয় করে তুলবার মত মারাত্মক প্রতিক্রিয়া দেখা দেওয়া স্বাভাবিক। এমতাবস্থায় ছায়াচিত্র আমদানীর ব্যাপারে সরকারকে আরও জোরালো গোছের বাধা নিষেধ আরোপ করার জন্য করদাতাদের দাবী বিবেচনা করার জন্য আমরা অনুরোধ করছি।

আমরা আরও মনে করছি যে, পাকিস্তানের বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে অনতিবিলম্বে অশ্লীল পত্র-পত্রিকা ও ছায়াচিত্র বিদেশ হতে আমদানী ও দেশের মাটিতে তাদের জন্মের প্রতি কড়া বাধা নিষেধ আরোপ করা সরকারের কর্তব্য। তা না হলে জাতীয় জীবনে এর যে সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া ও মারাত্মক কুফল দেখা দেবে তা ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে।

সৈয়দ মুস্তফা জামাল

ঘোড়দৌড়ের পুনঃপ্রবর্তন

বিষয়টি ঠিক সংস্কৃতি সংবাদের পর্যায়ে না পড়লেও ঘোড়দৌড় প্রবর্তনের সাম্প্রতিক সংবাদটি নিঃসন্দেহে সংস্কৃতি সচেতন মানুষ মাত্রকেই সচকিত করেছে বলে সে সম্পর্কে আলোচনা সংস্কৃতি সংবাদের পর্যায়ে ফেলা চলে। বস্তুতঃ এ সংবাদে সচকিত হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক, কেননা এতে করে সংস্কৃতির উপর আরো একটি অশুভ আক্রমণ উদ্যত হওয়ার আশঙ্কা করা যাচ্ছে। শুধু আশঙ্কা নয়, ঘোড়দৌড়ের প্রবর্তনের সাথে সাথেই তা সত্যে পরিণত হবে। অশ্লীল পত্র-পত্রিকা, নোংরা ছায়াছবি যেভাবে আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনে দুষ্ট ক্ষতের সৃষ্টি করেছে, তেমনি আরো একটি ক্ষত ঘোড়দৌড় যে সৃষ্টি করবে তাতে সন্দেহ করবার অবকাশ কোথায়?

দেশের এক বিরাট অংশের দৃষ্টি খেলাটি প্রবর্তিত হওয়ার সাথে সাথেই সেদিকে আকৃষ্ট হবে–তার ফল দাঁড়াবে মারাত্মক। 'স্পোর্টস' বলে যাকে অভিহিত করা হচ্ছে সমস্ত দেশের পক্ষে তা প্রমাণিত হবে নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর বলে। কতিপয় প্রতিষ্ঠান 'ইকনমিক এইড', 'শব্দ পূরণ' ও 'শব্দ সন্ধান' প্রতিযোগিতা প্রভৃতির নামে যে খেলা খেলে জাতীয় জীবনের পক্ষে অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার সৃষ্টি করে তুলেছিল এবং এখনো ক্রমান্বয়ে তুলেই চলেছে, তারি সাথে ঘোড়দৌড় নতুন স্রোতের সৃষ্টি করে আবহওয়াকে আরো বিষাক্ত করে ফেলবে। ফলে যে ভয়ানক অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের সৃষ্টি হবে তাতে করে আমাদের সাংস্কৃতিক জীবন আরো গভীরভাবে পর্যুদস্ত হতে বাধ্য হবে।

সে জন্যে দেশের প্রতিটি সচেতন মানুষের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে আমরাও ঘোড়দৌড় খেলা পুনঃপ্রবর্তন না করার জন্যে দাবী জানাচ্ছি।

–খোরশেদ আলম

নতুন বই

কুলসুম

গল্পের বই। আব্দুল হাই মাশরেকী॥ শাহজাহান লাইব্রেরী, বাবু বাজার, ঢাকা॥ দামঃ এক টাকা আট আনা।

পূর্ববাংলায় কথাশিল্পের উন্নতির জন্য চেষ্টা চলছে। এদিকে কয়েকজন লেখকের বিশেষ লক্ষ্য দেখা গেছে। বিভাগোত্তর পূর্ববাংলার কৃষ্টি, জীবন অবলম্বনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নিয়ে যে কয়েকজন সাহিত্যিক সাহিত্য আসরে এগিয়ে এসেছিলেন কবি আব্দুল হাই মাশরেকী এঁদেরই একজন। কবি বেশ কিছুদিন আগে থেকেই লিখছেন। সম্প্রতি তাঁর ছোট গল্পগ্রন্থ 'কুলসুম' প্রকাশিত হলো। মাশরেকী সাহেবের কবিতা ইতিমধ্যে বাংলার সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। পূর্ববাংলার গ্রাম্য জীবনের কথার সুর ছড়িয়ে আছে তাঁর কবিতায়, সেখানে গ্রামের রাখাল, কৃষাণ-কৃষাণী কথা বলে ওঠে সহজ সুরে অকৃত্রিম কণ্ঠে। কুলসুমের কাহিনী চতুষ্টয় অনুরূপ গ্রাম জীবনের বিভিন্ন দিকের রূপায়ণ।

লেখকের প্রথম গল্প 'বাঁশি' আঙ্গিকে অসাধারণত্ব দাবী করতে পারে না। এখানে কবির সংবেদনশীলতার জন্য চরিত্র স্পষ্ট। কিন্তু গল্পের অন্যান্য দিক দুর্বল। 'নীল পাহাড়' লেখকের সার্থক সৃষ্টি, কাহিনী বিন্যাস প্রশংসা, তবু কাহিনীর পরিবেশ সৃষ্টি করতে লেখক একটু বেশী কথা বলেছেন। নীল পাহাড়ের সঙ্গে সম্বন্ধ রেখে নায়কের রোমান্টিক মন অত্যন্ত সহজ ও সুন্দরভাবে পাঠকের মন আকর্ষণ করে। 'কন্যা' লেখকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প। বিয়ের কথার শুরুতে নায়িকাচিত্তের আলোড়ন স্বাভাবিকভাবেই গল্পে বলা হয়েছে মাতৃস্নেহ কন্যার বিয়ের পর যে সুখ-স্বপ্ন রচনা করে সেখানে হৃদয়ের প্রগাঢ় অনুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়। অপরদিকে আজন্ম স্নেহে যত্নে লালিত কন্যার বিচ্ছেদব্যথা মাতৃমনকে ব্যথায় নিঃসাড় করে ফেলে। এই চিরন্তন বেদনাবোধের শৈল্পিক রূপায়ণ লেখকের শক্তি সম্বন্ধে, অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে পাঠকের মনকে সচেতন করে। 'কুলসুম' গল্পে লেখক সমাজের দুই শ্রেণীর স্বাভাবিক দ্বন্দ্ব স্পষ্ট করে তুলেছেন। কঠোর পরিশ্রমের পর যে মানুষ গৃহ-সুখের আশ্রয় প্রেমপরায়ণা স্ত্রীর সাহায্যে ক্ষণিকের জন্যও দুর্লভ সম্পদ খুঁজে পায়, সেখানে প্রভুর নির্মম হস্ত সে সুখে বাধা দেয়। আজকের যুগে মানুষের হৃদয়ের এত বড় ভয়াবহ দুর্দশা লেখক আশ্চর্য সুন্দরভাবে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

মাশরেকী কবি, পল্লীর অভিজ্ঞতা তাঁর রচনায় স্পষ্ট। মানুষের সুখ-দুঃখের প্রতি তাঁর সহানুভূতি অপরিসীম। কিন্তু তবু উপন্যাসের ক্ষেত্রে লেখকের যে স্বাধীনতা রয়েছে, গল্পের ক্ষেত্রে তার স্থান নেই। মাশরেকী সাহেবের গল্পে এই লক্ষণ দেখেছি। এদিকে সতর্ক হলে তার অভিজ্ঞতাপ্রসূত কাহিনী অধিকতর সমাদর লাভ করবে সন্দেহ নেই। 'কুলসুম' সুধী সমাজে সমাদৃত হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

—জহুরুল আলম

দুরন্ত ঢেই

নাটিকা সঙ্কলন॥ আসকার ইবনে শাইখ॥ প্রাপ্তিস্থান ঃ তমদ্দুন লাইব্রেরী, ১৯, আজিমপুর ঢাকা। পাঁচ সিকা।

সাহিত্যে অন্য যে কোন শাখার চেয়ে সমকালীন মন ও মানসের প্রতিফলন নাটকের ওপর পড়ার অবকাশ বেশী-এ কথা স্বীকার করতেই হবে। নাট্যকারের ওপর পারিপার্শ্বিক পরিবেষ্টনীর প্রভাব তো পড়ছেই, তার চেয়েও বড় কথা সচেতনভাবেও নাট্যকার নিয়ন্ত্রিত হচ্ছেন সমকালীন মানুষের চিন্তাধারার দ্বারা। কেননা সমসাময়িক দর্শকদের তৃপ্তি দেওয়ার জন্যেই তাঁর রচনা, সমকালীন শিল্পীরাই তাঁর অভিনেতা-অভিনেত্রী, আর সে নাটক মঞ্চস্থ করার পেছনে যারা থাকছেন তারাও সমকালীন সমাজেরই মানুষ। আসকার ইবনে শাইখের নাটিকা সঙ্কলন 'দুরন্ত ঢেউ' সম্পর্কে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য হলো এই যে সমকালীন মানসের প্রভাব সঙ্কলিত নাটিকা চারটির মধ্যেই বর্তমান।

যে নাটিকার নামানুসারে বইয়ের নামকরণ করা হয়েছে সে নাটক-'দুরন্ত ঢেউ'-'দ্যুতি'তে প্রকাশিত হয়েছিল এবং সে কারণে 'দ্যুতি'র পাঠকদের সাথে তার পরিচয় থাকার কথা। মোটামুটিভাবে একে সঙ্কলিত নাটিকাগুলোর মূল সুরের প্রতিনিধিত্ববাহী বলা চলে। আর একটি মাত্র লাইনে যদি উপরোক্ত নাটিকাটির সমগ্র বক্তব্যকে উপস্থাপিত করতে হয় তাহলে সে লাইনটি হবে এইঃ

"'ভয় নেই, ঢেউয়ের আঘাতে ধসে পড়ছে শক্ত উঁচু পাড়, ভেঙ্গে পড়বে অন্যায়ের পাষাণ পাঁজা, দুরন্ত ঢেউ আজ সবখানে।"

'দুরন্ত ঢেউ' ছাড়া 'দুর্যোগ', 'যাত্রী' ও 'আওয়াজ' নামক আরো তিনটি একাঙ্কিকা বইতে স্থান পেয়েছে।

নাটকের অপরিহার্য যে সংঘাত প্রথম তিনটি নাটিকাতে রয়েছে, তা বলা চলে মূলত প্রায় এক। সংসারের বন্ধনও ও আদর্শের আহ্বান-সংঘাতটা মূলতঃ এই দু'য়ের ভেতরেই। 'দুর্যোগে' কর্মী আমজাদকে টানছে 'রাজকন্যা' রিজিয়া, 'যাত্রী' এসরার সেলে বসে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে "দুঃখভরা সংসারের নানা ছবি", আর 'দুরন্ত ঢেউয়ে' আজহার প্রশ্ন করছে সায়েরাকে "তুমি আসবে সায়েরা আমাদের পথে?"-সায়েরা আসতে পারছে না, বরং আজহারের জন্যে যেন বন্ধনই সৃষ্টি করছে। 'আওয়াজে' বিরোধ বেঁধেছে ন্যায় এবং অন্যায়ের মধ্যে।

নাট্যকার আশাবাদী। তাই দেখি দুর্যোগের মাঝেই এগিয়ে যাচ্ছে আমজাদ। এসরার শেষ পর্যন্ত ঘোষণা করছে–"দুর্নিবার যাত্রীদল–আমিও এদেরই একজন"। সায়েরা নিজেই চলে যাচ্ছে আজহারদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে; আর সামাজিক

অন্যায়ের প্রতীক "মওজুতদার আলিম চকদার" শেষ পর্যন্ত নিজ হাতে চাবি বের করে দিচ্ছে মওজুত ধানের গোলার 'ভাঙ্গন' দেখতে।

সমসাময়িক মন ও মানসের ছাপ বহন করলেও একথা সত্য যে, উপস্থাপিত সংঘাতগুলো নিঃসন্দেহে চিরন্তন বলে মর্যাদার দাবী করতে পারে। এ কারণে সমকালীন চিন্তাধারার প্রতিফলন বহন করলেও নাটিকাগুলোকে নেহায়েৎ 'সাময়িক'- অর্থাৎ বর্তমানেই শুধু যার মূল্য থাকবে–এমন বলা চলে না। সামাজিক সংঘাতের প্রতিভূ হিসেবেই যে শুধু চরিত্রগুলোর মূল্য তা নয়-'চরিত্র' হিসেবেও তাদের মূল্য নিঃসন্দেহে স্বীকার্য।

'দুর্যোগ', 'যাত্রী' ও 'দুরন্ত ঢেউয়ের' নায়ক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ। আর তাদেরকে কেন্দ্র করে যে সংঘাত বেঁধে উঠেছে আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা থেকেই তার উৎপত্তি। 'দুর্যোগে'র আমজাদের বিয়ে হওয়ার কথা ধনীর একমাত্র কন্যা রিজিয়ার সাথে, পরীক্ষা দেওয়ার কথা সি,এস,পি। 'যাত্রী' এসরার বণ্ড লিখে দিয়ে অনায়াসে জেল থেকে বেরিয়ে আসতে পারে, তারো ছিল 'সুখের সংসার', দিন ছিল 'আনন্দ আহ্লাদের', এখনো সে 'সামলাতে পারে' নিজের 'ঘর'। আর 'দুরন্ত ঢেউয়ে'র আজহার স্বীকার করে নিতে পারতো সায়েরার বন্ধনকে-তবু তারা কেউ তা করল না, পা বাড়াল দুর্যোগের তরঙ্গ-সঙ্কুল পথে।

আমাদের সাহিত্যে নাটকের অভাব সুবিদিত। সে অভাব পূরণে আসকার ইবনে শাইখের প্রচেষ্টা ইতিমধ্যে স্বীকৃতি পেয়েছে। আর একাঙ্কিকা নাটিকার সঙ্কলন এ পর্যন্ত প্রায় প্রকাশিত হয়ইনি বলে, 'দুরন্ত ঢেউ'কে একটি স্থায়ী অভাব মেটানোর জন্যে বলিষ্ঠ প্রচেষ্টা বলে অভিহিত করা চলে।

নাটক রচনা যদি কঠিন হয় তাহলে একাঙ্কিকা নাটিকা রচনা নিঃসন্দেহে কঠিনতর। সামান্য আয়তনের ভেতর চরিত্র রচনার সমস্যা ত আছেই; ঘটনা উপস্থাপন, তার প্রবাহ, উৎকর্ষ Climax ও নিম্নগমনের মধ্য দিয়ে পরিণতিতে নিয়ে যাওয়া এবং সেই সাথে সংঘাতের সৃষ্টি করাও কম দুরূহ নয়। তার জন্যে প্রয়োজন পরিমিতিবোধ ও সচেতন শিল্প-জ্ঞানের। সে প্রয়োজন কমবেশী 'দুরন্ত ঢেউ'তে মিটেছে-এ কথা বলা চলে। তবু অতিরিক্ত সীমিত বলে 'যাত্রী'কে অন্য তিনটি নাটিকার পাশে ম্লান মনে হয়। নাটকীয়তার অভাব হয়ত তাতে নেই কিন্তু এসরারের মনের দু'টো ভাবনার তীব্র বিরোধটাকে যে উপায়ে দর্শক সাধারণের কাছে পরিবেশন করার প্রচেষ্টা করা হয়েছে তাকে খুব বেশী শিল্প-কৌশল-সমৃদ্ধ বলা চলে না। মাত্র ছয় পৃষ্ঠার আয়তনে নাটিকাটি তাই পূর্ণভাবে আবেদনশীল হওয়ার অবকাশ পায়নি। এছাড়া 'দুরন্ত ঢেউ'য়ের পরিণতির সময়ে হঠাৎ গান শোনা যাওয়া এবং 'দুর্যোগে' 'পাশের

কোঠা থেকে রেডিওতে গান' বেজে উঠাটা মঞ্চের চেয়ে সিনেমা টেকনিকের কথাই বেশী করে মনে করিয়ে দেয়। পরিবেশের বর্ণনাতে নাট্যকারের নৈর্ব্যক্তিকতার অভাব লক্ষ্য করা গেছে।

একাঙ্কিকা নাটক রচনার ক্ষেত্রে লেখকের এ প্রচেষ্টাকে আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি।

-সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

পূর্ববাংলার কবিতা

কবিতা সংকলন।॥ সম্পাদনায় ঃ মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ ও আবু হেনা মোস্তফা কামাল॥ তমদ্দুন লাইব্রেরী, ১১, আজিমপুর রোড, ঢাকা থেকে প্রকাশিত॥ দামঃ দেড় টাকা।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে গত সাত বছর আমাদের সাহিত্যের গঠনমুখিতা নিয়ে পত্র-পত্রিকায় বিস্তর আলোচনা হয়েছে। পূর্ববাংলার সাহিত্য কোন্ রূপ নেবে এ নিয়ে তর্ক বিতর্কও কম হয়নি। গত সাত বছরের অভিজ্ঞতায় আমরা একটু উপলব্ধি করতে পেরেছি যে, এখানকার সাহিত্যে মত ও পথ নির্ধারণের চেষ্টা যতটুকু হয়েছে সে তুলনায় গঠনমূলক সাহিত্য খুব কমই সৃষ্ট হয়েছে। পাকিস্তানোত্তর যুগে সুষ্ঠু সাহিত্যালোচনা পরিণত হয়েছে অবাঞ্ছিত কলহ–কোন্দলে। ফলে সাহিত্যের সমৃদ্ধি ঘটার পরিবর্তে নেমে এসেছে সংশয়ের ছায়া। এ সংশয় তীব্রভাবে দেখা দিয়েছে আমাদের কবিদের মনে, বিশেষ করে কাব্য সাহিত্যে যারা সবেমাত্র আত্মপ্রকাশ করেছেন তাঁদের। এ ধরনের হতাশাব্যঞ্জক পরিবেশে পূর্ববাংলার বত্রিশজন আধুনিক কবির কবিতা সংকলন 'পূর্ববাংলার কবিতা'র আত্মপ্রকাশ নিঃসন্দেহে অভিনন্দনীয়।

আলোচ্য সংকলনে স্থান পেয়েছে ফররুখ আহমদ, আহসান হাবীব, তালিম হোসেন, মুফাখখারুল ইসলাম, সৈয়দ আলী আহসান, আবুল হোসেন, মতিউল ইসলাম, হাবীবুর রহমান, সিকান্দার আবু জাফর, আব্দুল হাই মাশরেকী, আশরাফ সিদ্দিকী, আবদুর রশীদ খান, চৌধুরী ওসমান, শামসুর রাহমান, আলাউদ্দীন–আল-আজাদ, মুযহারুল ইসলাম, মোহাম্মদ মামুন, জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, জাহানআরা আরজু, রওশন ইজদানী, সৈয়দ আলী আশরাফ, নুরুন্ নাহার, শাহেদা খানম, আবুল খায়ের মুসলেহ উদ্দিন, তরীকুল আলম, চৌধুরী লুৎফর রহমান, আবদুর রশীদ ওয়াসেকপুরী, আবদুল গাফফার চৌধুরী, মফিজ উদ্দিন আহমদ, মোহাম্মদ আজিজুল হক, মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ ও আবু হেনা মোস্তফা কামালের কবিতা।

ভূমিকায় সম্পাদকদ্বয় বাংলা সাহিত্যে মুসলিম চেতনা ও স্বাজাত্যবোধের ক্রমবিকাশের ধারা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং বিভাগোত্তর যুগের

পূর্ববাংলার সাহিত্যের সমস্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, "বিভাগ পরবর্তীকালে পূর্ব পাকিস্তানীদের আর্থিক, রাষ্ট্রীয় ও অন্যান্য বিপর্যয়ের সাথে সাথে সাহিত্য জগতে যে একটা বিশেষ সমস্যা মাথাচাড়া দেয় তা হলো– পূর্ববাংলার সাহিত্য কোন্ রূপ নেবে? পূর্ববাংলার সাহিত্য কী গঙ্গা-ভাগিরথী তীরে সমৃদ্ধ সাহিত্যকেই তার ঐতিহ্য হিসাবে গণ্য করবে, না যে সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য ও স্বাজাত্যবোধের তাগিদে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাকে ভিত্তি করে নতুন সাহিত্য গড়ে তুলবে।" এই সমস্যার সমাধানের পথ হিসেবে ভূমিকায় বলা হয়েছে, "দেশের আপামর সাধারণের জীবন নিয়ে যে সাহিত্য রচিত হয়নি তা কোন কালেই সাহিত্য পদবাচ্য নয়। পূর্ব পাকিস্তান তথা পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠের জীবন ইসলামের মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত ও নিয়ন্ত্রিত, কাজেই এখানকার সাহিত্য হবে ইসলামের মূল্যবোধ ভিত্তিক ...... সাহিত্যের এই ভাবধারা পূর্ববাংলার কাব্য সাহিত্যে বিশেষভাবে লক্ষণীয়।"

সম্পাদকদ্বয়ের এই মন্তব্যের প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁদের সংকলনের অধিকাংশ কবিতাতেই–যেমন ফররুখ আহমদ, তালিম হোসেন, মুফাখখারুল ইসলাম, সৈয়দ আলী আহসান, আবদুর রশীদ খান, সৈয়দ আলী আশরাফ ও আরো অনেকের কবিতয়।

ভূমিকায় বলা হয়েছে যে, "আদর্শের কথা ছাড়াও পূর্ববাংলার সাহিত্যের প্রকাশভঙ্গি কলিকাতা-কেন্দ্রিক সাহিত্য থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, কারণ, কলিকাতাকেন্দ্রিক সাহিত্যের ভাষা, রূপক, উপমা, উৎপ্রেক্ষা প্রভৃতি এখানকার মানুষের চিন্তাধারা ও জীবন পদ্ধতির মূলীভূত নয়।......এ সংকলনে যে সব কবিতা স্থান পেয়েছে তাতে সামগ্রিকভাবে পূর্ববাংলার নিজস্ব সুরের পরিচয় পাওয়া যাবে বলে আশা করি। সংগৃহীত কবিতাগুলোতে আছে দেশজ অনুভূতির রূপায়ণ, ইসলামী আদর্শের কাব্যরূপে ব্যক্তিমানসের অভিব্যক্তি।" সম্পাদকদ্বয়ের এ মন্তব্যের যথার্থ পরিচয় প্রায় সবগুলো কবিতাতে থাকা সত্ত্বেও এ কথা না বলে উপায় নেই যে, সংকলনের কয়েকটি কবিতায় পশ্চিম বাংলার কবিদের অনুকরণের ছাপ সুস্পষ্ট। দৃষ্টান্তস্বরূপ শামসুর রাহমানের 'তার শয্যার পাশে' উল্লেখ করা যায়। এতে পশ্চিম বাংলার কবি জীবনানন্দ দাশের প্রভাব সুগভীর।

পরিশেষে আমরা তরুণ সম্পাদকদ্বয়কে এ জন্যে অভিনন্দন জানাচ্ছি যে, এ ধরনের একটি সামগ্রিক ও সুষ্ঠু কবিতা সংকলন করে তাঁরা পূর্ববাংলার সাহিত্যের সমৃদ্ধি সাধন করেছেন। বইটির ছাপা বাঁধাই প্রশংসনীয়।

গ্রন্থপঞ্জি

ডক্টর শ্রীরমেশ চন্দ্র মজুমদার, বাংলা দেশের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড (প্রাচীন যুগ,) ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৯৭৪ সাল।

ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়, 'বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)'-এর সংক্ষেপিত সংস্করণ, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, নিউ এজ সংস্করণ, ১৯৬০ সাল।

অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু, বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৫৯ সাল।

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ, গৌড়রাজমালা, প্রথম নবভারত সংস্করণ, ১৯৭৫ সাল।

অধ্যাপক অতীন্দ্র মজুমদার, চর্যাপদ, ১৯৭২ সাল।

শ্রী অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, গৌড়রাজমালার উপক্রমণিকা।

ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, মুসলিম বাঙ্গালা সাহিত্য, প্রথম মুদ্রণ, ১৯৫৭ সাল।

মানবেন্দ্রনাথ রায়, ইসলামের ঐতিহাসিক অবদান, অনুবাদঃ মুহম্মদ আবদুল হাই, তৃতীয় সংস্করণ, ডক্টর আবদুল করিম, বাংলার ইতিহাস, সুলতানী আমল, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭, ১৯৬৯ সাল।

আবদুল হালিম, ইতিহাসের রূপরেখা, প্রকাশ ভবন, ঢাকা, ১৯৬৯ সাল।

অধ্যাপক আবদুল গফুর, ইসলামে ক্রীতদাস প্রথা (প্রবন্ধ), অগ্রপথিক, ৩রা জুলাই, ১৯৮৬ সাল।

শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায়, বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৮০ সাল।

আবদুল মওদুদ, মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ ঃ সংস্কৃতির রূপান্তর, নওরোজ কিতাবিস্তান, প্রথম সংস্করণ, ১৯৬৯ সাল।

ডক্টর এম, এ, রহিম, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, অনুবাদ ঃ মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান, বাংলা একাডেমী, ১৯৮২ সাল।

সুফীবাদ ও আমাদের সমাজ, নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৬৯ সাল।

শ্রী অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়, মীর কাসিম, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, চতুর্থ সংস্করণ, ১৩১২ সন (বাংলা)।

ফজলুল হাসান ইউসুফ, বাংলাদেশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬ সাল।
কার্ল মার্কস ফ্রেডারিক এঞ্জেলস, প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা-যুদ্ধ ১৮৫৭-১৮৫৯, মস্কো।
উইলিয়াম হান্টার, দি ইন্ডিয়ান মুসলমান, অনুবাদ ঃ আবদুল মওদুদ, আহমদ পাবলিশিং হাউস, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৯৬৮ সাল।
অরবিন্দ পোদ্দার, উনবিংশ শতাব্দীর পথিক।
সুপ্রকাশ রায়, ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৭২ সাল।
সুপ্রকাশ রায়, ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭০ সাল।
শ্রীনিখিলনাথ রায়, মুর্শিদাবাদ-কাহিনী, তৃতীয় সংস্করণ, ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশিং কোং, কলিকাতা, ১৩১৬ সন।
আবদুল মান্নান তালিব, বাংলাদেশে ইসলাম, আধুনিক প্রকাশনী ঢাকা, ১৯৮০ সাল।
মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা, চর্যাগীতিকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, বাংলা সাহিত্যের কথা, প্রথম খণ্ড, রেনেসাঁস প্রিন্টার্স ১৯৫৩ সাল।
আখতার ফারুক, বাংগালীর ইতিকথা, জুলকারনাইন পাবলিকেশন্স, ঢাকা, নূতন সংস্করণ, ১৯৮৫ সাল।
আল্লামা সৈয়দ সুলায়মান নদভী (মূল), নবী চিরন্তন, অনুবাদ ঃ মাওলানা আবদুল্লাহ্-বিন-সাঈদ জালালাবাদী, ১৯৭৫, পৃ. ১০১।
আবদুল মান্নান তালিব, বাংলাদেশে ইসলাম, ১৯৮০, পৃ. ৬৪-৮৮।
সুফীবাদ ও আমাদের সমাজ, নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৬৯, পৃ. ১৬৩।
J. W. Kaye, A History of Sepoy War, Vol. 1, P. 498.
History of Bengal, Vol. 11, edited by Sir Jadunath Sarkar, The University of Dacca, 1972.
Michael Edwardes, A History of India, First NEL, Mentored, 1967.
M. N. Roy, The Historical Role of Islam, Bombay, Fourth Impression, 1938.
Dr. Nalini Kanta Bhttashali, Coins and Chronology of the Early Independent Sultans of Bengal, First Reprint, 1976.
Dr. Muhammad Mohar Ali, History of the Muslims of Bengal, Vol. 1A & IB, Imam Muhammad Ibn Sa'ud Islamic University, Riyadh, 1985.
C. E. Buckland, Bengal under the Lieutenant Governors, Vol. 1 & 11, Second Edition, DEEP Publications, New Delhi, 1976.

Dr. Dipasri Banerjee, Aspects of Administration in Bengal: 1898-1912, New Delhi, 1980.
Proceedings on Debates of Council of States, Bengal: 1922, 1927, 1930, 1934, 1939, 1943, 1944,1946.
Macaulay, T.B., Essays on Lord Clive.
Dutt, R. C., Economic History of India, 1906.
Report, Select Committee, H. C., 1931-1932.
Younghusband, Transactions in India, 1786.
O' Malley, L.S. S., Bengal, Bihar and Orissa under British Rule, Cambridge, 1917.
Karl Marx, Future Results of British Rule in India, (Selected Works).
Woodrow, H., Macaulay's Minutes on Education in India, Calcutta, 1862.
Lorenz, The Round The World Traveller.
Misra, B.B., The Indian Middle Class: Their Growth.
Nehru, Jawaherlal, The Discovery of India.
Trevelyan, G.C., Life and Letters of Lord Macaulay, Vol. I, 1876.
Ram Gopal, Indian Muslims: A Political History.
Report From the Select Committee of the House of Commons on the Affairs of the East India Company, 1831-1832.
Khundakar Fuzli Rubbi, The Origin of the Musalmans of Bengal published in the Journal of East Pakistan History Association, 1968.
Malleson, C.B., The Decisive Battles of India, London, 1883.

ইফাবা- ২০০৪ - ২০০৫ - প্র/ ৫৮৬৬ (উ) - ৫২৫০

লেখক-পরিচিতি

নাট্যকার আসকার ইবনে শাইখ। প্রকৃত নাম মুহম্মদ ওবায়দুল্লাহ্, এম. এস-সি. পি এইচ. ডি। জন্ম ৩০ মার্চ ১৯২৫, ময়মনসিংহ জেলার মাইজহাটি গ্রামে। প্রবেশিকা পরীক্ষা ময়মনসিংহ জিলা স্কুল, বি. এস-সি ময়মনসিংহের আনন্দ মোহন কলেজ, এম.এস-সি. ও পি-এইচ. ডি. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১৯৫১ সালে লেকচারার হিসাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগে যোগদান, ১৯৬৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েরই পরিসংখ্যান গবেষণা ও শিক্ষণ ইনস্টিটিউটে সহযোগী অধ্যাপক হিসাবে যোগদান এবং ১৯৯০ সালে প্রফেসর হিসাবে অবসর গ্রহণ। ১৯৪৭-এর পর আরম্ভ হয় জনাব শাইখের নাট্য-সাধনা। তাঁর প্রথম নাটক 'বিরোধ' মঞ্চস্থ হয় ১৯৪৯ সালে। 'বিরোধ'ই ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মঞ্চস্থ মুসলমান সমাজের উপর কোনও মুসলমান নাট্যকারের রচিত প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাটক। তাঁর প্রকাশিত নাটক-নাটিকার সংখ্যা ১২০-এর উপর। দীর্ঘকাল যাবত তিনি রেডিও-টেলিভিশনের জন্য নিয়মিত নাটক লিখে আসছেন এবং অভিনয় ও নির্দেশনা করছেন। এদেশের মানুষের মন ও মানস, তাদের ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও চেতনা, তাদের জীবন-সংগ্রাম ও আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন তাঁর নাট্যকৃতির প্রধান বৈশিষ্ট। তিনি অনলস নাট্যকর্মী।

বাংলাদেশী নাটকের উন্নয়নে তাঁর অবদান অসামান্য। চারদিকে আজ নাট্য-প্রয়াসের যে শুভ কর্মচাঞ্চল্য, তার সূচনাকারীদের প্রধান পুরুষ জনাব শাইখ। স্বগৃহে 'নাট্য একাডেমী' স্থাপন করে তিনি বহু নাট্যোৎসাহীকে হাতে-কলমে নাট্য বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছেন। ১৯৬১ সালে নাট্য-সাধনার স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি পান 'বাংলা একাডেমী পুরস্কার'। আর ১৯৮৬ সালে তিনি লাভ করেন জাতীয় পুরস্কার 'একুশে পদক'।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ